সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০০৯

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.bjilibrary.com

সেমিনার-প্রবন্ধ সংকলন
২০০৯

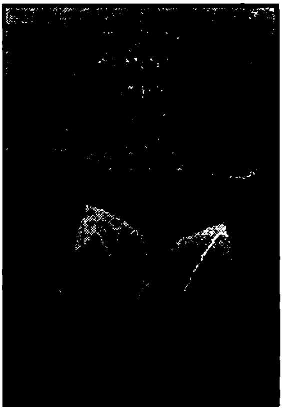

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

সেমিনার বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ভারত উৎসারিত বাংলাদেশবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাস

আজিজুল হক বান্না

■

ভূমিকা

পঠিতব্য মূল বিষয়ে যাবার আগে আমি মনে করি, বাংলাদেশ কেন ভারতের মতো বৃহৎ ও নিকটতম প্রতিবেশীর সামগ্রিক আক্রমণের টার্গেট, তার কার্যকারণ খুঁজে দেখা দরকার। আর এ জন্য আমাদেরকে ইতিহাসের পেছনের ঘটনাবহুল অধ্যায়ে আলোকপাত করা ছাড়া কোন উপায় নেই। যদিও ঘটনা প্রবাহের ঐতিহাসিক ধারাভাষ্যকে অনেকে ভারত বিরোধী মানসিকতার চর্বিতচর্বন বলে ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। অথবা দু'টি দেশের মধ্যকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে অতীতচারিতাকে টেনে আনাকে পাকিস্তান পর্বের ভারত বিরোধী ফোবিয়ার সাথেও সরলীকরণ করতে পারেন। কিন্তু ভারতের সামরিক আসামরিক নীতি নির্ধারক গবেষক-নিরাপত্তা বিশ্লেষক সাংবাদিক রাজনীতিক, ধর্মীয় নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে সবার মাঝেই বাংলাদেশ বিরোধী একটা প্রচারণার ঐক্যতান লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এর উৎস বা পটভূমি কী? এই সাথে প্রাসঙ্গিক যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হচ্ছে, ভারতের জনগণের অগ্রসর অংশের এবং সরকারী পর্যায়ের বাংলাদেশ বিরোধী ঢালাও অপপ্রচারের জন্য বাংলাদেশ বা এ দেশের জনগণ কতটা দায়ী? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাংলাদেশ ভারতীয় এই বুদ্ধিবৃত্তিক সামরিক-অসামরিক আমলাতন্ত্রের কূট প্রচারণার বিষ-দংশন থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারে? কিংবা ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সৌহার্দের হাত প্রসারিত না হলে বাংলাদেশ একা কখনও এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারবে কি না।

বাংলাদেশের জন্য ভারতীয় সরকারী বেসরকারী বুদ্ধিজীবী ও কুশলী প্রচারকদের মুকাবিলায় দু'ধরনের সমস্যা রয়েছে। প্রথমত : ভারতে যেমন বাংলাদেশকে ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বলয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ছায়া গ্রাসে 'লীন' করার একটি সর্বাত্মক জাতীয় লক্ষ্য ও কর্মনীতি গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশে তা হয়নি। ভারতের দিক থেকে এটাকে তার আগ্রাসী জাতীয়তাবাদাশ্রিত দেশপ্রেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ভারতীয় হিন্দুদর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রান্তিক দেশপ্রেম হিটলারের উগ্রজাতীয়তাবাদের সাথে তুলনীয় হলেও গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে এটিকে তারা জাতীয় অহংকার ও ঐক্যের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। একুশ শতকে ভারতকে 'আঞ্চলিক সুপারপাওয়ার' থেকে 'বৈশ্বিক সুপারপাওয়ারে' উন্নীত করার জাতীয় চেতনার সাথে রাজনীতিক-সামরিক-অসামরিক-আমলা-বুদ্ধিবৃত্তিক থিংকট্যাংককে একাট্টা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশে ভারতের আগ্রাসন, অবিরাম অন্তর্ঘাত, বৈরিতা অনুধাবন করা এবং জাতি-রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অনিবার্যিক স্বার্থে ভারতের চানক্য কুশলী যুদ্ধ মুকাবিলায় বাংলাদেশে রয়েছে নানা মত ও পথ। অর্থাৎ জাতি-রাষ্ট্র দুর্বল করে তাকে কুক্ষিগত বা পদানত করে রাখার ভারতীয় নীলনকশাকে মুকাবিলায় বাংলাদেশ কোন অভিন্ন জাতীয় নীতি অবস্থান গড়ে তুলতে পারেনি।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে ভারতের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা, জাতিগত মনস্তাত্ত্বিক হীনমন্যতা এবং ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিরকালীন শৃংখলজনিত মানসিক প্রতিবন্ধী চেতনা জাতিগত দেশপ্রেমকে খন্ডিত, বিকৃত বা আত্মসমর্পিত করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত : ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখরতায় এবং প্রতিরোধের সক্রিয়তায় যাদেরকে অগ্রসরমান দেখা যায়, তাদের একটি বড়ো অংশের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিতর্কিত বা ভূমিকার সূত্রে ভারত বিরোধিতাকে 'স্বাধীনতা বিরোধী' ধারার সাথে একাকার করে এর গুরুত্ব ও জনগণের কাছে তার আবেদনকে খাটো করে দেখানো হয়ে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক শহীদ জিয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে দিকদর্শন দিয়েছেন, যার ভিত্তি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী দর্শন যার প্রাণস্পন্দন, তাকে যারা ধারণ ও লালন করছেন, দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে তাদের নেতৃত্বও ভারতের প্রশ্নে সুসংহত, সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত নীতি কৌশলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। ক্ষমতাসীন

www.bjilibrary.com

অবস্থায়ও জাতীয়তাবাদী সরকার এডহক ভিত্তিতে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের পর জাতীয়তাবাদী শক্তি তাদের নীতি আদর্শ-লক্ষ্যসমূহ কাগজে কলমে বন্দী রেখেই ক্ষমতার দায়শোধ করেছে। ফলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে রাষ্ট্র নির্মাণ ও জাতি রাষ্ট্র রক্ষার মূল সূত্র অন্তর্হিত হয়ে ক্ষমতার রাজনীতির স্থূলতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই অবক্ষয় ও বিচ্যুতি থেকে উদ্ধার লাভের উপায় বের করা রাজনীতিকদেরই দায়িত্ব। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী মহলও দিশাহীন লক্ষ্যচ্যুত রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার দীর্ঘশ্বাস চাপছেন। অসংগঠিত ও লক্ষ্যহীন জাতি অতি সহজেই বিদেশী আগ্রাসনের শিকার হতে পারে। এদেশের ইসলামী শক্তিসমূহের মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার সূত্রে জাতি-রাষ্ট্র রক্ষার চলমান সংগ্রামকে তাদের নেতৃত্বদানের গ্রহণযোগ্যতাকে 'স্বাধীনতা বিরোধিতার' প্রশ্নে দুর্বল করে জনগণের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার নানা কূটকৌশল চলছে। এ ধরনের যুথবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে ওঠার আগেই ইসলামী শক্তিকে নির্মূলের নিশানা বানানো হয়েছে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করণ, ৩৮ বছর আগের তামাদী হয়ে যাওয়া 'যুদ্ধাপরাধীদের' বিচারের দাবী তুলে একাত্তরের যুদ্ধের ধারায় জাতিকে অতীতমুখী ও বিভক্ত করা, বিশেষ বিশেষ অপছন্দের রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পায়তারা, এসবই ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী মনস্তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের পরিপূরক। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সেনাবাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা তৈরীর নতুন বাহানা তৈরী করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সহজাত ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করে তুরস্কের আদলে সেক্যুলার ধারায় বিন্যাস করার দেশী-বিদেশী চাপও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে যারা আধিপত্যবাদের শৃংখলে বন্দী করে আশ্রিত রাষ্ট্র বানিয়ে রাখতে চায়, অথবা জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তিকে হীনবল ও বিভক্ত করে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাবেদার গোষ্ঠীকে বসাতে চায় তারা মূলত বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার মূলভিত্তি ইসলামকে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে নির্বাসনে পাঠাতে চায়। ভারত উৎসারিত বাংলাদেশ বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাসের উপসর্গ হিসেবে ইসলামী জঙ্গিবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ যায়গা দখল করে নিয়েছে। ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা তাই সাময়িক বিষয় বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা ভারতের জাতিগত বিশেষত হিন্দু ও রাষ্ট্রাচারের নীতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত নেহরু ডকট্রিন অনুযায়ী এ অঞ্চলে কোন স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে ইচ্ছুক নয়। একারণে ভারতের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে সার্বভৌম সমতার রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় না। আস্থাশীল সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতেও ভারত সব সময়ই অনীহ।

অনেকে মনে করেন, ১৯৪৭-এর দেশ বিভক্তির সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই সকল অনর্থের মূল। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তার ভৌগোলিক বিভক্তির জন্য মুসলিম লীগের 'সাম্প্রদায়িক' রাজনীতিই দায়ী। এই সমীকরণের সূত্র টেনে তারা আরও একধাপ

www.bjilibrary.com

এগিয়ে বলতে চান যে, ১৯৭১-এ পাকিস্তানের খণ্ডিতকরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের সমীকরণকে ভুল প্রমাণ করেছে। তবে এই সুবিধাবাদী স্থূল সমীকরণ মেনে নিতে হলে বাংলাদেশের সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তিই থাকে না। বাংলাদেশকে একটি ভাষাভিত্তিক সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। আবারও সেই ব্যর্থতা মুছে বাংলাদেশকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার খুঁটির ওপর 'সেক্যুলার' বাংলাদেশ গড়ার কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে ফ্যাসীবাদী তাণ্ডব কিংবা বহিঃশক্তির সামরিক হস্তক্ষেপকে ডেকে আনা হবে কিনা, সে আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্র কাঠামোর সেক্যুলার রূপান্তর কিংবা সন্ত্রাসী শক্তির অন্ধ অনুগামী একটি তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে : প্রধানত ১. ইসলামী শক্তি, ২. সেনাবাহিনীর ইসলামী চেতনা, ৩. জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তির জোটবদ্ধ রাজনীতিকে।

১/১১-এর আকস্মিক পটপরিবর্তন অনিবার্য ছিল না, তবে আবার অপ্রত্যাশিতও ছিল না। ইসলামী জঙ্গিবাদ, ভারতীয় জঙ্গী বিদ্রোহীদেরকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহারের অভিযোগ, সুশাসনের অভাব, নিয়ন্ত্রণহীন দুর্নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং গণতান্ত্রিক শাসনের বিকৃতির সূত্র ধরে বাংলাদেশকে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বানানোর চাপ ভারতের আগ্রাসী পরিকল্পনাকে অভূতপূর্ব আনুকূল্য দিয়েছে। জাতীয় সেনাবাহিনীর নীতি নির্ধারকরা বিগত ২২শে জানুয়ারীর সংবিধান নির্ধারিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতার বদলে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করায় ১/১১ এর পটপরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তি সেনাসমর্থিত সরকারের রাজনীতি দমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বদলে সকল আক্রমণ মাথা পেতে নিয়েছে। বাংলাদেশে দু'ভাবে জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সরকার গদিচ্যুত হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও একইভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। এর একটি হচ্ছে, ১৯৭৫-এ আওয়ামী লীগের দ্বারা সংসদীয় গণতন্ত্রের কফিনে এক দলীয় বাকশালের পেরেক ঠুকে ফ্যাসীবাদকে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা। অন্যটি হয়েছে ১৯৮২ সালে নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে তদানীন্তন সেনাপ্রধান এরশাদের ক্ষমতা দখল। এক্ষেত্রেও প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগের সহায়তা ছিল দৃশ্যমান। ছিল প্রতিবেশী ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ। আড়াই দশক পর ১/১১-এর আগে আওয়ামী লীগ তার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের নিয়ে চরম নৈরাজ্য, রাজপথে লগি-বৈঠার সন্ত্রাস, গণহত্যার তান্ডব সৃষ্টির পথ ধরে ভিন্ন আঙ্গিকে 'সেনাসমর্থিত' অভিনব সরকারের আবির্ভাব ঘটায়। এটা সামরিক অভ্যুদয়ের ভিন্ন রূপ। এ সরকারের আন্তর্জাতিক সমর্থনে যেমন ভারত-মার্কিন-যায়নবাদী চক্র সক্রিয় ছিল, তেমনি আওয়ামী লীগও বলেছে যে, তারাই আন্দোলন করে এ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। ভারতীয় মিডিয়া এ পটপরিবর্তনকে বলেছে, 'ফ্রেন্ডলী ক্যু'। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরাজমান স্থিতাবস্থা নস্যাৎ হোক সেটা সেনাবাহিনীর জেনারেলরাও চাইবেন বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িকী 'দি

www.bjilibrary.com

ইকোনমিস্ট' লিখেছে, চারদলীয় জোট আবারও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করুক, আওয়ামী লীগ যেমন সেটা মেনে নেবে না, তেমনি সেনাবাহিনীর জেনারেলরাও মানবেন না। এদিকে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ব্যর্থ হলে দেশে আবারও অস্থিতিশীলতার আবহ বা অসাংবিধানিক শাসনের আবহ তৈরীর আশংকা রয়েছে। বাংলাদেশে অতীতে যতোবার ইতিহাসের বাঁক পবির্তনকারী ঘটনা ঘটেছে, তার পেছনে সেনাবাহিনীর মেরুকরণেরও প্রভাব ছিল। আগামী দিনে জাতিসংঘ ও গ্লোবাল রাজনীতির পার্টনার বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে কোন বড়ো অভিযান সম্ভব কিনা, তা সময়ই বলে দেবে। যারা বাংলাদেশ থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা বিরোধীদের উৎখাতে আর একটি মুক্তিযুদ্ধ কামনা করছেন এবং এতে ভারতের অর্থবহ সহায়তা প্রত্যাশা করছেন তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসতে না পারলে ভিন্ন পথেই হাঁটবেন। সুতরাং গণতান্ত্রিক উৎকর্ষের জন্য যে সহিষ্ণুতা ও দলীয় সম্প্রীতি দরকার তা কখনও এখানে গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। বাংলাদেশে ভারতের হস্তক্ষেপ যদি আরও প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে তার সাথে এ্যাংলো স্যাকশান আমেরিকান যায়নবাদী চক্রের বৈশ্বিক ছত্রছায়া থাকবে। মুম্বাই ম্যাসাকারের পর পাকিস্তানকে নিয়ে গ্লোবাল রাজনীতির পার্টনাররা ভারতকে সামনে রেখে যে আগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছে, তা এ উপ-মহাদেশে আর একটি পলাশী অধ্যায় সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরী করেছে। ভারত এবার পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের দিকেও নজর ফিরিয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি. চিদাম্বরম অতি সম্প্রতি লোকসভায় বলেছেন, ভারত বিরোধী জঙ্গীরা বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ব্যবহার করে যাবে, ভারত এটা মেনে নেবে না। জঙ্গী নিয়ন্ত্রণে নয়াদিল্লী ঢাকার ওপর চাপ বৃদ্ধি করেছে বলে আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে।

এতে করে পাকিস্তানের মতোই তথাকথিত ইসলামী জঙ্গী এবং সন্দেহভাজন ইন্ডিয়ান মুক্তি যোদ্ধাদের দমন কিংবা বাংলাদেশে বন্দী উলফা নেতাদের ফেরৎ দানের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লীর চাপ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কিভাবে মুকাবিলা করবে, সেটাই নির্ণেয় বিষয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাষ্ট্রীয় প্রচারণার পটভূমি ও প্রকৃতি বোঝাতে আমি এই সুবিস্তৃত ভূমিকা টানার প্রয়োজন মনে করছি। বাংলাদেশ বিরোধী এই অপপ্রচার, তথ্য সন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রীয় অন্তর্ঘাত বাংলাদেশকে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্র বানানোর ইন্ডিয়ান ডকট্রিনেরই সুনির্ধারিত পরিণতি। বাংলাদেশ এই বিপজ্জনক বৃত্ত থেকে কীভাবে বের হবে, সেটাই ভাবনার বিষয়।

পাক-ভারত সংঘাতের ছায়া

১৯৪৭ পরবর্তীকাল থেকে ভারত তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ বিনিয়োগ করেছে, তার সুফল পেয়েছে ১৯৭১ সালে। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ভারতীয় নেতাদের 'হাজার বছরের' বদলা নেবার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলেও তাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে যথেষ্ট ফারাক ছিল। না পাবার হতাশাজনিত প্রতিহিংসায় উদ্ধত ভারতের দুর্বীনিত আগ্রাসন তাই বাংলাদেশের ভাগ্যলিপি হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ভারতভুক্ত পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ হতভাগ্য মুসলিম দেশ-মাটি-ঘর-বাড়ির মায়াত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করতে না পেরে ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর শৃংখলিত নাগরিক হিসেবে ন্যুব্জদেহ বনি আদমের ভাগ্যলিপি মেনে নিয়েছে। পশ্চিম বাংলার বাংগালী মুসলিমরা না বাংগালী, না মুসলিম এ দুয়ের মাঝামাঝি ন-পুংসক হয়ে 'ভারতীয়' হতে চেয়েও চরম লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। ১৯৪৭-এর র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ভৌগোলিক বিভক্তির সুবিধাভোগী বৃহত্তর বাংগালী মুসলিম জনগোষ্ঠী নতুন সফরে কিস্তি ভাসানোর ঝুঁকি নিলেও ১৯৭১-এ ভারতের সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় শামিল হয়। কিন্তু ভারতের কাছে তারা যেমন প্রতারিত হয়েছে, তেমনি ভারতও যে প্রত্যাশায় সেনা, অর্থ, রাজনৈতিক, মানবিক সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার সুফল পায় নি। এ হিসেবটা ভারতের। তবে বাংলাদেশের মানুষ মনে করেন, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করণই ভারতের জন্য বড়ো পাওনা। অন্ততঃ তার নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থে এটা তার জন্য এক বিশেষ প্রাপ্তি।

তবে ভারত আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করায় তার প্রাপ্তিতেও শূন্যতা থেকে গেছে। ভারতের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার স্বরূপ বোঝার জন্য একাত্তরের ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। ভারতের প্রতি এ দেশের মানুষের যে মোহ ছিল, তা ১৬ই ডিসেম্বর-৭১ থেকেই কেটে যেতে থাকে। কেননা ভারত ত্রাতার ভূমিকায় এসে ভাগ্যবিধাতা বা ভক্ষকের রূপে আবির্ভূত হয়েছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেনাপ্রধান কিন্তু মার্শাল মানেক শ' একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলেই রাজনীতিকদের ঘোর প্যাঁচ এড়িয়ে নিরেট সত্যি উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাহলে ভারতের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকেরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি একথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমিও জানতাম, ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।" [দ্য স্টেটসম্যান', ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮]

ভারতের খ্যাতিমান কূটনীতিক এবং মুক্তযুদ্ধকালে দিল্লীর সাউথ ব্লকে 'ইস্ট পাকিস্তান ডেস্ক' এর প্রধান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার জে এন দীক্ষিত তাঁর 'লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড' বইতেও বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক এবং দিল্লীর আচরণ সম্পর্কে একই অনুভূক্তি ব্যক্ত করেছেন। ভারতের সম্ভবত একমাত্র রাজনীতিক রাজা গোপালাচারী ১৯৭১ সালে ভারতকে তার ভূমিকা সীমিত রাখতে

www.bjilibrary.com

বলেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন, বাংগালী মুসলমানদের ঘুমন্ত জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়ে উঠলে দিল্লীকে পস্তাতে হবে। কিন্তু ভারত নানা কারণেই অসম্ভবকে সম্ভব করায় আশাবাদী হয়ে উঠেছিল। প্রথমত : পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তিনদিক দিয়ে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশকে শ্বাস নিতে হলেও ভারতের নেকনজরে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত : ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার কৃতজ্ঞতা বাংলাদেশকে চিরকাল ভারতমুখী করে রাখবে। তৃতীয়ত : বাংলাদেশে ভারতের অঘোষিত নাগরিক এবং লালিত পঞ্চমবাহিনীর যুথবদ্ধ অন্তর্ঘাত ভারতের প্রতি বাংলাদেশকে চিরকাল নতজানু রাখবে। চতুর্থত : ২৫ সালা বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির বাধ্যবাধকতা। পঞ্চমতঃ বাংলাদেশের সংবিধানে ভারতের নীতিমালার অনুসরণ। ষষ্ঠত : অর্থনৈতিকভাবে ভারতের ওপর বাংলাদেশের অনিবার্যিক নির্ভরশীলতা। সপ্তমত : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে ভারতের ব্যাপক ছায়াপাত এবং পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির সহজাত প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা।

ভারতের দিক থেকে এ প্রত্যাশা হয়তো অমূলক ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার অহংকারকে আহত করে ভারত যে অবিশ্বাসের দেয়াল তুলে রেখেছে, সেটাই তাকে সন্নিকটবর্তী হবার পথ আগলে রেখেছে। এটাকে ফিল্ডমার্শাল মানেকশ' বলেছেন, ভারতের 'বেনিয়াসুলভ আচরণ।' একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারলেও ভারতের ধীমান বর্ষীয়ান রাজনীতিকরা ১৯৪৭ এ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া 'পূর্ববঙ্গের' ফিরে পাওয়ার সুযোগকে স্বার্থপরতায় বরণ করে নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর ভারত বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়ে ভুল করেছিল বলেও অনুশোচনা করেছে। ভারতের ভূমিকা যে লিবারেটরের নয়, বরং দখলদার বাহিনীর মতো, সেটা ১৬ই ডিসেম্বর'৭১ এ সম্পাদিত আত্মসমর্পন দলিলেই তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে, বাংলাদেশের সরকার বা 'মিত্রবাহিনীর' বাংলাদেশী পক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের কোন প্রতিনিধির উপস্থিতি অংশগ্রহণ তথা স্বাক্ষরদানের সুযোগ সুপরিকল্পিতভাবে কেড়ে নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসী সরকার তথা তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বের প্যারালাল 'মুজিববাহিনী' গঠন ও তাকে নিজের প্রভাব বলয় সৃষ্টির কাজে ব্যবহার, মুক্তিযুদ্ধ উত্তর কালে 'মুজিব বাহিনীর' কার্যক্রমকে নিজস্ব পরিকল্পনায় বিন্যাস ও প্রসারিত করা এবং সেনাবাহিনীর প্যারালাল রক্ষীবাহিনী গঠনের মাধ্যমে ভারতীয় করণের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে আত্মস্থ করে নেবার প্রক্রিয়া ব্যর্থ না হলে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া সত্ত্বেও ভারতের কবজা থেকে বাংলাদেশ ছুটে যেতে পারতো না। প্রকৃত অর্থে, বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী সশরীরে বিদ্যমান না থাকলেও ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অঘোষিত একাধিক বাহিনী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ৭৫-পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব তথা এর ভ্রূণ গড়ে ওঠার পর্বে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের পাশাপাশি 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস গ্রুপ'কে ভারত সরাসরি পরিচালনা করেছে। এই 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াসটিই' একাত্তরের ২৫ মার্চের পর ভারতে মুজিব বাহিনীর খোলসে নতুন করে

www.bjilibrary.com

আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শেখ মুজিবের প্রতি আস্থা রাখতে না পেরে ভারত 'বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' পতাকা নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদকে মাঠে নামায়। জাসদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারায় 'গণবাহিনী' পর্যন্ত গঠিত হয়। যার শাখা জাতীয় সেনাবাহিনী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। জাতীয় সেনাবাহিনীর বিকাশের সূচনাপর্বে 'গণবাহিনীর' ধাঁচে সেনা বাহিনী গড়ে উঠলে আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর বর্তমান কাঠামো কখনো তৈরী হতো না। 'গণবাহিনীর' কনসেপশন আমাদের সেনাবাহিনীর বিকাশ আঁতুড়ঘরেই নিঃশেষ করে ফেলতো। ১৯৭৫-এর আগষ্ট পট পরিবর্তন এবং জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে সংঘটিত পরবর্তী সিপাহী জনতার বিপ্লব সফল না হলে বাংলাদেশের ইতিহাস ইন্ডিয়ানদের দ্বারাই লিখিত হতো।

ভারত বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর সহজাত প্রবৃত্তিকেই পাকিস্তানী ধারার প্রত্যাবর্তন হিসেবে সরলীকরণ করে থাকে। এটা তার পাকিস্তান ফোবিয়ার নবসংস্করণ। ভারত বাংলাদেশের স্বকীয়তা সংরক্ষণের সংগ্রামের মাঝে বাংলাদেশের মাঝে আর একটি পাকিস্তানের ছায়া দেখে আসছে। এটা মূলত ভারতের নীতি ভংগীর পরাজয়ের স্বীকৃতি। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে লাখো মানুষের আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশের আস্থা ধরে রাখতে পারেনি এবং ভারতের কাছে সাহায্য না চেয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তান গণচীনের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হচ্ছে। এর দায় পুরোপুরি ভারতের। ভারতকে নিজের তৈরী করা এই অন্ধ বৃত্ত ভেংগে বেরিয়ে আসতে হবে। ভারতের দিক থেকে এটা সম্ভব না হলে বাংলাদেশকেই তার অস্তিত্বের সহযাত্রীদের বেছে নিতে হবে।

একক বিশ্বব্যবস্থার ভারতের অবস্থান :
বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি

ভারত একটি আঞ্চলিক পরাশক্তি। শুধু সামরিক ও ভৌগোলিক বিশালত্ব ও অবস্থানগত বিচারেই নয়। শতকোটি মানুষের বিকাশমান অর্থনৈতিক বিচারেও আগামী দিনে ভারত গণচীনের পাশাপাশি একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। শুরুতে ভারত জোট নিরপেক্ষ নীতিমালার একটা বাতাবরণ তৈরী করে তৃতীয় বিশ্বের কাছে একটা নন্দিত ইমেজ গড়ে তোলার প্রয়াস চালালেও ১৯৭১-এর পাকভারত যুদ্ধের সময় তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ২০ সালা সামরিক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তার জোটনিরপেক্ষ নীতির মুখোশ খসে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারত এমন একটা বৈশ্বিক অবস্থায় মৈত্রী সম্পাদন করেছিল, যখন বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও মার্কিন-ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমন্বয়ে দুটি বিশ্বে বিভক্ত। বিশেষ করে ঐ সময়টা ছিল দুটি শিবিরের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের চরম উত্তেজনা ও বৈরিতা এবং শক্তি-দ্বন্দ্বের নাটকীয়তার দ্বান্দ্বিকতায় পরিপূর্ণ।

ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকেই বৃটিশ-বেনিয়া শাসকদের সাথে ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। প্রথমে এর ভিত্তি মুসলিম শাসন-কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে বিকাশমান ইংরেজ রাজশক্তির নেক নজর পাবার লক্ষ্যে নিবেদিত

www.bjilibrary.com

হলেও হিন্দুদের রাজনৈতিক চেতনায় দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্ব দখল করার স্বপ্ন যুক্ত হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বের একশ বছর [১৮৫৭-এর সিপাহী জনতার মহাসংগ্রামের পূর্ব পর্যন্ত] ভারতের অগ্রসর হিন্দু এলিটরা ইংরেজদের আনুগত্য-আরাধনায় নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করেছে। আর এটা করতে গিয়ে তারা বৃটিশ-ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিপক্ষ হাজার বছরের মুসলিম শাসকদের উচ্ছেদে ইংরেজদের অনুগত মুৎসুদ্দী-কলাবরেটরের ভূমিকা পালন করেছে। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় আঞ্চলিক হিন্দু মারাঠা নেতা শিবাজীর বিদ্রোহের ধারায় ভারতে হিন্দুদের রাজনৈতিক আস্তিত্বের ভ্রুণ তৈরী হয়। হিন্দুদের এই মুসলিম বিরোধী চেতনাকে ব্যবহার করেই ইংরেজ কোম্পানী শাসকগণ এবং পরবর্তীকালে বৃটিশ রাজের অমাত্যরা হিন্দুদের পূর্ণ সহযোগিতায় ভারতের সকল পর্যায় থেকে স্বাধীন মুসলিম শাসকদের উচ্ছেদ করেছে। ফলে নব জাগ্রত হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্বকারী এলিট সমাজ যেমন ইংরেজদের প্রতি বরাবর চির কৃতজ্ঞ থেকেছেন, তেমনি ইংরেজ শাসকরাও তাদের ঔপনিবেশিক যুগের অবসানকালে হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অনেক নজীর তৈরি করে গেছেন। ফলে ১৯৪৭-এর দেশ বিভক্তির পর থেকে ভারত প্রতিটি পর্যায়ে বৃটিশ আমেরিকান আনুকূল্য পেয়ে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে কাশ্মীর ইস্যু, ১৯৬৫ ও ১৯৭০ এর পাক-ভারত যুদ্ধ, পাকিস্তানের পরমাণু ইস্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কিংবা ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তির ভারতঘেঁষা নীতির কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান মার্কিন ছত্রছায়া পায়নি। যুদ্ধ বিরতি হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। ১৯৭০-এর সংকট উত্তরণে মার্কিন কূটনীতি পাকিস্তানের পক্ষে ছিল না। ফলে একটি রাজনৈতিক সংকটের সামরিক সমাধান রক্তাক্ত অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। তদানীন্তন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ওপর মার্কিন কূটনৈতিক চাপ থাকলে ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্র সীমালংঘন করতে পারত না।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভাংগন ও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের অভিঘাত মুক্ত হয় বটে। তবে এতে নতুন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ইউরোপও ন্যাটো সামরিক জোটের সহযোগী হয়ে কার্যত বিশ্বব্যাপী একক মার্কিন কর্তৃত্বকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের ফলে তাদের 'ওয়ারশ' সামরিক জোট ভেংগে যায়। এর ফলে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যই শুধু বিনষ্ট হয়নি, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ধ্বংস্তূপের ওপর স্নায়ুযুদ্ধ মুক্ত বিশ্বে একক শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এতে তামাম মুসলিম বিশ্বকে প্রতিপক্ষের নিয়তি বরণ করতে হয়। স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' থিউরীর বিভাজন রেখা ধরে ৯/১১-এর বিমান হামলার দায় ইসলামী জঙ্গীদের ঘাড়ে চাপানোর মধ্য দিয়ে বিশ্ব আর একটি নতুন অবস্থার মুখোমুখি হয়। পরিবর্তিত বিশ্বে জঙ্গিবাদী ও জঙ্গী তৈরীর কারখানা যাদের হাতে, জঙ্গিবাদ দমনের অস্ত্রও তাদের হাতে। মাঝখান থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি আক্রান্ত ও জবর দখল হতে থাকে। যে সব মুসলিম দেশ

www.bjilibrary.com

জঙ্গিবাদ ইস্যুতে এখনও সরাসরি আক্রমণের শিকার হয়নি, তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। তবে বিশ্ব শক্তির নতুন মেরুকরণে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইলী অক্ষের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক তথা দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিগত ১/১১-এর পট পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে ভারসাম্য ছিল। অর্থাৎ পাক-চীন-মার্কিন শক্তির মাঝে স্বতন্ত্র ধারায় সম্পর্ক রেখে বাংলাদেশ ভারতের প্রভাব বলয় থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে আসছিল। কিন্তু ১/১১-এর পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শাসন ক্ষমতায় আবির্ভূত সেনা সমর্থিত সিভিল ও মিলিটারী ব্যুরোক্রেসীর সরকারের মাধ্যমে ভারতীয় লবী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে ভারতীয়দের প্রভাব ১৯৭১-পরবর্তী সময়ের চেয়েও ব্যাপক ও বিপজ্জনক ধারায় উপনীত হতে যাচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নেটওয়ার্ক মূলত তার সাম্রাজ্যকে নিরাপদ, অক্ষত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাখার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করা এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইলী অক্ষ সামনে নিয়ে আসলেও মূলত এর পেছনেও পশ্চিমা খৃস্টীয় জগতের ক্রুসেডীয় প্রতিহিংসার ছায়া রয়েছে। ৯/১১-এর পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বুশের 'অন্তহীন' যুদ্ধের শুরুতে বুশ বলেছিলেন ঈশ্বর তাকে এ যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে কট্টর যায়নবাদী-উগ্রবাদী 'নিউকন' এবং ভারতের উগ্র হিন্দুদের মধ্যে ইসলামী শক্তি ধ্বংসে এক অশুভ ঐক্য গড়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক যুদ্ধের সূচনায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়তায় হিন্দুত্ব যেমন হাত মিলিয়েছিল, বর্তমান সময়েও যায়নবাদীদের তদারকীতে কট্টর পৌত্তলিক হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি এবং মার্কিন অক্ষ একাট্টা হয়েছে। মুম্বাই ম্যাসাকারের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রসত্তা বিনাশী শক্তির প্রত্যক্ষ মেরুকরণ ঘটেছে। এই অবস্থা তৈরির জন্য এতকাল মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসকে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি মদদ ও প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। বাংলাদেশকে একটি 'অকার্যকার' রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে ত্রি-শক্তির সক্রিয়তা দৃশ্যমান। ভারত শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক কারণেই নয়, তার জাতিগত হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের দায়বদ্ধতার কারণেই রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণবাদ ও প্রতিপক্ষকে জাতিগত সহিংসতা-অন্তর্ঘাতে নিঃশেষ করতে চায়। ভারতের সামনে একদিকে রয়েছে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরাশক্তির হাতছানি, তেমনি ভারতকে গণচীনের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন-যায়নবাদী অক্ষের সাথে গাঁটছাড়া বাঁধার আগ্রহ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা এ অঞ্চলের অন্যান্য প্রতিবেশীর প্রতি ভারতের দীর্ঘকালের আগ্রাসী নীতি- তাই নব পর্যায়ে ত্রয়ী বৈশ্বিক শক্তির মদদ পেয়ে আরও আগ্রাসী ও সহিংস হয়ে উঠেছে। মুম্বাই ম্যাসাকারের পর ভারতের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি আরও আগ্রাসী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগ্রাসনের ক্ষেত্র তৈরী করা এবং 'অকার্যকর' রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা

www.bjilibrary.com

ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রোপাগান্ডার সাথে যায়নবাদী পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তা মিডিয়া সন্ত্রাসকে বাংলাদেশের জন্য অসহনীয় ও বিপজ্জনক করে তুলেছে। তবে ভারতীয় মিডিয়া সন্ত্রাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পক্ষে স্থানীয় 'পঞ্চমবাহিনীর' সহায়ক ভূমিকা জাতি-রাষ্ট্রের অন্তর্ঘাত মুকাবিলার শক্তিকে দুর্বল করে রেখেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাসের ইস্যুগুলো হচ্ছে :

১. বাংলাদেশ ইসলামী মৌলবাদের দিকে জাতি-রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করছে।
২. বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদ পালিত ও বর্ধিত হচ্ছে। যা ইসলাম এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকেই প্রাণ-রস আহরণ করছে।
৩. বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ইসলামী জঙ্গি ও ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিরা ব্যবহার করছে।
৪. বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তিসমূহ ইসলামী-জঙ্গিবাদকে লালন ও পরিপুষ্ট করছে।
৫. বাংলাদেশের জাতি-রাষ্ট্রের ইসলামীকরণ ভারতের নিরাপত্তার জন্য বিপদ তৈরি করছে।
৬. বাংলাদেশকে ইসলামী শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে ভারত বৈরিতা পরিহার করতে হবে এবং বাংলাদেশের কাছে ভারত তার নিজের প্রয়োজনে যা কিছু চায়, অবলীলায় তা পরিশোধ করতে হবে।

১/১১ এর পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মূলত ভারতীয় আধিপত্যবাদীদের জন্য বাংলাদেশ আরও উন্মুক্ত অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তির বিনাশ, সেনাবাহিনীকে ভারতীয় আগ্রাসনের বাস্তবতা ভুলে অভিন্ন প্রতিরক্ষা নীতিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতিকে ভারতের সাথে জুড়ে দেওয়ার চাপ বাড়ছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল নির্ধারণকারীদের একটি অংশ বাংলাদেশের জন্য স্বাধীন কিংবা বিপরীতমুখী কোন প্রতিরক্ষা নীতি ও প্রতিরক্ষা শক্তির উন্নয়ন ঘটানোকে ভারতের প্রতি বৈরিতা বলে মনে করেন। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের একশ্রেণীর প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, রাজনৈতিক-বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক শক্তির ভারতীয়দের চেয়েও অতিমাত্রায় ভারতমুখী ভূমিকা জাতি-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভেতর থেকেই অন্তর্ঘাতের ক্ষত তৈরি করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে, ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশ কোন জাতীয় নীতি তৈরি করতে পারেনি। ভারতের জন্য যা তাদের নিরাপত্তা ইস্যু, বাংলাদেশের জন্য তা অস্তিত্বের মামলা। বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ ইস্যু কিংবা ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিবাদের ঘাঁটির অস্তিত্ব নিয়ে ভারত যতোই প্রোপাগান্ডা করুকনা কেন, তাতে বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই উদ্ভট ও নাজুক ইস্যুতে ভারতীয় গোয়েবলসীয় প্রচারবিশারদদের চেয়েও বাংলাদেশের একশ্রেণীর মিডিয়া কর্মী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকদের অসত্য প্রতিষ্ঠায় ভারতের পক্ষে সাফাই সাক্ষী হিসেবে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা জাতীয় কলংককে অমোচনীয় করে রেখেছে।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের ক্ষোভ, অভিযোগ, প্রতিহিংসা অন্তহীন। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রোল মডেল হলেও বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু ও উপজাতীয়রা অরক্ষিত, বিপন্ন এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এ বিষয়টি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংকট নিয়ে ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা-লন্ডন-আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় সেমিনার-আলোচনা সভা হচ্ছে। এতে বরাবরই বাংলাদেশের ব্যাপারে ভুল বার্তা যাচ্ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ সহ মাইনরিটি স্বার্থ রক্ষার নামে গজিয়ে ওঠা নানা সংগঠন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু উপজাতীয়দের উস্কানী দিয়ে মেজরিটির দেশে তাদেরকে সংখ্যালঘুদের তাবেদারীতে ন্যস্ত করতে চায়। বাংলাদেশের মানুষের বৃহত্তর মুসলিম ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামী আদর্শের মধ্যেই ব্যাপক সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানবিক উপসর্গ বিদ্যমান। ইসলামী জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মিথ্যা অপবাদে বাংলাদেশকে যারা 'অকার্যকর রাষ্ট্র' বানাতে চায়, তারাই আধিপত্যবাদের সহায়ক পঞ্চম বাহিনী। এরা ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডার অন্ধ চুঙ্গাবাজই নন, বাংলাদেশের সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় চরিত্র পুনরুদ্ধারে এরা ভারতের হস্তক্ষেপে তাবেদার সরকার গঠনেও প্রস্তুত। ১৯৪৭-এর বিভক্তির পর বাংলাদেশ থেকে অপশন দিয়ে স্বেচ্ছায় ভারতে চলে যাওয়া কোটি কোটি হিন্দুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে নাগরিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা দিয়ে পুনর্বাসন করার দাবী উঠেছে। ভারতের পশ্চিম বাংলায় সেখানকার বাংগালী হিন্দুদের একটি অংশ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জিলা নিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' বা একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছে। বাংলাদেশের অভিন্ন-অবিচ্ছেদ্য ভৌগোলিক ও নৃ-তাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্যের ধারা ধ্বংস করে বাংলাদেশকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করার দাবীও কেউ কেউ তুলেছেন। এটা বাংলাদেশকে আধিপত্যবাদের খপ্পরে পড়তে সুযোগ তৈরি করে দেবে। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় একটি তাবেদার সরকার না বসানো পর্যন্ত দিল্লী বিশ্রাম নেবে না। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানের বিনিময় ছাড়াও বৈশ্বিক পরাশক্তির মদদপুষ্ট আঞ্চলিক শক্তি ভারত বাংলাদেশের কাছে স্থল ট্রানজিট, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, গ্যাস, কয়লাসহ বাংলাদেশকে অভিন্ন প্রতিরক্ষা নীতিতে শরবিদ্ধ করতে চায়। জঙ্গিদমনে বাংলাদেশের সাথে মিলে ভারতের দিক থেকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে সামরিক অভিযান চালানোর অব্যাহত চাপের কাছে বাংলাদেশ নতি স্বীকার না করা পর্যন্ত ভারত চাপ বাড়িয়েই চলবে। শাসন ক্ষমতায় যদি একটা দুর্বল ও নতজানু নীতির তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে ভারতের কোন দাবীই অপূর্ণ থাকবে না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চাপ ও পিঠ চাপড়ানী এবং পঞ্চমবাহিনী ব্যবহার করে অন্তর্ঘাত চালানোর কৌশলে ভারত লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। ভারতের প্রতিটি বোমা-সন্ত্রাসের সাথে কোন না কোনভাবে বাংলাদেশকে জড়িয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্রকে জঙ্গিবাদের দোষে দুষ্ট করা ভারতীয়দের কৌশল। এই অভিযোগকে ভারত ক্রমশ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদী করেছে।

www.bjilibrary.com

একক বিশ্বব্যবস্থার ভেতর থেকে বাংলাদেশ তার জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তাকে সংরক্ষণ করে আঞ্চলিক পরাশক্তির সাথে কীভাবে সার্বভৌম সমতা নিয়ে টিকে থাকবে, তার উপায় উদ্ভাবনই হওয়া উচিত রাজনীতির মূলমন্ত্র। মুম্বাই ম্যাসাকারের পর জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় ও জঙ্গী দমনে ভারতের দিক নির্দেশনা মেনে নিতে সবাইকে বাধ্য করা অথবা ইঙ্গ-মার্কিন-যায়নবাদীদের মদদপুষ্ট ভারতীয় সমরকুশলীদের প্রণীত যুদ্ধ নীতির শিকার হবার একটি আতংক তৈরি করা হয়েছে। একে জাতীয় ঐক্য ও বুদ্ধিমত্তায় মুকাবিলা করতে না পারলে আত্মসমর্পণ করে কারজাইয়ের ভূমিকা গ্রহণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সরকারকে বাধ্য করা হবে।

১/১১ এবং ভারতের তথ্যসন্ত্রাস

ভারতের তথ্যসন্ত্রাস এবং অন্তর্ঘাত অনেক আগেই আঞ্চলিক বৃত্ত অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক শক্তির সমন্বয়ে বাংলাদেশের জন্য ভয়ংকর বিপদ তৈরি করেছে। এখানেও ৯/১১-উত্তর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-নীতির ছায়া পড়েছে। সুতরাং ৯/১১-এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের তথ্যসন্ত্রাস ছিল গতানুগতিক এবং আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক সংঘাতের বৃত্তে বন্দী। এরপর ভারত এক্ষেত্রে তার অন্তর্জাতিক সহায়ক শক্তির বুদ্ধি-পরামর্শ প্রযুক্তি টেকনিক পেয়েছে। বিশেষ করে, ভারতের জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি পাকিস্তানের ওপর থেকে আশীর্বাদের ছায়া অপসারণ করে নিতে ভারত তার প্রচেষ্টা সফল করতে পারে, তাহলে পাকিস্তানকে নিয়ে নয়াদিল্লী যে কোন নিষ্ঠুর খেলাই খেলতে পারবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত রিপাবলিকান প্রার্থী ম্যাককেইন এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ভারত সফর করে জঙ্গি মুকাবিলায় শুধু ভারতের পক্ষে থাকার আশ্বাসই ব্যক্ত করেন নি। পাকিস্তান ও পাকিস্তান কেন্দ্রিক বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন নির্মূলে মার্কিন সরকার ভারতের সকল বক্তব্যের প্রতি অন্ধ সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানকে ভারতের ক্লায়েন্ট স্টেটের মতো নতজানু হয়ে সকল হুকুম তামিল করার ছবকও দিয়েছেন। পাকিস্তান কী করবে, সেটা তার নিজের ব্যাপার। তবে মার্কিন কূটনীতি ও রণনীতিতে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের প্রয়োজন এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ব্যাপারেও ভারত একইভাবে মার্কিনীদের চোখে ঠুলী লাগিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল খেলায় বিজয়ী হতে চায়।

বাংলাদেশে যারা অনুসন্ধানী রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় উৎসাহী এবং বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সিক্রেট এজেন্ডার খোঁজ-খবর রাখেন, তারা জানেন, বিগত ২২শে জানুয়ারী সংবিধান নির্ধারিত নির্বাচন বানচালই ঐ গোয়েন্দা সংস্থাটির প্রধান এজেন্ডা ছিল এবং তারা তাতে সফল হয়েছে। অথচ ভারত সরাসরি কোন হস্তক্ষেপ করেনি। গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করার হাতিয়ার হিসেবে একটি বড়ো দল, এনজিও সুশীলদের ব্যবহার করার মাধ্যমে নির্বাচন ভণ্ডুল করে দেয়। এখানে জাতীয় সেনাবাহিনীর জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থা

www.bjilibrary.com

তৈরি করা হয়, যাতে সেনাবাহিনীর পক্ষেও নির্ধারিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘের নামে প্রচারিত একটি বিবৃতির সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনী নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার বদলে দু'বছরের সরকারের পক্ষে স্ট্রাইকিংফোর্স হিসেবে কাজ করে এসেছে। পরে জানা গেছে, জাতিসংঘ ঐ বিবৃতি দেয়নি। জাতিসংঘের কথিত ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, দুই প্রধান দল ও জোট তথা দুই নেত্রীর মধ্যে নির্বাচন নিয়ে সমঝোতা তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে একদিকে মানবাধিকার লংঘিত হবে, অন্যদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ মিশনে তাদের সমুদয় চাকুরী হারাবে। এর সত্যাসত্য যাচাই কিংবা জাতিসংঘের মনোভাব বদলানোর কোন চেষ্টাই সেদিনের সরকার করেননি।

১/১১-এর পট পরিবর্তনকে ভারতীয় মিডিয়া 'ফ্রেন্ডলী ক্যু' বলে অভিমত দিয়েছে। তারা এ সরকারের আমলে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে গেছে। এ সরকার গণচীন, পাকিস্তান, মুসলিম বিশ্বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতপ্রেমের বিশেষ ধারা তৈরি করেন। ভারতের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ এ সরকারের আমলেই ঢাকা সফর করে বাংলাদেশকে সেক্যুলার রাষ্ট্র দেখতে চান বলে দাবি তুলেছেন। শেখ হাসিনার প্রবাসী পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয় জনৈক মার্কিন-ইহুদী লেখক সিওভাক্কোর সাথে মিলে এক লেখায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ইসলাম মুক্ত তথা বাংলাদেশকে 'সেক্যুলার' বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চান। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তির যে ধারা রাষ্ট্র সরকারের জন্য একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম নীতি তৈরি করেছে, তা সরাসরি ভারতের আধিপত্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী। এ কারণে ভারত ইচ্ছা পূরণের একটি তাবেদার সরকার চাইছে। দেশপ্রেমিকদের জন্য রাজনীতি কঠিন করে দিয়ে তাবেদারদের ক্ষমতার দৃশ্যপটে টেনে আনার জন্য বাংলাদেশে যা কিছু ঘটানোর প্রয়োজন হয়েছে, তা তারা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতা এখনও চলছে।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সূত্রে বাংলাদেশের ওপর ভারত যেভাবে প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাতে তারা পুরোপুরি সফল না হলেও হাল ছেড়ে দেয়নি। একাত্তরের মতো আর একটি মুক্তিযুদ্ধের হুংকার যারা দিচ্ছেন, তাদের পেছনেও এ ধরনের প্রণোদনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কার্যত জনযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। তবে আধিপত্যবাদী ভারতই একে একটি একক দলের বিজয়কীর্তি হিসেবে আগলে রেখে তাদের দখলদার বাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় ঐ দলটিকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালে জাতীয় ঐক্য ও পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় সরকারের জন্য আকাংখাকে অবজ্ঞা করেই দলীয় সরকারের অহংকারের কাছে জাতীয় বিজয়ের কীর্তিকে পদদলিত করা হয়েছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্বে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সকল দল ও মতকে একই সামিয়ানার নীচে নিয়ে আসার সম্ভাবনাকেও কাজে লাগানো হয়নি। কেননা, মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনার বহু আগে থেকেই এর সংগঠকদের ওপর ভারত এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল, যাতে করে বিভাজন রেখার দুই প্রান্তে অবস্থান

www.bjilibrary.com

নিয়েই মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এর লক্ষ্য ছিল, মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে জাতিকে চিরদিনের জন্য বিভক্ত রেখে আধিপত্যবাদের হিংস্র নখরে বাংলাদেশকে ক্ষত-বিক্ষত করে রাখা। জাতীয় মুক্তির গতিধারায় ১৯৭১পর্বে ভারত এদেশের ইসলামী শক্তির জন্য যে ফাঁদ পেতে রেখেছিল, তারা তাতেই পা দিয়ে ফেঁসে যায়। তবে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও.প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীরা কার্যত একটি যুদ্ধ প্রহসনের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করার গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, এই রূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটনও উপলব্ধি করা পাকিস্তানের স্ব-ঘোষিত রক্ষকদের জন্য সম্ভব ছিল না। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় চারদশক পরও যখন বৃহত্তর জনগণকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে, তখন তাদের পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে 'স্বাধীনতা বিরোধী'-'যুদ্ধাপরাধী', হিসেবে চিহ্নিত করে জনগণের মূল সংগ্রামকে দুর্বল করা হচ্ছে।

ভারত বাংলাদেশের ওপর বিষ-দাঁত বসাতে না পেরে ইঙ্গ-মার্কিন-যায়নবাদীদের সাথে নিয়ে তার অশুভ পরিকল্পনাকে আরও শাণিত ও ব্যাপক রূপ দিয়েছে। বাংলাদেশের তেল-গ্যাস-বন্দর-স্থল ট্রানজিট সহ অন্যান্য কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারতের লোলুপ থাবা বিস্তারের প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি প্রভৃতি সংস্থার প্রত্যক্ষ ওকালতি ছাড়াও মার্কিন দুতিয়ালীও সমভাবে সক্রিয়। বাংলাদেশকে 'অকার্যকর' রাষ্ট্র বা ইসলামী জঙ্গিবাদের 'অভয়ারণ্য' হিসেবে প্রমাণ করার বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বাধীন মিডিয়া সন্ত্রাসের যারা কুশলী তাদের অবস্থান ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে। আন্তর্জাতিক যায়নবাদ এদের সমন্বয় সাধন করছে।

ভারতের বিশ্ব শক্তি হয়ে ওঠার সাধনা, তার সহজাত ইসলাম ভীতি এবং তার আভ্যন্ত রীণ বিদ্রোহ-সংঘাত-সশস্ত্র জনযুদ্ধ মাওবাদী অভিঘাত মুকাবিলা করার প্রয়োজন যায়নবাদী বৈশ্বিক শক্তির ওপর তার নির্ভরতাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, যা ভারতকে গণতন্ত্রের আবরণে একটি ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করতে যাচ্ছে। মুম্বাই ম্যাসাকারের পর ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাস দমনের কর্ম কৌশল নিরূপণে বৈদেশিক শক্তি তথা ইঙ্গ-মার্কিন-যায়নবাদী নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের ওপর ভারতের নির্ভরতা কার্যত তার সার্বভৌম সত্তাকেও আঘাত করতে শুরু করেছে। তবে এই ত্রয়ী শক্তির সাথে ভারতের মেরুকরণ এ অঞ্চলেরর দুটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলয়ে আঘাত হানার উপসর্গ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের জনগণের বিপন্নবোধের এও একটি উপসর্গ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নয়াদিল্লীর আয়নায় এবং ভারতের আগ্রাসী পরিকল্পনায় বিবেচনা করলে বাংলাদেশের পক্ষে আধিপত্যবাদ মুকাবিলা করা হবে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাস ও সরকারী পর্যায়ে ব্লাকমেইলিং আজ আর আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। এক মেরু বিশ্বে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন-যায়নবাদী চক্রের কাজে সহযোগী হিসেবে ভারতের যোগদান বাংলাদেশের সংকটকে তীব্র করে তুলেছে।

www.bjilibrary.com

প্রতিবেশী ভারতের দায়িত্বশীল মহল জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে বাংলাদেশে সামরিক হানার উস্কানীও দিয়েছেন।

মুম্বাই ম্যাসাকারের নানা বিশ্লেষণ হয়েছে, তবে ভারত মুম্বাই জঙ্গিদের পাকিস্তানের লোক বলে চিহ্নিত করলেও ভারতীয় বিশ্লেষকদের ভিন্ন মতও রয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায় এবং মহারাষ্ট্রের ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক অমরেশ মিশ্রের দুটির বিশ্লেষণ চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছে। এতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। এক. মুম্বাই ঘটনার সাথে ভারতের আভ্যন্তরীণ ঘটনার যোগসূত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দুই. ভারতের পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তিন. চিরাচরিত নিয়মে এ ঘটনায় ভারত তার আজন্ম শত্রু পাকিস্তানকে আঘাত হানার সুযোগ পেয়েছে। মুম্বাই ঘটনায় পাকিস্তান এজন্যই মদদ দেবেনা যে, এ ঘটনা সূত্রে তাকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে হবে। রাষ্ট্রহীন জঙ্গিদের দমন করা সব রাষ্ট্রের জন্যই কঠিন। ভারত ৫০ বছরেও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে পারেনি। মাওবাদীদের তৎপরতা ভারতে ক্রমবর্ধমান। ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে যদি পাকিস্তান বা আজাদ কাশ্মীরে কোন সশস্ত্র তৎপরতা গড়ে উঠে থাকে তার দায় ভারতেরও রয়েছে। তবে পাকিস্তান সরকারের গৃহীত কোন পদক্ষেপেই যদি ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেরাই পাকিস্তানী ভূ-খণ্ডে সামরিক হামলাকে প্রাধান্য দেয় সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের কিছু করণীয় নেই। আধিপত্যবাদী ও পাশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের যুথবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর শক্তি হচ্ছে জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তি। জঙ্গিবাদের মদদতাতা ও লালনকারী কলাবরেটর হিসেবে দেশপ্রেমিক এই শক্তিকে চিহ্নিত ও নিন্দিত করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর করে রাখাই ভারতীয় মিডিয়া সন্ত্রাসের লক্ষ্য। এই সাথে রাজনৈতিকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ চাপিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ব্যবহার করে জাতীয়তাবাদী-ইসলামী শক্তিকে অবদমন করার সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নেপথ্যচারী শক্তি হিসেবে আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে সংঘাতমুখী ও জটিল করে দেবে।

মুম্বাই ম্যাসাকার :
অপবাদের দায় চাপানোর কুশলতা

মুম্বাই ম্যাসাকার ভারতের মতো একটি বড়ো দেশের নিরাপত্তার দুর্বলতা ও প্রতিরক্ষার অক্ষমতা প্রকাশ করে দিয়েছে। হামলাকারীরা যদি সমুদ্রপথ ব্যবহার করে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং মুম্বাইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে ভারতে প্রবেশ করে ৬০ ঘন্টা ধরে গোটা ভারত সরকারকে জিম্মি করে থাকে, তবে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ভারত ভবিষ্যতে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে, তাও বিশ্বাস করা যায় না। ভারতের ভাষ্য অনুযায়ী ১০ জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ যদি পাকিস্তান থেকে কয়েকশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এসে মুম্বাই ম্যাসাকার করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতেও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র গ্রুপ এরকম হামলা চালাতে পারে। অর্থাৎ মুম্বাই

www.bjilibrary.com

ম্যাসাকারের মাধ্যমে তারা সন্ত্রাসীদেরকে আক্রমণের পথ ও কৌশল দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতের জন্য মুম্বাই ম্যাসাকারকে আর একটি ৯/১১ হিসেবে পশ্চিমা মিডিয়ার প্রচারণা চালানো এবং এই ঘটনার সূত্রে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে দেবার অভিঘাত এ অঞ্চলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

মুম্বাই ম্যাসাকার সম্পর্কে অমরেশ মিশ্র পিলে চমকানো তথ্য-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এটি ভারতের মূলধারার মিডিয়া যেমন উপেক্ষা করেছে, তেমনি ভারতীয় সরকারী মহলও একে পাশ কাটিয়ে গেছে। অমরেশ মিশ্র নিজেই লিখেছেন ঃ মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে যারা মিডিয়া এবং রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের বক্তব্যে অতি উৎসাহী হয়ে পড়েন এবং বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন না, তাদের প্রতি আমার করুণা হয়।"

বিবিসি রিপোর্টের উল্লেখ করে অমরেশ মিশ্র লিখেছেন : মুম্বাইয়ে হামলাকারীদের কয়েকজন ভারতীয় ছিল না এবং অবশ্যই মুসলিমও নয়। একে ৪৭ রাইফেলধারী দুই যুবক, যারা মুম্বাইয়ের শিবাজী রেলওয়ে ষ্টেশনে হামলা চালায়, তাদের চেহারা ছিল বিদেশীদের মতো ......। এন্ড্রু জি মার্শালকে উদ্ধৃত করে অমরেশ মিশ্র লিখেছেন : 'বিদেশীদের মতো চমৎকার চুলধারী কমান্ডোরা কয়েক বোতল বিয়ার খেয়ে শান্তভাবে বহুলোককে হত্যা করলো, এতে মনে হয় যে, মুম্বাইয়ের হামলা ছিল দেশজ ভারতীয় মুসলমান অথবা আরব আল কায়েদা সন্ত্রাসীদের নয় বরং এরা ছিল এ্যাংলো-অ্যামেরিকান গোপন গোয়েন্দা দল।

এই হামলার ফলে পাকিস্তান ভাংগার ভিত্তি তৈরী হয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং এই এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটায়। মুম্বাই হামলার সাথে ভারত-পাকিস্তান অথবা পাকিস্তানী মুসলিম এবং হিন্দু ভারতীয়দের কিছু করার ছিল না।

পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করে তোলা এবং শেষ পর্যায়ে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রচেষ্টায় প্রতিবেশী দেশসমূহে বিশৃংখলা ও স্থিতিহীনতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে কৌশলগত এলাকা সৃষ্টির অংশ হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ইরাকের মাধ্যমে গৃহীত এ্যাংলো আমেরিকান প্রচেষ্টার অধীনে ইরানের প্রতিবেশী ইরাকে এর বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছে। এন্ড্রু মার্শাল এর লেখা বই Divide and Conquer : Anglo American Imperial Project এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অমরেশ মিশ্র দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন, মুম্বাইয়ের ইহুদী কেন্দ্র নরিমন হাউসে হামলার ঘটনা ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে দৃশ্যপটে টেনে আনে। .... আমেরিকার বর্তমান ক্ষমতাসীন মার্কিন অভিজাত সংস্থা White Anglo-Saxon Protestant [WASP] Forces যায়নবাদীদের সাথে এক চুক্তিতে পৌঁছেছে। নরিমন হাউসে ইহুদী রাববী ও তার নবপরীণীতা স্ত্রীকে হত্যার মাধ্যমে যায়নবাদীরা দুটি লক্ষ্য পূরণ করেছে। এক. এই ঘটনায় মোসাদ কমান্ডোদের জড়িত থাকার বিষয়টি আড়াল করতে পেরেছে। দুই. এই হত্যাকান্ডে তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহানুভূতি পাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

যায়নবাদীরা নিজেদের লোক হত্যা করে প্রতিপক্ষ ঘায়েল করার কৌশল দীর্ঘদিন ধরেই অবলম্বন করে আসছে। ভারতের মুম্বাইয়ে সবরমতি ট্রেনে হিন্দু উগ্রবাদীরা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের হত্যা করে তার দায় মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এরই পটভূমিতে গুজরাটের কসাই নরেন্দ্রমোদীর নেতৃত্বে সেখানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালানো হয়। সম্প্রতি মুম্বাই ম্যাসাকারের আগে মুম্বাইয়ের মালেগাঁওয়ে মুসলিম জনপদে হিন্দু জঙ্গিবাদীরা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একাংশের সমর্থন ও সংঘ পরিবারের উগ্র ধর্মীয় নেতা নেত্রীদের মদদে বোমা সন্ত্রাস চালিয়ে ধরা পড়েছে। ভারতের নিরপেক্ষ গোয়েন্দা সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে যে, এর আগে ভারত থেকে পাকিস্তানগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণও ঘটিয়েছে হিন্দু জঙ্গিরা। যায়নবাদী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এর সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞতা বিক্রয় ও সহযোগিতা চুক্তির পর ভারতে যায়নবাদীদের কায়দায় নকল ইসলামী জঙ্গি তৈরী করে ভয়ংকর সন্ত্রাসের নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে একের পর এক। এই ঘটনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন লেঃ কর্ণেল পুরোহিত এবং হিন্দুজঙ্গিবাদী সন্ন্যাসিনী সাধবী প্রজ্ঞা গ্রেফতার হন। আরও গভীরে গিয়ে তদন্ত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুম্বাইয়ের এন্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াডের প্রধান হেমন্ত কারেকার ও তার সহযোগীকে মুম্বাই ম্যাসাকারের দিনই অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা হত্যা করেছে। যদিও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দাবী করছে যে, মুসলিম বন্দুকধারীরাই কারেকারকে হত্যা করেছে। তবে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ঘটনাকে মূল ঘটনা চাপা দেবার কৌশল বলে মনে করেন। হেমন্ত কারেকারের স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে মনে করেন। এমনকি তিনি নরেন্দ্রমোদীদের থেকে সরকারী ক্ষতিপূরণের অর্থ নিতে অস্বীকার করেছেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মিডিয়া তার আর কোন সন্ধান পাচ্ছে না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মিসেস হেমন্ত কারেকারের কোন বক্তব্যই যাতে মিডিয়ায় না আসে সে ব্যাপারে কঠোর ভূমিকায়।

অমরেশ মিশ্র লিখেছেন : 'হলসবার্গ' গত কয়েক মাস ধরে হামলা পরিকল্পনাকারীদের ঘরভাড়া দিয়েছিল এবং তারা এই অপারেশনকে অধিকতর কার্যকর করতে সাহায্য করেছিল। হলসবার্গকে জেরা করার সুযোগ পাওয়া গেলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। তবে এটা ভারত সরকারই চাইবে না। অমরেশ মিশ্র উল্লেখ করেছেন, হামলাকারীরা ইসরাইলের মোসাদ ,কমান্ডো এবং মুম্বাইয়ের ইহুদী কেন্দ্র নরিমন হাউসকে তারা সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। নৌ পথে পাকিস্তান থেকে কমান্ডো হামলার বিষয় প্রমাণ করতে তারা বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। একজন ইহুদী লেখক যায়নবাদ ও হিন্দুত্বের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে ভারতীয় পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ, মিডিয়া ইহুদীদের কেন্দ্র নরিমন হাউসকে নিয়ে কোন সন্দেহের আলো ফেলতে চায় নি। মুম্বাইয়ের উত্তেজিত জনতা নরিমন হাউসের ওপর সন্দেহ করে হামলার প্রস্তুতি নিতেই সেখানে পুলিশী নিরাপত্তা দেওয়া হয়। নরিমন হাউসে বিলম্বে পুলিশী অভিযান চালানো হয়। এ নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। মুম্বাইয়ের চামা হাসপাতালে হামলাকারী বন্দুকধারীরা অনর্গল মারাঠী ভাষায় কথা বলেছে। 'মহারাষ্ট্র টাইমস' এ

www.bjilibrary.com

খবর দিয়েছে। অমরেশ মিশ্র লিখেছেন : মুম্বাই থেকে যে সব ইহুদী ইসরাইলে হিজরত করেছিল, তারা অনর্গল মারাঠী বলতে পারে এবং মোসাদ তাদের রিক্রুট করে।"

অমরেশ মিশ্রের বিশ্লেষণ :

১. কতিপয় সন্ত্রাসী সম্ভবত শ্বেতাঙ্গ ছিল।

২. তারা হয়তো ভাড়াটে সৈন্য ছিল।

তাহলে তারা কোন দেশের? মোসাদ ও সিআইএ-র তথাকথিত জিহাদী গ্রুপ সহ বেশ কয়েকটি ভাড়াটে সেনা গ্রুপ রয়েছে।

৩. কারেকারের হত্যাকারী মারাঠী ভাষীদের পরিচয় কি? তাহলে মোসাদ কী কারেকারকে হত্যায় মারাঠী ভাষী সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করেছে? উল্লেখ্য কারেকার বিরোধী হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অফিসার এবং ছোট রাজনের [হিন্দুবাদী জঙ্গিনেতা] লোকদের একটি যৌথ টিম কারেকারকে নিয়ে যায়। ছোট রাজন হত্যার অভিযোগে মুম্বাই পুলিশের একজন অফিসারকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে।

৪. মহারাষ্ট্রের পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী বিলাস রাও দেশমুখ ঘটনার সময় মুম্বাই ছিলেন না। তবে রাত ৯টায় খবর পেয়েও তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে বিষয়টি জানান রাত ১১টায়। রাতে কারেকার যখন ঘটনাস্থলে আসেন, তখন সেখানে কোন পুলিশ ছিল না। এ সময় মুম্বাইয়ের ৪০ হাজার পুলিশের কোনই তৎপরতা দেখা যায়নি।

অমরেশ মিশ্র লিখেছেন ঃ রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যে সময় সন্ত্রাসীরা নিরূপদ্রবে লোকদের হত্যা করছিল, সে সময় মুম্বাই পুলিশকে ইচ্ছাকৃতভাবে সরিয়ে রাখা হয়।

এদিকে অরুন্ধতি রায় লিখেছেন : '৯ মানে ১১ নয়, ভারতও নয় আমেরিকা : ১৫.১২.০৮ প্রথম আলো [ভারতের আউটলুক'] মিস রায় লিখেছেন : 'সন্ত্রাসবাদ মুকাবিলা করার একমাত্র পথ হলো, আয়নায় দানবের প্রতিবিম্ব দেখা। ওটা আমাদেরই প্রতিবিম্ব। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক সড়ক সঙ্গমে। একদিকের পথে লেখা রয়েছে, 'ন্যায়বিচার', অন্যপথটি 'গৃহযুদ্ধের' দিকে গেছে। তৃতীয় কোন পথ আর নেই, নেই ফিরে যাওয়ারও কোন উপায়। অরুন্ধতী লিখেছেন : 'মুম্বাই হামলার জন্য ভারত সরকার জোরের সঙ্গে দায়ী করেছে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের মদদপুষ্ট লস্কর-ই-তাইয়েবাকে। এর মধ্যে পুলিশ জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ পুলিশবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ মুখতার ও কলকাতা নিবাসী তাউসিফ রহমানকে আটক করেছে। সুতরাং কেবল পাকিস্তানী নাগরিকদের দোষারোপ করাটা কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সবসময়ই দেখা যায়, সন্ত্রাসবাদের গোপন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এক বৈশ্বিক নেটওয়ার্কও উন্মোচিত হয়। তারা কেবল দুটি দেশের মধ্যেই কাজ করে না। তাদের কাজকর্ম আন্তর্জাতিক। আজকের দুনিয়ায় কোন সন্ত্রাসী হামলার জন্য একক কোনো দেশকে দায়ী

www.bjilibrary.com

করা অবাস্তব, যেমন অবাস্তব আন্তর্জাতিক পুঁজিকে কোন একক দেশের বলে চিহ্নিত করা।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পাকিস্তানে আক্রমণ করলে সন্ত্রাসীদের শিবির হয়তো ধ্বংস হবে, কিন্তু সন্ত্রাসীরা রয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার, পরাশক্তির বন্ধু হয় না, হয় এজেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেশি মাখামাখির পরিণতি সর্বনাশা। ইরাক আফগানিস্তানের উদাহরণ সামনেই আছে। অন্যদিকে যুদ্ধে জড়িত হলে ভারতের লাভ একটাই- আভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া। আর একটি লেখায় অরুন্ধতি রায় লিখেছেন ঃ 'আমরা জানি ইসরাইল হলো মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার খুঁটি এবং সব দিক থেকে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট রাষ্ট্র। সুতরাং আমেরিকা ও ইসরাইল ধারণাগতভাবে আলাদা দুটি দেশ নয়। এবং খেয়াল করলে দেখবেন, ইসরাইল ও আমেরিকার মুসলিম বিদ্বেষের সাথে ভারতের শাসক মহলের মুসলিম বিদ্বেষ কীভাবে একাকার হয়ে যাচ্ছে।' [প্রথম আলো : জেড নেট : ১৪ অক্টোবর-২০০৮]

উপমহাদেশীয় মুসলিমদের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী এবং ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত প্রবাসী প্রবীণ বাংলাদেশী সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সাম্প্রতিক এক লেখায় "ভারত-ইসরাইল আঁতাত : উপমহাদেশে মোসাদের কালো ছায়া"-য় আরও কিছু তথ্য বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। দৈনিক ডেসটিনি : ২৫.০৯.০৮ তিনি লিখেছেন : ইসরাইলের সাথে ভারতের সম্পর্ক কূটনৈতিক অর্থনৈতিক পর্যায় অতিক্রম করে সামরিক সহযোগিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। মোসাদের সাথে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ককে তিনি প্রতিবেশীদের জন্য বিপজ্জনক হুমকি বলে উল্লেখ করেছেন। গাফফার চৌধুরী লিখেছেন : উপমহাদেশের আকাশে মোসাদের কালো থাবার ছায়া গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই এক ভয়াবহ বিপদ সংকেত। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতের অন্ধ পাকিস্তান বৈরিতার ফলে ভীতিগ্রস্ত পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মার্কিন মৈত্রীর খেসারত দিতে গিয়ে পাকিস্তান এখন তার সার্বভৌমত্ব ও ভূ-খণ্ডগত নিরাপত্তা হারানোর পথে। ভারতকে গণচীন ও ইসলামী জঙ্গিবাদে ভীতির মুখে ইঙ্গ-মার্কিন-যায়নবাদী চক্র আর একটি সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের ঝুঁকিতে নামিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের শূণ্য ফলাফল নিয়ে বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ তারপরও বলেছেন, সন্ত্রাসবিরোধী এ যুদ্ধ যুগ যুগ ধরে চলবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের ঘাড়ে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নয়া দায় চাপিয়ে অমেরিকা স্বস্তি পেতে চাইছে। সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের ফলে ভারতে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে, সেই সূত্রে ভারতের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি সুবিধাবঞ্চিত জনগণ এবং জাতিসত্তার স্বীকৃতির জন্য লড়াইরত জনগোষ্ঠী এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে কিনা, সে প্রশ্ন যৌক্তিকভাবেই উঠেছে। ভারতীয় শাসকরা ইসলামী জঙ্গিবাদ দমনের নামে এ অঞ্চলে যে যুদ্ধের দাবানল জ্বালাতে শুরু করেছেন, তা থেকে তাদের সরানো কঠিন হবে। হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক ফ্রন্ট-বিজেপির সাথে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় জঙ্গিপনায় প্রতিযোগিতা

www.bjilibrary.com

করছে। প্রথমত: তাদের সামনে রয়েছে একটা জাতীয় নির্বাচন এবং দ্বিতীয়ত: গান্ধী পরিবারের উত্তর সূরী রাহুল গান্ধীর ক্ষমতার পথ মসৃন করার দায়ও কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘাড়ে চেপেছে। মার্কিন আশীর্বাদ পুরোপুরি ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ায় আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার ভারতের দক্ষিণ এশিয়ায় উগ্রতা ও খবরদারি আরও বাড়বে। একক বিশ্বব্যবস্থার মেরুকরণের পুরো সুবিধা ভারত ভোগ করছে।

এই পটভূমিতে ইন্ডিয়ান-পলিটিকো-কালচারাল-মিলিট্যান্ট-স্ট্রাটেজিস্টদের মিলিত কলম সন্ত্রাস বাংলাদেশকে ঘিরে আরও বেগবান হবে। বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ-দুর্নীতি অপশাসনের অপবাদে মিডিয়া-সন্ত্রাসের মাধ্যমে অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্য বাস্ত বায়ন অনেকদূর এগিয়েছে। বিগত ১/১১-এর পটভূমি তৈরিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কার্যকর ভূমিকা কারও দৃষ্টি এড়ায়নি।

একক বিশ্বব্যবস্থায় সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কার্যকারণে 'এমবেডেড জার্নালিজম' তৈরি হয়েছে। সাংবাদিকতা, বিশেষ করে বড়ো বড়ো প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মালিকানায় করপোরেট পুঁজির আবির্ভাব তথ্য ও মতের সাম্রাজ্যিকীকরণ করেছে। ৯/১১-এর পর এর দায় আল-কায়েদা-বিন লাদেন ও সাদ্দাম হোসেনের ওপর চাপানোর ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নামে গল্প-কাহিনী প্রচার ও তাতে বিশ্বাসযোগ্যতার অনুপান আনয়নে মিডিয়ার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও আগ্রাসী। টুইন টাওয়ার হামলার পর যে যুদ্ধটা হয়েছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছে মিডিয়া। ভারতের রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদ এবং হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক-সামাজিক সংগ্রামের সাথে সেখানকার সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী-থিংকট্যাংকের অধিকাংশই একাত্ম।

সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের জুজু মূলত: সাম্রাজ্যবাদের এক মারণাস্ত্র। এই সাথে তারা দুর্বল গণতন্ত্র, সংখ্যালঘু-উপজাতীয়দের নিরাপত্তা, সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ দমনে অক্ষমতা ইত্যাদির মানদন্ডে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে 'ব্যর্থ' বা প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর কৌশল সাম্রাজ্যবাদীদের আর একটি মারণাস্ত্র। এই মারণাস্ত্র ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা অথবা তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী করা হয়েছে। ইসলামী জিহাদীদের সশস্ত্র তৎপরতা প্রমাণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ তাদের লালিত নকল জিহাদী ও জঙ্গিদের পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাধিক্য এবং জনগণের ইসলামী চেতনা-মসজিদ-মাদ্রাসা-খানকাহ্ ইত্যাদির অস্তিত্বের কারণে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশকে টার্গেট করা সহজ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ভারতীয়করণ করার মাধ্যমে জাতি-রাষ্ট্র রক্ষার সংগ্রামকে দুর্বল করা হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বভৌম উত্থান ও পরিচিতিকে ভারত ঔদ্ধত্য হিসেবে দেখছে। বাংলাদেশের ইসলামী আইডেন্টিটির সাথে তার অস্তিত্ব জড়িত। এই পরিচিতি থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেক্যুলার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্তর্ঘাত চলছে।

www.bjilibrary.com

১৯৪৭-পূর্ব সংখ্যাতাত্ত্বিক ভীতি

১৯৪৭ সালে ভারত ভেংগে মুসলিমদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে। যদিও হিন্দু-বৃটিশ চক্রান্তে ভারতের সবগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ভারত বিভক্তির পূর্বে অখণ্ড ভারতে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের নীতিতে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো সমন্বিত ক্যাবিনেট মিশন পস্নানকে কংগ্রেসী নেতা গান্ধী নেহরু নাকচ করেছিলেন মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভীতিকে সামনে রেখে। একইভাবে সর্বশেষ স্বাধীন সার্বভৌম যুক্তবাংলার প্রস্তাবটিও কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংগালী মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভাবের ভয়ে বাতিল করে দেয়। ভারতের আসাম রাজ্যে বর্তমানে বাঙ্গালী মুসলিমদের বিতাড়ন অভিযান চালানো হচ্ছে। সেখানকার মুসলিমদের একদিকে যেমন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখানো হচ্ছে, তেমনি তাদের ওপরও ইসলামী জঙ্গিবাদের অপবাদ চাপানো হচ্ছে। ভারতের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা আসামে মুসলিম জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারকে সেখানে মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করবে বলে আশংকা প্রকাশ করছেন। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা, বিহারসহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের স্থানীয় বা প্রাদেশিক রাজনীতিতে মুসলিমদের প্রভাব সীমিত রাখার বিষয়ে তারা খুবই সচেতন। ভারতের মুসলিমরা কখনও যাতে শাসকের ভূমিকায় উন্নীত হতে না পারে, ভারত সে ব্যাপারে অতি সতর্ক। কেননা, মুসলিমদেরকে রাজনীতি-অর্থনীতির সমপর্যায়ে টেনে নেবার মতো উদারতা ভারত আজও অর্জন করতে পারেনি। মুসলিমদের অবদমিত রাখতে ভারত সবকিছু করছে। ভারতের দুদিকে দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। ভারতে রয়েছে প্রায় ১৫ থেকে ২০ কোটি মুসলিম। ভারতের হরিজন-দলিত ও নিম্নবর্ণের বঞ্চিত হিন্দুদের সংখ্যা বর্ণ হিন্দুদের থেকে আলাদা করলে তাদের সংখ্যাও ৫০ কোটির ওপরে হবে। এই বিপুল জনসংখ্যার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষোভ কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী-উচ্চ বর্ণের ভারতীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে ফুঁসছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যেমন ভারতের ভেতরের দলিত ও নিম্নবর্ণের মানুষকে অবদমিত করে রেখেছে, তেমনি সামরিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ভারত প্রতিবেশী দুটি মুসলিম রাষ্ট্রকে শৃংখলিত ও নতজানু করে রাখতে চাইছে।

অনেকেই জানেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রধানকেন্দ্র ভারতের পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতা। কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার রাজনীতি, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের অধিকাংশেরই পূর্ব পুরুষ পূর্ববাংলা থেকে ৪৭ এর দেশবিভক্তির ক্ষত চিহ্ন নিয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে যাবার বেদনামিশ্রিত ক্ষোভ তাই পশ্চিম বাংলার বাংগালী হিন্দুদের মধ্যে প্রবল। যদিও এদের অনেকেই স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ববাংলার

www.bjilibrary.com

বাংগালী মুসলিমদের রাষ্ট্রনৈতিক উত্থানকে সহ্য করতে না পারার আক্রোশবশে ভারত চলে গেছেন। পূর্ব বাংলার চাষা-ভূষা-রায়ত-প্রজার সাথে সমান্তরালে বসতে-চলতে বা তাদের নেতৃত্বে বসবাস করার গ্লানি বহনে অস্বীকৃতি জানিয়ে 'পূর্ববাংলার' অগ্রসর হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে যান। এরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ভারতভুক্তি কামনা করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। অথবা তারাও 'এপার বাংলার' সাথে মিলন তৃষ্ণায় ভারত ত্যাগ করে আসতে চান নি। পাকিস্তান বিভক্তির পর কলকাতার বাংগালী হিন্দুদের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকবে না। তাও যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা দিল্লীকে আর একবার বাংলাদেশে সামরিক হামলা চালানোর উস্কানীও দিচ্ছে। কলকাতার বাবু কালচারের পুরোধাদের আশীর্বাদে সেখানে বাংলাদেশ ভেংগে স্বাধীন বঙ্গভূমির দাবীদারদের বাড়বাড়ন্ত। কলকাতা থেকেই আওয়াজ তোলা হচ্ছে– বাংলাদেশ সংখ্যালঘু নির্যাতনের। বলা হচ্ছে, তাদের ঘর বাড়ি দখল করে নেয়া হচ্ছে। অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করে ভারতীয় বাংগালী হিন্দুদেরকে তা ফেরত দিতে বলা হচ্ছে। বাংলাদেশে ও কলকাতায় হিন্দুদের সভা-সম্মেলন থেকে দুই-আড়াই কোটি হিন্দুদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে নাগরিকত্ব সহ সহায় সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ, CAAMB [Campaign Against Atrocities on Minorities in Bangladesh] ধরনের বহু সংগঠন গড়ে উঠেছে। একাধিক বাংলাদেশ বিরোধী ওয়েবসাইট রয়েছে কলকাতায়। যারা অবিরত বাংলাদেশকে ঘিরে সংঘবদ্ধ অপপ্রচার চালায়। নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের কর্তাব্যক্তি 'মায়ের ডাক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানো। ভারতের বামফ্রন্ট সরকার বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে তাদের জাতীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লী সরকারের কাছে নালিশ জানিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ ইসলামী জঙ্গিবাদের 'অভয়ারণ্য' এবং উলফা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গীদের ঘাঁটি থাকার কারণে পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ হুমকি হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপই হতে পারে এর প্রতিকার। কৌশলগত কারণেই পশ্চিম বাংলা সরকার কলকাতায় বাংলাদেশ বিরোধীদের মদদ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ বা বাংগালী মুসলিম ইস্যুতে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট এবং সংঘ পরিবারের উগ্র হিন্দুদের আচরণ ও দৃষ্টিভংগিতে কোন পার্থক্য নেই। উগ্র হিন্দুবাদী নেতা প্রবীণ তেগাড়িয়া আসামের গৌহাটিতে এসে বলেছিলেন, আসামের বাংলাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার ভূ–খণ্ড দখল করে সেখানে পুনর্বাসন করা হবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় মিডিয়া সন্ত্রাসীরা অধিকাংশই পশ্চিম বাংলার। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন হিরন্ময় কারলেকার। এই ভদ্রলোক বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদকে ভয়ংকর বিপজ্জনক হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে Bangladesh : Next Afghanistan' নামে একখানা বই লিখে

www.bjilibrary.com

ফেলেছেন। এ বইয়ের অধিকাংশ তথ্য উপাত্ত স্থানীয় প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ভোরের কাগজ, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকা থেকে নেয়া। পশ্চিম বাংলার আর একজন থিংকট্যাংক সদস্য হচ্ছেন সুমিত গাঙ্গুলী। তিনিও যায়নবাদী থিংকট্যাংকের কলাবরেশনে বাংলাদেশ বিরোধী গবেষণা কর্মে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদের বিপদ সম্পর্কে নানা বানোয়াট কথা লিখেছেন। অরবিন্দ আদিগাও প্রায়শই বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় সক্রিয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে এরা বাংলাদেশ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হননি। এদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিপুল অর্থের বিনিময়ে। বাংলাদেশে এদের বেশ কিছু সহযোগী ও রিসোর্স পারসন রয়েছেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদেশী সাংবাদিক Bestil Lintner প্রথমে লিখেন, 'A Cocoon of Terror। এতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইসলামী জঙ্গিবাদের অপবাদ চাপানো হয়। ভারতীয় লেখক অরবিন্দ আদিগা লিখেন- State of Disgrace, নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক নিবন্ধে উস্কানীমূলক বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এতে লেখা হয়: বাংলাদেশ : পরবর্তী ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র! টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন : আল কায়েদার নিরাপদ আশ্রয় বাংলাদেশ। এছাড়া লস এঞ্জেলস টাইমস, নিউজউইক, নিউইয়র্ক টাইমস সহ বেশ কিছু পশ্চিমা প্রিন্ট মিডিয়া বাংলাদেশ বিরোধী পরিকল্পিত মিডিয়া ক্যাম্পেইনে যুক্ত ছিল এবং এখনও আছে।

একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রধানত ভারতের উৎসাহে যায়নবাদীদের মদদে বাংলাদেশ বিরোধী সার্বিক প্রচারণা চলে আসছে। বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় ইন্দো-যায়নবাদী লবীই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। এই মহলের স্পন্সরশিপে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বর্ণাঢ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে। এসব মিডিয়ার সীমান্তবহির্ভূত আনুগত্য, জাতীয় এজেন্ডার চেয়ে গ্লোবাল এজেন্ডার প্রতি দায়বদ্ধতা, বাংলাদেশকে ইসলামী জঙ্গিবাদের আখড়া প্রমাণের নিরলস সাধনা ভারতীয় বা যায়নবাদী প্রোপাগান্ডার চেয়েও দেশের বেশি ক্ষতি করছে।

বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার কিছু ধরণ

সাম্প্রতিতম ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। ঢাকার 'দৈনিক সংবাদ' গত ১৭.১২.০৮ তারিখ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে 'জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে ঢাকার ওপর দিল্লীর চাপ'। অপর রিপোর্ট 'ভারতের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ।' অভিযোগটা অতি পুরনো। তবে তার উপস্থাপনা নতুন। মুম্বাই ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের পদত্যাগের পর নয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিঁসেবে দায়িত্ব নিয়েই লোক সভায় চিদাম্বরম জঙ্গিবাদে মদদদানের জন্য বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করেন। বাংলাদেশ ভারতের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ যে কোন দেশের সঙ্গে সন্ত্রাস বিরোধী কাজে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে কোন সন্ত্রাসবাদীর কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ নেই। বাংলাদেশে কোন

www.bjilibrary.com

সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী নেই। এখানে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। ভারতের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৬-১২.২০০৮ জানায়, ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরাম লোকসভায় 'বাংলাদেশ তাদের মাটিতে ভারত বিরোধী জঙ্গিদের অবাধে কার্যকলাপ চালাতে দিতে পারে না' মর্মে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি জঙ্গিবাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দানের ব্যাপারে বাংলাদেশকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তাতে তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তিনি যেন নিশ্চিত হয়েই এসব কথা বলছেন। অর্থাৎ বাস্তবতা যাই থাক, বাংলাদেশকে চাপে রাখার জন্য নয়াদিল্লী জঙ্গিবাদের অস্ত্র ব্যবহার করেই যাবে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, ভারত বিরোধী কোন জঙ্গির এদেশে অবস্থানের কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশ তার নিজের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, পাশাপাশি অন্য রাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান জানিয়ে আসছে। তিনি উভয় দেশের মঙ্গলের জন্য এরকম অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য পরিহার করা উত্তম বলে মনে করেন।

এদিকে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় অগ্রগামী ভারতের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাদের একই তারিখের সংখ্যায় লিখেছে : "মুম্বাই সন্ত্রাসে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে যারা জঙ্গিদের যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলার পরও সে দেশে সামরিক অভিযানের পথে যেতে ভারত রাজী নয়। ঠিক তেমনই উত্তর পূর্বের জঙ্গি সংগঠনগুলোর শিবির গুঁড়িয়ে দিতে বাংলাদেশে এখনই যৌথ সেনা অভিযানের পক্ষপাতি নয় ভারত। কারণ পশ্চিম ও পূর্বের দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একসঙ্গে বিবাদে যেতে চাইছে না ভারত। আপাততঃ তাই ঢাকার ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়িয়েই সরকার বাংলাদেশে কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার পথ নিচ্ছে। বাংলাদেশের মাটিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গিদের শিবিরগুলো যে পাক গুপ্তচর সংস্থা- আইএসআই-এর পৃষ্ঠপোষকতাতেই চলে সে বিষয়ে ভারতের হাতে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশে পাক মদদপুষ্ট ইসলামী জঙ্গিদের সঙ্গেও উলফা ও উত্তর-পূর্বের অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি চিদাম্বররম বাংলাদেশকে ভারতের প্রত্যাশা অনুধাবনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ঃ "বাংলাদেশও বোঝা উচিৎ তাদের কি কর্তব্য। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হলে আখেরে বাংলাদেশেরই ক্ষতি।"

ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রতি চোখ রাঙ্গানীর আভাষ রয়েছে। তবে বাংলাদেশ মিথ্যা অভিযোগ মাথায় নিয়ে জঙ্গিবাদ, ভারতীয় গেরিলাদের মদদদান বা আইএসআইয়ের সাথে যোগসাজসে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের দায় স্বীকার করে নিলেই ভারতের দৃষ্টিতে 'কর্তব্য' পালন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জঙ্গি ও ভারতীয় বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ধ্বংসে যৌথ সামরিক অভিযান চালানোর জন্য চাপ দিয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার বা মিডিয়া সন্ত্রাসের উৎস ও মদদদাতা হচ্ছে ভারতের

www.bjilibrary.com

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সরকারগুলো এবং দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার। এই একই ধারা অনুসরণ করছেন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তারা বাংলাদেশকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করে বিকৃতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করে থাকেন। ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী কুল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের অন্ধ অনুগামী হিসেবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচারণা চালায়। এটাকে বাংলাদেশ বিরোধী মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বেশ কিছু ভারতীয় পন্ডিত যায়নবাদীদের নিবিড় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশীয় নিরাপত্তা ইস্যু এবং জঙ্গিবাদ নিয়ে গবেষণা কর্মের নামে সুসংগঠিতভাবে উচ্চ মাত্রার তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাই শীর্ষে। সুমিত গাঙ্গুলি, হিরন্ময় কারলেকার, অরবিন্দ আদিগা, সি, রাজামোহন প্রমুখ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কোন না কোনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গোব্যাল মিডিয়া যুদ্ধের অংশীদার। বাংলাদেশের জন্য এখানেই রয়েছে বড়ো সমস্যা।

বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করতে দেশের ভেতরে যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক সুশীল এবং তাদের কতিপয় মিডিয়া তৎপর, তেমনি দেশের বাইরে ভারতীয় থিংকট্যাংকের প্ররোচনা এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে মিডিয়া সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক সামাজিক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। দেশের ভেতরে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ সাম্প্রাদায়িক জুজুর অজুহাত তুলে যেমন সাম্প্রাদায়িক অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তেমনি তাদের সংগঠনের প্রবাসী শাখাগুলোও ইউরোপ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ বিরোধী ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা এ প্রক্রিয়া চালিয়ে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের অব্যবহিত পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপক সংখ্যালঘু নির্যাতন অভিযোগ উত্থাপনের পর হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা আরও আগ্রাসী ও অন্তর্ঘাতী হয়ে উঠে। ২০০৪ সালের এপ্রিল ও মে মাসে সংগঠনটি নিউইয়র্কে ইএন পস্নাজা হোটেলে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী জানায়। সেমিনারের অন্যতম বক্তা ছিলেন ভারতীয় নাগরিক অধ্যাপক বেদপ্রকাশ নন্দা। যুক্তরাষ্ট্রের কলারোস বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মি. নন্দা ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ এনে মি. নন্দা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নিরাপত্তা পরিষদকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করতে হবে। এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন 'ঐক্য পরিষদ' নেতা দ্বিজেন ভট্টাচার্য। এ

www.bjilibrary.com

সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন মিডল ইস্ট ফোরাম ইউএস পিস ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক ড্যানিয়েল পাইপস, ভারতীয় নিউজার্সি রাজ্য এসেম্বলীম্যান উপেন্দ্র শিভুকালা, ভারতীয় নাগরিক জিতেন্দ্রকুমার, পাদ্রী লুইস ব্র্যাকসটন ও আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি খালিদ হাসান, রূপা বর্ণিক, কানাডা ঐক্য পরিষদ নেতা কিরিট বিক্রম সিনহা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী সম্প্রদায় এবং সন্তু লারমার প্রতিনিধি আইনজীবী লা লাম লাই এবং খাসিয়া সম্প্রদায় প্রতিনিধি সজীব দ্রং। নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত এ খবরটি ১৮মে, ২০০৩ তারিখে 'দৈনিক ইনকিলাব' প্রকাশ করে।

এ সেমিনারের মূল থিম ছিল : 'রাইজ অব মিলিট্যান্ট ইসলাম ইন বাংলাদেশঃ হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন ইন বাংলাদেশ: হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন এন্ড দ্য ক্যাম্পেইন অব রিলিজিয়াস এন্ড এথনিক ক্লিনসিং।' প্রধান বক্তা ড্যানিয়েল পাইপস কট্টর ইসলাম বিরোধী হিসেবে সুপরিচিত। যদিও তিনি কখনও বাংলাদেশ সফর করেননি। তারপরও বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন : "১৯২০ সাল থেকে চরমপন্থী ইসলামের প্রসার ঘটেছে। পাকিস্তানের মাওলানা মওদুদী এবং মিসরের হাসান আল বান্না নিজেদের মতবাদকে ইসলামী পন্থা হিসেবে চালু করে দিয়েছেন। সে থেকে চরমপন্থী ইসলামের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। টাইম 'ম্যাগাজিন' ১৪ অক্টোবর, ২০০২-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, টাইমস-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল কান্দাহার থেকে জাহাজে করে তালেবানরা বাংলাদেশে অস্ত্র শিপমেন্ট করেছে। সে সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তদন্ত করা উচিৎ।

২০০৪ সালের ২৫ এপ্রিল ইনকিলাব-এ প্রকাশিত আর একটি খবর "বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিরূপ প্রচারণাঃ ৩০ এপ্রিল নিউইয়র্কে শুনানী : হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সক্রিয় ভূমিকা।" নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা 'এনা' পরিবেশিত খবরে বলা হয়, কানাডাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড পীস পার্ক' বাংলাদেশ বিরোধী দলীয় রাজনীতিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত দমন পীড়নে গভীর উদ্বেগ এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের ওপর বুশ প্রশাসনের ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রীডমের উদ্যোগে নিউইয়র্ক সিটিতে একটি শুনানী অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রীডমের শুনানীতে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের [চারদলীয় জোট] বিভিন্ন পদক্ষেপের বৈরী ও বিকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক শীতাংশু গুহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।'

সীতাংশু গুহ এক সময় দৈনিক সংবাদ-এ সাংবাদিকতা করেছেন এবং সিপিবি-র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। বামপন্থী প্রগতিবাদী হলেও তিনি বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী কট্টর সাম্প্রদায়িক অবস্থান নিয়েছেন। এই সীতাংশু গুহই

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সময় তাঁর বিরুদ্ধে একটি উকিল নোটিশ করিয়েছিলেন। এই সীতাংশু গুহ রাই জোট সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু দলনের ইস্যুতে ভারতের কলকাতায় আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন।

বাংলাদেশকে ঘিরে মোসাদ-'র'-এর ষড়যন্ত্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা সাময়িকী 'দি ইকোনমিস্ট' পত্রিকা তাদের ২০০৮ সালের বার্ষিক রাজনৈতিক সমীক্ষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছে যে, বাংলাদেশে ২০০৮ সাল ঘোষিত নির্বাচনের বছর হলেও "ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতময়" পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। James Astill নয়াদিলীর ডেটলাইনে "There will be no election in Bangladesh in 2008"-২০০৮ সালে বাংলাদেশ কোন নির্বাচন হচ্ছে না- শীর্ষক এক রিপোর্টে এ কথা উলেখ করেছেন। James Astill কিসের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন নিয়ে এমন নিশ্চিত নেতিবাচক রিপোর্ট করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বিস্মিতভাবে প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশে যেখানে নির্বাচনমুখী একটা প্রবাহ শুরু হয়েছে, সেখানে 'ইকোনমিস্ট'-এর দিলী প্রতিনিধির এই আশংকার ভিত্তি কি? পর্যবেক্ষক মহল আরও প্রশ্ন তুলেছেন, James Astill কী তাহলে যায়নবাদী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'ও আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী 'র'-এর নীল নকশা জেনে নিয়েই আসন্ন নির্বাচন প্রশ্নে চূড়ান্ত নেতিবাচক কথা লিখেছেন। বাংলাদেশ ২০০৭ সালের ২২শে জানুয়ারির সংবিধান নির্ধারিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেনি। ঐ সময়ও আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক চক্র আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচাল করেছে। অতীতের সংঘাত, রক্তপাত, নৈরাজ্য, ব্যর্থতা পেছনে ফেলে বাংলাদেশ যখন আর একটি নির্বাচনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীলতার ঘূর্ণিপাকে ফেলে 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের' তকমা এঁটে দেওয়ার জন্য চিহ্নিত আন্তর্জাতিক মহলটি বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ২০০৮ সালের 'দি ইকোনমিস্ট'-এর রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন।

কয়েকদিন আগে 'আমার দেশ' [২৭.১১.০৭] এ 'মোসাদ' ও 'র' তৎপর ঃ বড় ধরনের নাশকতার আশংকা' শীর্ষক প্রকাশিত একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্টের কথা এ প্রসঙ্গে উলেখ করা যায়। এ রিপোর্টে উলেখ করা হয়েছিল যে, "বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ফিলিস্তিন বানানো ও চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসরাইলী গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' উঠেপড়ে লেগেছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে এই দুটি সংস্থা চাইছে, তাদের পছন্দনীয় পক্ষের অনুকূলে আবহ তৈরী করতে।" আসন্ন নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ইস্যু তুলে

www.bjilibrary.com

সরকারকে লক্ষ্যচ্যুত করার রাজনীতিও চলছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে যে বিদেশী চক্রটি সক্রিয়, তারাই জাতীয় বিভাজন ও সংঘাতের নয়া উপাদান হিসাবে নন ইস্যুকে উস্যু বানিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাক গলানো, অন্তর্ঘাত সৃষ্টি এবং প্রতিবেশী দেশটির পক্ষ থেকে বিভিন্নমুখী ইস্যুতে তাদের পালিত পকেট সংগঠনসমূহ ব্যবহার করে নতুন করে নির্বাচন নিয়ে সংকট তৈরী করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে ইকোনমিস্ট এর আগাম নেতিবাচক মন্তব্য বাংলাদেশের ভেতরে নির্বাচন বহির্ভূত নন ইস্যু নিয়ে রাজনীতি ঘোলাটে করার আন্তর্জাতিক প্যাকেজ কর্মসূচির অংশ বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

ভূ-মণ্ডলীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির নানা সমীকরণে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর সাথে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর বহুমাত্রিক নিবিড় সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর ঝুঁকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের এগ্রিসিভ সীমান্ত নীতি এবং সীমান্তে উত্তেজনা জিইয়ে রাখার কৌশল গ্রহণ মোসাদ-এর বিশেষজ্ঞদের অবদান বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় অস্থিতিশীলতা ও অশান্ত পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রেও 'র'-ও 'মোসাদ' একযোগে কাজ করছে বলে অনেকে মনে করেন। বাংলাদেশকে মুসলিম মেজরিটির একটি মডারেট গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে অগ্রগতির ধারায় এগিয়ে যেতে না দেওয়ার ব্যাপারে 'র'ও 'মোসাদ' যুথবদ্ধ কর্মসূচি নিয়েছে।

'ইকোনমিস্ট-এর সমীক্ষক জেমস অস্টিন লিখেছেন : "Bangladesh will worsen in 2008. Its technocratic administration, installed by the army in January 2007, promises to hold elections in December 2008. It will break its promise. At the army's behest, it has arrested the country's main political leaders, Khaleda Zia and Sheikh Hasina Wazed. The charges against the two women of corruption and extortion, respectively may or may not be deserved. But, in the absenee of other leaders, their parties demand their release. This gives the army a choice : democracy and the two Begums (as The feuding Mrs. Zia and Sheikh Hasina are known) or no Begums and no democracy. It will choose the latter in 2008. Public dissatisfaction with the government will increase during the year. Violent protests are all but guaranteed."

৩—

www.bjilibrary.com

জেমস অস্টিল-এর এই সরাসরি মন্তব্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রকেই উন্মোচিত করেছে। তারা বাংলাদেশে যা চায়, অন্যের ঘাড়ে তা চাপিয়ে তা প্রকাশ করেছে মাত্র। বাংলাদেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেওয়াই তাদের নীল নকশার লক্ষ্য।

ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশ

'আনন্দবাজার পত্রিকার' ২২ মার্চ-২০০৭-এর রিপোর্ট :

'অস্ত্র কিনতে দাউদের সঙ্গে 'ডিল করেন খালেদা-পুত্র।' জিয়া পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিএনপি-র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের গ্রেফতার সম্পর্কে পত্রিকাটি রিপোর্ট করতে গিয়ে নয়াদিলীর কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পর্কে রিপোর্টের শুরুতেই উল্লেখ করে যে, "যতই কান্নাকাটি করুন, তাঁর কারাবাসের ঘটনায় স্বস্তি সাউথ ব্লকে'। ভারতের মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহীমের ছবির সাথে তারেক রহমানের ছবি প্রকাশ করে দাউদের সাথে তারেকের যোগসূত্র প্রমাণের প্রয়াস চালানো হয়। এ রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়.... "ভারত যেটা চাইছিল প্রকারান্তরে সেটাই ঘটেছে বাংলাদেশে। ভারত বিরোধী জঙ্গিঘাঁটি প্রশ্রয় দেওয়া ও অনুপ্রবেশ নিয়ে বাংলাদেশ সবসময়েই দিলীর রক্তচাপ বাড়িযে রেখেছে। ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাই আপাততঃ স্বস্তিতে ভারত।" তবে দু'বছরের মাথায় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি-চিদাম্বরম আবারও ভারত বিরোধী জঙ্গীরা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড তৎপর বলে অভিযোগ করে প্রমাণ করলেন যে, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারেনি।

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ২৫ মার্চ ২০০৭ একই বিষয়ে আরও একধাপ এগিয়ে আর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এর শিরোনাম : "দাউদ যোগ, তলাসী খালেদার দফতরেও।" ঢাকা থেকে প্রেরিত পত্রিকার 'নিজস্ব সংবাদদাতার' পাঠানো এ রিপোর্টেও তারেক রহমানে ছবি রয়েছে। রিপোর্টে বলা হয় : মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিম এবং ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা গোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের যোগাযোগ খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। "উল্লেখ্য 'যৌথ বাহিনীর' ৮ ঘন্টাব্যাপী 'হাওয়া ভবনে' অভিযানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয় : অভিযানের খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ভবনের কর্মচারীরা গোপন কাগজপত্র নিয়ে আগেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ...... প্রয়োজনে তারেককে আবার হেফাজতে নিয়ে দুবাই ও দাউদ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে ঘনিষ্ঠসূত্রে জানা গিয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকার একই বিষয়ের ২৫ মার্চ'০৭ এর আর একটি রিপোর্ট। ঢাকার ডেট লাইনে পিটিআই পরিবেশিত এ রিপোর্টের শিরোনাম ঃ "তদন্ত : দাউদ চক্রে তারেক? তল্লাসী খালেদার দপ্তরে।"

www.bjilibrary.com

সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের ভারত সফর সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' '১লা মে'০৭ তারিখ লিখে যে, "ওয়াকিবহাল শিবিরের মতে, তাঁর [মইন] ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় ভারতের সিলমোহর লাগাতে আগ্রহী তিনি।"

South Asia Analysis Group-এর ব্যানারে ভারতীয় লেখক ডঃ সুভাস কপিলা ২৩ জুলাই'০৮ লিখেছেন : Bangladesh : Visit of Indian Army chief significant.'

এতে তিনি লিখেছেন : India's policy establishment needs to factor in its strategic and political calculus the centrality of the Bangladesh Army chief and the Bangladesh Army in Bagnaldesh's policy establishment and governance.

ভারতের 'ডেইলি পাইওনিয়ার' পত্রিকা অনলাইন ২৬ ফেব্রুয়ারী/০৮ রিপোর্টে বলেছে : ভারত সফররত বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল মইন বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে ভারতের সমর্থন চেয়েছেন। 'পাইওনিয়ার'-এর মতে, 'বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতার মূল ব্যক্তি হচ্ছেন জেনারেল মইন।" জেনারেল মইন ভারতীয় সেনাপ্রধানের আমন্ত্রণে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ/০৮ পর্যন্ত ভারত সফর করেন। ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মানস ঘোষও লিখেছেন : 'গণতন্ত্রের স্বার্থেই জেনারেল মইনের সফরকে গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত।' তবে ভারতীয় মিডিয়ায় সেনাপ্রধানের সফর নিয়ে যেভাবে উচ্ছ্বাস ও তথ্য উপস্থাপন করেছে, তা নিয়ে সেনাসদরও ভিন্নমত প্রকাশ করে প্রেসনোট দিয়েছে। এ ব্যাপারে 'দৈনিক সংগ্রাম' ২৮ ফেব্রুয়ারী/০৮ লিখেছে জেনারেল মইনের সফরের সময়কে বেছে নেয়া হয়েছে : বিভেদ-বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ভারতীয় মিডিয়ার তথ্য সন্ত্রাস। এ ব্যাপারে ভারতীয় সাংবাদিক লেখক ভাস্কর রায়ের ২৪ ফেব্রুয়ারী/০৮ তারিখের "Bangladesh Army Cheif visits India লেখায় আর একটি লেখায় ২৭ ফেব্রুয়ারী/০৮ 'সিফি-ডট কম ওয়েব সাইটে/- Dhaka needs to barn'- এ বাংলাদেশের সেনা প্রধানের ভারত সফরকে ভারতের ইচ্ছা পূরণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভাস্কর রায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী/০৮ ইন্টার ন্যাশনাল রিপোর্ট ডট কম এ Democracy in Bangladesh and its impact on India- তেও বাংলাদেশকে ভারতীয় প্রভাব বলয়ে টেনে নিতে জেনারেল মইনের সফরকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। মি. ভাস্কর রায় লিখেছেন : Indian security officials had lamented that recent terrorist attacks in India like Varanas, Delhi, Mumbai, Hydrabad and even Ludhiana and all had Bangladesh connections. It is alleged that Islamic terrorist choose the

www.bjilibrary.com

porous border between India and Bangladesh for carrying out terrorist activities in India.

উদ্ধৃতি লম্বা করলে নিবন্ধের কলেবর আরও বেড়ে যাবে। শেষ করার আগে আরও কয়েকটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যের ইতি টানবো। ২০০৭ সালের ৮ এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট : 'সীমান্ত নিয়ে বুদ্ধের-উদ্বেগ : ঢাকাকে জার্নাল নয়াদিল্লী।' ২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট 'আনন্দবাজার' এর রিপোর্ট : বাংলাদেশী সেনারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ভারতীয় জঙ্গিদের, রিপোর্ট ঢাকাকে। এই উদ্ধৃতির সাথে আর একটি তথ্য সূত্র যোগ করতে চাই। সন্ত্রাস ও অনুপ্রবেশ মুকাবিলায় পরামর্শ দিতে উচ্চ পর্যায়ের ইসরাইলী সামরিক প্রতিনিধি দল ভারত সফর করেন। ইসরাইলী সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল Moshe Kapalinsky-র নেতৃত্বে ১২ জুন/০৮ একটি উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধি দল ভারত সফর করেন। উল্লেখ্য, ভারত-ইসরাইল সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ক গত কয়েক বছর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।।

সুতরাং বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের যে মিডিয়া সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় অন্তর্ঘাতের ক্রুর থাবা বিস্তৃত তা এখন আর কোন দ্বি-পাক্ষিক বা আঞ্চলিক বিষয় নয়। এটি এখন বিশ্ব যায়নবাদীদের লালনে ও পরিচর্যা পৃষ্ঠপোষকতায় গেল্লাবাল আগ্রাসনের রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশকে তার অর্জিত স্বাধীনতা ও জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌম অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে চলমান রাজনীতিতে রাষ্ট্র রক্ষার বহুমুখী সংগ্রামের কর্মসূচী ও কৌশল যুক্ত করতে হবে। কেবল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বা ভারতের নিন্দা জানিয়ে সর্বতোমুখী আগ্রাসন অন্তর্ঘাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচানো যাবে না। ■

লেখক-পরিচিতি : আজিজুল হক বান্না– বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৫ই জানুয়ারী, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্ক
অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র পরাশক্তি। ভারতের রয়েছে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী, ষষ্ঠ বৃহত্তম নৌবাহিনী ও অষ্টম বৃহত্তম বিমানবাহিনী। ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং পৃথিবীতে শিল্প উৎপাদনেও তার অবস্থান সপ্তম। তদুপরি ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। সংগত কারণেই তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীরা সন্ত্রস্ত থাকে আধিপত্যবাদী–সম্প্রসারণবাদী আশঙ্কায়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ভারত একটা বড় ফ্যাক্টর। ভারত দক্ষিণ এশিয়ার ৭৮% এলাকা, ৭৬% লোকসংখ্যা, ৭৭% জিডিপি, ৬৭% সামরিক ব্যয়, সশস্ত্র বাহিনীর ৪৬%, ৫৯% আমদানি, ৬২% রপ্তানির ৬৮% মোট উৎপাদনের মূল্য সংযোজনে ৭৯% বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ৪১% দখল করে আছে।[১] ভারতের আছে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন, বিমানবাহী জাহাজ। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর মূলত তার হাতে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াও ভারতের নৌশক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন।

---

১. রেহমান সোবহান 'The Logic of Placing Economic Cooperation on the SAARC Agenda' in SAARC PERSPECTIVE, Vol-1, No-2, Kathmandu থেকে প্রকাশিত

www.bjilibrary.com

এমনকি বিশ্বব্যাংক যে বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটিকে ধরা যায় বিশ্বের অনেক কিছুর নিয়ন্ত্রক, সেখানের ১৩০৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৫৩৭ জনই ভারতীয়। অর্থাৎ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই তার অবস্থান। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারেও জনশক্তি রপ্তানিতে ভারত সমান আধিপত্য বজায় রেখেছে। আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারতের একক কর্তৃত্ব-এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। তার আগ্রাসী ও বড়ভাইসুলভ মনোভাব সর্বক্ষেত্রে প্রমাণিত।[২] ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পর অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর থেকেই ভারত আগ্রাসী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। ইন্ডিয়া ডকট্রিন, ইন্দিরা ডকট্রিন বলে খ্যাত ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল বক্তব্যই হচ্ছে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র। বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পরে ভারতের ভূমিকাই হবে প্রধান। কে. সুব্রামোনিয়াম লিখেছেন, This country [i.e.India] with its population, size, resources and industrial output will be a dominant country in the region just as USA and Soviet Union and China happen to be in their respective areas. This is a fact of geography, economics and technology. পুরো দক্ষিণ এশিয়া বাধ্য হয়ে একদিন তার সংগে মিশে যাবে।[৩]

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূ-অবস্থান । দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ সূত্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ভারত মহাসাগরের প্রান্তস্থ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশের প্রতিবেশীদের দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ থেকে নেপালের দূরত্ব মাত্র ২০ মাইলের মত। ভূটান রয়েছে মাত্র ৫০ মাইল দূরে । চীনের সীমান্ত মাত্র ৬০ মাইলের মধ্যে। ভারত ও মায়ানমারের সীমানা বাংলাদেশেরই সীমানা।[৪] সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্ত বঙ্গোপসাগর এবং তার মধ্যদিয়ে ভারত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরই বাংলাদেশকে দিয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ এক ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান। এ অবস্থান, সৃজনশীল কূটনীতির ফলে হতে পারে শক্তির উৎস, কিন্তু এ সম্পর্কে উদাসীনতা বাংলাদেশকে দুর্বল [Vulnerable] করে তুলতে পারে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশের সংগে ভারতের সর্ম্পক কেমন? এ প্রশ্নের আবেগমুক্ত উত্তর খুঁজতে হলে

---

২. মোঃ শামীম আহসান, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সমস্যাবলী ও সম্ভাবনা, রিচার্স কনসার্ন, পিরোজপুর, পৃ.৫৮

৩. উদ্ধৃত ড. হাসান মোহাম্মাদ, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার আলোকে করিডোর ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট, ইউনিভার্সিটি পাবলিশার্স, চট্টগ্রাম, জুলাই ২০০০, পৃ. ৭৪

৪. বাংলাদেশ-ভারতের প্রায় ২৫৬৬ মাইল সীমানার পাশাপাশি মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত মাত্র ১৭৬ মাইল

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে কিছু বিষয়াবলীর আলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা দরকার। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কয়েকটি দিক সম্পর্কে সাপ্তাহিক পূর্ণিমায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কি ভারতকে বিশ্বাস করতে পারে? ভারতীয় নেতা কিংবা বাংলাদেশে ভারতপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য হচ্ছে, যে রাষ্ট্র আমাদের এক কোটি লোককে বিপদের সময় আশ্রয় দিতে পারে, যে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে এবং সর্বোপরি যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য আমরা স্বাধীন হয়েছি, তাকে বিশ্বাস না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর ২৫ বছর পার হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে অবিশ্বাসই কেবল বেড়েছে। গঙ্গার পানি, চাকমা সন্ত্রাস, দক্ষিণ তালপট্টি, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, বাংলাদেশের সরনার্থী নাম দিয়ে ভারতীয়দের বাংলাদেশে পুশব্যাক, সীমান্তের কিছু অংশ অমীমাংসিত রাখা এসব ঘটনা প্রমাণ করে ভারত বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন। ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশের বুক থেকে বেরুবাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিল। বিনিময়ে তিন বিঘা পেতে আমাদের একুশ বছর অশ্রু বিসর্জন দিতে হয়েছে। তারপরও যা পেয়েছি তা সার্বভৌম ভূখণ্ড নয়। কেবল পতাকা উড়ালেই সার্বভৌমত্ব প্রমাণ হয় না। দহগ্রাম, আঙ্গোর পোতার মানুষ আজো বন্দী। রাতের বেলা মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার নেই। সূর্য ওঠার পর দিনের আলোতে এক ঘন্টা করে দৈনিক ছয়বার তারা তিনবিঘা করিডোর ব্যবহার করার অনুমতি পায়। ভারতীয় সন্ত্রাসের মধ্যে মৌলিক অধিকারহীন মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। কেন এই নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা? কারণ একটা, বাংলাদেশের মানুষকে ভারত বিশ্বাস করে না। এই সামান্য করিডোর ব্যবহারে ভারতের যখন এত আপত্তি, আমরা আমাদের মাতৃভূমির সকল শরীর কেন বিদেশীদের কাছে নগ্ন করে তুলবো?[৫] বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আরও কয়েকটি দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন ড. মাহবুব উল্লাহ। এগুলো হচ্ছে : ভারতের বহুদিনের পরিকল্পনাটি কি? পরিকল্পনাটি হল, ভারতের ১৯৪৭ পূর্ব মানচিত্রে ফিরে যাওয়া। এগুলোর নেহেরু ডকট্রিন, ইন্দিরা ডকট্রিন ও গুজরাল ডকট্রিনেরই কথা। ভারত তার বহুদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগতভাবে কোশেশ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় বিদ্রোহের মদদ দিচ্ছে, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশের ৫৪টি অভিন্ন নদী থেকে পানি প্রত্যাহারের আয়োজন করে, ছিটমহলের জটিলতা অব্যাহত রেখে উভয় দেশের মধ্যে সমুদ্র সীমা চিহ্নিত না করে এবং বাংলাদেশের ভেতরে পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করে ভারত তার বহু দিনের পরিকল্পনা সুচারুভাবে বাস্তবায়িত করে চলছে। বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট/করিডোর আদায় করাও ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারই অংশ।[৬]

---

৫. পূর্ণিমা, ৪ অগাস্ট, ১৯৯৯ সংখ্যা

৬. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ অগাস্ট ১৯৯৯

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নানাদিক যেমন- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান অগ্নিগর্ভ অবস্থা, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে করিডোর সুবিধা লাভে ভারতের দীর্ঘপ্রয়াস, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ, বহুপাক্ষিকতায় ভারতের পরিকল্পিত অনাগ্রহ, প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে রেলওয়েকে কেবল নিজের স্বার্থে ব্যবহারকল্পে ভারতীয় প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য অসমতা, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্যদেশকে ভারত নির্ভরকরণ প্রচেষ্টা, বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নামে ভারত নির্ভরতা বৃদ্ধিকরণ, ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক লক্ষ্যসমূহ, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ,[৭] সীমান্ত সন্ত্রাস/ছিটমহল,[৮] তিনবিঘা করিডোর, সীমান্ত সংঘর্ষ, পুশইন, পুশব্যাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশের তৎপরতা, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বলকরণে ভারতীয় প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় প্রচারণা, চোরাচালানকে উৎসাহিত করা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, বাংলাদেশের চিহ্নিত গডফাদার ও সন্ত্রাসীদের কলকাতাসহ প্রায় ভারতের সর্বত্র আশ্রয় দেয়া, বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিকদের আধিপত্যবাদী আচরণ ও অতিউৎসাহ, বাংলাদেশের ব্যাপক জনগণের বিশ্বাস ও আদর্শের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্প সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বহুবিধ ষড়যন্ত্র ও ডাম্পিং, অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন সমস্যা ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ প্রসংগে প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন লিখেছেন, বাংলাদেশের সংগে সম্পর্কের অবনতির জন্য ভারত নিজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।[৯]

---

৭. ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চিহ্নিতকরণ নিয়ে ফায়সালার কথা বলা হলেও এবং বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে ঐ চুক্তি সংবিধানের অংশে পরিণত করলেও ভারত আজ পর্যন্ত ঐ চুক্তি বাস্তবায়নে পা টেনে চলছে। ঐ চুক্তিতে বিভিন্ন সেকটরে কিভাবে সীমান্ত চিহ্নিত হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। চুক্তি অনুসারে এ সেকটরগুলো হলো : ক. মিজোরাম-বাংলাদেশ সেকটর, খ. ত্রিপুরা-সিলেট সেকটর, গ. ভাগলপুর রেললাইন, ঘ. শিবপুর-গুরুংতাল সেকটর, ঙ. মহুরী নদী (বিলানিয়া সেকটর), চ. ত্রিপুরা-ফেনী/কুমিল্লা সেকটরের অবশিষ্টাংশ, ছ. ফেনী নদী, জ. ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম সেকটরের অবশিষ্টাংশ, ঝ. বিয়ানী বাজার-করিমগঞ্জ সেকটর, ঞ. হাকার খাল, ট. বইকারী খাল, ঠ. হিলি, ড. লাঠিটিলা-ডামবাড়ি সেকটর

৮. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ছিটমহলের সমস্যা রয়েছে ৪৭ পরবর্তী সময় থেকেই। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৯৫টি ছিটমহল রয়েছে। এগুলোর আয়তন ২৯২২.২৫ একর। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ২৭৪৯.১৫ একর আয়তনের ১২৬টি ছিটমহল রয়েছে। ইন্দিরা-মুজিব সাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে দুই দেশের মধ্যে এই ছিটমহলগুলোর বিনিময় হবার কথা ছিল। উভয় দেশের মধ্যকার ছিটমহলসমূহ বিনিময় প্রক্রিয়া এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। মূলত ভারতের অনীহার কারণেই তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি

৯. প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব, ১৯৯৪ পৃ. ১২, উদ্ধৃত ড. হাসান মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

www.bjilibrary.com

অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন সমস্যা

অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন সমস্যা বাংলাদেশকে ঘিরে ফারাক্কা ও মিনি ফারাক্কার মরণ ফাঁদ সৃষ্টি বাংলাদেশের প্রতি সম্প্রসারণবাদী- আধিপত্যবাদী ভারতের অন্যায় আচারণের এক বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের পানি প্রবাহের সকল উৎসই ভারতে। প্রায় শতকরা ৯৩ ভাগ পানি আসে ভারত থেকে, কেননা ৫৪টি নদীর উৎস হলো ভারতে। ভারত তার দেশ দিয়ে আসা ৫৪টি নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত অংশকেই মরুভূমি বানাতে চাচ্ছে। ভূগোলের এই নির্যাতনে (Tyranny of Geography) বাংলাদেশের মানুষ প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য পানির হিস্যা পাচ্ছে না। এজন্যই বলা যায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও জটিল সমস্যা হচ্ছে অভিন্ন নদীর পানি বন্টন। বাংলাদেশের প্রধান নদী গঙ্গা বা পদ্মার পানি বন্টন ছাড়াও তিস্তাসহ আরো কয়েকটি নদীর পানি বন্টন নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এর কোন সমাধান হচ্ছে না ।

ফারাক্কা বাঁধ

ফারাক্কা বাঁধ ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের পানি লুণ্ঠনও রাজনীতির প্রতীক প্রকল্প। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীগুলোর মধ্যে গঙ্গা নদীই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ২৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা নদী ইন্দো-চীন সীমান্ত থেকে চীন-নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গতি পথ অতিক্রমকালে ৩০০ মিলিয়ন মানুষের জন্য ২ মিলিয়ন কিউসেক বিশুদ্ধ পানি বহন করে। গঙ্গা নদীর প্রবাহের ওপর বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ জনপদ তথা দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহই এ অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি উৎপাদন, নৌ-চলাচল, বনজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, পৌর ও গৃহস্থালী পানি সরবরাহ এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্যর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ভারতীয় ভূখণ্ডে ভারত কর্তৃক ফারাক্কার নিকট বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহারের ফলে গত ৩৫ বছর ধরে বাংলাদেশ অংশে গঙ্গার পানি প্রবাহ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের ওপর ভারতের এই পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে ।

ফারাক্কা বাঁধের প্রেক্ষাপট

কলকাতা বন্দরকে পলির হাত থেকে রক্ষা করতে পঞ্চাশ দশকে বাংলাদেশের রাজশাহী সীমান্ত থেকে মাত্র ১১ মাইল উজানে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর গ্রামের ফারাক্কা নামক স্থানে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে ভারত। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালের ২৯ অকটোবর তার দেশের সার্বিক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে উৎকন্ঠা প্রকাশ করলে ১৯৫২ সালের ৮ই মার্চ ভারত সরকার জবাব দেয় যে, এটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের পরিকল্পনা। তখন ভারত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে পাকিস্তানের সাথে আলোচনা করারও অঙ্গীকার করে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে ভারত তার প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা না করে বাঁধের কাজ শুরু করলে পাকিস্তান এতে তীব্র আপত্তি তোলে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান ভারতের কাছে প্রস্তাব দেয়, জাতিসংঘের সহায়তায় দুই দেশের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক নদী উন্নয়ন কর্মসূচী নেয়া যায় যার মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে দুই দেশের সুবিধা-অসুবিধা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। কিন্তু ভারত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তবে তারা এ ব্যাপারে সুষ্ঠু সমন্বয়ে আসার জন্য তথ্য আদান–প্রদানে রাজি হয় । ১৯৬০ সালের ২৮ জুন উচ্চ পর্যয়ের এক বৈঠক হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালের দিকে পাকিস্তানে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ভারত ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হয়। বাঁধটি নির্মাণ করতে ১০ বছর সময় লাগে। ১২৪৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২৩ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন এ বাঁধটির মূল নির্মাণ কাজে ব্যয় হয় ১৫৬ কোটি রুপি। এর সঞ্চয়াগারে এককালীন পানির ধারণক্ষমতা ২৫ লাখ কিউসেক। ১৯৭১ সালে এর ফিডার ক্যানাল নির্মিত হয়। যার মাধ্যমে বাংলাদেশর গঙ্গার পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ক্যানাল নির্মাণ করতে খরচ হয় ৪৪ কোটি রুপি।

ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান কাজ

১. গঙ্গায় আড়াআড়ি সড়ক ও রেল সেতুসহ ব্যারাজ তৈরি।
২. গঙ্গার ডান তীরে ফিডার খালের জন্য একটি হেড রেগুলেটর স্থাপন।
৩. হেড রেগুলেটর থেকে একটি ফিডার খাল সৃষ্টি।
৪. ভাগিরথীর ওপর জঙ্গীপুরে একটি ব্যারাজ নির্মাণ।
৫. নৌ চলাচলের জন্য চারটি লক (কপাট কল) তৈরি।
৬. ফিডার খালের ওপর সড়ক ও রেল সেতু নির্মাণ।
৭. ফারাক্কা বাঁধের ১৯০টি খিলান গেটসহ ফোবার রয়েছে।

ব্যারেজের মধ্যে দিয়ে পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ২৭ লাখ ঘনফুট। ব্যারেজের পানির আধারের পরিমাণ উচ্চতা +৭২ ফুট, শৃঙ্গের উচ্চতা ৫২ ফুট। স্লুইসের উচ্চতা +৪৭ ফুট। হেড রেগুলেটর দিয়ে পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ৪০ হাজার ঘন ফুট। পূর্ণ সরবরাহের অবস্থায় পানির উচ্চতা ৭২ ফুট। হেড রেগুলেটরের ১১ খিলান রয়েছে।

ভাগিরথী ও হুগলি নদীর সঙ্গে ফিডার খাল ২৩ দশমিক ৮ মাইল দীর্ঘ। ৪৯৫ ফুট চওড়া এর পূর্ণ সরবরাহে পানির গভীরতা ২০ ফুট।

১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর গঙ্গার যে শাখাটি বাংলাদেশে বহমান রয়েছে তার পানি প্রবাহ গ্রীষ্মকালে চরমভাবে কমে যায়। ফারাক্কা চালু হওয়ার পর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশ তাদের চাহিদা অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী কখনোই পানির ন্যায্য হিস্যা পায়নি। ফলে যে পদ্মার প্রবাহ ছিল ১৮০০ মিটার চওড়া তা কমে গ্রীষ্মকালে মাত্র ৪০০ মিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। কুষ্টিয়ার হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ১৫টি পিলারের ১১টি এখন বালুচরে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন

www.bjilibrary.com

বোর্ডের স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, ২০০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাজশাহী পয়েন্টে যেখানে পানির উচ্চতা ছিল ১৭.৯১ মিটার সেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৫.২৪ মিটার, ৩১ অকটোবর ১৩.৯৩ মিটার, ৩০ নভেম্বর ১১.৩০ মিটার, ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি ৯.৭৪ মিটার, ১ ফেব্রুয়ারি ৮.৯৭ মিটার, ১ মার্চ ৮.৫৬ মিটার আর এভাবে ক্রমান্বয়ে কমতেই থাকে।

১৯৭৫ সালে দ্'দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠকে যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ফারাক্কায় ফিডার খাল রাখা আবশ্যক এবং এপ্রিল মাসের ১০ দিন [২১-৩০] ১১ হাজার, মে মাসের ১০ দিন [১-১০] ১২ হাজার, ১১ থেকে ২০ মে ১৫ হাজার ও ২১ থেকে ৩১ মে ১৬ হাজার কিউসেক পানি পাবে বাংলাদেশ। কিন্তু পরে হয়ে যায় বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বাংলাদেশ ও তার নির্ধারিত হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়।

মাওলানা ভাসানী তখন লংমার্চের ডাক দেন। উল্লেখ্য, ফারাক্কা বাঁধের কাজ শেষ হওয়ার পর এ দেশে তা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে খোলা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, পানি প্রত্যাহারের ফলে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলো শুকিয়ে সাহারার মতো বালুময় হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে ফেলার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত এ অনুরোধ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকারের কাছে গৃহীত না হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরক্কো কর্তৃক অনুসৃত নীতির মতো আমি আগামী ১৬ মে রোজ রবিবার রাজশাহী থেকে লাখ লাখ বুভূক্ষ বাঙালিসহ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে ফারাক্কার দিকে অগ্রসর হবো। এটিই ছিলো জননেতার জীবনে সর্ববৃহৎ আন্দোলন ও ঐতিহাসিক ফারাক্কার লংমার্চ।

জাতিসংঘে ফারাক্কা

ভাসানী লংমার্চ করার পর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৭৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩১তম অধিবেশনে ফারাক্কায় একতরফাভাবে গঙ্গা পানি প্রত্যাহারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি শিরোনামে আলোচনাটি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। পরিষদের ক্ষমতা সংক্রান্ত সনদের ১০, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৫ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়, ফারাক্কা প্রশ্নের অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। কিন্তু ভারত এর বিরোধিতা করে বলে এটা একটি দ্বিপক্ষীয় সমস্যা। তবে বিষয়টি আলোচ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পানির হিস্যা ১৯৭৫-এর আগ পর্যন্ত ছিল ৫৫ হাজার কিউসেক। ফারাক্কা চালু হওয়ার পর শুষ্ক মৌসুমে আসতে থাকে ৪৪ হাজার কিউসেক।

১৯৮২ সালের অকটোবর মাসে দু'দেশের সরকারের মধ্যে পানি বন্টন নিয়ে দুই বছর মেয়াদে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়। কিন্তু এরশাদ সরকারের সঙ্গে পানি নিয়ে বিরোধ বাড়তে থাকে। উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৫ সালে

www.bjilibrary.com

কোন চুক্তি করা হয়নি এবং এ বছর নভেম্বরে আবার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয় যার মেয়াদ হয় ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। তারপর আর কোন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়নি। বাংলাদেশে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে তখন তুমুল আন্দোলন চলছে। নব্বইয়ের দশকে এরশাদ সরকারের পতন হয়। অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৯২ সালের ২২ মে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে পানি বিরোধ নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে ২৮ মে যুক্ত ইশতেহারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ফারাক্কার পানিপ্রবাহ সমবণ্টনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরাজমান সঙ্কট এড়ানোর চেষ্টা করবেন। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ফারাক্কার প্রসঙ্গ তার বক্তৃতায় উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে গঙ্গা তথা পদ্মা অববাহিকায় বাংলাদেশের চার কোটি মানুষ বিপর্যয়ের মুখে। এছাড়াও ১৯৯৫ সালের ২৩ অকটোবর জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অধিবেশনে তিনি বলে, ১৯৯৩ সালের এই বিশ্ব সভায় দাঁড়িয়ে আমি এ গুরুতর ও সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সমস্যাটি এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
গঙ্গা পানি সমস্যা এখানো বিরাজমান। এ সমস্যার সমাধান ভারতের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। তাই বাংলাদেশকে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানকল্পে এগিয়ে যেতে হবে।

সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ : '৭৭-এর পানি চুক্তি

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পানি নিয়ে বিরোধ যখন অব্যাহত, এমনকি বিষয়টি জাতিসংঘ পর্যন্ত গড়ায় তখন ভারতে সাধারণ নির্বাচন হয় এবং সরকারের পরিবর্তন হয়। '৭৭ সালের এপ্রিলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বাক্ষরিত হয় পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পানি চুক্তি। ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর দু'পক্ষ স্বাক্ষর করে এ চুক্তিতে। এতে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত হয় সাড়ে ৩৪ হাজার কিউসেক পানি। '৭৭ সালের এ চুক্তিতে বাংলাদেশ-ভারত একটি সমঝোতায় পৌঁছালেও এ দেশের পানি সমস্যা আজো দূর হয়নি। বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা, লবণাক্ততার জন্য দায়ী ভারতের মনমতলবি আচরণ। যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চরম হুমকির সম্মুখীন করেছে।

'৭৭ সালের চুক্তিতে যা ছিল

১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর চুক্তিতে বলা হয়, দু'দেশ তাদের বন্ধুত্ব ও সৎ প্রবিবেশীসূলভ সম্পর্ক উন্নয়ন জোরদার করতে উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি পারস্পরিক সমঝোতা ভিত্তিক বণ্টন ও পানি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।
চুক্তির ক, খ, গ অংশে মোট ১৫টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত এক নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয় ভারত কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি ফারাক্কায় পরিমাপ করা হবে। অনুচ্ছেদ-

www.bjilibrary.com

২ এ বলা হয়, প্রতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কা গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের সূত্র হলো তফসিলে বর্ণিত পরিমাণ। যার ভিত্তি হচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ফারাক্কায় রেকর্ডকৃত প্রবাহের ৭৫ শতাংশের নির্ভরযোগ্যতার ওপর। চার নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়, দুই দেশ একটি কমিটি গঠন করবে। এ যৌথ কমিটি ফারাক্কা বাঁধের নিচে ও ফিডার ক্যানালে এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজে পানির দৈনিক প্রবাহ পরিমাণ ও রেকর্ড করার জন্য পর্যবেক্ষক দল গঠন করবে।

৮ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়, উভয় সরকার শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বের করবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবে।

১২ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়, এ চুক্তির মেয়াদকাল [৫ বছর] ফারাক্কায় বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি স্বীকৃত পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না।

এ চুক্তিতে জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত প্রতি দশ দিন অন্তর পানি বন্টন করা হবে। যেমন প্রথম থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ফারাক্কায় প্রাপ্য ৯৮ হাজার ৫০০ কিউসেকের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার কিউসেক ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য প্রাপ্য ৫৮ হাজার ৫০০ কিউসেক নির্ধারণ করা হয়। ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কায় প্রাপ্য ৫৫ হাজার কিউসেকের ক্ষেত্রে ভারতের জন্য ২০ হাজার ৫০০ এবং বাংলাদেশের জন্য প্রাপ্য ৩৪ হাজার ৫০০ কিউসেক নির্ধারণ করা হয়।

গঙ্গার পানি চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী একটি পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হায়দারাবাদ হাউসের মোঘল ডাইনিং রুমে বসে সেদিন সোনালি কলমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনেক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের পর পানি নিয়ে বিরোধ দুই পক্ষও বুঝতে পেরেছিল গঙ্গায় পানিপ্রবাহ বাড়াতে হবে। কিন্তু সেটা কি করে হবে তা নিয়ে দুই পক্ষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। ভারত সবসময়ই প্রস্তাব দিয়ে আসছিল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যে সংযোগ খাল তৈরি করে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের কাছে সে প্রস্তাব কখনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ভারতের প্রস্তাব এ রকম ছিল, আসামের জঙ্গিগোপানামক স্থান থেকে বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুরের ওপর দিয়ে ৬৪ মাইল যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে ফারাক্কার কিছুটা উজানে গঙ্গা নদীতে গিয়ে ২০০ মাইল লম্বা ৩০০ ফুট গভীর এ খাল খনন করা হবে। এতে ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গায় আসবে। কিন্তু বাংলাদেশ এ প্রস্তাব কখনো মেনে নেয়নি। কারণ, এতে বাংলাদেশের ১ লাখ ৬১ হাজার একর জমি নষ্ট হবে। খালের উজান দিয়ে প্রবাহিত ১১টি নদীকে এর ফলে আড়াড়িভাবে বিচ্ছিন্ন করবে এবং যমুনা নদী ও তার ৭টি উপনদী ও ১টি শাখা নদী পানি থেকে বঞ্চিত হবে।

www.bjilibrary.com

তাই বাংলাদেশ প্রস্তাব দিয়েছিল, নেপালকে যৌথ নদী কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করে নেপাল ও বাংলাদেশে জলাধার নির্মাণ করা, যাতে বর্ষা মৌসুমে গঙ্গার পানি সেখানে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভারতও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে সব বিরোধের অবসানকল্পে দু'দেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। '৮৮ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত কোনো চুক্তি না থাকায় বাংলাদেশ পানিবঞ্চিত হয়ে আসছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল।

৩০ বছর মেয়াদী এ চুক্তি ২০২৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। প্রয়োজনে পাঁচ বছর অন্তর অথবা আরো কম সময়ে দু'পক্ষ আলোচনা করে প্রতিবিধান করবে। স্বচ্ছ, সমতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে তারা ব্যবস্থা করবে।

ফারাক্কা পয়েন্টে যদি ৭০ হাজার কিউসেক পানি থাকে তবে বাংলাদেশ ও ভারত সমানভাবে তার ভাগ পাবে। আর যদি ৭৫ হাজার কিউসেক পানি থাকে তবে বাংলাদেশ ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। বাদবাকি ভারতের জন্য। ৭৫ হাজারের বেশি পানি থাকলে ভারত ৪০ হাজার কিউসেক আর বাংলাদেশ পাবে বাকি অংশটা।

নিশ্চয়তা অনুচ্ছেদে গ্যারান্টি ক্লজে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয় মার্চের ১ তারিখ থেকে মে মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন করে ৩ দফা পালাবদল করে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি নিশ্চিত হবে। চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি যৌথ যুক্ত কমিটি গঠন করা হবে। তবে যদি ফারাক্কার প্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নেমে যায় এবং যে কোন ১০ দিনের জন্য তীব্র সঙ্কট দেখা দেয় সেক্ষেত্রে দুই সরকার জরুরি পর্যালোচনায় বসে কোনো পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চুক্তি ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছরে গঙ্গার মোট প্রবাহ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ এবং ভারতের জন্য প্রতি ১০ দিনের পালাবদলে বণ্টন সিডিউল তৈরি করা হয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে প্রথম ১০ দিন ভারত কম নিয়ে বাংলাদেশকে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি দেবে। পরবর্তী ১০ দিন বাংলাদেশ কম নিয়ে ভারতকে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি দেবে। দু'পক্ষের সমন্বয় সাধনের সর্বোপরি চেষ্টা চালানো হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ২৫তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তিটির খসড়া তৈরি করেন সচিব ড. মহিউদ্দীন খানের নেতৃত্বে তারেক করিম, খলিলুর রহমান ও আইনুন নিশাত।

কিন্তু চুক্তির বর্তমান বাস্তবতাটি অত্যন্ত সুখকর নয়, ভারত তার স্বভাবগতভাবেই ন্যায্য হিস্যা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে যাচ্ছে। কারণ ১৯৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যেখানে পদ্মার পানির উচ্চত ছিল ১০.৪৩ মিটার, ১৯৯৮ সালের একই তারিখে ১০.৪০ মিটার, ১৯৯৯ সালে ১১.১২ মিটার, ২০০০ সালে ১০.৪৯ মিটার, ২০০১ সালে ১০.১৭ মিটার, ২০০২ সালে ১০.৬৫ মিটার, ২০০৩ সালে ৯.৫৫ মিটার, ২০০৪

www.bjilibrary.com

সালে ৯.৬২ মিটার, ২০০৫ সালে ৯.১২ মিটার, ২০০৬ সালে পানি উচ্চতা দাঁড়ায় ৮.৫৮ মিটার। এভাবে প্রতিনিয়ত ভারত বাংলাদেশকে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে আসছে।

যৌথ নদী কমিশন

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে যৌথ নদী কমিশন [JRC] প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালের ২৪ নভেম্বর আইনগতভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। যৌথ নদী কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য থাকবেন। যাদের অধিকাংশ প্রকৌশলী থাকবেন। ২০০০ সালের ২৭ জুন পর্যন্ত এভাবে যৌথ নদী কমিশন পরিচালিত হতো। কিন্তু ২০০০ সালের ২৮ জুন এটি পানিপাম্প মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত একটি স্বাধীন সংগঠনে পরিণত হয়। জেআরসির অফিসের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পানি অনুসন্ধান অধিদফতর [The Water Investigation Directorate of Bangladesh]

জেআরসি ৫৭টি নদীকে পর্যবেক্ষণ করবে। যার মধ্যে ভারতের সঙ্গে ৫৪টি ও মিয়ানমারের সঙ্গে ৩টি। এ নদীগুলো সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে সরকারকে পরামর্শ দেবে। যাতে সরকার করণীয় নির্ধারণ করতে পারে।

জেআরসি প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২৫-২৬ জুন। জেআরসির সবেচেয় বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তিকে। ১৮৮৩ সালের ২০ জুলাই ঢাকা অনুষ্ঠিত হয় ২৫তম বৈঠক। এতে তিস্তার পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের ব্যাপারে আলোচনা হয়। ১৯৯৮ সালের জুনে জেআরসির উদ্যোগে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তে তিস্তা বেড়িবাঁধ নির্মিত হয়। এ তিস্তা বেড়িবাঁধ নির্মাণই যৌথ নদী কমিশনের উল্লেখ করার মতো সফলতা। যৌথ নদী সমস্যার সমাধানে কোনো কার্যকর ও স্থায়ী পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া আর সব কিছুই করেছে যৌথ নদী কমিশন। যেমন-মিটিং, ব্রিফিং, বিবৃতি প্রভৃতি।

বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহের নাম

ভারত থেকে আসা নদী	সীমান্তবর্তী এলাকা	ভারত থেকে আসা নদী	সীমান্তবর্তী এলাকা
রায়মঙ্গল	সাতক্ষীরা	দামালিয়া/যাদুখালী	সুনামগঞ্জ
ইছামতি-কালিন্দী	সাতক্ষীরা	নোয়াগাং	সুনামগঞ্জ
বেতনা-কোদালিয়া	যশোর	উমিয়াম	সুনামগঞ্জ
ভৈরব-কপোতাক্ষ	যশোর ও মেহেরপুর	ধলা	সিলেট
মাথাভাঙ্গা	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর	পিয়াইন	সিলেট
গঙ্গা	নবাবগঞ্জ	শারি-গোয়াইন	সিলেট
পাগলা	নবাবগঞ্জ	সুরমা	সিলেট
আত্রাই	দিনাজপুর ও নওগাঁ	কুশিয়ারা	সিলেট
পুনর্ভবা	দিনাজপুর ও নওগাঁ	সোনাই-বারদল	সিলেট

www.bjilibrary.com

তেতুলিয়া	দিনাজপুর	জুরী	মৌলভীবাজার
টংগন	দিনাজপুর	মনু	মৌলভীবাজার
কুনিক বা কোকিল	ঠাকুরগাঁও	ধলাই	মৌলভীবাজার
মহানন্দা	পঞ্চগড়	লংলা	মৌলভীবাজার
করতোয়া	পঞ্চগড়	খোয়াই	হবিগঞ্জ
তলমা	পঞ্চগড়	সুতরাং	হবিগঞ্জ
ঘোড়ামারা	পঞ্চগড় ও নীলফামারী	সোনাই	হবিগঞ্জ
দিওনাই ও যমুনেশ্বরী	নীলফামারী	হাওড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
তিস্তা	নীলফামারী	বিজানী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ধরলা	লালমনিরহাট	সালদা	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
দুধকুমোর	কুড়িগ্রাম	গোমতী	কুমিল্লা
ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম	সিলোনীয়া	ফেনী
জিঞ্জিরাম	কুড়িগ্রাম	মহুরী	ফেনী
ভোগাই	শেরপুর	কর্ণফুলী	রাঙামাটি
চিল্লাখালী	শেরপুর	মিয়ানমার থেকে আসা নদী	সীমান্তবর্তী এলাকা
নিতাই	ময়মনসিংহ	সাংগু	বান্দরবান
সোমেশ্বরী	নেত্রকোনা	মাতামুহুরী	বান্দরবান
যদুকাটা	সুনামগঞ্জ	নাফ	কক্সবাজার

ফারাক্কার অশুভ প্রভাব

ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের যুক্তি ছিল যে, এর সাহায্যে ফিডার ক্যানাল দিয়ে গঙ্গার পানিকে ফেলা যাবে ভাগীরথীতে। এভাবে শুষ্ক মৌসুমে ভাগীরথীর পানি প্রবাহ বাড়িয়ে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, ভাগীরথীর পানি বাড়িয়ে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের মূল যুক্ত এখন অকেজো হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও ফারাক্কা ব্যারাজ রাখা হয়েছে। কারণ, তার ওপর দিয়ে নির্মিত হয়েছে রেল রাস্তা। সেটা কলকাতার সাথে পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করছে। কেবল তাই নয়, ফারাক্কার উপর দিয়ে প্রয়োজনে সৈন্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে আসামে। তাই ভারত চাচ্ছে না ফারাক্কা ব্যারাজ ভাঙতে। কিন্তু ফারাক্কা ব্যারাজ গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে পশ্চিম বাংলার জন্য। ফিডার ক্যানেল উপচে পানি উঠে মুর্শিদাবাদে সৃষ্টি করছে বন্যা। অন্য দিকে ভাঙছে পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এভাবে ভাঙতে থাকলে মালদহ জেলার অনেক গ্রাম ও কৃষিভূমি বিলীন হয়ে যাবে গঙ্গার বক্ষে। কেবল পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলাই নয়। বিহারের অনেক অঞ্চলে সৃষ্টি হতে পারে বড় রকমের বন্যা। কারণ, বর্ষাকালে আগে যেমন গঙ্গা দিয়ে পানি গড়িয়ে যেতে পারত, এখন আর তা পারছে না ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে। বন্যা ও নদীর ভাঙন যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, এটা একাধিক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই তারা ছিলেন না ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের পক্ষে। কিন্তু ভারতের

www.bjilibrary.com

কংগ্রেস সরকার এই ব্যারাজ নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ করে বিশেষ কারণে। এই কারণ ছিল সাময়িক। ধরা হয়েছিল এর সাহায্যে গঙ্গার পানি বন্ধ করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে ফেলা যাবে বিপাকে। কিন্তু ফারাক্কা এখন হয়ে উঠতে যাচ্ছে বিহার ও পশ্চিম বাংলার জন্য বিশেষ সমস্যা। যেটা নিয়ে এখন ভাবনায় পড়েছে বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার। ফারাক্কার কারণে মালদহ জেলার দক্ষিণাঞ্চল ভাঙছে। কারণ, ফারাক্কা ব্যারাজের ধাক্কা খেয়ে গঙ্গার পানি উত্তর দিকে ধাক্কা মারছে। মালদহ জেলার এ অঞ্চলের মাটি অনেক নরম তাই ভাঙছে সহজেই। পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মাটি তুলনামূকভাবে শক্ত, তাই ফারাক্কা ব্যারাজে ধাক্কা খেয়ে কিছু পানি সেদিকে ধাক্কা মারালেও বড় রকমের ভাঙন সৃষ্টি হচ্ছে না, পশ্চিম বঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার চেয়ে মালদহ জেলার মানুষ ফারাক্কাজনিত কারণে তাদের ক্ষতি হচ্ছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছে ক্ষতিপূরণের জন্য। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা চলছে। যার রায় এখনো হয়নি। কিছু দিনের মধ্যে হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। ফারাক্কা ব্যারাজের কারণে, বাংলাদেশের শিবগঞ্জ উপজেলার অনেক অংশে বড় ধরনের ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর ফলে পদ্মা সরে এসে মিলিত হতে যাচ্ছে পাগলা নামের নদীর সাথে। পাগলা নদী এসে মিলেছে নবাবগঞ্জ শহরের দক্ষিণে মহানন্দা নদীর সাথে। অর্থাৎ পদ্মা, পাগলা ও মহানন্দা নদী এক হয়ে পড়তে চাচ্ছে। নদীর ভাঙন সৃষ্টি হয় দু'ভাবে। বর্ষাকালে নদীর পানি নদীর কূলে ধাক্কা দিয়ে ভাঙন সৃষ্টি করে। এটা হলো প্রাথমিক ভাঙন। নদীর পানি এ সময় মাটির নিচ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে যায়। বর্ষা শেষে এই পানি নদীতে নেমে যেতে থাকে, এই যাওয়ার সময় নদীর কূল ভেঙে পড়ে। ফারাক্কার কারণে ভাঙনের মাত্রা শিবগঞ্জ এলাকায় বেড়েছে। কারণ বর্ষার শেষে পানি অনেক দ্রুত নেমে যাচ্ছে। যেহেতু নদীতে আগের মতো আর পানি থাকছে না। এভাবে পানি নেমে যাওয়ার ফলে নদীর পাড় ভাঙছে আগের চেয়ে অনেক সহজে ও বেশি করে।

ফারাক্কা বাংলাদেশের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা। এর কারণে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ফারাক্কার কারণে পরিবেশগত ভারসাম্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাণী ও বনজ সম্পদ পরিবেশগত কারণে বিপর্যস্ত এবং বিরল প্রাণীও বিলুপ্ত হওয়ার পথে। পশু সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত। বিভিন্ন পেশার মানুষ পেশা হারাতে বাধ্য হচ্ছে। সুপেয় পানির অভাবে দেশের এক চতুর্থাংশ মানুষের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। লবণাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনী রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। পানির অভাবে দেশের প্রায় ৪০ ভাগ উর্বর প্রান্তর মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশের সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে মরুকরণ। এর ফলে গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে লবণাক্ততা। এই লবণাক্ততার কারণে শিল্প ও কৃষি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পলি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায়

৪—

www.bjilibrary.com

নৌপথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মৎস্য ও পশু সম্পদ বিলীন হবার পথে। এর ফলে পদ্মার ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার অগণিত মানুষ তাদের জীবিকা হারিয়েছে। অনেকেই হয়েছে বাস্তুচ্যুত। সারা পৃথিবী যখন পরিবেশ সংরক্ষণে সোচ্চার, তখন বাংলাদেশের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারেরই লঙ্ঘন। এক কথায় ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যয়ের সম্মুখীন।[১০] মরণ বাঁধ ফারাক্কার অশুভ প্রভাবে বিরান হচ্ছে সোনার দেশ। জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শিরোনামের সম্পাদকীয়তে ৪ অকটোবর, ১৯৯৩ দৈনিক ইনকিলাব লিখেছে, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেয়া ভাষণের মধ্যে কোনো রাখঢাক নেই, কোনো অস্পষ্টতা নেই। তিনি ফারাক্কা সমস্যাকে বিশ্ব সভায় তুলে ধরে শুধু বাংলাদেশের ফারাক্কা উদ্ভূত পরিস্থিতিকেই তুলে ধরেননি, বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবীকেই পেশ করেননি, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারত কিভাবে ক্ষুদ্র দেশকে নাজেহাল করছে, ক্ষতির শিকারে পরিণত করেছে তার একটি বাস্তব নজির বিশ্ববিবেকের দরবারে উপস্থাপন করেছেন।[১১]

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

বঙ্গোপসাগর উপকূল বাদ দিয়ে বাকি তিন দিক দিয়েই ভারত পরিবেষ্টন করে আছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ৫৭টি নদী। যার ৫৪টি ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুন্দর দেশ বাংলাদেশ। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য এ দেশকে বিশ্বের বুকে গর্বের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের গঙ্গার পানি ও ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বৈরিতা এবং ভারতের অন্যায়ভাবে নদীশাসন সে সৌন্দর্যেও ভাটা পড়েছে। ভারত পরবর্তী ৫০ বছরের পানির চাহিদা পূরণের জন্য যে পরিকল্পনার ছক আঁকছে তা হলো ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং এর অববাহিকার সব নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার এবং সংযোগ খালের মাধ্যমে সংরক্ষণ করবে। ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ কাবেরী নদী পর্যন্ত এ পানি পৌঁছে দিয়ে শুষ্ক অঞ্চলের পানির প্রয়োজন পূরণ করবে খরা উপদ্রুত উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের জন্য ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি খালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটাবে এবং ৭৮টি জলাধারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করবে। যাতে মরুভূমিতে পরিণত হওয়া এ অঞ্চলগুলোতে কৃষি উৎপাদন কোনো সমস্যা না হয়। কারণ, পানি এসব অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের প্রধান বাধা।

ভারত ১২ কিলোমিটার কৃত্রিম নদী তৈরি করবে। যাতে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার এক তৃতীয়াংশ পানি অর্থাৎ ১৭৩ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি উপদ্রুত অঞ্চলে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ১২-১৫ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হবে ২০১৬ সালের মধ্যে।

---

১০. সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ, দৈনিক সংগ্রাম ৩ অকটোবর, ১৯৯৩

১১. দৈনিক ইনকিলাব, ৪ অকটোবর, ১৯৯৩ জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শীর্ষক সম্পাদকীয়, পৃ.৭

www.bjilibrary.com

ভারতের ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি। অর্থাৎ ১২৪ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, এর ব্যয় ১৪৪ থেকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি পশ্চিমবঙ্গ তারপর উড়িষ্যার ওপর দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক হয়ে ভারতের থর থেকে দক্ষিণের প্রদেশ তামিলনাড়ুতে নিয়ে যাবে। আর গঙ্গার পানি উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটে পৌঁছাবে। মরুময় এসব অঞ্চল সবুজ করার পরিকল্পনা হয়তো বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু তার ভয়াবহ পরিণতি গুণতে হবে বাংলাদেশের মতো হতদরিদ্র এই রাষ্ট্রটিকে।

ভারতের একটি পদক্ষেপ

উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের 'কেন' নদী থেকে প্রতি বছর ১০২ ঘনমিটার পানি মধ্যপ্রদেশের নদীকে তোয়ায় প্রবাহিত করা হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে 'কেন' নদীতে বাঁধ তৈরি করা হবে এবং ২৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগ খাল খনন করা হবে। ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যয় করা হবে ৪০০ কোটি রুপি।

ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পগুলো হলো :

১. ব্রহ্মপুত্রের উপনদী মানতা-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা সংযোগ
২. কোশি-সাগর সংযোগ
৩. গণ্ডক-গঙ্গা সংযোগ
৪. ঘাগরা-যুমনা সংযোগ
৫. সারদা-যমুনা সংযোগ
৬. যমুনা-রাজস্থান সংযোগ
৭. রাজস্থান-সাবরমতী সংযোগ
৮. চুনার-শোন ব্যারাজ সংযোগ
৯. শোন ব্যারাজ ও গঙ্গার দক্ষিণের শাখাগুলোর মধ্যে সংযোগ
১০. গঙ্গা-দামোদর-মাহান্দী সংযোগ
১১. সুবর্ণরেখা- মাহান্দী সংযোগ
১২. কোশি-মোর্চ সংযোগ
১৩. ফারাক্কা-সুন্দরবন সংযোগ
১৪. ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ
১৫. মাহান্দী (মনিভদ্র) গোদাবরী (ধলেশ্বর) সংযোগ
১৬. গোদাবরী ইনামপল্লী নিচু বাঁধ কৃষ্ণ (নাগার্জুন সাগর) (টেইলপাড়) সংযোগ
১৭. গোদাবরী (ইনামপল্লী), নাগার্জুন সাগর সংযোগ
১৮. গোদাবরী (পোলারভারাস) বিজয়ওয়ালা সংযোগ।
১৯. কৃষ্ণা (আলাসাত্তি) পেন্নরে সংযোগ
২০. কৃষ্ণা (শ্রীসইলাম) পেন্নরে সংযোগ

www.bjilibrary.com

২১. কৃষ্ণা (নাগার্জুন সাগর) সোমশিলা সংযোগ
২২. পেন্নরে (সোমশিলা) কাবেরী (গ্রান্ড এনিকুট) সংযোগ
২৩. কাবেরী (কডালইয়া) ভাইগাই গণ্ডুর সংযোগ
২৪. কেন-কেতোয়া সংযোগ
২৫. পার্বতী-কালীসন্ধি চম্বল সংযোগ
২৬. পার-তাপ্তি-নর্মদী সংযোগ
২৭. দাসন-গঙ্গা-পিঞ্জুল সংযোগ
২৮. বেদাতি-বার্গা সংযোগ
২৯. নেত্রাবতী-হেমবতী সংযোগ
৩০. পাম্বা-আচান-কোভেলী-ভাইপদার সংযোগ

ভারত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় নির্ধারণ করেছে ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি। ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা দেয়ার জন্য ৩৭টি নদীর সঙ্গে ৯ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ৩০টি খাল খনন করা হবে। এ প্রকল্পের দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর নিয়ে যাওয়া হবে মহানন্দা ও গোদাবরীতে। গোদাবরী থেকে কৃষ্ণায় এবং সেখান থেকে পেন্নরে ও কাবেরীতে। নর্মদার পানি সাবরমতীতে নিয়ে যাওয়া হবে। ২০১৬ সালের মধ্যে ভারত সরকার অন্ত:অববাহিকা পানি প্রত্যাহার প্রকল্প সম্পন্ন করবে। অন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের ওপর তার যেমন প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রয়োজন অন্যান্য মৌসুম থেকে বেশি হয়। কারণ এ সময় ইরি-বোরো ধান চাষ হয়। বাংলাদেশের পানির চাহিদা ৯০ ভাগ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলো দিয়ে আসে। যদি ভারত তার আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তবে সে পানি আর বাংলাদেশে আসবে না। ফলে নদীমাতৃক এ বাংলাদেশের নদীগুলো মরে যাবে। ভূগর্ভস্থ পানি নিচে নেমে যাবে। ফলে নলকূপ থেকেও আমরা পানি তুলতে পারবো না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। ফসল উৎপন্ন হবে না। পানিস্বল্পতার কারণে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাবে। লবণাক্ততা আরো তীব্র হবে। মিঠা পানিতে মাছের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাবে। যেমন এক সময় আমাদের মাছে ভাতে বাঙালি বলা হতো। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমাদের সে অস্তিত্ব আজ হারিয়ে গেছে। নদীর পানি দূষিত হবে বেশি পরিমাণে। গ্রিহাউসের প্রভাব বেড়ে যাবে যা আমাদের দেশকে গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে দেবে। মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হবো হয়তো আমরা। যার একটি উদাহরণ, বাংলাদেশের একটি গ্রামও এখন আর্সেনিকমুক্ত নয়। যা ফারাক্কা বাঁধের প্রতিফল।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রকল্পের যথার্থতা

আন্তর্জাতিক আইন বিবেচনায় আনলে ভারত এ প্রকল্প বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, হাতে নিতেও পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। আন্ত র্জাতিক নদীর একতরফা পরিবর্তন বা পরবর্ধন অথবা পানি প্রত্যাহার করা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ও বেআইনি। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত হেলসিংকি

www.bjilibrary.com

নীতিমালায় ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র, অভিন্ন নদীগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনকে বিবেচনা করতে হবে এবং অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতি না করেই ভাবতে হবে। হেলসিংকি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২৯-এ বলা হয়েছে, এক অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র অন্য অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক নিষ্কাশন অববাহিকার পানি ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবহিত করবে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার ২ নাম্বার নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবার অংশগ্রহণে করতে হবে। কিন্তু আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের ব্যাপারে ভারত সে রকম কোনো ব্যবস্থা করেনি এবং ভারতের এ প্রকল্প আন্তর্জাতিক জল প্রবাহ কনভেনশন ১৪ নাম্বার অনুচ্ছেদেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশকে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে চাপ দিতে হবে। যাতে ভারত একতরফা আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের পুরো সমীক্ষা ও নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত অঞ্চলগুলো নিয়ে [ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও চীন] জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আঞ্চলিক কমিশন গঠন করে পানি সম্পদ ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক লবিতে বাংলাদেশে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। মেকং নদী কমিশনের মতো বাংলাদেশও একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মেকং নদীর অববাহিকায় অবস্থিত কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, লাওস ও ভিয়েতনামের মধ্যে মেকং নদীর পানি ব্যবহারের বিষয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মেকং নদী কমিশন গঠন করা হয়। সব দেশের মধ্যে সমন্বয় রেখে পানি বন্টন করে দিচ্ছে। তাতে তাদের মধ্যে পানি সংক্রান্ত বিরোধেরও অনেকটা নিষ্পত্তি হয়েছে। ইউরোপ মহাদেশের দানিয়ুব নদীর পানিও ১২টি দেশ সমতার ভিত্তিতে ভাগ-বাটোয়ারা করছে। নীল নদের পানি ভোগ করছে ইজিপ্ট, সুদান ও ইথিওপিয়া। সিন্ধু অববাহিকা চুক্তির মাধ্যমে ভারত তার চির বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু নদের পানি ভোগ করছে ৩০ বছর আগে থেকে। ভারত যখন আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের চিন্তা করছে তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বৃষ্টি হতো না। তাই বৃষ্টির পানি কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থার কথা ভাবছিল। কিন্তু এখন সেসব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সঙ্গে বন্যাও হয় যা ভারত কাজে লাগাতে পারে। ভারতের যেমন হাজার হাজার টাকা সাশ্রয় হবে তেমনি বাস্তুচ্যুত হতে হবে না অনেক মানুষকেই। তাই বাংলাদেশকে সে দেশের পরিবেশবিদ, প্রকৌশলী সমাজ ও সুশীল সমাজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাদের বিবেক জাগ্রত করতে হবে।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশকে ঘিরে অসংখ্য মিনি ফারাক্কা

শুধু গঙ্গা-পদ্মাই নয়, ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা ৫৪টি যৌথ নদী নিয়ে একই রকম সমস্যা। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল গঙ্গানদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ চালু করেই ভারত থেমে থাকেনি, ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা ৫৪টি যৌথ নদী নিয়ে একই পরিকল্পনায় এগিয়েছে। সব ক'টি নদীতেই 'মিনি ফারাক্কা' এবং সাম্প্রতিক 'টিপাইমুখ বাঁধ' প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন সমস্যাকে আরো জটিলতর করে তুলেছে। ফারাক্কা ও বহুসংখ্যক 'মিনি ফারাক্কা' নির্মাণ করে বাংলাদেশকে শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে মারার এবং বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদীর নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে। আর এর সুযোগ নিয়ে ভারত যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে।

গোমতি নদীর উজানে ভারতীয় বাঁধ

ভারত ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে গোমতি নদীর উজানে ত্রিপুরাস্থ মহারানীতে ৬ গেট বিশিষ্ট ৮০ মিটার দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে আসছে। শুকনো মৌসুমে গোমতির পানি প্রাপ্যতা হ্রাস পায়। ভারত এক তরফাভাবে গোমতি নদীর পানি ব্যবহার করায় বাংলাদেশের কুমিল্লা জিলার বুড়িচং, দেবীদ্বার, কুমিল্লা সদর ও মুরাদনগর উপজিলাসমূহে অবস্থিত গোমতি প্রকল্প এবং সোনাছড়ি প্রকল্পের প্রায় ৪০ হাজার একর জমির ফসল হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকারী পর্যায়ে গোমতি নদীতে বাঁধ নির্মাণের ভারতীয় পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং দুই দেশের মধ্যে গোমতি পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার দাবী জানায়। কিন্তু ভারত এর তোয়াক্কা না করেই বাঁধটি নির্মাণ করে চালু করেছে।[১২] বাংলাদেশের দিক থেকে গোমতি বাঁধ 'মিনি ফারাক্কা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনু নদীর উজানে মিনি ফারাক্কা

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ফটিকরাই শহর থেকে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণে মনু নদীর উজানে কাঞ্চনবাড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাংলাদেশের মনু নদী প্রকল্পের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ বাঁধের ফলে ভারত শুষ্ক মৌসুমে হাওড় এলাকা পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। মনু নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের মিজোরাম পাহাড়ে হলেও এটি বাংলাদেশ ও ভারতের একটি অভিন্ন নদী। ভারতে ৫৮ মাইল পথ পরিক্রমণ শেষে নদীটি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন শরীফপুর ইউনিয়ন দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নদীটি বাংলাদেশে মনুমুখ নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। মনু নদীর উজানে ভারতের ব্যরাজে নির্মাণের প্রতিক্রিয়ায় পুরো ভাটি অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশের

---

১২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন দৈনিক ইনকিলাব ১৬ জুলাই, ১৯৯১ এবং ১৭ জুলাই ১৯৯১ সংখ্যা, গোমতি উজানে ভারতীয় বাঁধ শীর্ষক সম্পাদকীয়, পৃ-৭

www.bjilibrary.com

অভ্যন্তরে প্রবাহিত অংশে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে প্রতিবছর ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মনু নদীতে নির্মিত মিনি ফারাক্কা বাংলাদেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়ার ভারতীয় চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৩]

খোয়াই নদীর উৎসমুখে বাঁধ

ভারত আন্তর্জাতিক নদী আইন লংঘন করে ভারত থেকে নেমে আসা ৫৪ নদীর ভারত অংশে একের পর এক বাঁধ নির্মাণ করে এদেশকে শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে এবং বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করছে। এই নীল নকশার অংশ হিসেবে হবিগঞ্জ খোয়াই নদীর উজানে ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়া মড়ায় 'চাকম ঘাটে ব্যারেজ' নির্মাণ করেছে। এই বাঁধের ফলে হবিগঞ্জের ৫০ ভাগ আবাদীত জমি ও প্রায় ১০ লাখ মানুষ ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।[১৪]

কুশিয়ারা নদীতে ভারতের গ্রোয়েন নির্মাণ

কুশিয়ারা আন্তর্জাতিক নদী। কুশিয়ারা নদীর মধ্যস্রোত দীর্ঘ ২২ মাইল এলাকায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তরেখা। আসামের নদী বরাক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অমলসীদে এসে দু'টি শাখা হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। একটি শাখা সুরমা। অন্য শাখা কুশিয়ারা। কুশিয়ারা নদীর ভারতীয় তীরে গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৩০টি পাথর ও কাঠের খুঁটির গ্রোয়েন ছিলো। এখন ছোট বড় ছয়টি গ্রোয়েন আছে। এইসব গ্রোয়েনে কুশিয়ারা নদীর পানি প্রবাহ ধাক্কা খেয়ে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে আঘাত হানে। এর ফলে সীমান্তের ১০ বর্গমাইল এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গনে প্রতিদিনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তের নদীতীরবর্তী গ্রামগুলো। একের পর এক বাড়ি, ফসলী জমি, সুপারি বাগান, মসজিদ, স্কুল, বাজার, রাস্তা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কুশিয়ারার ভাঙনে তলিয়ে গেছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখা বদলে যাচ্ছে। কুশিয়ারা ভাঙছে বাংলাদেশের ভূমি। ওপারে জাগছে চর। ভারতের গ্রোয়েন নির্মাণের কারণেই বাংলাদেশ ভূখণ্ড হারাচ্ছে। করিমগঞ্জ শহরে একটি বৃহদাকার জেটি তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা থেকে পণ্য নিয়ে আসা ভারতীয় জাহাজ এই জেটিতে মাল খালাস করে। জেটির স্থাপনায় বাধাগ্রস্ত হয় কুশিয়ারার প্রবাহ। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে কুশিয়ারার প্রবাহ আঘাত হানে। এভাবে সৃষ্টি হয় ভাঙনের। ভারতের করিমগঞ্জ জিলার ভাঙ্গাবাজারে কুশিয়ারার ওপারে যে হার্ডবোর্ড মিল রয়েছে তার কারণেও বাংলাদেশ অংশে ক্রমাগত ভাঙন সৃষ্টি হচ্ছে। ওই মিলের জন্য ব্যবহৃত বিশাল গাছ নদীর পাড়ে স্তূপ করে রাখার কারণে তাতে ঢলের পানি বাধাগ্রস্ত হয়ে এপাড়ে আঘাত করে। ফলে বাংলাদেশের

১৩. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৭ 'নয়া চক্রান্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয়, পৃ-৭
১৪. দৈনিক সংগ্রাম ১৮ মার্চ, ১৯৯৭। ১৯৯৭ সালের ১৬ মার্চ জামায়াতে ইসলামী হবিগঞ্জ জেলা আমীর মাওলানা মুখলিছুর রহমান খোয়াই নদীর উজানে ভারতের বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে জেলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে তা ১৮ মার্চ ১৯৯৭ এর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়

www.bjilibrary.com

অংশ ভেঙ্গে কুশিয়ারার গতিপথ এদিকে সরে আসছে।[১৫] সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলা আজ ভারতের গ্রোয়েনের কারণে কুশিয়ারায় ভাংতে ভাংতে নিঃশেষ হতে চলেছে।

উত্তরাঞ্চলের ৩০টি নদীর উজানে বহু মিনি ফারাক্কা

পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওসহ উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তীরনই, রংচণ্ডী, মহানন্দা, করতোয়া, চাওয়াই, তালমা, টাঙ্গন, ভেরসা, কুরুম, আত্রাই, তিস্তা, হাতুরী, নাগর, চিলকা, ধরলা, কুলিফনাসর, ঘোড়ামাড়া, বালাম, পিছলা, ত্রিমোহিনী, শাহিয়াজান, রত্নাই, ভালু, ইছামতিসহ ৩০টি নদীর পানি আটক করেছে ভারত। বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্টে দাঁড়ালে পশ্চিম-উত্তর কোণে দেখা যাবে মহানন্দা নদীর ওপর ভারতের একতরফাভাবে নির্মিত বিশাল বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণ করে ভারত শুষ্ক মৌসুমে ফিডার ক্যানেলের সাহায্যে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার রাজ্যে সেচকার্য চালাচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ী এলাকায় মহানন্দা নদীতে ২৫০ মিটার দীর্ঘ ও ২৫টি স্লুইচ গেইট সম্বলিত একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে ভারতের দু'টি সেচ প্রকল্প ও পূর্ব-পশ্চিম দিকের ৫২ কিলোমিটার সংযোগ খাল। এই খালের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে বয়ে যাওয়া ১৯টি নদীর পানি আটক রাখা হচ্ছে এবং ২টি ফিডার খালের মাধ্যমে বিহার ও উত্তর প্রদেশের ২টি বৃহৎ সেচ প্রকল্পে সেই পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ভারতের উক্ত সেচ প্রকল্প ২টির আওতায় রয়েছে বিহারের কাটিহার, দ্বারভাঙ্গা ও মোজাফফরপুর এবং উত্তর প্রদেশের গোরখপুর ও জৈনপুর জেলা। মহানন্দা নদীর ওপর নির্মিত একাধিক ভারতীয় বাঁধের মাধ্যমে খরা মৌসুমে পানি প্রত্যাহারের ফলে খরস্রোতা তিস্তাসহ পূর্বোল্লিখিত নদীগুলোর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর বর্ষা মৌসুমে ব্যাপক হারে পানি ছেড়ে দিয়ে তিস্তাসহ অন্যান্য নদীগুলোকে উপচে দিয়ে পরিকল্পিত বন্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। সর্বোপরি ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে খরস্রোতা তিস্তার স্রোতধারা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তিস্তা বাঁধ প্রকল্প এলাকায় সেচ দেয়ার মত প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাবে না। ফলশ্রুতিতে দেশের এই বৃহত্তম সেচ প্রকল্পটি পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে যাবার সমূহ আশংকা রয়েছে বলে পানি বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেছেন।

পঞ্চগড় জেলার উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার মেকলীগঞ্জ থানার কাশিয়া বাড়িতে বাংশু নদীর স্রোতের মুখে বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের ঘোড়ামারা নদীতে পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের করতোয়াসহ শাখানদীগুলোতে খরা মওসুমে মোটেও পানি থাকে না।

বাংলাদেশের উজানে তিস্তা নদীতে ভারত সরকার মেখলিগঞ্জ ও ধাপড়াহাটে দু'টি আড়াআড়ি বাঁধ [স্পার] নির্মাণ করায় দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন

---

১৫. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ মার্চ, ১৯৯৭

www.bjilibrary.com

হয়ে পড়েছে। এর আগে ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার কুচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা রক্ষা করার নাম করে আঙ্গরপোতার উজানে পশ্চিবঙ্গের দড়িপত্তনী নামক স্থানে তিস্তার ওপর একটি স্পার নির্মাণ করে নদীর প্রবাহকে দহগ্রাম ইউনিয়নের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে গত ২৫ বছর উক্ত ইউনিয়নের এক-চতুর্থাংশ এলাকা তিস্তা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভারতের তৈরি আড়াআড়ি বাঁধ [স্পার] বর্তমানে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বাসীদের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

পুনর্ভবা নদীতে মিনি ফারাক্কা

ভারত আর একটি মিনি ফারাক্কা বাঁধ দেয়ার ফলে বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের একমাত্র নদী পুনর্ভবা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। মহানন্দার শাখা নদী পুনর্ভবাই একমাত্র নদী যা ভূ-উপরিস্থিত পানির প্রধান উৎস হিসেবে উত্তরের খাদ্যভাণ্ডার বরেন্দ্র এলাকায় অবস্থিত। উত্তরে দিনাজপুর থেকে নওগাঁ হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বরেন্দ্র ভূমিকে স্পর্শ করে এ নদী প্রবাহিত ছিল। ভারত আশির দশকে পশ্চিম দিনাজপুরের পালুঘাটে এই নদীতে একটি বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশে এর প্রবাহ স্তব্ধ করে দেয়। এছাড়া ভারত পুনর্ভবা নদীর বাংলাদেশী অংশের পানি প্রত্যাহার করে তার ভূ-খণ্ডে প্রবাহিত করার জন্য নিতপুরের বিপরীত একটি খাল খনন করেছে। এই খাল বালুরঘাটের কাছে পুনর্ভবার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। শুকনো মৌসুমী ভারতীয় কৃত্রিম পুনর্ভবা বা পূর্ণ প্রবাহমান থাকলেও বাংলাদেশের মূল পুনর্ভবা নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। 'বলাবাহুল্য পুনর্ভবা নদী এখন প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

কোদলা নদীর ওপর মিনি ফারাক্কা

ভারত সরকারের নীল নকশানুযায়ী বাংলাদেশের শার্শা উপজেলার বিপরীতে আন্ত র্জাতিক কোদলা নদীর ওপর দু'টি 'মিনি ফারাক্কা' নির্মাণ করায় বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রায় ৪০ হাজার একর জমির ফসলসহ অসংখ্য গ্রাম বন্যা কবলিত হচ্ছে। বর্তমানে এই নদীতে আরো একটি বৃহদাকার বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা ভারত সরকার হাতে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

সোনাই নদীতে মিনি ফারাক্কা

সোনাই নদী ভারতের ভিতর থেকে ভারতের তারালী এবং বাংলাদেশের কেড়াগাজী সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে এপারে ঢুকেছে। ভাদিয়ালী, রাজপুর, চান্দা ও বড়ালী সামীন্ত দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে। সোনাই নদীতে ভারতের তেঁতুলিয়ায় বাঁধ দেয়া হয়েছে। ফলে সোনাই নদীতে পানি প্রবাহ নেই।

এ ছাড়াও ধরলা নদীর উজানে বাঁধ, ব্রহ্মপুত্রের উজানে বাঁধ, যুমনার উজানে কুমারপুরে বাঁধ, মালদহ নদীর উজানে নিমসারায় বাঁধ, কালেন্দ্রীর উজানে নূরপুরঘাট ও ভাগীরথীর উজানে রামচান বাঁধ, প্রিয়াং নদীতে গ্রোয়েন নির্মাণ করে বাংলাদেশকে মরু প্রক্রিয়ার মুখে ঠেলে দিয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ভারত এসব মিনি ফারাক্কা ও নির্মিত অবকাঠামোর সাথে সন্নিবেশিত ক্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভিমুখী প্রবাহিত পানি প্রত্যাহার করে নিজ দেশে কৃষি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

www.bjilibrary.com

টিপাইমুখ বাঁধ আরেকটি নতুন ফারাক্কা

টিপাইমুখ বাঁধ হলো সিলেট জেলার পূর্ব সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মনিপুরের চোরাচাঁদপুর জেলার টিপাই নামক স্থানে নির্মিতব্য একটি বাঁধ, যা মূলত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিতর্কিত প্রয়াস।

২০০৫ সালের ২৪ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ধারণা করা হয়, ২০১১ সালে মধ্যে এর কাজ সম্পন্ন হবে। বরাক নদীর ওপর এই বাঁধের মাধ্যমে ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। ৩৯০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬০ মিটার উঁচু এ বাঁধ নির্মাণের জন্য ৮৮৬৭ কোটি রুপি বাজেট ধরা হয়। বাঁধটি নির্মিত হলে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং অর্থনীতি চরম ক্ষতির মুখে পড়বে। কারণ, বরাক নদীটি সিলেটের করিমগঞ্জের ওপর দিয়ে ১০০ কিলোমিটার উজানে টিপাইমুখ নামক স্থানে পড়েছে এবং সুরমা ও কুশিয়ারা দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। বরাক নদী ভারত এবং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই ভারতের ইচ্ছা মতো এর পানি ব্যবহার ঠিক হবে না। এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে। এ বাঁধ নির্মিত হলে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি প্রবাহ স্বাভাবিক গতিতে চলবে না। কারণ তা ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আর তা বাংলাদেশের জন্য নতুন একটি ফারাক্কার মতো হবে। এ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করে ভারত জেন্টেলম্যান এগ্রিমেন্ট লংঘনসহ ২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩৬তম জেআরসির বৈঠকের সিদ্ধান্তও উপেক্ষা করে চলেছে। ভারতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান আসাম রাজ্যের নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড [নিপকো] ইতোমধ্যেই এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন অনুমোদন আদায় করেছে এবং তা বাস্তবায়নের নানা কাজ শুরু করেছে। এর ফলে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়ীরা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, বরিশাল ও লক্ষ্মীপুরসহ মেঘনা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে। সিলেটের বিশাল এলাকা জুড়ে যে হাওড় রয়েছে তা শুকিয়ে যাবে। কৃষি ও মৎস্য খাতে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। দেশের খাদ্য উৎপাদনে দেখা দিবে মারাত্মক বিপর্যয়। পরিবহন, শিল্প ও সেচব্যবস্থাও একই পরিস্থিতির শিকার হবে। লাল লাখ মানুষ বেকার হবে, খাদ্যাভাব দেখা দেবে, বর্ষাকালে বন্যায় ভাসবে বৃহত্তর সিলেট। শুষ্ক মৌসুমে পুরো মেঘনা অববাহিকার সকল নদ নদী শুকিয়ে যাবে। তাছাড়া টিপাই বাঁধের কারণে গোটা সিলেট অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এ বাঁধটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ বাঁধে আঘাত হানলে তার ভয়াবহ পরিণত বাংলাদেশকে ভোগ করতে হবে। তাছাড়া এ বাঁধ নির্মিত হলে এবং

www.bjilibrary.com

চালু হলে ভারতের মনিপুর ও মিজোরামের ৩১১ বর্গকিলোমিটার এলাকা ডুবে যাবে এবং কমপক্ষে লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশের প্রাক্তন সেচ ও পানিসম্পদ মন্ত্রীর অভিজ্ঞতা থেকে দু'টি ঘটনা

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পানি বন্টন সমস্যা, সংযোগ খাল, ফারাক্কা বাঁধ প্রভৃতি সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রাক্তন সেচ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী এল.কে.সিদ্দিকীর অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়- আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দু'টি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

এক. সেচমন্ত্রী থাকাকালীন ঘটনা। যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে বাংলাদেশ একজন কো-চেয়ারম্যান। প্রতি মাসেই বৈঠক হতো। একবার ঢাকায় হলে পরের বার দিল্লীতে বৈঠক হতো। ভারতীয় সেচ মন্ত্রী ছিলেন রাও বীরেন্দ্র সিং এবং ভারতীয় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন জিয়াউর রহমান আনসারী। আলোচনা হয়, চর্বিত চর্বন হয় কিন্তু কিছুতেই এগোয় না।

আমরা গঙ্গা নদীর উৎস হিসেবে নেপালকে জড়াতে চাই, ভারত তা চায় না। তারা ব্রহ্মপুত্র থেকে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে সংযোগ খাল কেটে গঙ্গাতে ফেলতে চায় এবং এই সংযোগ খালের উৎপত্তি হবে ভারতের ভূখণ্ডে এবং গঙ্গাতে মিশবে তাও ভারতীয় ভূখণ্ডে। এধরনের একটা উদ্ভট প্রস্তাবে আমরা কিছুতেই রাজি হতে পারি না। আলোচনার অচলাবস্থা নিরসনকল্পে নেপালের কথা উল্লেখ করে আমরা নতুন আঙ্গিকে একটা প্রস্তাব দিলাম কিভাবে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা যায় এবং প্রবাহ বৃদ্ধি করলে উভয় দেশেরই চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। পুস্তক আকারে বিস্তারিতভাবে প্রণীত প্রস্তাবটি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর শামস-উল-হক জাতিসংঘের অধিবেশনে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করলেন, কথা ছিল তিনি সেই প্রস্তাব রাও বীরেন্দ্র সিং-এর কাছে পৌছে দেবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবো।

আমরা খোঁজ খবর রাখতে থাকলাম। যখন নিশ্চিত হওয়া গেল আমাদের প্রস্তাব ভারতীয় সেচমন্ত্রীর হাতে পৌছেছে তখন আমরা যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক আহ্বান করার জন্য ভারতকে অনুরোধ করলাম এবং নির্ধারিত সময়ে আমরা দিল্লী পৌছলাম। আনুষ্ঠানিক আলোচনা বৈঠকের আগে আমরা ভারতীয় সেচমন্ত্রীর অফিস কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাতের সময়ে জানতে চাইলাম, আমাদের বিকল্প প্রস্তাব তারা পেয়েছেন কি না। রাও বীরেন্দ্র সিং জানালেন তারা এধরনের কোনো প্রস্তাব পাননি। আমরা দিন, সময় উল্লেখ করে তাকে জানালাম, কিভাবে জাতিসংঘের অধিবেশনের সময়ে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন এবং আমাদের তথ্য অনুযায়ী সেই প্রস্তাব মন্ত্রীর হাতে পৌছে গেছে। তিনি বেমালুম অস্বীকার করলেন।

মন্ত্রীর টেবিল ছিল ফাঁকা। কিন্তু পাশে দেয়ালের পাশে সংরক্ষিত ছিল একটি র‍্যাক।

www.bjilibrary.com

সেখানে কিছু বই, কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি ছিল। সেদিকে তাকিয়ে যে বইটিতে আমাদের প্রস্তাব ছিল সেটি দেখতে পেলাম। আসন ত্যাগ করে সেই র‍্যাক থেকে বইটি উদ্ধার করে মন্ত্রীর টেবিলে ছুড়ে দিয়ে বললাম, এই সেই প্রস্তাব। মন্ত্রী মোটেই দয়ার পাত্র নন। তিনি তখনো বলতে থাকলেন, এই প্রথমবার তিনি এই প্রস্তাবটি দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন এই প্রস্তাবে কি আছে? আমরা বললাম গঙ্গা নদীর উৎস মুখে এবং হিমালয় থেকে যে তিনটি বড় নদী বেরিয়ে এসে গঙ্গায় পড়েছে সেসব নদীতে মোট ৩৮টি উপযুক্ত স্থান আছে যেখানে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি করে গঙ্গার পানি প্রবাহ অন্তত দ্বিগুণ করা যায়। ফলে পানির আর কোন সমস্যাই থাকবে না। ভারতেরই জন্য যে পানি প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি পানি উৎপাদন সম্ভব। ভারতীয় মন্ত্রীর এই মিথ্যাচারে আমার মন্ত্রী কাজী আনওয়ারুল হক খুবই ব্যথিত হন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে হবে। তাহলে আমার মন্ত্রী কিভাবে সময় কাটাবেন। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা জানতে চাইলে তিনি ভারতের নদী গবেষণা কেন্দ্র দেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

দুই. ভারতীয় প্রতিমন্ত্রী একটি বড় সোফায় এবং তার সামনে আর একটি বড় সোফায় বসে আমি, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার মুচকন্দ দুবে, ভারতীয় সেচ মন্ত্রণালয়ের সচিব প্যাটেল এবং আমাদের পক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ অন্য চেয়ারে বসে আছেন। আলোচনার পর্যায়ে যথারীতি ভারত সংযোগ খালের কথা উঠালো। আমরা নেপাল-ভারত বর্ডারে ৩৮টি স্থানের কথা উল্লেখ করে সেখানে জলাধার সৃষ্টি করে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির কথা এবং এই সমস্ত স্থানে পানি বিদ্যুৎ তৈরি করে বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব ইত্যাদি বললাম। থোড় বিড় খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। এর আগের বৈঠকগুলোর মতো সেই চর্বিত চর্বন। এক পর্যায়ে অসহিষ্ণু হয়ে আমরা প্রতিপক্ষকে বললাম, এক্সেলেন্সি, আপনাদের প্রস্তাব আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই পরিস্থিতিতে কি আমরা কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে যেতে পারি মধ্যস্থতার জন্য? মি. আনসারী বললেন, তৃতীয় পক্ষ কে হবে? আমি বললাম, আমরা উভয় দেশ মিলে ঠিক করতে পারি কে তৃতীয় পক্ষ হবে, আমরা জাতিসংঘকে অনুরোধ করতে পারি। মি. আনসারী উত্তর দেয়ার জন্য মুখ খোলার আগেই তার দু'পাশে ধপ করে বসে পড়লেন মুচকন্দ দুবে এবং মি. প্যাটেল। অনুচ্চ স্বরে ফিসফিস করে দু'জনে মন্ত্রীকে কি সব বোঝালো। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে মন্ত্রী কিছু বলার আগেই আমি বললাম, এক্সেলেন্সি, আমি জানি, আপনি কি বলবেন। আপনি বলবেন, আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সমস্যা আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করার চেষ্টা করবো। কোনো তৃতীয় পক্ষকে না টানাই ভালো। বেচারা মি. আনসারী. তার মুখে যেন কেউ কালি লেপে দিল। মিটিং আর এগোলো না।

তিন. বিকেলে হোটেল রুমে আমরা মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করলাম এবং তিনি সারা

www.bjilibrary.com

সকাল কি করলেন তা জানতে চাইলাম। তার অভিজ্ঞতাও ছিল একই ধরনের। নদী গবেষণা কেন্দ্রের দেয়ালে আছে বিশাল ম্যুরাল, যেখানে গঙ্গা নদীর উৎস থেকে সমুদ্রে পতন পর্যন্ত রিলিফ ম্যাপ তৈরি করে দেখানো হয়েছে। নেপালের বর্ডারে এবং যে তিনটি নদী নেপাল থেকে গঙ্গা নদীতে পড়েছে সেই সব স্থানে কয়েকটি জায়গায় লাল পিন লাগানো আছে। আমার মন্ত্রী জানতে চাইলেন, ঐ লাল পিনগুলো কি বোঝাচ্ছে? কেন্দ্রের মহাপরিচালক বললেন, ঐ লাল পিন যেখানে লাগানো আছে সেরকম ৩৮টি স্থান আছে যেখানে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে গঙ্গার প্রবাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং ঐ সমস্ত স্থানে বিপুল সস্তা জলবিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব। আমার মন্ত্রী ভারতীয় মন্ত্রীর দিকে তাকাতেই তিনি তার বাহু ধরে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, তিনি স্বয়ং গঙ্গা নদীর উৎস থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত নদীপথে সফর করেছেন কিন্তু কোথাও এ ধরনের সম্ভাবনার কথা তিনি দেখতে পাননি। বেচারা মহাপরিচালক! নদী গবেষণা কেন্দ্রে সফর ছিল আকস্মিক সিদ্ধান্ত এবং তাকে আগে সতর্ক করে দেয়া সম্ভব হয়নি বলে লাল পিনগুলো সরানো হয়নি।

এই হচ্ছে ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি ভারতের আর্ম টুইষ্টিং-এর শিকার হবো নাকি মাথা তুলে দাঁড়ানো চেষ্টা করবো। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটেন এবং মিত্র শক্তি চার্লস দ্যাগলকে সুদূর আলজেরিয়া থেকে এনে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সেই চার্লস দ্যাগল-এর জীবদ্দশায় বৃটেনকে ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটের সদস্য হতে ফ্রান্স দেয়নি তার স্বার্থকে বাদ দিয়ে। আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ অবশ্যই থাকবে কিন্তু অস্তিত্ব বিকিয়ে দিয়ে নয়। যে ফারাক্কার কারণে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তার তুলনায় বছরে দু'হাজার কোটি টাকার বাতাসা কি আমাদের কাছে এতোই লোভনীয়? রবী ঠাকুরের উপেনের ভাষায় বলতে হয়- সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া?[১৬]

'মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ' ও উজানে অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ভারত যেভাবে বাংলাদেশকে তার ন্যায্য পাওনা পানি সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছে সে সম্পর্কে আরিফুল হক লিখেছেন পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর উজানে ভারত বাঁধ দিতে সাহস করেনি। অথচ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীতেই বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে শোষণ করছে ভারত।....১৯৭৫ সালের ৩১ মে ৪১ দিনের পানি চুক্তি করে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতকে ফারাক্কা বাঁধ চালু করতে দিয়েছিল। সেই ৪১ দিন আজও শেষ হয়নি এবং সেই বাঁধ শুধু ফারাক্কায় সীমাবদ্ধ না থেকে আরও ৫৪টি নদীতে প্রসারিত হয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।[১৭]

---

১৬. যায়যায় দিন, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ আগাস্ট, ১৯৯৯

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রীর মন্তব্য ও অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন

সাধারণত শুকনো মৌসুম শুরু হলে বাংলাদেশ-ভারত পানি বন্টন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সংবাদমাধ্যমে কমবেশি খবর প্রকাশিত হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেনের সাথে ১৩ জানুয়ারী, ২০০৯ ভারতের রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও পানিসম্পদ মন্ত্রীর সাথে অভিন্ন নদীর পানি বন্টনের নানা দিক নিয়ে তাদের মাঝে আলোচনা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাংবাদিকরা পানিসম্পদ মন্ত্রীর কাছে চুক্তিমাফিক পানি না পাওয়া এবং এ ব্যাপারে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানানো হবে কি না তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, পানি কম পেলেও প্রতিবাদ করা যাবে না। বরং যতটুকু পানি পাওয়া যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য তা-ই সৌভাগ্য। তিনি একই সাথে ফারাক্কার উজানে পানি প্রত্যাহার করা হয় না বলেও দাবি করেন। তবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যার ব্যাপারে সব সময় সোচ্চার থাকবে। দেশের স্বার্থহানি করে কিছুই করা হবে না। তিনি আরো বলেন, হিমালয় অঞ্চলে পানি এবার কম। তা ছাড়া প্রাপ্ত পানিই কাজে লাগাতে পারছে না বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, অভিন্ন নদীর পানি বন্টনসংক্রান্ত ইস্যুতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোনো ধরনের জট নেই। পানিসম্পদ মন্ত্রী অভিযোগ করেন, আগের সরকারের আমলে ভারতের সাথে বিভিন্নভাবে একটি জট সৃষ্টি করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে সেই জট খুলে দেয়া হবে। তিনি বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রতি অসম্ভব আন্তরিক। দেশের কাজের জন্য ভারতকে দরকার। পানিপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য নেপালে জলাধার নির্মাণের ব্যাপারেও ভারতের সাথে আলাপ হয়েছে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, নেপালে জলাধার নির্মাণ নিয়ে ভারত ইতোমধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। প্রণয়ন করেছে যৌথ উদ্যোগে একটি বিশেষ প্রকল্প প্রতিবেদনও। মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, পিনাক রঞ্জন তাকে বলেছেন, তিস্তার পানি ভাগাভাগির মতো সামান্য ইস্যুতে দু'দেশের সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে না। তিনি বলেন, তিস্তার উজানে পানি কমে গেছে। তিনি আশা করেন তা সত্ত্বেও তিস্তায় বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনমত পানি নিশ্চিত করবে ভারত।[১৮]

বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রীর বক্তব্যে যেন ভারতের স্বার্থের প্রতিধ্বনি ঘটছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি বন্টন নিয়ে আলোচনায় ভারত বারবার পানির ব্যবহার নিয়ে যুক্তি তুলে ধরে। তারা বোঝাতে চায়, বাংলাদেশ পানি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু শুধু নদী দিয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে পড়বে। অথচ শুধু পানির অভাবে বাংলাদেশের ৬০টির মত নদী শুকিয়ে গেছে। কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে জিকে

---

১৮. ড. এটিএম শামসুল হুদা, বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার

www.bjilibrary.com

সেচ প্রকল্প। পানির অভাবে তিস্তা সেচ প্রকল্পও সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। অথচ তিনি ভারতীয় পক্ষের বক্তব্য দিচ্ছেন যে প্রাপ্ত পানিই কাজে লাগাতে পারছে না বাংলাদেশ। হিমালয় অঞ্চলে পানি কম পাওয়ার এ তত্ত্বই বা তিনি কোথায় পাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, যতটুকু পানি পাওয়া যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য তা-ই সৌভাগ্য। আমরা জানি না পানিশূন্য এ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সত্যিই সৌভাগ্যবান কি না তবে পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন সৌভাগ্যবান। কারণ তার এ বক্তব্যের পরও গণমাধ্যমে এ নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ হচ্ছে না। এ ধরনের বক্তব্যের ব্যাখা দেয়ারও প্রয়োজন হচ্ছে না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের পর '৯৭ সালের মার্চ মাসে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে বাংলাদেশ স্মরণকালের সবেচেয় কম পানি পেয়েছিল। যার পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৫ শ' কিউসেক অথচ চুক্তি অনুযায়ী সে সময় পানি পাওয়ার কথা ছিল ৩৪ হাজার ৫ শ কিউসেক। এ সময় তীব্র বিতর্ক শুরু হলে জাতীয় সংসদে তৎকালীন পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ব্যাখ্যা দেন হিমালয়ে বরফ না গলার কারণে নাকি পানি কম পাওয়া গেছে। বর্তমান পানিসম্পদ মন্ত্রীও তার পূর্বসূরির সুরে বলছেন, হিমালয় অঞ্চলে পানি এবার কম। হিমালয়ের অবস্থান যেখানে সেই নেপাল বাংলাদেশ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। প্রতি বছর বহু লোক নেপাল ভ্রমণে যান। যাদের উদ্দেশ্য হিমালয় দর্শন। হিমালয়ের বরফ কী পরিমাণ গলে তাতে কত হাজার বা কত লাখ কিউসেক পানি আসে তা বোঝার কথা নয়। তবে নেপালে যে বিষয়টি সহজে চোখে পড়ে হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলো পহাড়ের গা বেয়ে তীব্র স্রোতে বইয়ে চলছে। কিছু দূর এসব নদীর স্রোত আটকে নেপাল সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। পানির অভাবে নেপালের নদী মরে যাচ্ছে এমন খরব নেপালে বেশ কিছু দিন অবস্থান করার পরও পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়েনি। বরং আমরা এমন খবর দেখছি বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি বা বিশ্ব গরম হয়ে যাওয়ায় নাকি হিমালয়ের বরফ আরো বেশি গলছে। হিমালয়ে পানির প্রবাহ কম এমন যুক্তি ভারতীয়রা দিলেও দিতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রী-মিনিষ্টাররা কেন দিচ্ছেন তা বোধগম্য নয়।

'৯৬ সালের চুক্তি অনুসারে ৭০ হাজার কিউসেক থেকে ৫০ হাজার কিউসেক পর্যন্ত পানি বাংলাদেশ-ভারত সমান সমান অংশ পাবে। এটাই প্রকৃতপক্ষে চুক্তির আসল দিক। কিন্তু ফারাক্কা পয়েন্টে পানির পরিমাণ ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নেমে গেলেই চুক্তির পানি বন্টন ফর্মুলা অকার্যকর হয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে দু'দেশের জরুরি আলোচনার মাধ্যমে পানির নতুন পরিমাণ ঠিক করবে। গঙ্গার উজানে ব্যাপক হারে টেনে নেয়ার পর ফারাক্কা পয়েন্টে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যাবে সে পানির ভাগই আমরা পাবো। গঙ্গার পুরো পানির ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। তাহলে গঙ্গার পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা কোথায়? বাংলাদেশের কাছে এটাই হচ্ছে সবেচেয়ে

www.bjilibrary.com

গুরুত্বপূর্ণ এবং চুক্তির সবচেয়ে দুর্বল দিকও বটে। চুক্তির এই ভিত্তিটাই বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী। এ ছাড়া চুক্তিটি ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশনের সুযোগ রাখা হয়নি। পরিণতিতে আজ ভারত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘণ করলেও দেনদরবার করার জন্য আমাদের অন্য কোথাও যাওয়ার পথ খোলা নেই। অথচ নেপালের সাথে মহাকালী নদী চুক্তিতে ভারত ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন মেনে নিয়েছে। দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমাদের মন্ত্রীরা এখন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আলোচনার প্রসঙ্গও তুলতে চাইছে না। যেন ভারতের স্বার্থ দেখার দায়িত্বটি তাদের ওপর বর্তেছে।

উজানে পানি প্রত্যাহার করলে ভাটিতে যে টান পড়বে তা পানির মতোই স্পষ্ট। ফারাক্কা পয়েন্টে পানি প্রবাহ যে ৫০ হাজার কিউসেকের নিচ দিয়েই প্রবাহিত হবে তা চুক্তির সাথে জড়িত ভারতের পানি বিশেষজ্ঞরা অবগত ছিলেন। আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা তা কি জানাতেন না? জানলে কোন স্বার্থে এ অসম চুক্তি করেছিলেন? মন্ত্রী না হয় টেকনিক্যাল বিষয় বুঝতেন না, কিন্তু তৎকালীন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞরা কী করেছিলেন। তৎকালীন সচিব এ টিএম শামসুল হুদা এই চুক্তির সময় তিনিও কি কোনো বিশেষ মহলকে খুশি করতে এমন চুক্তিতে রাজি হয়েছিলেন। ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী ১৩ জানুয়ারী মন্ত্রীর সাথে দেখা করে সঠিক কথাই বলেছেন? তিনি বলেছেন, গঙ্গা চুক্তি হয়েছে উজানে পানি প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে, ইন্ডিকেটিভ শিডিউল অনুযায়ী নয়। তিনি একে অতীত বলে উল্লেখ করে বলেন, এটা হচ্ছে ৪০ বছরে কী পরিমাণ পানি ছিল। এখন গঙ্গায় তো সে পরিমাণ পানি আসে না। গঙ্গা চুক্তি হয়েছে উজানে পানির প্রাপ্যতা নিয়ে। গঙ্গার ফারাক্কা পয়েন্টে যা পানি আসছে তা-ই বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী দেয়া হচ্ছে। আবদুর রাজ্জাক আর শামসুল হুদারা '৯৬ সালে এক অসম চুক্তি করেছিলেন। পিনাক রঞ্জন হয়তো বুঝতে পারছেন রাজ্জাক-শামসুল হুদাদের চেয়েও রমেশ সেনের মাধ্যমে আরো খারাপ চুক্তি করানো সম্ভব। রমেশ সেন সেই আভাসও দিয়েছেন। বলেছেন, যা পাওয়া যাবে তাতে সৌভাগ্য।

আজকে ভারতের পক্ষ থেকে যুক্তি দেয়া হচ্ছে, ফারাক্কার পানির প্রবাহ করে যাচ্ছে। ফারাক্কার উজানে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি মেট্রো এলাকা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার পানি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের হরিদ্বারে, উত্তর কাশীর কাছে মালেরীতে ও নারোরার কাছে গঙ্গার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। উজানে গঙ্গার দু'তীরে কয়েক হাজার শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। গঙ্গার পানি দিয়েই এসব শিল্প-কারখানা চলছে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কানপুরের তেহারীতে ৯৪৪ কোটি রুপি ব্যয়ে গঙ্গার ওপর নতুন একটি বড় আকারের বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। উজানে এত বাঁধ থাকলে ফারাক্কা পয়েন্টে ৩০ হাজার কিউসেক পানি কিভাবে মিলবে? অথচ আন্তর্জাতিক আইনে অভিন্ন নদীতে এভাবে বাঁধ দেয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর '৯৭ সালের ২৫ মে নিউইয়র্ক টাইমস গঙ্গার পানি ভাগাভাগির ওপর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে টাইমসের নিজস্ব প্রতিনিধি জন বার্নস তার এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ৪ কোটি জনগণের জীবনযাত্রা ও ভাগ্য সরাসরি গঙ্গার পানির ওপর নির্ভরশীল। অথচ পানি বন্টন চুক্তি হওয়ার পরও বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে চুক্তির মাত্র ৬ ভাগের ১ ভাগ পানি পাচ্ছে। বার্নস লিখেছেন, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বিরোধ চলার পর গত ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু ৩ মাসের মধ্যেই চুক্তির বরখেলাফ করা হয়েছে। বহুল আলোচিত ও প্রচারিত গঙ্গার পানি চুক্তি আজ পরীক্ষার সম্মুখীন। ফারাক্কা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালে। ততো দিনে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়বে কয়েক গুণ। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক জ্যাক দিয়োফ বলেছেন, '২০৩০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে বাড়বে পানির চাহিদাও।' বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য ভিশন-২০২১ ঘোষণা করেছে। এ সময় বাংলাদেশের পানি সঙ্কট কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে তা কি তারা ভেবেছেন? রাজ্জাক-হুদা সাহেবদের মতো রমেশ সেনরা যদি তিস্তা নিয়েও এমন চুক্তি করেন তবে পানিশূন্য বাংলাদেশের মানুষ মরুভূমির যুগে চলে যাবে। এখন হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে সারে। তখন ভর্তুকি দিয়েও পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের মানুষ নদী হারিয়েছে অনেক আগে। তারা কি পানিশূন্য এক ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে?[১৯] ■

---

১৯. আলফাজ আনাম, গঙ্গার পানি এবং সৌভাগ্যবান মন্ত্রী, নয়াদিগন্ত, ১৮ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ-৭।

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম– বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

৫—

www.bjilibrary.com

জায়নবাদ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ

মুহাম্মাদ নূরুল আমিন

■

ইহুদীদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে জায়নবাদ [Zionism] নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। হিব্রু Zion শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। বলা বাহুল্য জয়ন হচ্ছে জেরুসালেমের একটি পাহাড়ের নাম এবং এর অর্থ হচ্ছে দাগ কাটার মতো ঘটনা বা স্মৃতি উৎসব। জায়নবাদ একক প্রস্তরের স্তম্ভ [Monolithic] ভিত্তিক আদর্শবাদী কোনও আন্দোলনের নাম নয়।

এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে; যেমন বার বরোচভের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক, রাব্বিস কুক ও রেইনেস এর ন্যায় ধর্মীয়, জীভ জারেটিনস্কির ন্যায় জাতীয়তাবাদী ও এসব জিন্সবার্গ [আহাদ হা'ম] এর ন্যায় সাংস্কৃতিক জায়নবাদীরাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। ইউরোপ মহাদেশে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বিদ্যমান পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে জায়নবাদ একটি মতবাদ হিসেবে বিকশিত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতধারার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দেশ ও চিন্তাবিদদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এই মতবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রং ধারন করেছে।

www.bjilibrary.com

এ প্রেক্ষিতে জায়নবাদকে কোনও একক ব্যক্তি, গায়েবী গ্রন্থ, কোনও উক্তি বা ঘোষণার অভিব্যক্তি বলা যাবে না। ইহুদীরা জায়নবাদকে বিংশ শতাব্দিতে তাদের আদর্শিক সাফল্য গাথা বলে মনে করেন। একটি অসম্ভব স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য এই মতবাদ অনেক বাধার বিন্দাচল অতিক্রম করেছে। কেউ কেউ দাবী করে থাকেন যে জায়নবাদ প্রকৃত পক্ষে অনিষ্টকারী কোনও ষড়যন্ত্রের নাম নয়। তবে এটা স্বীকার করেন যে এই মতবাদ থেকে উৎসারিত কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে একটি তীব্র গণবিদ্বেষ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। জায়নবাদকে পরিষ্কারভাবে জানতে হলে ইহুদীবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। বস্তুত ইহুদীবাদ এবং জায়নবাদ হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

আল কুরআনে বণী ইসরাইল ও ইহুদী জাতি

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহিম [আ] এর দুই পুত্র হযরত ইসমাইল [আ] এবং হযরত ইসহাক [আ] ছিলেন আল্লাহর মনোনীত নবী। হযরত ইয়াকুব [আ] এর অপর নাম ছিল ইসরাইল [আ]। বাদশাহ নমরুদের প্রধান পুরোহিত আজরের সন্তান হওয়া সত্তেও ইব্রাহিম [আ] তাওহীদের উপর ইমান আনেন এবং সকল প্রকার শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। এই অপরাধে বাদশাহ নমরুদ তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেন এবং আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতে তাঁকে রক্ষা করেন। এর পর তিনি পিতৃভূমি ইরাক থেকে হিজরাত করে মিশর, জর্দান ও সওদী আরব সহ বিভিন্ন দেশে দীনে হক এর দাওয়াত পেশ করতে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করতে উদ্যত হন। আল্লাহ তাঁর এই কুরবানী গ্রহণ করেন। শৈশব থেকে জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত তিনি দ্বীনে হক এর প্রতি যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং তার জন্য নিজের সর্বস্ব কুরবানী করার যে নজির স্থাপন করেছেন আল্লাহ ইব্রাহিম [আ]কে এর প্রতিদান হিসেবে যে পুরস্কার দিয়েছেন সূরা আল বাকারার ১২৪ নং আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতটির তর্জমা হচ্ছে, "ইব্রাহিমকে তার রব কিছু কিছু ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন। সে সব পরীক্ষায় সে সফল হল। তাকে আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাবো। ইব্রাহিম নিবেদন করলেন, আর আমার বংশধরদের ব্যাপারেও কি এই ওয়াদা? উত্তরে আল্লাহ বললেন, আমার ওয়াদা যালিমদের জন্য নয়,"।

আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী হযরত ইব্রাহিম [আ]কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাইল উভয়েই নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হযরত ইসহাক [আ]-এর ছেলে হযরত ইয়াকুব [আ]ও নবী ছিলেন। তাঁর অপর নাম ছিল ইসরাইল অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর দাস। তাঁর বংশধররাই ইতিহাসে বনি ইসরাইল নামে খ্যাত। ইয়াকুব [আ]-এর ১২টি ছেলের মধ্যে

www.bjilibrary.com

চতুর্থ ছেলের নাম ছিল ইয়াহুদা। ইহুদীরা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে ইয়াহুদারই বংশধর। তার থেকেই বনি ইসরাইলের ১২টি বংশের উৎপত্তি ঘটে। মাওলানা হামিদুদ্দীন ফারাহীর বর্ণনানুযায়ী ইয়াশুব রাজত্ব কালে অধিকৃত সকল এলাকা এই বারোটি বংশের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে প্রাচীন আরবের এরশেলেম নামক স্থান থেকে শুরু করে দক্ষিণের সমগ্র এলাকা বনি ইয়াহুদের অধীনে চলে যায়। হযরত দাউদ [আ] এই বংশের লোক ছিলেন। তাঁর আমলে সমগ্র এলাকা বনি ইসরাইলের করতলগত হয়। তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান [আ] এর সময় 'হাইকেলে সুলাইমানী' তৈরী হয়েছিল। তাঁরা উভয়ে নবী ছিলেন।

হযরত সুলাইমান [আ] এর পরেই বনি ইসরাইলদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। তারা দুভাগে বিভিক্ত হয়ে পড়ে। এর এক অংশের নাম বনি ইয়াহুদা অপর অংশ বনি ইসরাইল নামে পরিচিতি লাভ করে। কালের আবর্তে ইয়াহুদা ও বনি ইসরাইল ছাড়া অপর বংশের সমূহের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর পর ইতিহাসের পাতায় শুধু ইয়াহুদা ও বনী ইসরাইলের নামই পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ইতিহাসের রেকর্ড অনুযায়ী এরা যখন কালদানীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে তখন বনী ইসরাইল নামটি ইহুদীদের সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং কাল পরিক্রমায় ইসরাইল ও ইহুদী জাতি সম্মিলিত ভাবে একক একটি জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এখানে আরেকটু গভীরে যাওয়া দরকার। এটা সর্বজনবিদিত যে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পর হযরত ইব্রাহিম [আ] ছিলেন প্রথম বিশ্বজনীন নবী। ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার জন্য প্রথমে তিনি নিজে সশরীরে ইরাক থেকে মিশর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে নিয়ে আরবের মরু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বছরের পর বছর সফর করে মানুষকে ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এর পর তিনি এই মিশন সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এরই অংশ হিসেবে পূর্ব জর্দানে হযরত লুত [আ]কে নিযুক্ত করা হয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে নিযুক্তি পান তাঁর ছোট ছেলে হযরত ইসহাক [আ] [বিবি সারার গর্ভজাত] এবং আরবের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করেন তাঁর বড় ছেলে হযরত ইসমাইল [আ]কে [বিবি হাজেরার গর্ভজাত]। এর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি মক্কায় কাবাগৃহ নির্মাণ করেন এবং তাঁকে সারা দুনিয়ার দীনী মিশনের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত ইব্রাহিম [আ] এর বংশ ধারা দুটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা হচ্ছে হযরত ইসরাইলের সন্তান সন্তাতিবর্গ। এরা আরবের বাসিন্দা। কুরাইশ ও আরবের আরো কতিপয় গোত্র এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় শাখায় হযরত ইয়াকুব [আ] হযরত ইউসুফ [আ], হযরত মুসা [আ], হযরত দাউদ [আ], হযরত সুলাইমান [আ], হযরত ইয়াহিয়া [আ] হযরত ঈসা [আ] প্রমুখ অসংখ্য নবী জন্ম গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করেন। হযরত ইয়াকুবের যেহেতু আরেক নাম ছিল ইসরাইল সেহেতু তাঁর বংশ বনী ইসরাইল নামে পরিচিত হয়। এই বংশধারার অবনতি ও অধঃপতন সূচিত হলে প্রথমে ইহুদীবাদ ও পরে খৃস্টবাদের উদ্ভব ঘটে। ইহুদীরা মুহাম্মাদ [সা]কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেনি কেন না তিনি ইসমাইলের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহুদীরা বিবি হাজেরার গর্ভজাত বলে আরবদের Haggarine এবং ইসলামকে Haggarism বলে থাকে।

বনি ইসরাইলদের প্রতি আল্লাহর রহমত

আগেই বলেছি বনি ইসরাইলদের পূর্ব পুরুষ ও মিল্লাতে মুসলিমার পিতা ছিলেন হযরত ইব্রাহিম [আ]। তারা যতদিন তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলেছে, সততা, সরলতা ও পরিপূর্ণভাবে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে ততদিন গোটা মানব জাতির ধর্মীয় নেতা ও পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছে। দায়িত্ব পালনের এই মেয়াদ প্রায় পাঁচ হাজার বছর। আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে একটি জাতি হিসেবে বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ৬৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যে কিতাব তোমাদের দেয়া হয়েছে তা তোমরা মজবুত করে আকড়ে ধরবে। এতে যে হুকুম আহকাম ও উপদেশ বাণী লেখা আছে তা স্মরণ রাখবে। বস্তত: এরই সাহায্যে আশা করা যায় তোমরা তাকওয়ার নীতি মেনে চলতে পারবে।" একই সূরার ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে," আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। পিতা মাতার সাথে, আত্নীয় স্বজনের সাথে, ইয়াতিম মিসকিনের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। সাধারন মানুষের সাথে ভাল আচরণ করবে, মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং এখন পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই আছ।" সূরা আল মায়েদার ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে," আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তোমাদের সাথে আছি যদি তোমরা নামাজ কায়েম রাখো যাকাত আদায় করো এবং আমার নবী গণকে মান্য করো, তাদের সাহায্য এবং শক্তি বৃদ্ধি করো এবং তোমাদের আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে থাকো।" পথ ভ্রষ্ট হবার আগ পর্যন্ত বনি ইসরাইলদের পথ ছিল ইব্রাহীম [আ]-এর পথ, তাওহীদের পথ। সূরা আল আনআমের ১৬১-১৬৩ নং আয়াতে আল কোরআন একথাই বলেছে। এতে বলা হয়েছে,

"[হে মুহাম্মাদ] বলুন, আমার রব নিঃসন্দেহে আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে সঠিক দ্বীন। যাতে একটু বাঁকা তেড়া নেই। ইব্রাহীমের পথ যা তিনি একাগ্রমনে অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বলো, [হে রাসূল] আমার নামাজ আমার সকল নিয়ম কানুন, আমার জীবন আমার মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জন্য। যার কোন শরীক নেই। আমাকে একবারই আদেশ দেয়া হয়েছে। আর ইবাদাতের জন্য মাথা নতকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।"

বস্তুত বনি ইসরাইল ও বনি ইয়াহুদাকে দাওয়াতে হকের পতাকাবাহী হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। শাহাদাতে হক বা সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করাকে তাদের বুনিয়াদী দায়িত্ব

www.bjilibrary.com

ও কর্তব্য হিসেবেও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"এই সব আহলে কিতাবকে [বনী ইসরাইল] সেই ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দাও যা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা এই যে তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। একে গোপন রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তাকে বিক্রয় করেছে। তারা এসব যা কিছু করেছে তা কতই না খারাপ কাজ।"

বনী ইসরাইলকে আল্লাহ যে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন প্রথম দিকে তারা তা সার্থকভাবেই পালন করেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর রহমতের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তিনি তাঁর অসংখ্য নবী ও পাঠিয়েছেন। সন্দেহ নেই যে এই জাতির মধ্যে অনেক ভাল লোক ও ছিলেন যাঁরা এসব নবীদের [আ] ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু এই গোষ্ঠির অধিকাংশ মানুষের আচার আচরণ কালক্রমে আল্লাহর কিতাব তাঁর হুকুম আহকাম এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি লজ্জাজনক ও শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বনী ইসরাইলদের পরহেজগার মুত্তাকী সদস্যদের প্রশংসা করা হয়েছে। সূরা আস্ সাজদার ২৩-২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

"এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি। অতএব তা লাভ করা সম্পর্কে তোমাদের মনে কোনও সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এই কিতাবকে আমি বনি ইসরাইলের জন্য হিদায়াত হিসেবে বানিয়েছি। যতদিন তারা ধৈর্য ধারন করেছে এবং আমার আয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ততদিন আমি তাদের মধ্যে এমন পথ প্রদর্শক ও নেতা পাঠিয়েছি যারা আমার নির্দেশে তাদের মধ্যে পথ প্রদর্শনের কাজ করেছে।"

সূরা আল আরাফের ১৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর আমি এ ফিরআউন গোষ্ঠির যায়গায় ঐ সব লোকদেরকে এই জমিনের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বলয়ের ওয়ারিশ বানিয়ে দিয়েছি সমৃদ্ধশালী করেছি যাদেরকে তারা দুর্বল করে রেখেছিল। এভাবে বনি ইসরাইলদের ব্যাপারে তোমার আল্লাহর কল্যাণময় ওয়াদা পূরণ হয়েছে। কারণ তারা ধৈর্যের সাথে কাজ করেছিল। আর ফেরআউন ও তার লোক জনদের সে সব কিছুই আমরা বরবাদ করে ছিলাম যা তারা বানাচ্ছিল এবং উঁচু করেছিল।

সূরা আল বাকারার ২৪৯-২৫১ নং আয়াতে তালুত এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের সত্যবাদিতা ও দৃঢ়তার কথা উল্লেখ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

"এর পর তালুত এবং তার সহযাত্রী মুসলিমগণ যখন নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো তখন তারা তালুতকে বললো, আজ জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সাথে

www.bjilibrary.com

মুকাবিলা করার কোন শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা মনে করতো যে তাদেরকে একদিন আল্লাহর সাথে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বললো: অনেকবারই দেখা গেছে যে এক ক্ষুদ্রতম দল আল্লাহর অনুমতি ক্রমে একটি বৃহত্তর দলের উপরে বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। যখন তারা জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা দোয়া করলো: হে আমাদের রব আমাদেরকে ধৈর্যদান কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং এই কাফির দলের উপরে আমাদেরকে বিজয় দান কর। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অনুমতি ক্রমে তারা কাফিরদের পরাজিত করেছিল।"

পক্ষান্তরে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশ্ব জাহানের নেতৃত্ব মর্যাদা ও গৌরব পাওয়া সত্তেও বনি ইসরাইল তথা ইহুদীরা শেষ পর্যন্ত নাফরমানির পথকেই বেছে নিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল বেঈমান। তারা আল্লাহকে প্রদত্ত ওয়াদা খেলাপ করে বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। সূরা আল মায়েদার ৬৯-৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"আমি বনী ইসরাইল থেকে মজবুত ওয়াদা গ্রহণ করেছি। তাদের নিকট অনেক রাসূল পাঠিয়েছি কিন্তু যখনি কোনও রাসুল তাদের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোনও কথা নিয়ে এসেছে তখন তারা কাউকে মিথ্যাবাদী বলেছে, কাউকে হত্যা করেছে; এবং নিজেরা ধারনা করে নিয়েছে যে এখন আর কোনও ফিৎনার সৃষ্টি হবে না। তাই তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল, এর পরও আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্তেও তাদের লোক আরো বেশি অন্ধ ও বধির হতে চললো;

সূরা আল জাসিয়ার ১৬-১৭ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনী ইসরাইল জাতির নাফরমানীর একটি ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এতে বলা হয়েছে:

"এর আগে আমি বনি ইসরাইলকে কিতাব হুকুম ও নবুয়াত দান করেছি। তাদেরকে আমি জীবন ধারনের জন্য উত্তম জীবিকা দান করেছিলাম। গোটা দুনিয়ার মানুষের উপর তাদেরকে অধিক মর্যাদাশীল করেছিলাম, দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হিদায়াত দান করেছিলাম। এরপর তাদের মধ্যে যে মতামত সৃষ্টি হলো তা তাদের অজ্ঞতার কারনে নয়, বরং নির্ভুল জ্ঞান লাভের পরই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হয়েছে এ কারণে যে তারা একে অপরের উপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল।"

বনী ইসরাইল জাতি যখন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন আল্লাহ তায়ালা বার বার তাদেরকে তার নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন নাফরমানির ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। সূরা আল বাকারার ৬ থেকে ৯ নং রুকুতে আল্লাহ পাক এরই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এতে ফেরাউনী দলের দাসত্ব কালে তাদের করুন অবস্থা, পুত্র সন্তানদের হত্যা ও কন্যা সন্তানদের রেখে দেয়া,

www.bjilibrary.com

সাগরের বুক চিরে হিজরাতের পথ করে দেয়া, ফেরাউনী দলের নিমজ্জন, মূসা [আ] এর অনুপস্থিতিতে বাছুরের উপাসনা, আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার জনী মুসা [আ] এর প্রতি বায়না, ভয়াবহ বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু ও পুররুজ্জীবন দান, প্রচন্ড রোদের কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য মেঘমালার ছায়া দান, বিনা পরিশ্রমে মান্না ও সালওয়ার ন্যায় সুস্বাদু খাবার সরবরাহ, প্রতিটি গোত্রের পানি চাহিদা মিটানোর জন্য স্বতন্ত্র ১২টি ঝর্না ধারার সৃষ্টি, খাবার নিয়ে বাড়াবাড়ি, গরু নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি, শনিবারের নিয়ম লংঘন, খুন রাহাজানির সাথে সম্পৃক্ততা, আমানতের খিয়ানত এবং আল্লাহর রহমত ও নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা এবং তার পরিণতি হিসেবে অভিশপ্ত জাতি হিসেবে তাদের বিধৃত করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের উপর আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে জাতিগত শত্রুতার ধরন প্রকৃতি। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতা বা মনোমালিন্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। একটি জাতির হাতে আরেকটি জাতি সাময়িকভাবে কষ্ট পেতে পারে এবং এক পর্যায়ে তা বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর প্রকৃতি সাময়িকই হয় এবং কালক্রমে তা শেষও হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবন এবং মানবেতিহাসে জাতিগত ভাগ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি তিক্ত সম্পর্ক ও পরিলক্ষিত হয় যা ইতিহাসের চিত্র ও শত্রুতার ধারাকে সরল রেখায় এগিয়ে নিয়ে যায়। স্থায়ী কারনের ভিত্তিতে এ ধরনের তিক্ততা গড়ে উঠে এবং জাতীয় ইতিহাসের সাথে এ ধারারও বিলুপ্তি ঘটে। এ প্রেক্ষিতে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সাময়িক শত্রুতা যে কোন জাতির বা দলের হতে পারে। ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষন করলে তাদের সাথে কেবল দু'টি জাতির স্থায়ী ও চিরন্তন শত্রুতা দেখা যায়। স্বয়ং আল কোরআন এই বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে। এতে বলা হয়েছে।

"অবশ্যই যারা ইমান এনেছে তাদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী এবং যারা শিরক করে তাদেরকেই তোমরা সব চেয়ে উগ্র দেখতে পাবে।" [সূরা আল মায়েদা : ৮২]

অর্থাৎ দুনিয়ার দু'টি জাতিই হবে ইসলামের অনুসারীদের প্রতি সব চে বেশি শত্রু ভাবাপন্ন; তাদের একটি ইহুদী অন্যটি মুশরিক। এ কথা অনস্বীকার্য যে চিরন্তন বঞ্চনার অনুভূতি থেকেই চিরন্তন শত্রুতার জন্ম হয়ে থাকে। সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদে বিশ্বাসী হবার কারনেও একটি জাতি আরেকটি জাতির চিরস্থায়ী শত্রুতে পরিণত হতে পারে। দুনিয়ার এই মতবাদে বিশ্বাসী তিনটি জাতি ছিল। এরা হচ্ছে ইহুদী, হিন্দু এবং পার্সী। স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে এদের বৈশিষ্ট্য অনেকটা অভিন্ন। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় এদের বলা হয় insular বা সংকীর্ণমনা। এরা সর্বদা রক্ত, অস্থি ও বংশ ধারার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে এবং তাদের দৃষ্টি থাকে অভ্যন্তরের দিকে এবং নিজের

www.bjilibrary.com

আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে তারা এতই সজাগ যে প্রতিটি ব্যাপারে তারা নিজেদের জাতি বংশ ও রক্তধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে চায়। বিজিত ও পরাজিত সকল অবস্থায়ই তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতার চেতনা ও বিদ্বেষ সক্রিয় থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের তিনটি জাতির মধ্যে যরথুষ্ট্রীয় অগ্নি উপাসক পার্সী জাতিটি সংখ্যাল্পতার কারনে বিশ্ব ইতিহাসে প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। অপর জাতি দুটি হিন্দু [মুশরিক] এবং ইহুদীরা জাত্যাভিমান নিয়ে এখনো টিকে আছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে হিন্দু বলতে তারা ব্রাহ্মনদেরই বুঝিয়ে থাকে। নিম্ন বর্ণের বৈশ্য,শুদ্র বা ক্ষত্রিয়দের জন্মই হয় ব্রাহ্মণদের সেবা করার জন্য। তারা যতই নিখাদ হিন্দু হোক না কেন কখনো ব্রাহ্মণ হতে বা ব্রাহ্মনের ন্যায় ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা পেতে পারে না। কোনও অহিন্দু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে বৈশ্য, শুদ্র বা ক্ষত্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণদের নয়। অর্থাৎ হিন্দু বিবেচনার ভিত্তি ঈমান বা বিশ্বাসের উপর নয় বরং বংশ ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহুদীরা কাউকে ইহুদী বানায় না। কেউ ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করলেও ইহুদী হতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় গোত্রগুলো খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে কোনও গোত্রের সাথে তাদের গোত্র বা বংশগত সামঞ্জস্য। এই উদ্যোগ প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে নব্বই এর দশকের শুরুতে তারা সুদানের একটি গোত্রের সাথে তাদের গোত্রকে ইহুদী ফালাসা [Falasha] নাম দিয়ে তাদের লক্ষ লক্ষ সদস্যকে ইসরাইল ভূমিতে বসতি স্থাপনের সুযোগ দিচ্ছে। এর কিছু কাল পর উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কোন কোন গোত্রকে তারা ইহুদী বলে গণ্য করেছে এবং তাদের ইসরাইলে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাইরের ইহুদীদের এনে ইসরাইলে বসবাসের সুযোগ দেয়া বর্তমানে ইহুদীদের একটি জাতীয় প্রয়োজন। কেননা ইসরাইলের প্রতিরক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা অত্যন্ত জরুরী। আর এই কাজটি করার জন্য প্রথম ঠেলে দেয়া হয় অভিবাসীদের। কেননা ইহুদীরা প্রাণ দিতে ভয় পায়। হিন্দুদের মধ্যে যেমনি ব্রাহ্মন ইহুদীদের মধ্যে তেমনি সেফারদিম [Sepherdim] এবং আশকেনাজিম [Ashkenazim] নামক দু'টি উচ্চ বর্ণের সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের ইসরাইলের মালিক বলে মনে করে।

আলকোরআনের সূরা আল মায়েদার ৮২ নং আয়াতের প্রসংগ উল্লেখ করে আমি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলেছিলাম যে ইহুদী এবং মুশরিক এই দুটি জাতি হচ্ছে মুসলিমদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুতামুখর। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূলের [সা] নির্দেশ প্রনিধান যোগ্য।

আবু সাঈদ আল খুদরী [রা] নবী [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করবে প্রতি পদে পদে এমন কি তারা কোন গো সাপের

www.bjilibrary.com

গর্তে ঢুকে পড়লে তোমরাও তেমনি করবে। আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল, তারা কি ইহুদী ও খৃস্টান? রাসূল [সা] বললেন, নয় তো কারা? "[সহীহ আল বুখারী কিতাবুস সুন্নাহ অনুসরণ অধ্যায়]। এই হাদীস থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে মুসলিমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের পদাংক অনুসরণ করার ফিতনার জড়িয়ে পড়তে পারে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেন, ততদিন কিয়ামাত হবে না যতদিন না তোমরা ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে। এমনকি পাথরের পেছনে লুকানো ইহুদীকে নির্দেশ করে পাথর বলবে, হে মুসলিম, আমার পেছনে লুকিয়ে আছে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। [সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ]

এই হাদীস থেকে মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যকার অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুমান করা যায়। এ থেকে ইহুদীদের মনোভাব, তাদের সৃষ্ট বিপর্যয় এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে তাদের সর্বশেষ যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আন্দাজ করা যায়। একই ভাবে সূরা আল মায়েদার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখিত "যারা শিরক করে" এই বাক্যাংশটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে এই পরিভাষাটি হিন্দুদের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ইহুদীদের জন্য ইয়াহুদ শব্দটি। হিন্দু এবং ইহুদী উভয় জাতি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। বিশ্লেষকরা এ ব্যাপারে একমত যে বৃটিশ আমলে হিন্দুস্তানে হিন্দু জাতির মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা চেতনার যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রকৃত পক্ষে ইহুদী প্রাচ্যবিদদের প্রচেষ্টারই ফল। এ প্রসংগে রাসূল [সা] এর দুটি হাদীস গভীর চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে। প্রথম হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তার সুনান গ্রন্থে "হিন্দুস্তানের যুদ্ধ" শিরোনামের আওতায় উদ্বৃত করেছেন। তার দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম আত্ তাবরানী রাসূল [সা] এর মাওলা ছাওবান থেকে রেওয়াত করেছেন। প্রথম হাদীসে রাসূল [সা] বলেছেন, আমার উম্মাতের দুটি দলকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন, তাদের একটি দল হচ্ছে তারা যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে, অপর দলটি হচ্ছে যারা মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস্সালাম-এর সাথে থাকবেন। দ্বিতীয় হাদীসটিতে হযরত আবু হুরাইরা [রা] বলেন, রাসূল [সা] আমাদের সাথে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন। যদি আমার জীবন কালে সে যুদ্ধ হয় তাহলে আমি নিজেকে ঐ যুদ্ধে সপে দেব। যদি আমি নিহত হই তাহলে আমি হবো সর্বোচ্চ মর্যাদার শহীদ। আর যদি আমি সশরীরে ফিরে আসি তাহলে আমি হবো গুনাহ মুক্ত আবু হুরাইরা। এ ব্যাপারে আল্লামা তাহের ইবনে আলী গুজরাটির তাজকিরাতুল মওদুআত গ্রন্থে উল্লেখিত আরেকটি হাদীস ও উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি হচ্ছে "ইহুদী ও হিন্দুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো যদিও তারা হয় সন্তরটি বংশজাত।" আল্লামা হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ সিসানী লাহোরী এটিকে মওদু বা বানোয়াট হাদীস হিসেবে গন্য করলেও

www.bjilibrary.com

এখানে দুটি কথা ও প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হাদীসটি থেকে সত্যের যে আভা বেরিয়ে আসে তার ভিত্তিতে এটি সম্পর্কে পুনরালোচনা এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য খৃস্টানরাও দীর্ঘকাল মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করে আসছে। এই শত্রুতা খিলাফতে রাশেদার সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে আসলেও তাকে সাময়িক বলতে না পারলেও স্থায়ী শত্রুতা বলা যেতে পারে না। ঐতিহাসিকরা এর অনেকগুলো কারন উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে মুসলিমদের সাথে প্রকৃত খৃস্টানদের শত্রুতা বড় জোর ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে। পূর্ব রোমান তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর খৃস্টানদের বৃহত্তম অংশের শক্তি সামর্থ নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্বৃত্ত হযরত আবু হুরাইরা [রা] বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ " আর কাইসার অবশ্যই ধ্বংস হবে এবং এর পর আর কোন কাইসার আসবেনা।" মুসলিম শরীফে নাফে ইবনে উতবা বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল [সা] এর জামানা থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত সময়কালকে বাইরের সংঘাতের ভিত্তিতে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জাযিরাতুল আরবের যুদ্ধ, পারশ্যের যুদ্ধ, রোমের যুদ্ধ এবং সর্বশেষ দাজ্জালের যুদ্ধ। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায় ১৪৫৩ এর পর এই জামানা শুরু হয়েছে তার অবসান ঘটবে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ে খৃস্টানদের সাথে সরাসরি যুদ্ধের ইংগত নেই। আবু দাউদের কিতাবুল মালাহিমে খরুজুদ দাজ্জাল অধ্যায়ে এবং মুসনাদে আহমদে আবু হুরাইরার বর্ণনাবলীতে বর্ণিত হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে প্রকৃত খৃস্টানরা শেষ পর্যন্ত ইসলামের উপর ঈমান আনবে।

আসল খৃস্টান বলতে ইহুদীজাত খৃস্টান ইহুদী খৃস্টান এবং খৃস্টান ইহুদী ছাড়া বাকী সকল খৃস্টানকেই বুঝায়। ইহুদী খৃস্টান হচ্ছে এমন সব খৃস্টান যাদেরকে প্রকাশ্যে জায়নবাদী খৃস্টান বলা হয়। খৃস্টান ইহুদী হচ্ছে এমন সব ইহুদী যারা অন্তরের দিক থেকে ইহুদী কিন্তু বাহ্যতঃ নিজেদের মিশনের সফলতার জন্য খৃস্টান হয়ে গেছে। আবার ইহুদীজাত খৃস্টান হচ্ছে এমন সব খৃস্টান যারা ইহুদী চক্রান্তের ফলে আসল খৃস্টানদের প্রতি বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হয়ে আলাদা হয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্বের খৃস্টানদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে এই ইহুদীজাত খৃস্টান। ১৪৫৩ সালের পর থেকে খৃস্টবাদের মূল ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই ইহুদী জাত খৃস্টান, খৃস্টবাদী ইহুদী ও ইহুদীবাদী খৃস্টানের ইতিহাস। এছাড়া ১০৯৯ সাল থেকে ১২১২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্রুসেড যুদ্ধ গুলোর অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই যুদ্ধগুলোতে সমগ্র খৃস্টান জগত অংশ গ্রহণ করলেও মূলত এগুলো ছিল ইহুদী চক্রান্তের ফল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহুদীরা তাদের চিরশত্রু খৃস্টানদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলে খৃস্টান জগত কেবল যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়

www.bjilibrary.com

তাই নয় বরং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রোমের পোপ সহ ইউরোপের খৃস্টান রাজ্যগুলোও ইহুদীদের ঋণে আকণ্ঠ ডুবে যায়। এভাবে পর্দার আড়ালে থেকে ইহুদীরা খৃস্টবাদকে বিধ্বস্ত করে সমগ্র ইউরোপের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

জায়নবাদের ক্রম বিকাশ

জায়নবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে একে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং বাইরের ঘটনা প্রবাহ এই বিভক্তির জন্য দায়ী। জায়নবাদের এই অধ্যায়গুলো নিম্নরূপ :

১. প্রাক-জায়নবাদঃ রাষ্ট্রহীন নাগরিক হিসেবে [Stateless citizen] ইহুদীদের দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর দীর্ঘ পরিক্রমায় সর্বদাই জায়নবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি ও ইসরাইল ভূমির প্রতি ইহুদীদের বন্ধন অটুট ছিল। এই সময়ে ইহুদী পুনরুদ্ধার বা খৃস্টবাদের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের আকারে জায়নবাদ প্রকাশ করা হতো। Yovel Yirmiyahu-এর ভাষায়:

"Zionism was a natural product of the culture of the Jewish people in Exile. It did not spring full blown from a void with the creation of the Zionist movement in 1897. The central idea of Zionism, disputed by anti-zionists, is that the Jews are a people, a nation tied to a specific land and not just a religion. It is a misconception to think that this idea was born in 19th century. Since the Romans exiled the jews from the land that the Jews called Judea and the Romans called Palestine, the Jews had referred to the lands outside the land of Judea or Israel as Gola meaning "exile" rather than Diaspora and to their condition as Galut. Both were always terms with negative and bitter connotations. Implicitly then, there was a land from which Jews were exiled and to which they understood that they belonged.

ইহুদীদের দাবী অনুযায়ী খৃস্টের জন্মের প্রায় ১২০০ বছর পূর্ব থেকেই তারা ইসরাইল ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরের সংগমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে এই ভূমিটি মিশর, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর, আবিসিনিয়া, বেবিলোনিয়া, পার্সিয়া, সিলিউসিড গ্রীক ও রোমানরা দখল করে নেয়। বিজয়ী জাতিসমূহের কেউই ইসরাইল ভূমিকে তাদের জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেনি ও একমাত্র ইহুদীরাই তাকে মাতৃভূমির মর্যাদা দিয়েছে। ইসরাইলের ইতিহাস, ভূগোল, আবহাওয়া, পরিবেশ সর্বত্রই ইহুদীদের জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস এবং আচার

www.bjilibrary.com

আচরণের ছাপ রয়েছে বলে তারা মনে করেন। বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্ট ইহুদীদের সৃষ্টি। এতে তাদের পুণ্যভূমি ও তাদের জাতীয় ইতিহাস বিধৃত রয়েছে। এই বাইবেল শুধু ইহুদীদের সংস্কৃতিরই ভিত্তি নয় বরং পাশ্চাত্যের খৃস্টানদের সংস্কৃতিরও মেরুদণ্ড। রোমানরা ফিলিস্তিন দখল করে ইহুদীদের নির্বাসনে পাঠানোর পর পিতৃভূমির সাথে তাদের সম্পর্ক একমাত্র বাইবেলই সংরক্ষণ করেছে। দৈনিক প্রার্থনায় তারা ফিলিস্তিনের পুনর্গঠন কামনা করেছে এবং মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের লিখনীতে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

ইহুদীরা ফিলিস্তিনের সাথে স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ১৩৫ সালের বার কোচা বিদ্রোহের পর থেকেই এমনকি তাদের এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এই বিদ্রোহের পর রোমানরা ইহুদীদের ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করে। পরবর্তী বছরগুলোতে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ক্রুসেডের আগে মুসলিম শাসনামলে ১০০০ খৃস্টাব্দে তাদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষে পৌছে। ক্রুসেডের নেতা কর্মীরা অধিকাংশ ইহুদী ফিলিস্তিনীদের হত্যা করে, অনেককে নির্বাসনে পাঠায় এবং মুসলিম সেনানায়ক সালাহ উদ্দিন যখন ফিলিস্তিন পুনর্দখল করেন সেখানে ইহুদী পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার।

মুসলিম শাসকরা ইহুদীদের প্রতি কখনো রূঢ় ব্যবহার করেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই ইহুদীরা পর্যায়ক্রমে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করেছে। কখনো তারা এসেছে ধর্ম প্রচারের নামে, তুর্কী শাসকদের আমন্ত্রণে অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নির্যাতনের হাত থেকে বাচার জন্য। তুর্কী শাসকরা তাইবেরিয়াস এবং হেব্রনে বসতি স্থাপনের জন্য ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বর্তমানে এই দুটি অঞ্চল ছাড়াও সাফেদ, জেরুসালেম, নাবলুস এবং গাজায় বসবাসকারী ইহুদীদের অধিকাংশই মুসলিম আমলে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী।

জায়নবাদ ও ইহুদীদের মুক্তি

ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ানের উত্থান ইউরোপীয় ইহুদীদের মুক্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে এবং এর ফলে তারা অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় সমান অধিকার পেতে সক্ষম হয়েছে। তাদের প্রতি উদারনীতি অনুসরণের এই ঘটনা পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ার উপরও প্রভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে ইহুদী সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে যা কট্টর জায়নবাদীদের মনপুতঃ ছিল না। ইয়োভেলের মতে,

"The enlightenment of the 18th Century and this emancipation of the 19th were a great shock for jewish culture and identity. Jews split into several groups during the 19th century. Ultra orthodox groups

www.bjilibrary.com

remain loyal to the culture of the ghetto, which excluded the possibility of intermingling in modern society or gaining a modern education. A second group attempted to assimilate completely into European society, converting to Christianity and losing their Jewish identity. A third group believed that they could integrate as modern citizens with equal rights and still maintain their jewish faith while renouncing any cultural or group allegiance to Judaism. They formed various euphemisms for their identity, such as Hebrews or Germans of the mosaic faith. This group founded the Reform Judaism movement. The assimilationists view point took it on faith that once the jews "become like everyone else" would be accepted in society as equals and would become Germans, Italians, Englishmen or Frenchmen.

উপরে বর্ণিত ইহুদীদের তিনটি গ্রুপের মধ্যে তৃতীয় গ্রুপটি অধিকতর সফল হয়েছে বলে মনে হয়। তারা যুগের পরিবর্তনকে সামনে রেখে রূপের পরিবর্তন করে বিভিন্ন জাতির সাথে মিশে গেছে, কিন্তু নিজেদের ইহুদী জাতি সত্তাকে অক্ষুন্ন রেখে সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপের কোন কোন দেশে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জনরোষে পড়তে হলেও তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এটা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দির ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহুদীরা অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র ছিল। ঐ সময় এ দুটি মহাদেশের বাসিন্দাদের অনেকের বাড়িতেই একটি সাইন বোর্ড ঝুলতে দেখা যেতো যাতে লেখা থাকতো "Dogs and Jews are not allowed" ইহুদীদের তৃতীয় গ্রুপটির অক্লান্ত পরিশ্রমে বিংশ শতাব্দিতে এসে এখন আর এই সাইন বোর্ড দেখা যায় না। কুকুর এখন ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের অনেকেরই বিছানা ও প্রাতঃ এবং সান্ধ্য ভ্রমনের সাথী আর ইহুদীরা তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি।

বৃটিশ জায়নবাদ

ধর্মীয় ও বাস্তব সম্মত অন্যান্য কারণে জায়নবাদের নামে ইহুদী সংস্কার আন্দোলন বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টতা তাদের মধ্যে বিপ্লবী হবার অনুপ্রেরণাও যোগায়। অবশ্য এক্ষেত্রে ইহুদী নারী ও নগদ নারায়নের যোগ যে ছিল না তা বলা যাবে না। কমুনিস্ট আন্দোলন যেমন আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত অনেক মুসলিম পরিবারের ইংরেজী পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় ও

www.bjilibrary.com

পারিবারিক ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়ে বিপ্লবী বানিয়ে দিয়েছিল তেমনি উনবিংশ শতাব্দিতে ইহুদীবাদ পুনরুজ্জীবনের উপর ভিত্তি করে J.N Darloy প্রতিষ্ঠিত Plymouth Brethren নামক সংস্কার আন্দোলনও বিলাতের শিক্ষিত যুব শ্রেণীকে ইহুদী পুনর্বাসনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৪০ এর দশকে লর্ড সভার দু'জন সদস্য সাফটেসবারী এবং পালামারষ্টন এই মর্মে প্রস্তাব করেন যে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের একটি কলোনী প্রতিষ্ঠাই বিশ্ববাসী ইহুদী সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাদের এই দর্শনও প্রস্তাবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইহুদী কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং নাট্যকাররা এগিয়ে আসেন। সেক্সপিয়ার ও অন্যান্য লেখকদের ইহুদী দর্শন বিরোধী নাটক উপন্যাসের মুকাবিলায় বাজারে নতুন নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। লর্ড বায়রন, বেজ্ঞামিন ডিসরেইলী, জর্জ ইলিয়ট ও ওয়াল্টার স্কটের গল্প উপন্যাস এবং কবিতা প্রবন্ধ এরই প্রমান। বলা বাহুল্য ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষণার পেছনে বৃটিশ রাজনীতিকদের তুলনায় সে দেশের কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকারদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়।

ধর্ম বনাম জায়নবাদ

ইহুদী ধর্মগুরুদের সকলেই জায়নবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে এক মত ছিলেন না। তাদের ভয় ছিল একটি ধর্মীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কৌশলগত কারনে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রনে চলে গেলে ধর্ম আর কখনো তার মর্যাদা ফিরে পেতে পারে না। প্রেসবার্গের রাব্বী [১৭৬২-১৮৩৯] Rabbi Moses Schreiber এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি জায়নবাদের নামে যে কোন সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। রাদুনের হাফেজ চেইম Rabbi Israd Meir Ha-cohen ও এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি Aqudath Yisrael নামক একটি সংস্থারও প্রধান ছিলেন। এদের অনেকের ধ্যান ধারনাই ছিল আমাদের দেশের তবলিগ জামায়াতের মতো। তারা মনে করতেন যে ধর্মের সাথে রাজনীতি বা জীবনের দৈনন্দিন তৎপরতা যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এতে ধর্ম তার বিশুদ্ধতা হারায়। অন্যদিকে ধর্মের উসুল সমূহ যদি পালন করা হয় এবং ধর্ম পুস্তককে সহিহ ভাবে পড়তে শেখা হয়, জীবনাচারে সততা নিষ্ঠা থাকে তাহলে আপনা আপনিই নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা ধর্ম প্রতিষ্ঠার অনুকূলে চলে আসবে এবং ইহুদীরা পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইহুদী সমাজে এই গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা পায়নি। মসির জন্য অপেক্ষা না করে জায়নবাদীদের যে দলটি ইসরাইল ভূমি পুনরূদ্ধারের পক্ষে ছিল [Proto Zionism] তারাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। তারা প্রথমতঃ ইসরাইলে ভূমি ইজারা ও পরে ক্রয়ের মাধ্যমে বসতি শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত মিত্র শক্তি ও বৃটিশ সরকারকে ব্যবহার করে বালফোর ঘোষণার মাধ্যমে গোটা ভূখণ্ড দখল করে নেয়।

www.bjilibrary.com

প্রোটো জায়নবাদের পরের অধ্যায়টি এই মতবাদের ইতিহাসে Foundational Zionism নামে পরিচিত। এই সময়ে Theodor Herzl এবং Chaim Weizmann এর নেতৃত্বে জায়নবাদ একটি সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক জায়নবাদ, সাংস্কৃতিক জায়নবাদ, ধর্মীয় জায়নবাদ, ভূখন্ডগত জায়নবাদ থেকে শুরু করে জায়নবাদী কংগ্রেস ও বৃটিশ ম্যান্ডেট আদায় পর্যন্ত সকল তৎপরতাই এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অধ্যায়ে জায়নবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইহুদীদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

ম্যান্ডেটরী জায়নবাদ

বৃটিশ ম্যান্ডেটের আওতায় ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে জায়নবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব ইউরোপ থেকে ইসরাইলে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের এনে ফিলিস্তিন তথা ইসরাইলে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করণ, আরবদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং তাদের প্রতিরোধ ও হলোকাষ্ট থেকে ইহুদীদের উদ্ধার প্রভৃতি জায়নবাদীদের প্রধান কাজ। ডেভিড বেন গুরিয়ন এই সময় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

যুদ্ধোত্তর জায়নবাদ

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর আরবদের সাথে যুদ্ধ এবং পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত এই ইহুদী রাষ্ট্রটিকে আনবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করণের ঘটনা জায়নবাদের আদর্শিক ও ভূখন্ডগত উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আরবদের সাথে ছয়দিন মেয়াদী যুদ্ধে ইসরাইলের বিজয় জায়নবাদীদের মধ্যে নতুন উদ্যমের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীরা জায়নবাদীদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সারা বিশ্বে জায়নবাদ পুনরুদ্ধারে আলোক ছটা ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি এর ফলে সামরিক সম্প্রসারণবাদও উৎসাহিত হয়। এর ফলে লিকুড পার্টি ও মোনাচেম বেগিন নেতৃত্বে আসেন এবং বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। নেতৃত্ব কট্টরপন্থী সংস্কারবাদীদের হাতে চলে যাওয়ায় আরব ভূখন্ড অগ্নিগর্ভা হয়ে পড়ে।

বস্তুত ১৯৭৭ সালে লিকুড পার্টি ক্ষমতার আসার পর ইসরাইল সরকার ও জায়নবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব কাঠামো অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় ইহুদী বসতি স্থাপনের ব্যাপারে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তারা মুক্ত বাজার অর্থনীতির অনুকূলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ করে। ইসরাইলের ঐতিহাসিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আনা হয় এবং জায়নবাদী বিভিন্ন দল উপদলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। বিভিন্ন দেশের জায়নবাদী আন্দোলন সমূহ ভূমি পুনরুদ্ধার ও বসতি

www.bjilibrary.com

স্থাপন আন্দোলনের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে। তবে জায়নবাদীদের মধ্যে এক্ষেত্রে এখনো অনেক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক জিভ স্টার্নহেলের একটি মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

"Those Israelis who opposed the settlement movement initiated a reaction against the zionist swing to the right. This reaction depressed itself in the form of zionist opposition to government policies, and of anti-zionist opposition which called itself Post-zionist. The zionist opposition seeks to end the occupation and settelement of territories conquered in 1967. The latter group tries to discredit zionsm as imperalist movement and wants to end the jewish state of Israel. As a byproduct of the Oslo Peace Process and the subsequent violence the post Zionist movement achieved considerable prominence for a time, while the ultimate victory seems to wait for the extremists.

আসলে জায়নবাদ ইহুদী চরমপন্থীদের একটি আন্দোলন। শুধু ইসরাইল ভূমি অথবা বনী ইসরাইলদের শাসনাধীন গোটা ভূখণ্ডে ইহুদীবাদ কায়েমই তাদের লক্ষ্য নয় বরং গোটা বিশ্বের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহুদী খৃস্টান এবং পৌত্তলিক হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর রয়েছে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিস্তিন হামলার মধ্য দিয়ে জায়নবাদের চরমপন্থী রূপ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। মানবতা বিরোধী তাদের এই হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং বিশ্ব শক্তিগুলো তাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

গবেষকদের মতে দুনিয়ায় যে সমস্ত সংস্থা সরাসরি জায়নবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরোক্ষভাবে তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে তাঁদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই মতবাদটি একটি ফিতনা যার প্রভাবে সারা দুনিয়া বিধ্বস্ত হবার উপক্রম হয়েছে। ইহুদী ও জায়নবাদীরা যে যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকে তখন সেই অবস্থাকে ব্যবহার করে তারা লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা নারী, অর্থ বিত্তসহ প্রলুব্ধ করার যাবতীয় উপাদানকে ব্যবহার করে। ইউরোপের রেনেসাঁ আসলে ছিল ইহুদী চক্রান্তের সাফল্যের সূচনা। রেনেসাঁর পর তারা চক্রান্তের জাল বিস্তার করে খৃস্টানদের ঐক্য ও রোমান সাম্রাজ্যকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। খৃস্টানদের আকিদা বিশ্বাস এবং চিন্তা চেতনায় এমন সব বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে যার ফলে তারা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যায়। কোটি কোটি খৃস্টানদের প্রাণ দিতে

৬—

www.bjilibrary.com

হয়। তারা বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইহুদীরা প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে প্রায় অর্ধেক খৃস্টীয় জনতাকে নিজেদের সহযোগী ও ক্রীড়নকে পরিণত করে। এবং এভাবে তাদের শত্রু Roman Catholic ও Orthodox Church এর কার্যক্রমকে দুর্বিষহ করে তোলে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে খৃস্টান জগতের অর্ধেক এখন জায়নবাদী ইহুদীদের দখলে, তারা তাদের কথায় উঠে বসে এবং অন্ধের মত তাদের অনুসরণ করে। এ ব্যাপারে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ইহুদী অনুপ্রেরণায় এরা ল্যাটিন বা পশ্চিমা খৃস্টবাদ থেকে আলাদা হয়ে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। যেমন, মোরাভিয়া, লুথারিয়া, ক্যালভিনিয়া এবং প্রেসবাইটেরিয়ান সম্প্রদায়। এর ভিত্তিতে তাদের গীর্জাও ভাগ হয়েছে। চার্চ অব ইংল্যান্ডের বাপটিস্ট, কংগ্রেগেশানালিস্ট, মেথডিস্ট, ইভানজেলিকান, মডার্নিস্ট ও এংলো ক্যাথলিক প্রভৃতি শাখা এরই প্রমাণ বহন করে। বিশ্বব্যাপী রোমান ক্যাথলিকদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হোলি সিটি তাদেরই প্ররোচনায় বিশাল ভূখণ্ড ছেড়ে রোমের একটি পাহাড়ের কয়েক একর জমিতে আশ্রয় নিয়েছে।

একটি অভিশপ্ত জাতি হিসেবে ইহুদীরা খৃস্টানদের কাছেও নিন্দিত ছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ফরাসী বিপ্লব এবং zionist International Jewry'র ন্যায় প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে এবং জায়নবাদী নেতাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে তাদের এই নিন্দিত অবস্থা বর্তমানে আর নেই বললেই চলে। খৃস্টান জগত সর্বসম্মতভাবে এই আকিদা পোষন করতো যে ইহুদীরা হচ্ছে আল্লাহর নবীদের হত্যাকারী একটি জাতি [Diecide nation]। এ প্রেক্ষিতে ইহুদীদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করা খৃস্টানদের উপাসনার একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। ১৯৬৫ সালের ২৮ অক্টোবর দ্বিতীয় ভ্যাটিকানের এক নির্দেশনামায় গুড ফ্রাইডে উপাসনার এই অংশটি পরিত্যাগ করা হয়। সংখ্যায় অনেক কম হলেও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য সাধনা, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম, সমর বিদ্যা, প্রশাসনসহ অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের উপর তাদের পরিকল্পিত দখল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী ইহুদীদের অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। আমেরিকা এখন শুধু তাদের বন্ধু নয়, পথ প্রদর্শকও।

জায়নবাদী সংগঠনসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

আগেই বলেছি জায়নবাদী ইহুদীরা দুনিয়ার এমন কোনও দেশ নেই যেখানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেনা। আস্তিক, নাস্তিক, পৌত্তলিক সকল মতবাদের মানুষকে টার্গেট করে তারা কাজ করছে এবং সর্বত্র সাংগঠনিক নিপুণতার পরিচয় দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিশ্বব্যাপী কর্মরত জায়নবাদী সংগঠনসমূহকে কাঠামোগত দিক থেকে ১০টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃঃ

১. আদর্শিক [Ideological]

২. রাজনৈতিক [Political]

www.bjilibrary.com

৩. প্রশাসনিক [Administrative]
৪. সামাজিক [Social]
৫. বুদ্ধিবৃত্তিক [Intellectual]
৬. বৈজ্ঞানিক [Scientific]
৭. সাংস্কৃতিক [Cultural]
৮. ধর্মীয় [Religious]
৯. কৌশলগত [Strategic]
১০. সরবরাহ সুযোগ সুবিধাগত [logistic]

আবার কার্যক্রমের দিক থেকে তারা এগুলোকে ইতিবাচক, নেতিবাচক, সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। তদুপরি কর্ম বিভক্তি অনুযায়ী এই সংস্থাগুলোকে সম্প্রচার ও পরিধারন এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যোগাযোগের দিকে থেকে ও আট প্রকারের জায়নবাদী প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এ গুলো হচ্ছেঃ

১. গোপন তবে সক্রিয় [Secret active]
২. গোপন তবে নিষ্ক্রিয় [Secret passive]
৩. অধিভুক্তি বহির্ভুত [Unattached]
৪. প্রত্যক্ষ [Direct]
৫. পরোক্ষ [indirect]
৬. স্বতঃস্ফূর্ত [Spontaneous]
৭. সংকট কালীন [Critical]
৮. স্ববিকশিত [Self growing]

আবার সম্পর্কের ভিত্তিতে এগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন প্রাণবন্ত এবং পরিত্যক্ত।

আগেই বলেছি সারা বিশ্বে জায়নবাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগণিত সংস্থা কাজ করছে। তবে এর সাফল্য ও ক্রম বিকাশে যেসব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং রাখছে সেগুলোর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এরা জন্মগতভাবে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপর। এর মধ্যে কিছু আছে প্রত্যক্ষ ইহুদী সংগঠন, কিছু পরোক্ষ সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এমনকি মুসলিম নামধারী সংস্থাও।

এক. প্রত্যক্ষ ইহুদী সংগঠন

১. আন্তর্জাতিক ইহুদী কংগ্রেস
২. আন্তর্জাতিক জায়নিস্ট লীগ
৩. বেরিহাহ মুভমেন্ট [Berihah movement]

www.bjilibrary.com

৪. বেনেই মোশা [Benei mosha]
৫. হা পু-এল হা মিযরাচি [Ha Poel Ha Mizrachi]
৬. হা সোমের হা যায়ের [Ha shomer Ha zair]
৭. হা নওয়ার হা জিওনী [Ha Noar Ha ziyyoni]
৮. আগুদাত ইসরাইল [Agudat Israel]
৯. বেতার [Betar]
১০. বিলু [Bilu]
১১. বান্ড [Bund]
১২. ডোরশেই জায়ন [Dorshei zion]
১৩. ইজরাত আহিম [Izrat Ahim]
১৪. হার্বোনেম [Habonem]
১৫. হাদাসাহ [Hadassah]
১৬. হাগানাহ [Haganah]
১৭. হাখশারাহ [Hakhsharah]
১৮. হ্যাসিদিজম [Hashidism]
১৯. হাসকালাহ [Haskalah]
২০. হেদের মেতুকান [Heder metukkan]
২১. হা হালুজ [He Halutz]
২২. হেরুত [Herut]
২৩. হোভেওয়াই জাইয়ন [Hovevii zion]
২৪. Helfjverein Der Deutchem Juden
২৫. Hestadrunt
২৬. Irgun zevai Leummi
২৭. Jewish Agency world zionists organisation
২৮. Jewish Colonial Trust
২৯. Jewish Legion
৩০. Jewish Natural Fund
৩১. Lohami Herul Israel
৩২. Kadumah
৩৩. Kneset Israel
৩৪. Malabi
৩৫. Mahal

www.bjilibrary.com

৩৬. Mapam
৩৭. Migrachi
৩৮. New zionist organization
৩৯. Pioneer women
৪০. Po Alei zion
৪১. Shalia plu Shelihum
৪২. V'aad Le Ummi
৪৩. Women zionist organistion [WIZO]
৪৪. Young Judea
৪৫. Youn Aliyah
৪৬. Zeirei zion
৪৭. Zyyoni zion

দুই. পরোক্ষ ইহুদী সংগঠন

১. International Communist Congress
২. United Nations Organization
৩. International Monetary Fund
৪. World Bank
৫. International Association & Poets, Play writes, Editors Essayists and Novelists.
১০। International Free Mason Movement etc.

আন্তর্জাতিক সংস্থা

১. UNDP
২. FAO
৩. UNCTAD
৪. WHO
৫. UNIDO
৬. UNICEF
৭. UNESCO

মুসলিম নামধারী সংগঠন

১. কাদিয়ানী সম্প্রদায়
২. বাহাই সম্প্রদায়
৩. দ্রুজ সম্প্রদায়

www.bjilibrary.com

৪. ইসমাইলী সম্প্রদায়
৫. নুসাইরী সম্প্রদায়
৬. মুতাজিলা সম্প্রদায়

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, বিভিন্ন মুসলিম দেশের ধর্মনিরেপক্ষতাবাদী সমাজতন্ত্রী কম্যুনিষ্ট, প্রগতিবাদী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও তথাকথিত জিহাদী ও ইজতিহাদী গ্রুপ ও গ্লোবাল সংস্থাগুলো প্রকৃতপক্ষে জায়নবাদীদেরই সৃষ্টি। সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা, কার্লমার্কস থেকে শুরু করে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার সরকার পরিচালনায় যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছিল জায়নবাদী ইহুদী। বিপ্লব পূর্ব যুগে রাশিয়ায় সোসালিষ্ট ডেমোক্রেটিক নামক যে দল আন্দোলনের অগ্রভাবে ছিল তার ৫০ শতাংশ সদস্যই ছিল ইহুদী। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলাম, ইসলামের সভ্যতা সংস্কৃতি, আচার আচরণ ধ্বংস ও মুসলিমদের সন্তানদের নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য তারাই অর্থ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। চীন, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, চিলি এমনকি আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও জায়নবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। জার্মানীকে ইহুদী মুক্ত করার জন্যই হিটলার গণহত্যার আশ্রয় নিয়ে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মানীর পূর্বাংশ ইহুদী নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্রের কবলে চলে যায়।

ভারতবর্ষে জায়নবাদী ইহুদীবাদীদের উদ্যোগে, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা অর্থায়নে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলও রয়েছে। এদের মধ্যে কোন কোন দল সরাসরি জায়নবাদী স্বার্থ দেখা শোনা না করলেও পরোক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করে। আবার কোন কোন দল রাখ ঢাকা না করেই ইহুদী স্বার্থ আদায়ের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এর মধ্যে তাদের নিজেদের স্বার্থের সম্পৃক্ততাও রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুরু থেকে একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে জায়নবাদী ইহুদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চক্রান্তের জাল বিস্তার করে এসেছে। তুর্কী খিলাফতের আমলে আরব অনারবদের মধ্যে এক দিকে বিদ্বেষ সৃষ্টি অন্য দিকে সুলতানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর আরব অফিসারদের লেলিয়ে দিয়ে বৃটিশ ও ইহুদীরা যৌথভাবে তুরস্কের মুসলিম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয়। তারা ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের মাধ্যমে তুরস্কের যুব শ্রেণীকে ইসলাম ও খিলাফাতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। মুস্তফা কামাল পাশা ইহুদীদেরই ক্রীড়নক হিসেবে মুসলিম জাহানের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রকেই শুধু ধ্বংস করেনি বরং তুরস্কক কয়েক শতাব্দি পিছিয়ে দিয়েছে। তাদের সৃষ্ট অন্তর্বিরোধ মুসলিমরা লুফে নেয় এবং তাদের অনৈক্য জায়নবাদের লক্ষ্য অর্জনকে

www.bjilibrary.com

ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে এই উপ-মহাদেশ ও তাদের চক্রান্তের থাবা থেকে নিস্তার পায়নি। এখানে কাজ করার জন্য তারা বিশেষভাবে ইস্পাহানি ও বাগদাদী ইহুদীদের কাজে লাগায়। মেধার দিক থেকে তারা ছিল শীর্ষে। তাদের ভাষা ছিল আরবী, ফারসী ও তুর্কী যা মুসলিম শাসনামলে উপ মহাদেশের দেশগুলোতে বহুল ব্যবহৃত ভাষা ছিল। তৎকালীন সময়ে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় দিল্লী ছিল সমগ্র প্রাচ্য জগতের কেন্দ্র বিন্দু। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইহুদী সংগঠন গুলো দলে দলে দিল্লীতে চলে আসতে থাকে এবং সমগ্র উপ-মহাদেশে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। মুঘল সাম্রাজ্য এক সময় অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী ও গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ধীরে ধীরে নিম্ন মানের কর্মকর্তারা তাদের স্থান দখল করে নেয় এবং আরাম আয়েশ ব্যভিচার অনাচার তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। তাদের দুর্বলতা ও মেধাহীনতার সুযোগে ইহুদীরা সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে তার দুটি স্তম্ভ শিয়া ও সুন্নীদের পারস্পরিক সংঘাতে জড়িয়ে দেয়। অনেক ফ্রি ম্যাসন ইহুদী নিজেদের বিশেষ করে কিরগিজী, আর্মিনী, গুর্জিস্থানী ও ইস্পাহানী শিয়া হিসেবে পরিচয় দিয়ে এবং শিয়া নাম গ্রহণ করে ইহুদী স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয় বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। বিগত চার শ বছরে উপ-মহাদেশে শিয়া সুন্নীদের মধ্যে যতগুলো সংঘাত হয়েছে সেগুলোকে এ প্রেক্ষাপটে নতুন করে অনুসন্ধান পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

আকবরের দীনে ইলাহী জাহাঙ্গীরের আমলে শিয়াদের ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধি, আলমগীরের আমলে শিয়া সুন্নী দ্বন্দ্ব, পরবর্তী মোঘল শাসকদের আমলে উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ এর সবই এই চক্রান্তের একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ। আকবরের আমলে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, জাহাঙ্গীরের আমলে মুজাদ্দিদ আলফেসানী, শাহজাহানের আমলে শাহ কালিম উল্লাহ দেহলভী এবং আমলগীর ও পরবর্তী মোঘল শাসকদের আমলে তিন সুফী ও মুহাদ্দিস যথাক্রমে হযরত মীর্জা মজহার জানেজানান, শাহ ফখরুদ্দিন ও শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলোভী এবং আঠারো শতকের শেষের দিকে ও উনবিশ শতকের শুরুতে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভীর প্রচেষ্টাবলী এই সয়লাবের গতিরোধ করারই প্রচেষ্টা ছিল। ইহুদীরা শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে প্রভাবিত করে এবং লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা সুন্নীদের মধ্যে এমনকি সুফিয়ায়েকিরামদের কোন কোন শ্রেণীকে ক্রীড়নকে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। এদের মধ্যে পীর মাশায়েখ উলামায়ে দ্বীন এবং সাধারণ মুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত শাহ কালিমুল্লাহর পত্রাবলী এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহর অসিয়ত নামা এই তথাকথিত সুফীদের চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষ করে এর নেতা সারমদের অবদান এখন ঐতিহাসিকদের

www.bjilibrary.com

কাছে অত্যন্ত পরিস্কার। তার সেকেন্ড ইন কম্যান্ড ছিলেন নামুদ ওয়া নামুদ। শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের এক রেফারেন্স থেকে জানা যায় যে তিনি ইহুদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

ফ্রি ম্যাসনের নয় দফা

জায়নবাদের ক্রম বিকাশের ধারনা এই উপ-মহাদেশে ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে দুর্বল ও খন্ড বিখন্ড করার লক্ষ্যে ভারত বিভাগের আগে ও পরে একটি নয় দফা কর্ম পরিকল্পনাকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়।

এই নয় দফার মধ্যে রয়েছে [১] শাসক সম্প্রদায় তথা প্রভাবশালী মহলে অনুপ্রবেশ করে তাদের প্রভাবিত করা এবং তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা। [২] ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের প্রভাবিত করা। [৩] মুসলিম শাসক বৃন্দ, উলামা মাশায়েখ ও আম জনতাকে পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া [৪] মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা [৫] তাদের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করা অথবা দুনিয়ায় বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা [৬] উলামা মাশায়েখদের খতম করে দেয়া [৭] সচেতন ও বাধাদান করার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের খতম করে দেয়া [৮] আলিমদেরকে নিজেদের মধ্যে এবং উলামা মাশায়েখদের পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাত মুখর করে তোলাএবং [৯] উলামায়ে কেরামকে গোপন পদ্ধতিতে এমন ভাবে সংঘাতে লিপ্ত করা যাতে তারা কারুর ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে সাধারণ মানুষ তা অনুভব করতে না পারে এবং অন্যদিকে এই সংঘাতকে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমগ্র মুসলিম সমাজে আগুন ধরিয়ে দেয়া। দেশ বিভাগের আগে ও পরে তারা এই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কাজ করেছে এখনো করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হবার পর এর সাথে নতুন মাত্রাও যোগ হয়েছে।

এই নতুন মাত্রার মধ্যে রয়েছে এই অঞ্চলে মুসলিম জাতি সত্তাকে ধ্বংস করার জন্য বাইরে থেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী গোষ্ঠির সাথে আঁতাত করে অর্ধ শিক্ষিত এবং বিভ্রান্ত কিছু আলিমের উপর ভর করে জিহাদের অপব্যাখ্যা এবং কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী জংগীবাদী ধ্যান ধারনা বিকাশের ব্যাপারে তাদের অপচেষ্টা। এ অগ্রগামী ভূমিকা পালনের জন্য অমুসলিমদের মুসলিম বেশে তারা সামনে নিয়ে এসেছে। ভারতের সংঘ পরিবার ইহুদীদের গৃহে লালিত একটি আন্দোলন। বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসের সাথে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রকাশ্য এবং জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদীদের সংগঠনের আদলে তাদের সংগঠিত করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বলা বাহুল্য ইঙ্গ- জায়নিষ্ট ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এই উপ-মহাদেশের মুসলিমদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের উপর যে কয়টি মারাত্মক আঘাত হানা হয় তার মধ্যে তাদের ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার উপর আঘাতটিই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। ১৭৭৬ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলিমরা জমি থেকে বেদখল হয়ে যায় এবং জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে স্থানান্তরিত হয়। এই আইন উত্তর ভারতে রায়তওয়ারী পদ্ধতি এবং পশ্চিম ভারতে মাহালওয়ারী পদ্ধতি নামে প্রবর্তন করা হয়। এভাবে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে ১৮৫০ সালের মধ্যে সমগ্র উপ-মহাদেশের জমি থেকে মুসলিমদের বেদখল করে দেয়া হয়। পরবর্তী বছর সমূহে শিক্ষা সংস্কৃতি, কৃষি শিল্প বাণিজ্য সরকারী ব্যবস্থাপনা সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল খাত থেকে তারা উৎখাত হয়ে যায়। বাংলার গর্ব মসলীনের দুনিয়াব্যাপী বাজার থেকে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য মুসলিম তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দেয়া হয়।

১৯৪৭ সালে মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এই ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। এই দেশটি যাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্থিতিশীল থাকতে না পারে জায়নবাদী ও হিন্দু আধিপত্যবাদী শক্তি তা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে এবং তাদের এজেন্টদের ব্যবহার করে এই দেশটির পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে পূর্বাঞ্চলকে অনেকটা উপনিবেশের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন অবধারিত হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে ভারতীয় হিন্দুরা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীনতার পরও এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন মানুষের ধর্ম ও আকিদা বিশ্বাস মুছে ফেলার প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে। বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাবনাকে ধ্বংস করার জায়নবাদী পরিকল্পনা এখনো কার্যকর আছে। একই ভাবে পাকিস্তানও যাতে সোজা হয়ে দাড়াতে না পারে তার জন্য হিন্দু-ইহুদীবাদী চক্র সক্রিয় রয়েছে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পারমাণবিক শক্তি অর্জনকে মুসলিম দেশগুলোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ইরাক ও আফগানিস্তানের উপর হামলা এবং দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে এই দেশগুলোকে সম্পৃক্ত করণ, ফিলিস্তিনে গণহত্যা ইসরাইলের মানবতা বিরোধী কর্মতৎপরতা, কাশ্মীরের গণহত্যা পারমাণবিক কর্মসূচী বন্ধ করার জন্য ইরানের উপর চাপ প্রয়োগ জায়ন বাদী কর্মসূচীর একটি অংশ। ভারত ইসরাইল সামরিক চুক্তি ও অস্ত্র তৈরীর জন্য যৌথ প্রকল্প গ্রহণ বারাক মিসাইল ক্ষেপনাস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি এই আন্দোলনের অন্যতম মোড় যা ইসলাম বিরোধী এই দুটি জাতিকে [ইহুদী, মুশরিক] একক প্লাটফরমে এনে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটনে অনুপ্রাণিত করছে। ফিলিস্তি ন ভূমিতে অভিশপ্ত ইহুদীরা এখন রাষ্ট্রহীন নাগরিকের ন্যায় বিশ্বব্যাপী লাঞ্ছিত নয়, বরং

www.bjilibrary.com

তারা সর্বত্র মুসলিমদের লাঞ্ছিত করছে। খৃস্টান, মুশরিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা এখন সারা দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করতে চায়।

উপসংহার

মুসলিম জাতি এখন সর্বত্র মাযলুমের ভূমিকায় রয়েছে। অনৈক্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে হলে এবং সার্থকভাবে জায়নবাদকে মুকাবিলা করতে হলে তাদের কিছু করণীয় রয়েছে।

এক. এর প্রথম কাজটি হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। কোরআন সুন্নাহর অনুসরণে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। মুসলিমদের ভেবে দেখতে হবে যে আল্লাহর দরবারে তাদের অপরাধ কি অভিশপ্ত ইহুদীদের তুলনায় এতই বেশি হয়ে গেছে যে ইহুদীর হাতে তাদের মার খেতে হচ্ছে? কোনটা আল্লাহর পরীক্ষা এবং কোনটা তার গযব তা তাদের উপলব্ধি করতে হবে।

দুই. জীবনাচরণকে কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকী করণ করতে হবে।

তিন. ইহুদী ও জায়নবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে উম্মাহকে সার্বক্ষণিক ভাবে সতর্ক করার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজস্ব গণ মাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, টিভি চ্যানেল, পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তেমনি সেগুলো পরিচালনার জন্য যোগ্যতা ও ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন জনবল তৈরী করতে হবে।

চার. জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মুসলিমদের হারানো সম্পদ। এই সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পাঁচ. মুসলিম জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে সক্রিয় ও পুনগঠিত ওআইসি এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ছয়. ডলার ষ্টার্লিং ও ইউরোর ন্যায় মুসলিম দেশ সমূহ নিজস্ব মুদ্রার প্রচলন করতে পারে। আই এম এফ এর বিকল্প হিসেবে ইসলামিক মনোটারী ফান্ড গঠন করা যেতে পারে।

ইহুদী খৃস্টান নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পর্যায় ক্রমে যদি মুসলিম বিশ্ব নিজস্ব সংগঠন ও উৎস সমূহের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে তাহলে আশা করা যায় যে তারা আস্তে আস্তে জায়নবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে। ■

www.bjilibrary.com

তথ্যপুঞ্জি

১। The Jewish chronicle, London 1913.
২। Protocal of the Learned Elders of zion.
৩। Lt Iyael Daiyan, A soldiers Diary, Telaviv, 1968 R.W. Setor Watson..
৪। R.W. Seton Watson Rise of Nationality in the Balkan.
৫। Barnard Lewish, The Emegence of Modern Turkey.
৬। Misbahul Ilam fung, Jenrish Cuspiracy is the Muslim world.
৭। Henry Klien, Zion Rnle the world, Now year.
৮। Alexander Bihleman, the Jewirsh people face the postwar world.
৯। আসবার আলম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী চক্রান্ত।
১০। আব্দুল খালেক, ইহুদী চক্রান্ত।
১১। এ বি এম খালেক মাহমুদার অভিশপ্ত ইহুদী জাতির বেঈমানীর ইতিহাস।
১২। A.D Gordon, Our Tasks Ahead.
১৩। Shbtar Tevcth, Ben-Lowisca and the palestimen Arales: From peace to mor.
১৪। University of Califarnia, Land, Labow and origin of the Isracli paletinia Conflict.

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল আমিন– বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৯শে মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ
কারণ ও প্রতিকার

শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া

■

১. ভূমিকা

অধুনা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর দেশে দেশে একটি সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এটি হলো কিশোর অপরাধ। কিশোরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চুরি, হত্যা, আত্মহত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, পকেটমার, মাদকসেবন, ইভটিজিং [Eve-teasing] ইত্যাদি সহ এমন সব ভয়াবহ কাজ করছে, এমন সব অঘটন ঘটিয়ে চলছে এবং এমন সব লোমহর্ষক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে যা কীনা অকল্পনীয়। বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সভ্যতার এ চরম উৎকর্ষের যুগে আমাদের আগামী দিনের আশা-ভরসার স্থল কিশোর সমাজের এ ব্যাপক বিপর্যয় সত্যিই বড় দু:খ ও দুর্ভাগ্যজনক। এ সর্বনাশা ছোবল থেকে আমাদের কিশোর-কিশোরীদেরকে রক্ষা করতে হবে।

১.১. প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ক্রমবধমান কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য প্রতিকার খুঁজে বের করা এবং জাতির সামনে এ লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা। যাতে করে আমাদের কিশোর-কিশোরীদের জনসম্পদে পরিণত হওয়ার পথে অপার সম্ভাবনার পথটি রুদ্ধ হয়ে না যায়।

১.২. প্রবন্ধের বিন্যাস

প্রবন্ধের শুরুতে দেশের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত কিশোর অপরাধের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরপর যথাক্রমে কিশোরের বয়স, অপরাধ কী, কিশোর অপরাধ কী, কৈশোরে

www.bjilibrary.com

কিশোর কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, পরিবর্তনে সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। অত:পর কিশোর অপরাধের বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এর পরে কিশোর অপরাধের কারণসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। পরিশেষে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে একটি 'সুপারিশমালা' পেশ করা হয়েছে।

২. কিশোর অপরাধচিত্র

১৯৯৪ সালে ইলিশিয়াম ভবনে স্কুল বন্ধুদের দ্বারা ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ঈশা [১৫] হত্যাকান্ড ঘটে। গ্রেফতার হয় ঈশার বন্ধু প্রিন্সসহ ৫ কিশোর। খুন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত কিশোরটি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নীল ছবি দেখছিল। এ ঘটনায় দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। অথচ এ ঈশাই মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তার মাকে বারবার আর্তনাদ করে বলছিল 'মা তুমি চাকুরী ছেড়ে দাও, আমি একা বাসায় থাকতে পারছি না'।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক ও নিকট অতীতের আরও কিছু অবাক করা ঘটনা :

ক. ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের তাসনুভা নামে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় সে আত্মহত্যা করে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের ধারণা। তার বাড়ি কুষ্টিয়া সদরে। তাসনুভার বাবা মোঃ একরাম একজন এনজিও কর্মকর্তা। গতকাল তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

[দৈনিক আমাদের সময়, ৩০.১১.২০০৮]

১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ সন পর্যন্ত এই ৫ বছরে পুলিশের ডায়েরী মতে, শুধু ঝিনাইদহ জিলায় ৬১টি জন শিশু, ১৯১ জন কিশোর ও ৪৩৬ জন কিশোরী আত্মহত্যা করে। [দৈনিক ইত্তেফাক, ২২.৩.১৯৯৫]

খ. কোতোয়ালী থানা পুলিশ গত ১৫ই জুলাই পাট গুদাম হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র নাজমুল হাসান বাবু [১২] হত্যা রহস্য উদঘাটন এবং হত্যার সহিত জড়িত একই মাদ্রাসার ছাত্র হামিদুল ইসালম [১৪] ও আবদুর রহমান মুন্না নামের অপর এক কিশোরকে গ্রেফতার করিয়াছে। পুলিশ নিহত বাবুর অপহৃত সাইকেল ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দা উদ্ধার করিয়াছে। উল্লেখ্য, গত ১২ই জুলাই রাত্রে শহরের কেওয়াটখালী নিবাসী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার এমরান হোসনের পুত্র নাজমুল হাসান বাবুকে জবাই করিয়া হত্যা করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে ধৃত কিশোরদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, নিহত বাবু গত ৫ই জুলাই পাট গুদাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা হইতে হেফজ সম্পূর্ণ করায় তাহার পিতা তাহাকে একটি সাইকেল কিনিয়া দেয়। বাবু সাইকেল লইয়া রাস্তায় বাহির হইলে তাহার সহপাঠী কোতয়ালী থানার চর নিখলিয়ার হামিদুল ইসলাম

www.bjilibrary.com

চালানোর জন্য বাবুর নিকট সাইকেলটি চায়। বাবু সাইকেল না দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাবু হামিদুলকে চপেটাঘাত করে। হামিদুল তাহার বন্ধু কোতওয়ালী থানার মড়াখোলার আবদুল জলিলের পুত্র আবদুর রহমান ওরফে মুন্নাকে ঘটনা অবহিত করে এবং বাবুকে মারিয়া ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ১২ই জুলাই রাত্রি সাড়ে আটটায় তাহারা এক বাড়ীতে কোরান খতমের দাওয়াতের কথা বলিয়া একই সাইকেলে তিনজন রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে পাওয়ার হাউজের দেওয়ালের পার্শ্বে হামিদুল অতর্কিতে বাবুকে ঝাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুইজন মিলিয়া দা দিয়া তাহাকে জবাই করিয়া ফেলিয়া রাখে। ঘটনার পর হামিদুল ও মুন্না সাইকেলযোগে চলিয়া যায়। [দৈনিক ইত্তফাক, তাং ২৮.০৭.১৯৯৬ খ্রি]

গ. পকেটমার আরিফ হোসেন [১৬]। বয়সে কিশোর হলেও কাজে সে ভয়ঙ্কর। চার বছরে শতাধিক মোবাইল ফোন সেট চুরির অভিজ্ঞতা আছে তার।

সুযোগ পেলে অস্ত্রের মুখে পণবন্দী করেও পথচারীদের ফোন ও টাকা লুটে নেয়। এসব অপরাধে এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে চারবার। তবে কিশোর হওয়ার সুবাদেই বারবার ছাড়া পেয়ে যায়। আরিফ ও তার সহযোগী কিশোর অপরাধী রাজ্জাক মূলত বাস বা জনবহুল স্থানে পকেট মারে। প্রতিপক্ষ তাদের থেকে দুর্বল হলে তখন পকেটমার থেকে তারা ছিনতাইকারীতে পরিণত হয়। তাদের টার্গেট মূলত জনসাধারণের পকেটে থাকা মোবাইল সেট ও মানিব্যাগ। পকেটমার হিসেবে দুজনই খুব দক্ষ। পকেট কেটে এ পর্যন্ত এক থেকে দেড়শটি মোবাইল ছিনতাই করেছে। ছিনতাইকৃত মোবাইল বিক্রি করে গুলিস্তান স্টেডিয়াম মার্কেটের মফিজ ভাই, নজু ভাইসহ অনেকের কাছে। তবে বয়সে ছোট হওয়ার কারণে ন্যায্যমূল্য পায় না তারা। সে জানায়, নোকিয়া এন সিরিজের একটি মোবাইল আনতে পারলে তাদের মাত্র ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা দেয়া হয়। বেশি টাকা চাইলে বড় ভাইয়েরা পুলিশে দেয়ার ভয় দেখায়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে আরিফ চারবার পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে। তবে বয়স কম থাকায় প্রতিবারই সে বেরিয়ে এসেছে। সে জানায়, আগে ছাড়া পেলেও এবার মনে হয় পাব না।

আরিফের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে। অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছয় বছর আগে এক প্রতিবেশীর সাথে ঢাকায় আসে। এখানে এসে পুরান ঢাকার একটি ওয়ার্কশপে ওয়েলডিংয়ের কাজ শেখে। সেখানে জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় তার। এই জাহাঙ্গীর যে ছিনতাই ও পকেটমারা শেখানোর ওস্তাদ তা সে জানত না। এক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে জাহাঙ্গীর তাকে পকেটমার শেখায়। এরপর থেকে চলতে থাকে ছিনতাই ও পকেটমারা। আরিফ ও রাজ্জাক মূলত এক সাথে পকেট কাটার কাজ করে

www.bjilibrary.com

থাকে। এই কাজের জন্য তাদের কিছু সাঙ্কেতিক শব্দ রয়েছে। বুকপকেটকে বলে বুককান, পাঞ্জাবী বা প্যান্টের ঝুল পকেটকে নিচকান ও প্যান্টের পেছনের পকেটকে বলে থাকে পিচকান। বাস বা জনবহুল স্থানে পকেট কাটার জন্য তারা এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে। এরপর ওই ব্যক্তির পিছু নেয়। সাধারণত রাজ্জাক ওই ব্যক্তির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর চুলকাতে থাকে। রাজ্জাকের হাত নাড়াচাড়ার এক ফাঁকে আরিফ ওই ব্যক্তির পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিয়ে যায় তার মূল্যবান জিনিসপত্র। হাত দিয়ে সহজভাবে কাজ সম্পন্ন না হলে সে ক্ষেত্রে ব্লেড ব্যবহার করা হয়। আর পকেট কাটার জন্য সব সময় জিলেট কোম্পানীর উন্নতমানের দামি ব্লেড ব্যবহার করে থাকে বলে সে জানায়। [দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৫.৪.২০০৮]

ঘ. দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রী শিশুকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজিলার বিদ্যানগর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। এলাকাবাসী জানায়, প্রতিবেশী লুৎফর রহমানের পুত্র হুমায়ুন [১৮] ও হযরত আলীর পুত্র শাকিল [১৫] দু'জন মিলে ৮ বছর বয়সী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী শিশুটিকে ধরে জোরপূর্বক একটি টমেটো ক্ষেতে নিয়ে যায়। সেখানে হুমায়ুন ও শাকিল পালাক্রমে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। এ সময় শিশুটির কান্না ও আর্তচিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং উপজিলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে শিশুটির শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে তাকে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার পর পর দুষ্কৃতিকারী হুমায়ুন ও শাকিল পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। [দৈনিক অপরাধকণ্ঠ, ০৫.০১.২০০৯]

বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের মাত্রা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৩. কিশোরের বয়স

অপরাধের সঙ্গে বয়সের সম্পর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বয়সের তারতম্য অনুযায়ী সাধারণ অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

শৈশবের শেষ ও যৌবনের সূচনার মধ্যবর্তী কালকে কৈশোর তথা বয়ঃসন্ধি কাল বলা হয়। আভিধানিক অর্থে এটি ১১ বছর বয়সে আরম্ভ হয়ে ১৫ বছর বয়সে শেষ হয়। অবশ্য ইংরেজী শব্দ 'Teens' এর অর্থ হচ্ছে ১৩ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বয়সসীমা।

তবে সুনির্দিষ্টভাবে কত বছর বয়সসীমা পর্যন্ত অপরাধ কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে তা নির্ভর করে সে দেশের অপরাধ আইনের ওপর। কোন কোন সমাজে এটি আঠার বছর এবং কোন কোন সমাজে আরও বেশি। তবে কোন সমাজেই একুশ বছরের বেশি বয়স হলে কিশোরের পর্যায়ে স্থান দেয়া হয় না।

www.bjilibrary.com

'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯' এর প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদ-১ এর মর্ম অনুসারে, ভ্রূণ সৃষ্টির সময় থেকে ১৮ বছরের নিচে প্রতিটি মানব সন্তানই শিশু। যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বৎসরের আগে শিশুকে সাবালক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে শিশু-কিশোর অধিকার এবং এ সংক্রান্ত আইনগুলো একটি একক সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নেই। এগুলো বিভিন্ন আইন ও সংবিধিতে লিপিবদ্ধ আছে। যেমনঃ

বাংলাদেশ দন্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা-৮৩ অনুযায়ী, ৯-১২ বছর বয়স্ক কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে তখনই অপরাধ বলা যাবে, যখন এটা প্রমাণিত হবে যে, সে পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো আচরণ করেছে অর্থাৎ সে স্বীয় আচরণের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করতে সমর্থ। এ আইনের ২৬১ ধারা অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি কর্তৃক অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোন মেয়ে এবং ১৪ বছরের নিচে কোনো ছেলেকে ছিনিয়ে নিলে তা শিশু অপরাধ বলে গণ্য হবে।

চুক্তি আইন, ১৮৭২ : ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি চুক্তি করতে পারবে না এই আইনে, ১৮ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়েছে।

সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ : ধারা-৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন অধিবাসীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া অবধি তাকে নাবালক বলে ধরা হয়েছে। তবে আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে থাকলে বয়স হবে ২১ বছর। দেবত্তের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ : এ আইন অনুসারে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিচে যে কেউ শিশু হিসেবে গণ্য।

মোটর যান আইন, ১৯৩৯ : এ আইনে ১৮ বছর বয়সের নিচে কোনো ব্যক্তিকে গাড়ি এবং ২০ বছরের নিচে কোন ব্যক্তিকে ভারী যান চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ : এ আইনের ধারা ২ [৩] অনুযায়ী শিশু বলতে ১৪ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে বুঝাবে।

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ : এ আইনের ধারা ১২ [১] [ক] অনুযায়ী, সাবালকত্বের বয়স ১৬ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৬৯ : বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ১৩ বছরের নিচের কোনো মেয়ে এবং ১৬ বছরের নিচে কোনো ছেলের জন্য এ আইন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

শিশু আইন, ১৯৭৪ : শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ আইনের ২ [চ] ধারায় বলা হয়, শিশু বলতে ১৬ [ষোল] বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে এবং কিশোর সংশোধনাগারে বা নিরাপদ হেফাজতে আটক থাকাকালীন সময়ে উক্ত ব্যক্তি ১৬ [ষোল] বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সে ব্যক্তি আটক থাকাকালীন সময় পর্যন্ত শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

www.bjilibrary.com

দি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী অর্ডিন্যানস, ১৯৭৬ : এ আইনে সরাসরি বয়সের কোন উল্লেখ না থাকলেও শিশু একাডেমীর যাবতীয় কর্মকান্ড সর্বোচ্চ ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ : এ আইনের ২ [ট] ধারা অনুযায়ী শিশু অর্থ অনধিক ১৪ বছর বয়সের কোন ব্যক্তি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ : এ আইনের ধারা ২ [৮] অনুযায়ী কিশোর অর্থ ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন কিন্তু ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেন নি এমন কোন ব্যক্তি।

উপরিউক্ত আইনসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন আইনে শিশু-কিশোরের বয়সকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। মোট কথা, বয়সের সীমানায় এদেশে কিশোরদের সংজ্ঞায়ন অস্পষ্ট ও পার্থক্যপূর্ণ।

৪. অপরাধ কী

সংক্ষেপে অপরাধ বলতে বোঝায়, এমন কোন সমাজবিরোধী বেআইনী কাজ যা ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ ধরনের কাজ যাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

অস্ট্রিয়ান মনোবিশ্লেষক Sigmund Freud [১৮৫৬-১৯৩৯] বলেন, মানুষের অপরাধ প্রবণতায় লিপ্ত হওয়ার পশ্চাতে ব্যক্তিত্বের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বকে জীবন প্রবৃত্তি ও মরণপ্রবৃত্তির চালিকাশক্তি রূপে গণ্য করেন। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের ব্যক্তিত্ব তিনটি সত্তা নিয়ে গঠিত। যথাঃ ইড [Id], ইগো [Ego] এবং সুপার ইগো [Super ego]।

যে ব্যক্তির মধ্যে সুপার ইগোর ভূমিকা প্রবল সে ব্যক্তি সহজে অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে ইগো ও সুপার ইগো, ইডের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম সে ব্যক্তি ইড কর্তৃক তাড়িত হয়ে খুব সহজেই অপরাধকর্মে লিপ্ত হবে।

৫. কিশোর অপরাধ কী

মানব জীবনে কৈশোর কালটি নানা প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার মাঝ দিয়ে পার হয়। স্কুল পেরুনো বয়সটাই হলো উড়ু উড়ু চঞ্চল। বাধা না মানার বয়স। এ বয়সে বন্ধু খুঁজতে থাকে সে। পেয়েও যায়। বন্ধুকে ঘিরে যা সত্য না তাও ভাবতে থাকে। কখনও সে মধুর স্বপ্নে আনন্দে বিভোর থাকে। আবার কখনও বিভিন্ন জটিল সমস্যার কারণে বিষণ্নতায় ভোগে। এ ক্রান্তিলগ্নে তার মাঝে এসে ভর করে অস্থিরতা, রোমান্টিসিজম, এডভানচারিজম ও হিরোইজম। এ সব চিন্তার মাঝে যেমন আছে ভাল লাগা তেমনই আছে নিরব পতনের পদধ্বনি।

সংক্ষেপে যে সমস্ত কাজ প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় সে ধরনের প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী কাজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত

৭—

www.bjilibrary.com

হলে সেটিকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অন্য কথায়, অসদাচরণ অথবা অপরাধের কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বিচারালয়ে আনীত কিশোরকে কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও অনেকক্ষেত্রে বলা হয় যে, আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কিশোররাই হচ্ছে কিশোর অপরাধী। কিন্তু আদালতের অপরাধ নিরুপণ পদ্ধতি ও রায় দেশ ও সমাজ ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, কোন কিশোর অপরাধী কি- না তা নির্ভর করে তার মাতাপিতা, প্রতিবেশী, সমাজ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সর্বোপরি আদালতের বিচারকের মনোভাবের ওপর।

অপরাধ ও অপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত ১৯৫০ সালের আগস্টে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত যে সব আচরণ অসংগতিপূর্ণ বা আইনভঙ্গমূলক অর্থাৎ যা সামাজিকভাবে বাঞ্ছিত বা স্বীকৃত নয় তা সবই কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে 'আমেরিকান চিল্ড্রেন ব্যুরো' কিশোর অপরাধের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত রাষ্ট্রিক আইন বা পৌর বিধি বিরোধী সব কাজই কিশোর অপরাধের আওতাভুক্ত। উপরন্তু, সমাজ সদস্যদের অধিকারে আঘাত করে এবং কিশোরদের নিজের ও সমাজের কল্যাণের পথে হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত এমন যে কোন মারাত্মক সমাজবিরোধী কাজও কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan এবং Ferdinand- এর মতে,সমাজ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ। পি ডাব্লু টাপ্পান কিশোর অপরাধীর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ

ক. যার বৃত্তি, আচরণ, পরিবেশ অথবা সংগীতদল তার নিজস্ব কল্যাণের পথে ক্ষতিকর;

খ. যে অবাধ্য, কিংবা যে তার মাতাপিতা বা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়;

গ. ইচ্ছাকৃতভাবে যে স্কুল পালায় কিংবা সেখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং

ঘ. যে রাষ্ট্রিক আইন বা পৌর বিধি বহির্ভূত কাজ করে।

৬. কৈশোরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ

একটি শিশু জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে সাধারণত দুরকম পরিবর্তন দেখা দেয় -শারীরিক ও মানসিক।

৭. কৈশোরের বিশেষ চাহিদা

ক. স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা [Need for freedom and activity]

এ বয়সে কিশোর-কিশোরীরা সর্ব ব্যাপারে স্বাধীন হতে চায়। তার আত্মসম্মানবোধ মনে

www.bjilibrary.com

প্রচন্ড আত্ম -বিশ্বাস সৃষ্টি করে। দায়িত্ব বহন করার, নিজের মত প্রকাশ করার, দশের মধ্যে একজন হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে দেখা দেয়। তখন সে সদা কর্মমুখর থাকে। তার এ স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

খ. সামাজিক বিকাশের চাহিদা

বয়:সন্ধিকালে সমাজ চেতনার বিকাশ খুব গভীর হয়। আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ তাকে সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। গৃহের বন্ধন অপেক্ষা বাইরের আহ্বান তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। সে তখন বৃহত্তর সমাজ জীবনে ভাবের দোসর খোঁজে, সঙ্গীসাথীদের সাথে মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করে, অপরিচিতের মধ্যে আত্মীয়তা অনুসন্ধান করে।

গ. আত্মপ্রকাশের চাহিদা

এ বয়সে আরেকটি চাহিদা হলো নিজেকে প্রকাশ করা। আবেগপ্রবণ হওয়ায় বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তারা নিজেদের মূল্যবোধকে সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাদের এ কর্মের মূল্য দেবে এটাই তারা বিশেষভাবে চায়। এ চাহিদার তৃপ্তি ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। এ চাহিদা পূরণ না হলে তারা দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও নিষ্ক্রিয় হয়। পড়াশুনা, খেলাধূলা, গান-বাজনা, অভিনয়, অংকন, কবিতা লেখা, পত্র মিতালী, ডায়েরী লেখা এবং অন্যান্য কাজের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশ করে।

ঘ. আত্ম নির্ভরতার চাহিদা

আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তারা ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। পরনির্ভর না হয়ে স্বাধীন জীবন যাপনের প্রবল ইচ্ছা বয়ঃসন্ধিকালে দেখা দেয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ভবিষ্যতে কোন ধরনের পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করবে সে চিন্তা সে করে। উপযুক্ত পেশা নির্বাচনে মাতাপিতা ও শিক্ষকের সহায়তা এ বয়সে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ঙ. নতুন জ্ঞানের চাহিদা

এ বয়সে মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। ফলে কৌতূহলপ্রিয়তা, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। নতুন কিছু জানতে চায়, শিখতে চায়, অসীম কৌতূহলে বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডার আহরণ করার তাকিদ অনুভব করে। এ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে যদি মাতা-পিতা, শিক্ষক, অভিভাবকবৃন্দ সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন তবে এ ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ জীবনে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সাফল্য লাভ করতে পারে।

www.bjilibrary.com

চ. নীতিবোধের চাহিদা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বোধ সে মন থেকে উপলব্ধি করে। নিজের এবং অপরের কাজকে নীতিবোধের মানদণ্ডে বিচার করে। সমাজের রীতি-নীতি, আদর্শবোধ তার বিবেককে নাড়া দেয়। নিজে নীতি বিরোধী কোন কাজ করলে তার মনে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়।

ছ. নিত্য নতুন চমকপ্রদ ও অভিনব বিষয়ে আগ্রহ

প্রাত্যহিক জীবনের কার্যক্রম এ বয়সের ছেলেমেয়েদের একঘেঁয়ে এবং বিরক্তিকর মনে হয়। তারা চায় নতুন নতুন চমকপ্রদ ও অভিনব বিষয়ের মাধ্যমে আনন্দ পেতে। তারা চায় দল বেঁধে পিকনিক করতে অথবা সিনেমা দেখতে। শিক্ষককে ফাঁকি দিয়ে পাঠশালা পলায়ন, রাতের অন্ধকারে পাড়া-প্রতিবেশীর বাগানের ফল চুরি করা, সিগারেট বা মাদকদ্রব্য চেখে দেখা, ইত্যাদি কাজে তাদের অসীম আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখা যায়। মাদকাসক্তদের কেইস হিস্ট্রি থেকে জানা যায় প্রথম মাদকদ্রব্য সেবনের অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে সহযোগী বন্ধুদের পরামর্শে এ্যাডভেঞ্চার করতে যেয়েই এবং পরবর্তীতে ড্রাগস এর মরণ ফাঁদে তারা জড়িয়ে পড়েছে।

জ. নিরাপত্তার চাহিদা

বেশীর ভাগ কিশোর-কিশোরীর মনে নিজেদের কর্মক্ষমতা, পরিবারে, দলে অথবা স্কুলে তার অবস্থান এবং নৈতিক মূল্যবোধ এর সমন্বয়ে নানারকম মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্বের টানাপোড়নে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অসহায় বোধ করে। এ বয়সের চাহিদাগুলোর পাশাপাশি শাস্তি পাওয়ার ভয়ও তাদের মনে কাজ করে। ফলে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

ঞ. আত্ম-পরিচিতির চাহিদা [Need for self identity]

এ বয়সের ছেলেমেয়েদের নিজ সম্পর্কে ধারণা পাকাপোক্ত হয়। তারা Gender appropriate behaviour- এর মাধ্যমে নিজের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরিকসন এ স্তরে Identity vs.role diffusion এ দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সমাজে তাদের স্থান ও ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করে এবং যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও স্বাধীনভাব অর্জিত হয়, তারা নিজেদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধনাত্মক পরিচিতি লাভ করে। অন্যদিকে, নিজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থাকলে অনেক সময় আত্মসংযম হারিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিশোর-কিশোরীরা এ বয়সে মাতা-পিতার ও সমাজের মূল্যবোধকে তীক্ষ্ণভাবে যাচাই করে আত্ম- পরিচিতি গড়ে তোলে।

www.bjilibrary.com

৮.কৈশোরে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া

বয়:সন্ধিক্ষণে মানব জীবনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

কৈশোরে পা দেয়ার পর থেকে কিশোর-কিশোরীরা ভাবতে শুরু করে যে, তারা আর ছোটটি নেই, আবার ঠিক বড়ও হতে পারেনি। কারণ, পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তাদের ছোট হিসেবে দেখে। এ বয়সে মা-বাবার কাছ থেকে সন্তান যেন সরে যেতে থাকে। ছেলের সাথে মায়ের, বাবার সাথে মেয়ের মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। ছেলে-মেয়ের আলাদা শোবার ঘর করে দেন বাবা-মা। হঠাৎ করেই ছেলে অথবা মেয়ে একা হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে একজন কিশোর মনে করে, সে ছোট ও বড়র মাঝামাঝি এক অচেনা জগতের বাসিন্দা। তার তখন কোন কিছুই ভাল লাগে না, কোন কিছুতেই যেন মন ভরে না।

অন্যদিকে একজন কিশোরী আয়নায় এক অন্য 'আমি' কে আবিষ্কার করে। নিজেকে দেখতে বা নিজের শরীরের পরিবর্তনকে দেখতে গিয়ে অনুচিত হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে। সামান্য কারণে যখন তখন মার বকুনি শুনতে হয়। যে মেয়েটি মা ছাড়া একদিন কিছু বুঝত না সে তখন ধীরে ধীরে মায়ের চেনা জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে।

বিষয়টি খুব চমৎকারভাবে ফোটে উঠেছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে। তিনি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'ছুটি' তে লিখেছেন :

"........ বিশেষত, তের চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানান রূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে।

তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না।

শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে

www.bjilibrary.com

করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়। ['গল্পগুচ্ছ']

৯. কিশোর অপরাধীদের বিভাগ

কিশোর অপরাধীদেরকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখানে কয়েকটি মূল বিভাগের উল্লেখ করা হলোঃ

ক. দুর্বোধ্য মনচ্ছ

ইংরেজীতে এদের 'Problem boy' বলা যায়। অনেক কিশোর তারা কী চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব কোনও ধারণা নেই। তাই কোনও কাজই তাদের মনঃপূত হয় না। তারা বারে বারে একটি কাজ বা পাঠ ছেড়ে অন্য কাজ বা পাঠ গ্রহণ করে। পরক্ষণেই তারা বুঝে যে, এটিও তাদের মনপূত নয়।

খ. আক্রমণাত্মক [Aggresive]

এ কিশোর সদাব্যস্ত ও একরোখা হয়, তারা লক্ষ্য ও পথ পরিবর্তন করতে চায় না। সব কিছুই ওদের তাৎক্ষণিক চাই। ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু ওদের সকলে বিনা বাধায় ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। কাউকে কাউকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। ওই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে অসমর্থ হলে তাদের ভাবাবেগ রুদ্ধ হয়। অবরুদ্ধ ভাবাবেগ নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। এ নৈরাশ্য হতে দু শ্রেণীর আক্রমণাত্মক কিশোরের উদ্ভব হয়-পরঘাতী ও আত্মঘাতী।

গ. বিকল্প-পন্থী

এরূপ কিশোরদের লক্ষ্যস্থল খুব উঁচু বা খুব নিচু নয়। বাধা পেলে তারা বিকল্প লক্ষ্য কিংবা পথ খুঁজে নেয়। সাধ্যাতীত লক্ষ্যবস্তুকে এরা এড়িয়ে চলে। এদের আকাঙ্ক্ষা সীমিত। নিজেদের সীমিত ক্ষেত্রে এরা প্রায়ই সফল হয়। এ সফলতা তাদের ভয়শূন্য করে। ব্যর্থতাও এদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ না। এটা তারা সহজভাবে গ্রহণ করে। এদের নিকট ভাবাবেগ অপেক্ষা যুক্তি বুদ্ধিই প্রধান। অভিজ্ঞতা দ্বারা সমস্যার গুরুত্ব কমিয়ে আনে। বয়স্ক লোকদের মত এদের ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস আছে।

ঘ. অস্বভাবী

অস্বভাবী কিশোরগণ নানারূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে। প্রশমিত মনোজট্ [Comple] - এর কারণ হতে পারে। কেউ বিচ্ছিন্ন-মনা [Split-up mind] রোগে ভোগে। কারো মধ্যে দ্বৈত বা বহু ব্যক্তিত্ব দেখা যায়।

'সিনেমায় কিংবা থিয়েটারে যাব' কিংবা 'ভাত বা রুটি কোন্‌টি গ্রহণীয়' - এরূপ সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষতিকর না। এ দুটি তাদের নিকট সমান প্রিয় হতে পারে। কিন্তু গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব বেদনাদায়ক। তাদের মধ্যে বহু হেতুহীন ভয় ও ক্রোধ দেখা যায়। মাঝে মাঝে

www.bjilibrary.com

এরা বিমর্ষ হয়ে উঠে। কিন্তু এর কারণ বুঝতে পারে না। কোনোও কিছুতে মনোনিবেশে অক্ষম হয়। এরা ধৈর্যহীন ও বিস্ফোরণশীল হয়ে থাকে।

ঙ. অপরাধমুখী

অপরাধমুখী কিশোরদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা কিছু বেশি থাকে। সুযোগ ও সুবিধা পেলে অপকর্ম করার জন্য তারা সদা উন্মুখ। এদের মধ্যে লোভী কিশোরদের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ কিশোরও থাকে। এদের অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য প্রলোভন বা ক্রোধ এদের প্রদমিত অপ-স্পৃহাকে বহির্গত করে। ওদের কেউ কেউ যৌনজ ও অযৌনজ এবং কেউ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। এরা স্বার্থপর হয় ও লাভালাভ বোঝে । এরা ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীন ও আশু ফল প্রয়াসী।

চ. দুর্বলচিত্ত [Feeble – minded]

দুর্বলচিত্ত কিশোরদের বুদ্ধিমত্তা বয়সের তুলনায় কম থাকে। এটিকে চিত্তদৌর্বল্য বলা হয়। এরা সরলমনা ও বিশ্বাসী হয়। কিছু বিষয়ে অভিযোগমুখর হলেও এরা প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্য বোধ দেখায়। এরা সহজেই অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের ভুল বোঝানো ও ভুল বিশ্বাস করানো সহজ। ভিটামিন, প্রোটিন খাদ্য ও হরমোনের ঘাটতি পূরণ এদের নিরাময় করে। বয়সের সাথে ওদের অনেকেরই বুদ্ধি দ্রুত বেড়ে পূর্বক্ষতি পূরণ করে।

মধ্যবর্তী কালে ওদের প্রতি কিছু বেশি লক্ষ্য রাখা সহ উৎপীড়কদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। অবশ্য বহু সরলমন কিশোরের সাধারণ বুদ্ধি প্রখর হয়। তবে উন্মাদ ও নির্বোধদের জন্য স্বতন্ত্র মানসিক ও দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন।

ছ. নেতৃত্ব বিলাসী

এ শ্রেণীর বালক অতি মাত্রায় নেতৃত্ব অভিলাষী হয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ এজন্য নিজেদের মধ্যে মারপিট পর্যন্ত করেছে। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে নেতৃত্বের উপযুক্ত গুণ থাকে না। এদের মধ্যে কিছু শান্তি প্রিয় কিংবা দুর্বল দেহী কিশোর থাকে। এরা নেতা হওয়ার সহজ পন্থাসমূহ বেছে নেয়।

এরা বাড়ির কিংবা অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করে ফুটবল বা খেলার সরঞ্জামাদি কিনে ক্লাব তৈরী করে নিজেই ক্লাবের প্রধান হয়। পড়াশুনা বা অন্য বিষয়ে এরা মধ্যপন্থা কিশোর। এদের অভিভাবকরা প্রয়োজনীয় যৎ-সামান্য অর্থ দিলে এরা এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হতো না। ওদের এরূপ নেতৃত্ব আরোপিত হলেও তারা সেটির দ্বারা সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব লাভ করে।

১০. কিশোর অপরাধীদের বৈশিষ্ট্য

কিশোর অপরাধীদের মাঝে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়।

ক. স্বাস্থ্যগত বৈশিষ্ট্য : নিরেট দেহী, সুসংবদ্ধ, পেশীবহুল।

www.bjilibrary.com

খ. মানসিক বৈশিষ্ট্য : অস্থির, ধৈর্যহীন, ভাবুকতা।

গ. কর্মশক্তিগত বৈশিষ্ট্য : মাত্রাহীনতা, আক্রমণাত্মক, নাশকতাপ্রিয়।

ঘ. আচরণগত বৈশিষ্ট্য : শত্রুতা, বেপরোয়া, বিঘ্নসৃষ্টিকারী, সন্দিগ্ধ, জেদী,অধিকার বিলাসী, দুঃসাহসিক, সংস্কারবিহীন মন ও আনুগত্যহীন।

ঙ. মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : জবরদস্তি স্বভাব, নেতৃত্ববিলাসী, সফলতার জন্য অন্যায় পন্থা গ্রহণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়ভাব, স্বার্থপরতা।

১১. কিশোর অপরাধের কারণ

১১.১. মনস্তাত্ত্বিক কারণ

ক. বয়:সন্ধিপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব খুব প্রকট হয়ে ওঠে। এ সংকটের অন্যতম কারণ অপরিণত আবেগের বৃদ্ধি।

মনস্তত্ত্বের পরিভাষায়, অপরিণত মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি মানে সুস্থ আবেগের স্বত:স্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটতে না দেওয়া। সহনশীলতা ব্যাপারটা সৃষ্টি হয় আবেগ থেকে। সেই স্বতস্ফূর্ত আবেগে যদি বাধা আসে, তাহলে সহনশীলতার অভাব ঘটতে বাধ্য। এই মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ই কৈশোরের অনেক বিতন্ডার মূল।

খ. শিশু-কিশোরদের আমরা অনেক কিছুই ঠিকমতো শেখাই না। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা সেভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারে না। জীবনে অনেক জিনিসই পাওয়া যায় না। এ না পাওয়া ব্যাপারটা যে জীবনেরই অঙ্গ, আমরা তা শেখাই না।

এমনিতেই বয়:সন্ধির সময় হরমোন এবং শারীরিক পরিবর্তনের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংকট দেখা যায়, এ সঙ্কট এতটাই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, তখন কোনও ব্যর্থতা দেখা দিলে তারা তা সহ্য করতে পারে না। সহ্য না করতে পেরে তারা ভেতরে ভেতরে নানাভাবে অপরাধী হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ এক ধরনের পলায়নপর মনোবৃত্তির আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন রাস্তা থাকে না। এটি যেমন পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে ঘটে থাকে, তেমনটা ঘটে থাকে প্রেম বা অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও।

গ. কোনও কোনও ছেলেমেয়ে এ বয়সে Pathological lier হয়ে যায়। তারা মিথ্যের মধ্যেই থাকতে শুরু করে। মিথ্যে আর সত্যের মাঝে ভেদরেখাটা তাদের সামনে ক্রমশ মুছে যায়। অবাস্তব বা রোমান্টিক স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তারা। মাতা-পিতার সঙ্গে যত বেশি মানসিক বিভেদ, বাড়িতে যত অশান্তি বাড়তে থাকে, ততই এ মিথ্যাচারও বাড়তে থাকে। পলাতকী মনোভাব [Escapism] থেকে এ মিথ্যা বিশ্বাস, মিথ্যা কথার ব্যাপারটা আসে। এ বয়সে ছেলেমেয়েরা একটু বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। মাতা-পিতার মধ্যে কোনও রকম টেনশন থাকলে, নিঃসঙ্গ বা Neglected বোধ করলে ছেলেমেয়েরা বয়ঃসন্ধিতে খুব

www.bjilibrary.com

বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। অসম্ভব জেদি, রাগী, একগুঁয়ে, সন্দেহপ্রবণ হয়ে এমন একটা পর্যায়ে তারা ক্রমশ চলে যায় যে, শেষ পর্যন্ত জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে। সব রকম আনন্দ, স্পৃহা, উৎসাহ থেকে দূরে চলে যায় এবং একেবারে খেতে চায় না। খিদেই পায় না এবং এদের শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায় না। বয়ঃসন্ধির এ মানসিক রোগকে বলে, 'Anorexia nervosa'। যারা এতদূর যায় না তাদের অনেকেই বিষণ্ণতায় [Depression] ভোগে।

ঘ. একটি কিশোরের ভেতরে Input-output খুব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের হাবভাবও ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। ওরা বুঝতে পারে, যদি সে পরীক্ষায় ভাল ফল করে, তাহলে মা তাকে ভালবাসবে। এ মানসিকতার ফলে মা-শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসার ঘাটতি দেখা যায়। ভালবাসা ব্যাপারটা শর্তসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটা শুরু হয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকেই। স্কুলে ভর্তি হওয়ার চাপ থেকে এই Input-output এর চাপ তৈরি। তখন থেকেই দূরে সরে যায় সহজ সরল জীবনের যাবতীয় সম্ভাবনা।

ঙ. অতি অল্পবয়স থেকেই কিশোরকে একটা যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে বেঁধে ফেলার চেষ্টা চলে। সে যেন-কোন এক উপকরণ বা কাঁচামাল। ওই যান্ত্রিক রুটিনের মধ্যে তাকে ক্রমশ বড় করে তোলা হয়। সে যখন বন্ধুদের সাথে খেলছে, তখন হয়তো তাকে টেনে হিঁচড়ে অঙ্ক কষানোর জন্য টিচারের কাছে বসিয়ে দেওয়া হল। পড়ানো শেষ না হতেই সাঁতারের সময় হয়ে যায়। তখনই আবার দৌড়। এরপর নাচগানের ক্লাস আছে। ড্রইং শেখা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, এ সব যান্ত্রিকতা ওদের ভাল লাগে না। এ ধরনের যান্ত্রিকতায় তারা মরিয়া হয়ে পড়ে। ফলে পড়াশুনাটা স্বাভাবিক ভাবে হয় না, পুরোটাই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। 'নাও এবার এটা মুখস্থ কর' -- এ মনোভাবে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এমন কি বাড়ির গন্ডি ছাড়িয়ে গেলেও দৃশ্য একই পদ্ধতি। সেখানেও রয়েছে সেই যান্ত্রিকতা।স্কুলে গিয়েও একই পদ্ধতির শিকার হয়।

চ. কিশোররা অনেক কিছু আঁচ করে নিতে পারে। তারা বুঝতে পারে বাবা মায়েরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমাগত ভাবনা চিন্তা করছেন। বাবা মায়ের উদ্বেগ তাদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিশোরদের মনেও তৈরী হয় অপরাধবোধ।

ছ. বাবা মায়েদের কৃত্রিম ব্যবহারও কিশোরারা বেশ বুঝতে পারে। সারাদিনের ধকল সামলে বাবা মায়েরা নিতান্ত অনীহা সত্তেও যখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গ দেন হাসিমুখে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে, তখন সে বুঝতে পারে বাবা কিংবা মায়েরা ক্লান্তি, বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে উৎসাহের ভান করছেন। তাদের সংবেদনশীল মন এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং ক্রমশ বাবা মায়েদের মেকি ব্যবহারে দুই পক্ষের মাঝে দূরত্ব তৈরী হয়ে যায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে। ফলে পরীক্ষায় খারাপ ফল বা

www.bjilibrary.com

প্রেমে ব্যর্থ হলে বাবা-মায়ের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে না। অন্যদিকে ব্যর্থতা মেনে নিতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

জ. অভিভাবকেরা সব সময়ই চান তাদের চাহিদামতো সন্তানটি বেড়ে উঠবে। অর্থাৎ, তার কোনও স্বকীয়তা থাকার দরকার নেই, তারা যেমনটি চাইবেন, ঠিক তেমনটি তাকে হতে হবে। একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই।

ঝ. একসময় মায়ের ভালবাসা ছিল শর্তহীন।'আমার সন্তান, সুতরাং চাওয়া-পাওয়ার হিসেব না করে হৃদয়ের নিষ্কলুষ ভালবাসা দিয়ে যাব' --- এ মনোভাব কাজ করত। মা মানেই সকল দু:খের অবসান, অফুরান ভালবাসা-- এ শ্বাশত ধারণা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আজকাল মায়েরা নিজস্ব জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ফলে মায়ের ভূমিকা এখন মিশ্র।

১১.২. স্বভাবগত কারণ

কিশোরদের অপরাধী হওয়ার নেপথ্যে কিছু স্বভাবগত কারণও রয়েছে। বিশেষত নিম্নোক্ত কয়েকটি স্বভাব ওদের অপরাধী হওয়ার সূচনা ঘটায়।

যেমন-

সৃষ্টি জগতের প্রতি নির্দয় ব্যবহার, অতিরিক্ত অবাধ্যতা, স্কুল- পলায়ন, দেরীতে ঘরে ফেরা, বেঢপ ও মলিন পোশাক পরিধান, শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা, অকর্তিত কেশ, দু:সাহসিকতা, এ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা, অতি মাত্রায় ছায়াছবি প্রিয়তা ইত্যাদি।

১১.৩. কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে মাতা-পিতা

নিম্নোক্ত প্রকার মাতাপিতার সন্তানগণ কিশোর অপরাধী হয়ে থাকেঃ

ক. সংসারত্যাগী বা পলাতক মাতাপিতা : এরা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। সন্তান এদের অপত্য স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

খ. অপরাধী মাতাপিতা : এরা সন্তানকে পাপের মধ্যে রেখে বড় করেন। কখনওবা সন্তানের সহায়তায় পাপ করেন।

গ. অপকর্মে সহায়ক মাতাপিতা : এরা সন্তানের অপরাধস্পৃহায় উৎসাহ দেন।

ঘ. অসচ্চরিত্র মাতাপিতা : তারা নির্বিচারে সন্তানের সামনেই নানা অসামাজিক কাজ করেন ও কথা বলেন।

ঙ. অযোগ্য মাতাপিতা : এরা সন্তানকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানে অমনোযোগী বা অপারগ।

আধুনিককালে শহরগুলোতে দেখা যায় যে, মা-বাবা উভয়ে ঘরের বাইরে কাজ করছেন। ফলে সন্তান-সন্ততি তাদের উপযুক্ত স্নেহ-শাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা আচরণে বিদ্রোহধর্মী হয়ে যাচ্ছে। এমনটিও দেখা যায় যে,মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে কোন কোন কিশোর মা অথবা বাবাকে হারাচ্ছে। এ কারণেও কিশোরদের

www.bjilibrary.com

স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সমস্যা দেখা দেয় এবং তারা অসংলগ্ন আচরণ তথা সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়। অধিকন্তু পারিবারিক পরিমন্ডলে কোন শিশু-কিশোর যদি সর্বদা ঝগড়া বিবাদ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং অপরাধমূলক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে তাহলে তাদের পক্ষে সহসা কিশোর অপরাধী হয়ে উঠা অসম্ভব নয়।

১১.৪. দারিদ্র্য

দারিদ্র যে অপরাধের জন্য দায়ী তা বলাই বাহুল্য। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারে কিশোর-কিশোরী তার নিত্য দিনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে তার মধ্যে কিশোর অপরাধমূলক আচরণ সৃষ্টি হতে পারে । এ কারণে এরা ছোট-খাটো চুরি বা ছিনতাই-এ অংশ গ্রহণ করে। দারিদ্রের কারণে আত্মহত্যা বা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতেও বাধ্য হয় অনেক কিশোর-কিশোরী।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় দুই ভাগ্যবিড়ম্বিতা কিশোরীর ঘটনা :

"চরনগরদীর শবমেহের কাঁদিতেছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক শুশ্রূষা, শিয়রে নির্বাক ভাইয়ের উপস্থিতি কিছুই সর্বস্বহারা নারীত্বের এ কান্না থামাইতে পারিতেছে না। নারী ব্যবসায়ের প্রথাসিদ্ধ নিয়মে শিকারীরা দূর গ্রামাঞ্চলে শিকার সন্ধানে গিয়া এ এতিমকে শিকার করিয়া আনিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের টান বাজারের অসামাজিক বন্দীত্বে তাহার নারীত্ব হরণের আগে জনপদবধুর বরণে সাজানোর ভূষণ সেলোয়ারটি এখনও তাহার আছে। কিন্তু যাহা গিয়াছে, শবমেহের তাহা পাইবে না। ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়ালে দেওয়ালে শাশ্বত নারীত্বের কান্না গুমরাইয়া মরিতেছে কিশোরী শবমেহেরের কান্না ও প্রলাপে।"

"আট-নয়দিন আগেও কৃষক জনপদের উদ্দাম কিশোরী ছিল শবমেহের [১১]। দারিদ্র্য ও বয়সের দিকটি ছাড়া শঙ্কা তাহার ছিল না। কোন এক জরিনা তাহাকে ফুসলাইয়া নারায়ণগঞ্জে আনিয়া টানবাজার পতিতালয়ে দুই হাজার টাকায় বিক্রয় করে। পতিত নগরে বিধ্বংস হয় পল্লীর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত স্বপ্ন- শবমেহের। তিনটি দিন পর মৃত্যুন্মুখ অসাড় দেহে শবমেহেরকে ট্রেনের কামরায় ফেলিয়া পতিতালয়ের লোকেরা চলিয়া যায়। কমলাপুরে সংজ্ঞাহীন শবমেহের ট্রেনে করিয়া আসিয়া পৌঁছিলে লোকজন তাহাকে হাসপাতালে লইয়া আসে। সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইবার পর হইতে শবমেহের কাঁদিতেছে। নীরব কান্নার মাঝে মাঝে প্রলাপ কহিয়া উঠে। সে প্রলাপে ধিক্কার কাহার প্রতি, স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪.০৪.১৯৮৫]

দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত আরও একটি রিপোর্টঃ

'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ সারাবিশ্বেই। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তা সত্ত্বেও ঢাকা মহানগরীর সর্বত্রই শিশুশ্রম আছে। বিদেশীদের হস্তক্ষেপে গার্মেন্টস কারখানায় শিশুরা

www.bjilibrary.com

এখন আর কাজ করে না, কিন্তু বাসে অথবা গ্রামীণ নামক ২২-২৪ সিটের ছোট বাসে এরা কাজ করছে। রামপুরা যাত্রাবাড়ীসহ বিভিন্ন রুটে এ বাস চলছে। এ ছোট বাসে যে শিশুরা কাজ করে এদের অধিকাংশের বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। যে বয়সে মা-বাবার আদরে-আহ্লাদে এদের স্কুলে যাওয়ার কথা, বিকেলে সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা, সে বয়সে এরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করছে। মাঝে মাঝে ছোট এ বাসের ভেতরে অথবা হ্যান্ডল ধরে ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে। অন্য দিকে যাত্রীদের দুর্ব্যবহার তো এদের নিত্যদিনের সঙ্গী। একটু আদর, একটু ভালবাসার কাঙাল এ শিশুদের সুযোগ দেয়া হলে এরাই একদিন দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে। দরিদ্র মাতা-পিতার ঘরে জন্ম নেয়াই এদের অপরাধ। জন্ম অপরাধে এদের সাথীরা যাচ্ছে স্কুলে আর এদের বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলে রাত ১০-১১টা পর্যন্ত কাটিয়ে সামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে ঘরেফেরা। এ ধরনের হাড়ভাঙা শ্রমের কাজ থেকে এদের সরিয়ে নিয়ে হালকা কাজ দিয়ে লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়ার কী কেউ নেই?'

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান আছে অনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৩৩ [The Suppression of Immoral Traffic Act, 1933]। কিন্তু সংবিধান, আইন সব কিছুই নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অদ্যাবধি অসমর্থ। অসংখ্য শবমেহের এর আত্মদান তারই প্রমাণবহ।

দু:খ ও দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেন -- তা শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। বাস্তবতার সাথে তার কোন মিল থাকে না। আর এসব বাস্তবতা আমাদের সমাজে বাড়িয়ে দিচ্ছে দুর্নীতি এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। দুর্নীতি, অপরাধের সে থাবা ছাড়ছে না আমাদের কিশোরদেরও। এমতাবস্থায়, জঠর-যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন কিশোর-কিশোরী বাধ্য হয়ে যদি দুষ্কর্মে বা পাপাচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে কতখানি দোষারোপ করা যায় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সুতরাং, দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণসমূহ কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে জাতীয়ভিত্তিক কর্মসূচী নিতে হবে। এ দায়িত্ব পরিবার প্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার। এ লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে সম্পদের সুষম বন্টনসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্যে অর্থনৈতিক/আর্থিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ-সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে বিশেষ করে অনগ্রসর অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে সবার আগে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা ছাড়া দারিদ্র দূর করার কোন উপায় নেই।

www.bjilibrary.com

১১.৫ সুষ্ঠু বিনোদন সঙ্কট

শিশু-কিশোরদের জন্য চাই উপযুক্ত চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা। এজন্য খেলাধুলা, শরীর চর্চা, সঙ্গীত এবং নানাবিধ সুস্থ বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ সবের অভাব শিশু-কিশোরকে যত্রতত্র রাস্তা-ঘাটে ঘুরতে ফিরতে এবং ছুটাছুটি করতে দেখা যায়।এ ধরনের বিশৃংখল ঘোরাফেরা কিশোরদের মনে সাময়িক আনন্দ দিলেও বস্তুতঃ পক্ষে তা একটি আদর্শ ও সুশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেও কিশোররা অসৎ সঙ্গে মেশে এবং একটি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার মধ্যে সময় কাটানোর কারণে তাদের চরিত্রে অনিয়ম এবং অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তারা হয়ে উঠে অপরাধ প্রবণ।

প্রসঙ্গত আকাশ সংস্কৃতির অপব্যবহারের কথা বলা প্রয়োজন। ইদানীং নিয়ম নীতিহীনভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা সাইবার ক্যাফে গুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের নামে চলছে রীতিমত পর্ণোগ্রাফির প্রদর্শনী। সার্ভিস চার্জ কম হওয়ায় এবং অন্যান্য অসৎ সুবিধা থাকায় উঠতি বয়সীরা এখন সাইবার ক্যাফের প্রধান গ্রাহক। অবাধ তথ্য প্রযুক্তির নামে অশ্লীল ওয়েবসাইটগুলো হয়ে উঠছে তাদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে। শিক্ষার্থীরা নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নানা অজুহাতে বেরিয়ে এসে সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্ণো ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করছে। এখানে এক ভিন্ন নেশায় মত্ত হয়ে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি কেউ কেউ পুরোদিনই চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত থাকছে। এর ফলে পড়াশুনার প্রতি তাদের অমনোযোগিতা সৃষ্টিই শুধু নয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়াসহ নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন দেশে সাইবার ক্যাফে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সাইবার নীতিমালা থাকলেও বাংলাদেশে এখনও তা প্রণীত হয় নি। কিশোরদের জন্য উপযুক্ত কিশোর সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও বিনোদন কেন্দ্রেরও চরম সংকট রয়েছে আমাদের।

১১.৬. শিল্পায়ন ও নগরায়ন

শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয় এবং শিল্প নির্ভর নগর জীবনে কতিপয় সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে আবাসিক সমস্যা অন্যতম। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গোটা শহর জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। চরম আবাসিক সংকটের কারণে জনাকীর্ণ এলাকার কিশোরদের চলাফেরা,গল্পগুজব এবং নানা ধরনের মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। একদিকে দারিদ্র অন্যদিকে অবাধ ও সারাক্ষণ দলবদ্ধ জীবনযাপন করতে গিয়ে অনেক সময় কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জাগে। তাদের এই অপরাধ প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দু:সাহসিক অভিযান ও কাজকর্মকে কেন্দ্র করে। এ অবস্থায় তারা কখনও একাকী আবার কখনও বা ছোট ছোট দল বেঁধে নানা ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়।

বাংলাদেশের শহর এলাকার মধ্যে রাজধানী ঢাকা শহরের চিত্র ভয়ঙ্কর। বস্তি আর রাস্তায়

www.bjilibrary.com

বেড়ে উঠা শিশু-কিশোররা সবকিছু এখানেই রপ্ত করে। এরা চলতে শিখলেই ছোট ছোট চুরি করে। একটু সাহস হলেই স্ট্রিটলাইট, ম্যানহোল, ইট, রডের টুকরো চুরি করে। পরবর্তীতে পরিবেশ-পরিস্থিতি এদেরকে ক্রমশ মাদকদ্রব্যের দিকে টেনে নেয়।

কখনও এরা পরিণত হয় রাজনৈতিক দলের টোকাই বাহিনী- যা হয়ে উঠে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ তথা কোন দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের হাতিয়ার। এদের ব্যবহার করা হয় অস্ত্র বহনের কাজে। এমনকি মাঝে মধ্যে ওদের ব্যবহার করা হয় মানুষ মারার মতো ঘৃণ্য ও ভয়াবহ কাজে। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সহযোগী হিসেবেও এরা কাজ করে থাকে। অপরদিকে ছিন্নমূল কিশোরীরা নেমে পড়ে ভাসমান পতিতাবৃত্তিতে। কিন্তু এ-তো গেল দরিদ্রদের কথা।

ধনীর দুলালেরা নষ্ট হচ্ছে ঘুষখোর, উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, জুয়াড়ি, মাতা-পিতার অযত্ন, অবহেলা, উদাসীনতা, স্নেহহীনতা, বিত্তবৈভবের প্রাচুর্যের কারণে। তাছাড়া ড্রাগ, ভিসিআর, ডিশ এন্টেনার অনুপ্রবেশ, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও ঠেলে দিচ্ছে নগরের বিত্তবানদের সন্তানদেরকে অপরাধকর্মে।

১১.৭ স্বাস্থ্যগত কারণ

কিশোর অপরাধের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া স্বাস্থ্যগত কারণও দায়ী হতে পারে। মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণের মতে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর কারণে একটি কিশোরের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কাজ করতে পারে।

১১.৭.১. 'বার্থট্রমা' - জন্মের সময় কোন আঘাত পেলে। এটি হতে পারে নীচের কারণগুলোর জন্য-

ক. ফোরসেপ ডেলিভারী,

খ. অবস্ট্রাকটেড ডেলিভারী,

গ. কর্ড ইনজুরি,

ঘ. অত্যধিক রক্তপাত,

ঙ. মেকোনিয়াম এ্যাসপিরেশন ও ফিট্যাল ডিসট্রেস।

এছাড়া মায়ের অসুস্থতার কারণেও এটি হতে পারে। মা অসুস্থ হতে পারেন নিচের কতিপয় কারণে-

ক. নেশাগ্রস্থ হলে অথবা মদ, গাঁজা, অত্যধিক ঘুমের ওষুধ সেবন করলে,

খ. উম্মাদগ্রস্থ বা মানসিক বিকারগ্রস্থ হলে,

গ. ডিভোর্সী হলে,

ঘ. অপরাধপ্রবণ হলে।

১১.৭.২. এছাড়া জেনিটিক ইনহেরিটেন্স- এর কারণে শিশু-কিশোররা অপরাধপ্রবণ হতে পারে -

ক. ক্রোমাজমাল ডিজিস।

www.bjilibrary.com

খ. এক্স, ওয়াই, ওয়াই, ক্রোমোজমের শিশু-কিশোররাঃ কয়েদীদের ওপর জরীপে দেখা গেছে যে, এ উপাদানটির কারণে তারা নরহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনে জড়িত হয়েছে,

গ. বর্ডার লাইন পারসোন্যালিটি থাকলে সামান্য কারণে উত্তেজিত ও বদ মেজাজী হতে পারে,

ঘ. শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী (বাতিকগ্রস্ত মন, দুর্বল দেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য, বিকলাঙ্গতা ইত্যদি) হলে,

ঙ. অস্বাস্থ্যকর বা বস্তির ছিন্নমূল হলে।

১১.৮ 'ডুয়েল ম্যাসেজ এফেক্ট'

মা বললেন 'হ্যাঁ' কিন্তু বাবা বললেন 'না'- একজন কিশোরের এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়াকে মনোচিকিৎসকরা বলেন, 'ডুয়েল ম্যাসেজ এফেক্ট'। এমন অবস্থা একজন কিশোর-কিশোরীর জন্য দারুণ ক্ষতিকর। এমন অবস্থার শিকার হলে সেই বয়সী কিশোরেরা এক দ্বন্দ্বের আবদ্ধে আটকে পড়ে। তারা বুঝতে পারে না আসলে কোন্‌টা সত্য বা মিথ্যা। কারণ একই অবস্থায় দুটোই সত্য বা মিথ্যে হতে পারে না। তাই সে মানসিক বিপর্যয়ে পড়ে এবং এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

'ডুয়েল ম্যাসেজ' এর ধরন ভিন্নও হতে পারে। উদাহরণ:

"অভিদের স্কুলে বার্ষিক বনভোজন আর বেশিদিন নেই। সবাই খুব হৈ-হুল্লোড় করছে। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই মিলে পরিকল্পনা করছে বনভোজনে কী কী করবে। সবকিছু ঠিকঠাক। অভির মনেও দারুণ আনন্দ। এখন শুধু বাবা-মাকে জানানোই বাকি। কিন্তু সে কাজটা করতে গিয়েই যতকিছু ঘটল। বাবা বলল, বনভোজনে একা যাওয়ার মতো বড় তুমি এখনো হওনি। অনেক আকূতি মিনতি করেও কোনো কাজ হয়নি। অবশেষে অভি না যাওয়াতেই রাজি হলো।"

সাধারণত ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোরদের এমন অবস্থা মুকাবিলা করতে হয়। কেননা এ বয়সী কিশোররা চট করে মুখের ওপর না বলতে পারে না। ওরা নীরবে নিজেদের কষ্ট দিতেই ভালোবাসে। তখন তাদের মাঝে একধরনের দু:খ বিলাসিতাও কাজ করে। মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কথা ব্যথার-অপমানের-অসন্তোষের হলেও অপারগতা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে চলে।

সাধারণত কিশোর অপেক্ষা কিশোরীরাই এ অবস্থার শিকার হয় বেশি। মেয়েদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি সেই মেয়েকে শিখিয়ে দেয় যে, সে বড় হয়েছে। কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক বৃদ্ধিও প্রয়োজন। আর এর অভাব থাকলে সেই মেয়ে চিন্তা করে যে, সে তেমন একটি বড় হয়নি। তাই তারা মা-বাবার অনুশাসনমূলক বাধা -বিপত্তির মধ্যে

www.bjilibrary.com

সবচেয়ে বেশি পড়ে। এতে সে দারুণ বিষণ্নতায় ভোগে। নিজেকে জগৎ থেকে আলাদা মনে করতে থাকে। এক পর্যায়ে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে বসে এবং তাতে সফল হয় অনেকে।

মা-বাবার দুজনের দু' রকম বাক্য ব্যয়ে সন্তান আক্রান্ত হয়ে থাকে। যদি 'না' বলতে হয় তবে ভালোভাবে যুক্তিসহকারে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আর যদি হ্যাঁ করেন তাহলেও তা-ই।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের মতে, অবসাদ, মাদকাসক্তি, ভগ্নমনস্কতা [Schizophrenia] সহ বহু মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে। মূলত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেই এমনটি হয়। তাই কিশোর-কিশোরীদের মনকে বুঝতে হবে। সব সময় না-না বাক্য কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। ওদের মনকে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়া যাবে না। ওদের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিতে হবে। কখনো যেন মানসিক বিপর্যয় না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা জরুরি। ছেলেমেয়ে বিভেদ -বৈষম্য করা ঠিক না। যা কিছু নিষিদ্ধ তা দুজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে হবে।

১১.৯. অন্যান্য কারণ

সামাজিক অসাম্য, দু:খ-দুর্দশা, তদারকীর ঘাটতি, অবিচার, আশৈশব দুর্ব্যবহার প্রাপ্তি, কু-সংস্কার ও কুসঙ্গ, প্রাকযৌন অস্থিরতা, প্রাক্-যৌন অভিজ্ঞতা, অসময়ে পিউবারটি [Puberty], অপছন্দকর কর্মস্থান, অতি আদর বা অনাদর, আর্থিক অসচ্ছলতা বা আর্থিক প্রাচুর্য, অনিদ্রা, পরাশ্রয়, বিমাতা বা দূর আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া, মাতা বা পিতার মালিকের গৃহে বসবাস, মালিক - তনয় দ্বারা নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, অপুষ্টি, ভেজাল আহার, বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের উপেক্ষা ও উপহাস, দ্বন্দ্বরত মন ও বিবিধ প্রদমিত মনোজট [complex] কিশোরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এগুলো কিশোরদের উম্মাদ, নির্বোধ ও অপরাধী করে তোলে যা জীবন প্রভাতে তাদের চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক।

১২. কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয়

আগেই বলা হয়েছে যে, মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অধ্যায় হলো কৈশোরকাল। এটি এমন এক সময় যখন একজন ব্যক্তি বয়স ও বুদ্ধি- এ উভয় দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে বটে, তবে যথার্থ অর্থে বয়সী তথা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে না। প্রাকৃতিকভাবে জীবনের এ সন্ধিক্ষণটি হয় স্বাপ্নিক ও কৌতুহলোদ্দীপক। এ সময়ে সে জানতে চায়, জানাতে চায়। জানতে ও জানাতে গিয়ে যদি বাধাগ্রস্ত হয় বা হোচট খায় তাহলে সে মূক ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে, বিভ্রান্তি তাকে অপরাধী করে তোলে, নিয়ে যায় সর্বনাশার অতল গহবরে। অন্যদিকে যদি সে অবলীলায় জানতে পারে, জানাতে পারে, উত্তর পায়, মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন পায়,

www.bjilibrary.com

নৈতিক দীক্ষা ও প্রেরণা পায় তাহলে তার অগ্রগতি-অগ্রযাত্রাও হয়ে ওঠে অনিবার্যভাবে সুন্দর, শাশ্বত ও সাবলীল।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন মানুষই অপরাধী হয়ে জন্মায় না। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে আবেগ ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাবে মানুষ অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং কিশোর অপরাধীরা পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে তা অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য সবার আগে দরকার গ্রাম কিংবা শহর, পাড়া কিংবা মহল্লায় সর্বত্র ভাল পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষিত সজ্জন ও অভিভাবক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রয়াস। অধ্যয়ন, সৃজনশীলতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাও জরুরী। পরিবার, সমাজ ও স্কুলের পরিবেশ হওয়া দরকার আনন্দময় ও প্রণোদনাপূর্ণ।

১২.১. পরিবারের দায়িত্ব

শিশু-কিশোরদের কাদামাটির সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। শিল্পী কাদামাটিকে যেভাবে রূপ দিতে চান, সে রূপেই গড়ে তুলতে পারেন। বস্তুত, শিশু-কিশোররা কাদামাটির মতোই কোমল। পরিবার ও সমাজ-জীবনের পরিপার্শ্বের মধ্যে তারা বেড়ে ওঠে। সভ্যতার প্রথম সোপানই হলো পরিবার সংগঠন। দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা অপরের প্রতি সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিগুলোর বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষালয় হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে বলা যায়, মানব জীবনের প্রধান বুনিয়াদ।

তাই সুষ্ঠুভাবে শিশু-কিশোরের ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে একটি সুসংহত পরিবার এবং পারিবারিক দায়িত্ব অপরিসীম। অস্বীকার করার জো নেই যে, নৈতিক শিক্ষার ভিত এখানেই রচিত হয় যা আজীবন টেকসই হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা হল:

ক. নিয়ন্ত্রণ : শিশু-কিশোরদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে এবং 'সীমার বাইরের কাজ করলে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়বে' - এ বোধ তৈরী হয়।

খ. বোধজ্ঞান : শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের সৃষ্টি করতে হবে। স্বাভাবিক উচিত, অনুচিত, ভালমন্দের সাধারণ প্রভেদ তাকে বুঝতে দিতে হবে।

গ. সাহায্য : মাতাপিতাকে প্রত্যেক শিশু-কিশোরের আস্থা ভাজন হতে হবে। সন্তানেরা যাতে নিজের ও অন্যের উপকার করবার মানসিকতা অর্জন করতে পারে তার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে।

ঘ. বিশ্বাস ঃ কাকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কাকে বিশ্বাস করা অনুচিত এসব সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

ঙ. স্বাধীনতা : একটি নিদিষ্ট গন্ডির মধ্যে কিশোরদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন

৮—

www.bjilibrary.com

এবং অপরিহার্য না হলে তাদের কোন কাজের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত।

চ. ভালবাসা : কিশোররা যেন অনুভব করে যে, তাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতার অসীম ভালবাসা ও গভীর দরদ রয়েছে এবং এ ভালোবাসায় আছে তাদের প্রতি তাঁদের মাতাপিতার 'সমতা-নীতি'।

ছ. প্রশংসা : কিশোরদের প্রতিটি সুন্দর ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রশংসা করতে হবে। তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া দরকার, তবেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে। মাতা- পিতার বলা উচিত 'আমি জানি এটা তুমি করতে পারবে।' তারপর হয়তো বলা হলো, 'জানতাম, তুমি পারবে ইত্যাদি।' কোনও সাফল্যই অভিনন্দন জানানোর জন্য ক্ষুদ্র নয়। কখনও কাজে সফল না হলে সমালোচনা করতে হবে, তবে প্রশংসাসহ। ছেলে যদি ফুটবল খেলতে গিয়ে গোল করতে না পারে, তাহলে তাকে বলা উচিত, 'তুমি যেভাবে ড্রিব্‌ল [dribble] করলে তা অসাধারণ ছিল। কালকে আর একটু ভাল করে প্র্যাকটিস কোরো।' এভাবে তাদের ছোটখাট সাফল্যকে মূল্য না দিলে তাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ঘিরে আসবে। কোনো লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারবে না ওরা। পায়ের নিচে জমি নড়বড়ে হয়ে যাবে।

জ. রক্ষা কার্য : কিশোররা যেন বিশ্বাস করে যে, মাতা-পিতা তাদের বিপদের বান্ধব, সর্বোপরি সবসময়ের অকৃত্রিম রক্ষাকবচ।

ঝ. নিরাপত্তা : কিশোররা যেন উপলব্ধি করে যে, তাদের ঘর তাদের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয় ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

ঞ. সংযম : ব্যবহার, কাজকর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে কতটা পর্যন্ত এগুনো উচিত, কী পরিমাণে একটি কাজ করা উচিত, কখন ও কেন একটি কাজ পরিহার করা উচিত - ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিমিতিবোধ ও তৎসম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান তাকে দিতে হবে।

ট. প্রশ্নোত্তর দানঃ শিশু-কিশোরদের প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর দেয়া উচিত। জার্মান শিক্ষাবিদ Friedrich Froebel [১৭৮২-১৮৫২] এর একটি উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন;

> " হে শিশুর পিতা, শিশুর প্রতি কঠোর হয়ো না। তার পুন: পুন: প্রশ্নবাণে অস্থিরতা প্রকাশ করো না। প্রতিটি কঠোর শব্দের আঘাত তার জীবন ফুলের পাপড়ি নষ্ট করে দেয়। জীবন তরুর শাখা বিনষ্ট করে ফেলে।"

কিশোরদেরকে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বোঝাতে হবে। কথা অপেক্ষা ঘটনা ও দৃষ্টান্ত তাদেরকে প্রভাবিত করে বেশি। তারা অনুকরণ প্রিয়। সুতরাং, মাতাপিতাকে তাদের সামনে মিথ্যাচার, ভণ্ডামী বা নৈতিকতা বর্জিত আচরণ হতে বিরত থেকে নিজেদেরকে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

মাতাপিতা হবেন সন্তানের কাছে একজন সৎ ও সুন্দর মানুষের প্রোজ্জ্বল প্রতিভূ।

ঠ. আবিষ্কার করতে দেয়া : একবার এক ঘন বৃষ্টির পর একটি কিশোর বাবার কাছে দৌড়ে এলো-, 'দ্যাখো বাবা, কী সুন্দর পাথর', বাবা তো কোনও পাত্তাই দিলেন না, বরং রাগ করলেন, 'কী সব সময় যে কাদা ঘাঁটো!' কিশোরটির মুখ শুকিয়ে গেল।

বাবা যদি ছেলের এ প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন, 'বা:, কী সুন্দর! কোথা থেকে পেলে? আরও ভাল পেতে পারতে !' ইত্যাদি। তাহলে ছেলেটি আরও উৎসাহিত হতো। নতুন কিছু করার আনন্দ পেত, জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগোনোর সুবিধে হতো।

ড. সন্তানের স্বপ্ন সম্বন্ধে জানা : মাতা-পিতা দেখলেন তাদের কিশোর ছেলেটি খেলোয়াড় হতে চায়। কিংবা কিশোরী মেয়েটি হতে চায় বিমানের পাইলট যা মাতাপিতার অপছন্দ। এক্ষেত্রে ওদেরকে ভর্ৎসনা করার আগে পুরো ব্যাপারটি ভালভাবে জানা প্রয়োজন। তাই ওদের পছন্দের পেশার খোঁজখবর নিতে হবে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ জানতে হবে। মাতাপিতার অপছন্দ হলেও ওদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে পুরো ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করতে হবে।

এখানে এটি বলা হচ্ছে না যে, কিশোর-কিশোরীর সব ইচ্ছেকে বিনা বাক্যে যাচাই-বাছাই ছাড়াই মেনে নিতে হবে। যাচাই -বাছাই অবশ্যই করতে হবে। তবে ওদের আবেগ -অনুভূতি -চিন্তা -রুচি ইত্যাদিকেও সহানুভূতির সাথে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

১২.২. বিদ্যালয়ের ভূমিকা

কিশোর- কিশোরীরা দিবসের একটি উল্লেখযোগ্য সময় ধরে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয়ের রীতিনীতি, আচার-শৃঙ্খলা, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, সিলেবাস -কারিকুলাম ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের মানস গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। একটি বিদ্যালয়ের রীতিনীতি -আচার শৃঙ্খলায় যদি সভ্যতা, ভব্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, সমতা ইত্যাদিসহ নানামুখী সুস্থ্য সংস্কৃতির নিয়ত চর্চা ও প্রাত্যহিক অনুশীলন ঘটে তাহলে কিশোর-কিশোরীরা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে বাধ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের চরিত্র -মাধুর্য, চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-লেহাজ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। সুতরাং শিক্ষক যদি চরিত্রবান না হন, সুন্দর স্বভাবের অধিকারী না হন, সমতা ও সমদর্শিতার গুণে গুণান্বিত হয়ে না উঠেন, সর্বোপরি শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে একটি নির্মল আসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে নিছক পাঠ্য পুস্তকের বাইরে জীবন গঠনের কোন দীক্ষা লাভ করতে পারবে না।

সুতরাং, সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন। পাশাপাশি স্কুল/মাদ্রাসার সিলেবাস-কারিকুলামকে এমনভাবে ঢেলে

www.bjilibrary.com

সাজাতে হবে যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিশু-কিশোরদের মাঝে একগুচ্ছ অভিন্ন নৈতিক মূল্যবান মূল্যবোধ তৈরীতে সহায়ক হয়, হয় জীবনমুখী।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে বৈষম্যের ছড়াছড়ি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বোধের জাগরণ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীবন্ধন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে হাঁটছে বিপ্রতীপ পথে। এ জায়গাটাতে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সংস্কার। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব বাংলাদেশে বিরাজমান। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ স্কুল, ইংরেজী মাধ্যম স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদির ধারা-উপধারা মিলে মোট তের ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। সন্দেহ নেই যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় এত বিভাজন আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। একেক ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক, কারিকুলাম, শিক্ষা-পদ্ধতি, সংস্কৃতি একেক রকম। ফলে ওরা একে অপরের সাথে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারে না, মন খুলে কথা বলতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর অভিভাবকও এতে উৎসাহ যোগান। এভাবে ক্রমশ একজন শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে নিজেকে আলাদা [Superior or Inferior] ভাবতে শুরু করে। সৃষ্টি হয় অতি শৈশবেই, বৈষম্য সৃষ্টিকারী মানসিকতা। এ মানসিকতা শিশু-কিশোরকে সমতা, একতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির পরিবর্তে নিজের অজান্তেই অপরাধ মনস্ক অথবা অনুচিত হীনমনা করে তুলতে সহায়ক হয়। কাজেই এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটি একমুখী সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১২.৩. টিনএজ আত্মহত্যা রোধে ভূমিকা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মানসিকতার যে আমূল পরিবর্তন হয়, সে বিষয়ে সমাজের বেশির ভাগ মানুষ তেমন সচেতন থাকেন না। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের কল্পনার একটা জগৎ তৈরী করে ফেলে। নিজেকে বিরাট বোদ্ধা ভেবে বিভিন্ন মতামত দেয়, সিদ্ধান্ত নেয়। দেখা যায়, এদের মতামতকে সচরাচর মা-বাবারা বিশেষ গুরুত্ব দেন না, আত্মীয়-স্বজনদের কাছেও তারা তখন না বড়, না ছোট। এ সময় যারা খুব চাপা প্রকৃতির হয়,তাদের মনের ওপর চাপ পড়ে বেশি। কারণ নিজের কাল্পনিক জগতের ওপরে বাস্তব জীবনের ধাক্কা ওরা সহ্য করতে পারে না। ফলে আচমকা ব্যর্থতার গ্লানি সইতে না পারায় চরম হতাশা জাগে তাদের মনে। তীব্র মনোবেদনায় জ্বলে-পুড়ে একাকার হয়। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায় না বলে আত্মহত্যা করে বসে। এটি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে। কেউ সেই সময়টা বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় কাটিয়ে উঠতে পারে, কেউ পারে না। যারা পারে না তাদের মধ্যে দেখা দেয় মানসিক অবসাদ। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে আত্মহত্যায়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর কেবল ৪০ লাখ কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যার চেষ্টা করে [Attempt Suicide]। দেশে দেশে এ বয়সে আত্মহত্যার হারে

www.bjilibrary.com

তারতম্য দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার পেছনে অনেক কারণ জড়িত রয়েছে।

যেমন: জেনেটিক, হরমোনাল, আবেগপ্রবৃত্ত [Impulsive] ও পরিবেশগত কারণ। আত্মহত্যার কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হচ্ছে - বিষণ্নতা; দৈহিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন; উগ্রতা ও উচছৃঙ্খল জীবনাচার।

উল্লেখ্য যে, আত্মহননের অনুভূতি ও ডিপ্রেশনের উপসর্গের মাঝে মিল রয়েছে। কিশোর-কিশোরীর নিচের উপসর্গ গুলোর প্রতি মাতাপিতাকে নজর রাখতে হবেঃ

ক. ঘুম ও খাওয়ার অভ্যাস বদলে যাওয়া। শরীরের ওজন কমে যাওয়া।

খ. দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করা, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও আলাদা থাকা।

গ. প্রতিদিনের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা এবং উৎসাহে ভাটা পড়া।

ঘ. সহিংস প্রতিক্রিয়া, বিদ্রোহী আচরণ, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় ঘনিষ্ঠজনের প্রতি ছুটে আসা ইত্যাদি।

ঙ. মাদকের নেশায় জড়িয়ে যাওয়া।

চ. চোখে পড়ার মতো ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। কথা বলা বা চলা ফেরায় অস্বাভাবিক গতি, হয় খুব দ্রুত অথবা ধীরে।

ছ. সব সময় মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ বা বিরক্তিভাব নিয়ে থাকা, মনোযোগের ঘাটতি, স্কুলে দক্ষতায় পিছিয়ে যাওয়া।

জ. আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত দৈহিক উপসর্গ যেমন- মাথাব্যথা, পেটব্যথা, অবসাদ ইত্যাদি নিয়ে সব সময় সেঁটে থাকা।

ঝ. আনন্দময় কাজে আনন্দ খুঁজে না পাওয়া।

ঞ. প্রশংসা বা পুরস্কার কোনটিই সহ্য না করা।

ট. সব সময় নিজের খারাপ দিক নিয়ে কথা বলা, নিজেকে খারাপ ভাবা, অনুভূতির ঘুরপাকে নিজেকে আটকে ফেলা।

ঠ. আত্মহত্যার ব্যাপারে মৌখিক সংকেত দেওয়া যেমন- 'তোমাদের আর বেশি জ্বালাব না। আর বেশি দিন নেই আমি' ইত্যাদি।

ড. নিজের প্রিয় সব কিছুতেই অনীহা, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা।

ঢ. বিষাদের একটি সময়ের পর আচমকা খুশি হয়ে ওঠা।

ণ. মনোরোগের বিভিন্ন উপসর্গ, যেমন, দৃষ্টিভ্রম [Hallucination] ও উদ্ভট চিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়া।

www.bjilibrary.com

১২.৪. ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশীলন

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা মানুষের শুধু শারীরিক সত্তা নয়, তার একটি মানস ও মনন রয়েছে। এ মনন বা মানসের বিকাশ দরকার এবং সেটা কেবল বস্তুগত নয়। এ মানস বিকাশ ধর্মের দ্বারা সম্ভব। ধর্ম মানব জীবনকে পরিপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং ধর্ম হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি।

এক কথায় মানব জীবনে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিকতা - অনৈতিকতা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনার এক সাবলীল ও সুষ্ঠু নির্ণায়ক নীতি বা বন্ধন হলো ধর্ম।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে যুগে যুগে যত ধর্ম এসেছে, যত ধর্মগুরু এসেছেন সবাই অন্যায়ের বিপক্ষে ন্যায়ের ও মানবতার জয়গান গেয়েছেন। সততা, সাধুতা, সেবা, সংযম, সৌজন্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সদাচার, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, বিনয়, বদান্যতা ইত্যাদি সব-ধর্মেরই সার কথা। সব ধর্মই তার প্রতিটি অনুসারীকে শৈশব-কৈশোর থেকে সৎপথে চলার, সুন্দরভাবে বাঁচার, সরলপথ অনুসরণ করার তাকিদ দিয়েছে।

সুতরাং আশৈশব স্বধর্মের বিশুদ্ধ চর্চা ও যথাযথ অনুশীলন ব্যক্তির অপরাধস্পৃহা অবদমন সহ আত্মশুদ্ধির জন্য সহায়ক।

১২.৪.১. কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম

সন্তানদেরকে সঠিক প্রতিপালনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম । এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে - "প্রথম সাত বছর তাকে [সন্তানকে] মুক্ত রাখ, দ্বিতীয় সাত বছর তাকে শিষ্টাচার [আদব] শিক্ষা দাও এবং তৃতীয় সাত বছর তার সাথে গভীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোল।"

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী [রা] বলেছেন :

"পিতার ওপর পুত্রের যেরূপ অধিকার আছে পুত্রের ওপরও পিতার তদ্রূপ অধিকার আছে। পিতার অধিকার হলো পুত্র শুধু আল্লাহ্কে অমান্য করার আদেশ ব্যতীত তাঁর সকল আদেশ মেনে চলবে এবং পুত্রের অধিকার হলো পিতা তার একটি সুন্দর নাম রাখবে, তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেবে এবং কুরআন শিক্ষা দেবে।" ['নাহজ্ আল বালাগা']

ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তাকে অংকুরে বিনষ্ট করতে চায়। এ কারণে ইসলামী শরিয়ত মানুষের নৈতিক সুরক্ষার্থে নিম্নলিখিত কর্মসূচী, বিধান ও মূলনীতির মাধ্যমে ব্যক্তির চারদিকে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দেয়, যার বিশুদ্ধ চর্চা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে নিয়ত রক্ষা করতে সহায়ক হয়।

ক. ইসলাম আশৈশব ব্যক্তির সংশোধন, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মলভাবে লালন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত করে তোলে। তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে

www.bjilibrary.com

অপরাধ ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে দিতে চায়। আর প্রকৃত সঠিক ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়-ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং নির্লজ্জতা ও নিষিদ্ধ কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে এক শক্ত প্রতিরোধ। কেননা সে নিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছুই করছে, আল্লাহপাক সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত আছেন।

খ. ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে দূরে রাখার জন্য খারাপ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করে। সে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করে পেশ করা হয়েছে। যা স্বভাবতই মানব মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস করে না।

গ. ইসলাম শরীয়তী বিধি বিধানের মাধ্যমে সকল ভাল কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সৎ কাজে আদেশ- অসৎ কাজে নিষেধ, ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ এবং সকল পাপ, সীমালংঘনমূলক কাজ, অন্যায়, যুল্‌ম ও বিপর্যয় প্রতিরোধের নির্দেশ দেয়।

ঘ. ইসলাম যখন কোন কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সেই কাজের সুযোগ করে দেয় বা অনিবার্য করে তোলে যেসব পথ, তা- ও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়, সেই উপায়, পথ ও পন্থাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যেসব প্রাথমিক অবস্থা ও কর্মকান্ড সেসব নিষিদ্ধ কাজকে সহজ করে দেয়, সেগুলোও সাথে সাথে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ঙ. ইসলাম যখন কোন জিনিস বা কাজ নিষিদ্ধ করে, তখন তদস্থলে একটা বৈধ-কাজের পন্থাও বাতলে দেয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিষিদ্ধ কাজটি পরিহার করে বৈধ কাজটির দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করুক।

চ. মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে পাপ ও অভিশপ্ত কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামে অবশ্য পালনীয় দু'টি ইবাদাত সর্বজন পরিচিত, মৌলিক এবং ব্যাপক প্রভাবশালী ইসলামী জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। এ দুটি ইবাদাত হলো - সালাত ও সাওম। মূলত এ দুটি ইবাদাতই বিশেষ প্রশিক্ষণ স্বরূপ। যার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সকল প্রকার হীনতা-নিচতা থেকে মুক্ত করে কেবল এক আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ বানানো।

সালাত : সালাত মহান আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর বান্দাহ্‌র এবং বান্দাহ্‌র সাথে তার মাবুদের প্রেমময়, গভীর ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ভাবধারার সৃষ্টি করে।

আল কুরআনের সূরা আত ত্বোয়াহা-র ১৩২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "আপনি [হে রাসূল!] আপনার পরিবারের লোকদের নামাযের আদেশ দিন"।

www.bjilibrary.com

আবু দাউদ শরীফে নামায অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, " তোমাদের সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামা য পড়ার নির্দেশ দাও। "

সালাতে মানবদেহের প্রায় সবকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবারের সালাত আল্লাহ্ তা'আলা বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সব মানুষের ওপর ফরয করেছেন। এরই মাধ্যমে বান্দাহ্ ও আল্লাহর মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুনিয়ার কোন মোহ সে সম্পর্ককে দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। বান্দাহ্ তখন ভুলে না যে, তার ওপর আল্লাহর হক সর্বাগ্রে এবং তাঁর ফরমানসমূহ কাজে পরিণত করেই মহামহিমের সেই অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব। মোদ্দা কথা, সারাদিনের কোন মুহূর্তেও মহান আল্লাহ্কে ভুলে না যাওয়াই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বড় সুফল ও মহামূল্যবান প্রাপ্তি। এরূপ অবস্থায় কোন অপরাধজনক কাজে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণেই সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা হচ্ছেঃ

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সর্বপ্রকারের নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে"।

[সূরা আনকাবুতঃ ৪৫]

সাওম : রমযানের মাসব্যাপী সিয়ামের প্রশিক্ষণমূলক অবদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির ওপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং রোযাদারকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। অপরাধ যে ধরনের ও যে প্রকৃতিরই হোক, তা হৃদয়ের কামনা, বাসনা, লোভ ও লালসা থেকে উৎসারিত হয়। আর এর উৎসে তিনটি প্রবল শক্তি নিহিত থাকে। প্রথম, লোভ-লালসা; দ্বিতীয়, যৌন স্পৃহা ও কু-প্রবৃত্তি এবং তৃতীয় হচ্ছে, অহমিকা-দাম্ভিকতা বোধ। সাওমের প্রবল প্রশিক্ষণমূলক প্রভাব রয়েছে এ তিনটি শক্তির ওপর।

এভাবে আল ইসলামের উপর্যুক্ত মূলনীতি ও বিধানাবলীর আলোকে মানব জীবনকে শৈশব-কৈশোর হতে সকল প্রকার অনাচার, পাপ ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করা গেলে মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবেই অপরাধজনক কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। ইসলামের এ বিধানসমূহ প্রতিটি মানব সন্তানকে সেই লক্ষ্যে ক্রমশ প্রস্তুত করে তোলে।

১৩. কিশোর অপরাধীদের জন্য আইন-আদালত ও বিচার ব্যবস্থাপনা

কিশোর অপরাধ থেকে কোন দেশ বা সমাজ মুক্ত নয়। এটিকে একটি রোগ বলে বিবেচনা করা হয়। একাদশ পোপ ইতালির রোমে কিশোর অপরাধ সংশোধনের জন্য সেন্ট মাইকেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এ সমস্যার অস্তিত্ব ছিলো।

তবে কিশোর অপরাধ সংশোধনের ধারণাটি গত শতকের। সভ্য সমাজ ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে, কিশোর অপরাধ যতটা না শাস্তিমূলক, তার চেয়েও বেশি সংশোধনমূলক।

www.bjilibrary.com

১৩.১. বাংলাদেশে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন তৈরীর প্রেক্ষাপট

১৯৭৪ সালে শিশু-কিশোরদের জন্যে 'চিল্ড্রেন এ্যাক্ট, ১৯৭৪' প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৬ সালে 'চিল্ড্রেন্স রুলস, ১৯৭৬' জারী করে প্রথমতঃ ঢাকা জিলা এবং পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে এ আইনের আওতায় আনা হয়। 'শিশু আইন, ১৯৭৪' এবং 'শিশু বিধি, ১৯৭৬'র ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালের ১লা জুন তারিখে ঢাকার অদূরে টংগীতে ২০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান [বর্তমান নাম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র] স্থাপন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, অপরাধী কিশোরদের কারাগারে অপরাপর বয়স্ক, দাগী অপরাধী ও অন্যান্য খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে রেখে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন এবং অপরাধ প্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল ও অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কিশোরদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এ প্রতিষ্ঠানটি কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র এ তিন ভাগে বিভক্ত। এর পর ১৯৯৬ সালে কিশোর অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণের আশা নিয়ে সরকার যশোর শহরের অদূরে পুলেরহাট নামক স্থানে আরও একটি 'কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান' চালু করেছেন। তাছাড়া গাজীপুরের কোনাবাড়িতে রয়েছে একটি 'কিশোরী সংশোধনী কেন্দ্র'। এটি স্থাপিত হয় ১৯৮২ সনে।

১৩.২. ভবঘুরে আইন, ১৯৫৩

অভাব অনটন, পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনা, অবহেলা আর অনাদরে গৃহত্যাগী কিশোর-কিশোরীরা শহরে এসে হয় ভবঘুরে বা টোকাই। ভবঘুরেদের পুনর্বাসনকল্পে ১৯৪৩ সালে কলকাতায় ভবঘুরে আইন জারি হয়। বাংলাদেশে এ আইন প্রবর্তিত হয় ১৯৫৩ সালে। এরপর ১৯৬২ সালে গাজীপুরের পুবাইলে এবং ময়মনসিংহের ধলায় দুটি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৭ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো ৪টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এগুলো হলোঃ ঢাকার মীরপুর, গাজীপুরের কাশিমপুর, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ও মানিকগঞ্জের বেতিলে। এসব আশ্রয় কেন্দ্রে আসন খালি হয়ে গেলেই পুলিশের মাধ্যমে ভবঘুরেদের আটক করা হয়। প্রথমে তাদেরকে মীরপুর ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়। এখানে সামারী কোর্ট বসে। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পরিচালনা করেন। শুনানির পর আবাস-স্থলহীন,পরিচয়হীনদের রেখে দেয়া হয় ভবঘুরে আশ্রমে। অন্যদের অর্থাৎ যারা নাম, ঠিকানা যথাযথভাবে বলতে পারে তাদেরকে ফেরৎ দেয়া হয় অভিভাবক অথবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। আশ্রয় কেন্দ্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশুনাও করানো হয়। এখানে আশ্রিতদের বেশীর ভাগই ১২-২৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী।

১৩.৩. শিশু আইন, ১৯৭৪

অপরাধী কিশোরদের সংশোধনার্থে প্রণীত শিশু আইন, ১৯৭৪ এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ আইনে বলা হয়েছে:

www.bjilibrary.com

ধারা-৬-বয়স্ক অপরাধীদের সাথে কিশোর অপরাধীর বিচার একত্রে হবে না

১. ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৯ ধারা অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাই থাকুক না কেন কোন বয়স্ক অপরাধীর সাথে একত্রে কোন কিশোর অপরাধীর বিচার করা যাবে না।

২. যদি কোন শিশু ফৌজদারী কার্যবিধির ২৩৯ ধারায় বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে অপরাধী হয় তবে আমল গ্রহণকারী আদালত শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তির বিচার পৃথকভাবে করার নির্দেশ দেবেন।

ধারা -- ৪৯-- জামিনে মুক্তি প্রদান করা না হলে সেক্ষেত্রে করণীয়

১. যেক্ষেত্রে আপাত: দৃষ্টিতে ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে ৪৮ ধারা অনুযায়ী জামিনে মুক্তি না দেয়া হয় সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত শিশুকে আদালতে হাজির করার পূর্ব পর্যন্ত রিমান্ড হোম বা নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন।

২. আদালত উক্ত শিশুকে জামিনে মুক্তি না দিলে রিমান্ড হোম বা নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য আদেশ দেবেন।

ধারা-৫১-শাস্তি প্রদানে বাধা নিষেধ

১. অন্য কোন আইনে যাই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদন্ড প্রদান করা যাবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত যদি মনে করেন যে, শিশুটি এতই অপরাধ করেছে যে অত্র বিধানে শাস্তি যথেষ্ট নয় অথবা যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটি এত দুর্দান্ত ও লম্পট চরিত্রের যে তাকে কোন সংশোধনাগারে রাখা যথোপযুক্ত নয়, তাহলে আদালত শিশুটিকে কারাদন্ড প্রদান করতে পারেন অথবা আদালত যেরূপ মনে করেন সেরূপ জায়গায় আটক থাকার আদেশ প্রদান করতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে মেয়াদের জন্য তাকে দন্ডিত করা যেত তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য তাকে আটকাধীন রাখা যাবে নাঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, এরূপ আটকাবস্থার যে কোন সময় আদালত উপযুক্ত মনে করলে এরূপ আটক রাখার পরিবর্তে ১৮ [আঠার] বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন সংশোধনাগারে রাখার আদেশ প্রদান করতে পারেন।

২. কিশোর অপরাধীকে তার কারাদন্ড ভোগকালীন সময়ে বয়স্ক কয়েদীদের সাথে একত্রে আটক রাখা যাবে না।

ধারা-৫২-সংশোধনাগারে আটক রাখা

কোন শিশু যদি মৃত্যুদন্ডে, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় কোন অপরাধে দন্ডিত হয়, তাহলে আদালত উক্ত শিশুকে সংশোধনাগারে আটক রাখার আদেশ প্রদান করতে

www.bjilibrary.com

পারবেন, তবে এ আটকের মেয়াদ ২ [দুই] বৎসরের কম ও ১০ [দশ] বৎসরের বেশি হবে না এবং কোনক্রমেই শিশুর বয়স ১৮ [আঠার] বৎসর অতিক্রম করতে পারবেনা।

ধারা-৫৩- কিশোর অপরাধীকে অব্যাহতি প্রদান বা যথোপযুক্ত হেফাজতে রাখা

১. আদালত উপযুক্ত মনে করলে কোন শিশু অপরাধীকে ৫২ ধারা অনুযায়ী কিশোর সংশোধনাগারে আটক থাকার আদেশের পরিবর্তে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন-

ক. যথাযথ সতর্ক করে অব্যাহতি, অথবা

খ. জামানতসহ বা ব্যতীত সর্বোচ্চ ৩ [তিন] বৎসরের সদাচরণের মুচলেকা গ্রহণ পূর্বক শিশুটির পিতামাতা বা অভিভাবক বা বয়স্ক আত্মীয় বা তাদের কোন যোগ্যতম ব্যক্তির হেফাজতে দিতে পারেন এবং আদালত আরো নির্দেশ প্রদান করতে পারেন যে, শিশুটি প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

২. যদি আদালত প্রবেশন অফিসার বা অন্য কোন মাধ্যমে সংবাদ পান যে, শিশুটি সদাচরণে ব্যর্থ হচ্ছে তখন আদালত তা তদন্ত করে সন্তুষ্ট হলে প্রবেশনের বাকী মেয়াদ কোন সংশোধনাগারে আটক রাখার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

ধারা-৬৫-পলাতক শিশুর প্রতি পুলিশের কার্যক্রম

বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাই থাকুক না কেন, কোন পুলিশ অফিসার বিনা পরোয়ানায় সংশোধনাগার হতে বা কোন তত্ত্বাবধায়কের নিকট হতে পলাতক কোন শিশুকে গ্রেফতার করতে পারবেন এবং এরূপ শিশুর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ রেকর্ড না করে বা তাকে অভিযুক্ত না করে উক্ত শিশু বা কিশোর অপরাধীকে সংশোনাগারে বা তত্ত্বাবধায়কের নিকট পুনরায় প্রেরণ করবেন এবং কোন শিশু বা কিশোর অপরাধী এরূপ পলাতক হবার কারণে কোন অপরাধ করে নি বলে ধরে নেয়া হবে।

১৩.৪. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

ধারা -৩৪- শিশু ও কিশোর নিয়োগে বাধা-নিষেধ ।

(১) কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোরকে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না। যদি না --

(ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একজন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র মালিকের হেফাজতে থাকে।

(খ) কাজে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের উল্লেখ সম্বলিত একটি টোকেন বহন করেন।

www.bjilibrary.com

ধারা-৩৯- কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধা: কোন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিষ্কারের জন্য, উহাতে তেল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য বা উক্ত চালু যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে কোন কিশোরকে কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

ধারা- ৪০- বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ:

(১) কোন কিশোর যন্ত্রপাতির কোন কাজ করিবেন না, যদি না -

(ক) তাহাকে উক্ত যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিপদ সম্পর্কে এবং এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন

সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল করানো হয়,

এবং

(খ) তিনি যন্ত্রপাতিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তিনি যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞ এবং পুরোপুরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করেন।

ধারা - ৪১- কিশোরের কর্ম-ঘন্টা

(৩) কোন কিশোরকে কোন প্রতিষ্ঠানে সন্ধ্যা ৭ঃ০০ ঘটিকা হইতে সকাল ৭ঃ০০ ঘটিকার মধ্যবর্তী সময়ে কোন কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না।

ধারা - ৪২- ভূগর্ভে এবং পানির নিচে কিশোরের নিয়োগ নিষেধ

কোন কিশোরকে ভূগর্ভে বা পানির নিচে কোন কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

১৩.৫ কিশোর আইন সমূহ পর্যালোচনা

প্রথমত শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, কিশোর আদালত সাধারণত কোনো শাস্তি প্রদান না করে মূলত কিশোরদেরকে সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আমাদের দেশের কিশোর সংশোধনাগারের সংখ্যা হাতে গুণা কয়েকটি মাত্র। যা প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েত অপ্রতুল। অন্যদিকে দেশের কারাগারগুলোর বাস্তব অবস্থা উল্টো। সেখানে শিশু-কিশোর অপরাধীদেরকে সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হয়। যার পরিণতি হয়ে উঠে ভয়াবহ।

হাইকোর্ট ২০০৩ সালের ৯ এপ্রিল এক আদেশে কিশোর অপরাধীদেরকে সাধারণ কয়েদীদের সাথে না রাখা সহ পৃথক হোমের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু এ নির্দেশনাটি কার্যকর হয় নি। ফলে যেসব কিশোর অপরাধী কারাগারে থাকছে তারা সংশোধনের সুযোগ তো পাচ্ছেই না বরং বয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আরও দাগী অপরাধীতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

www.bjilibrary.com

অন্যদিকে আমাদের দেশের কল-কারখানা মিল-ফ্যাক্টরীগুলোতে বাছ-বিচারহীন ভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে কিশোর কিশোরীদের। এসব কিশোর কিশোরী কাজ করার জন্য শারীরিক ভাবে সক্ষম কী না - সে বিষয়ে কোন চিকিৎসকের নিকট থেকে সনদপত্র গ্রহণের গরজ বোধ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে. কিশোর কিশোরীদের এমন সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয় যা শ্রম আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। শুধু তাই না, তাদেরকে দিয়ে গভীর রাত পর্যন্তও কাজ করানো হয়ে থাকে। আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, অনেক কিশোরী রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে বিধ্বস্ত দেহ ও মন নিয়ে ঘরে ফিরছেন।

১৪. সুপারিশমালা ঃ

০১. **সমন্বিত ভূমিকা গ্রহণ:** কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে মাতা-পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিক সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র সবাইকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। সুস্থ কিশোর - মানস ও মনন গঠনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্ব স্ব স্থান থেকে সমন্বিত প্রয়াস চালাতে হবে।

০২. **দারিদ্র দূরীকরণ:** দারিদ্র বিমোচনে দেশের অর্থনীতিবিদ্ সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্যোগী হতে হবে।

০৩. **বিনোদন :** প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশস্ত খেলার মাঠ থাকা উচিত। বিদ্যালয় গুলোতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, বিজ্ঞান মেলা, বই পড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্ক উৎসব, দেয়ালিকা প্রকাশ ইত্যাদি নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। স্কুলগুলোতে ছাত্রদেরকে 'বয় স্কাউট' ও ছাত্রীদেরকে 'গার্ল গাইড' - এ যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। সরকারী উদ্যোগে প্রতিটি বিভাগে একটি করে শিশু-কিশোর পার্ক থাকা উচিত। জাতীয় দৈনিক পত্রিকা গুলোতে সাপ্তাহিক বা মাসিক কিশোর পাতা প্রকাশ এবং রেডিও ও টিভি চ্যানেল গুলোতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। কিশোর পত্রিকা, উপযুক্ত কিশোর সাহিত্য রচনা এবং কিশোরদের উপযোগী শর্ট ফিল্ম নির্মাণ করা উচিৎ। জাতীয় ভাবে বছরের একটি দিনকে 'জাতীয় কিশোর দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন এবং কিশোর-কিশোরীদের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের জন্য কিশোর পুরস্কার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

০৪. **ধর্মচর্চা :** ধর্মীয় নৈতিকতা কিশোর মনে পোক্তভাবে প্রোথিত হতে হবে। এ লক্ষ্যে আশৈশব ধর্মের বিশুদ্ধ চর্চা ও যথাযথ অনুশীলন করতে হবে।

০৫. **সুশিক্ষক নিয়োগদান :** শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি-সামর্থ্য- চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণ সমূহ অবগত হয়ে শিক্ষক এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন এবং শিক্ষার্থীর

www.bjilibrary.com

অধীত বিষয় সমূহে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করবেন। শিক্ষকদের আদর-যত্ন, মায়া-মমতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে নিরাপত্তা বোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগদান এবং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে শিশু-কিশোরদের মানসিকতা অনুধাবন করার মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

০৬. **পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন :** শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য ও অভিরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

০৭. **আত্মহত্যা রোধ:** আত্মহত্যা প্রতিরোধে প্রাথমিক অবস্থায় ঝুঁকি নির্ণয় পূর্বক চিকিৎসা করতে হবে। ডিপ্রেশন শনাক্ত করা সম্ভব হলে চিকিৎসা সহজ হতে পারে। এক্ষেত্রে মনোচিকিৎসকের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের সহজ-নাগাল থেকে কীটনাশক দ্রব্যাদি দূরে রাখতে হবে। চারপাশে এমন কিছু যথাসম্ভব না রাখা যা আত্মহননে সাহায্য করে।

০৮. **সংবেদনশীল মনোভাব প্রদর্শন:** যে কোন সমস্যার ওপর তাদের কথা ধৈর্য, আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে মন দিয়ে শুনতে হবে এবং সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে সে মনে করে তার কাজে বড়দের সমর্থন ও সহানুভূতি আছে। কথায় কথায় তাদের সাথে ঝগড়া বা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

৯. **টিনএজ-ক্রাইসিস বিষয়ে কাউন্সেলিং :** ক্ষেত্রবিশেষে টিনএজ-ক্রাইসিস বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী বা মনোচিকিৎসকগণের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সেলিং সার্ভিসে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে সমস্যা মুকাবিলায় মনোবল সঞ্চয় করানো যেতে পারে।

১০. **কিশোর সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা :** সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগে কিশোর সংশোধনাগারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সংশোধনাগার গুলোকে সত্যিকার অর্থে কিশোর -বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেখানে কিশোর-কিশোরীদের আত্মিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে কিছু দিন পর পর সংশোধনাগারে আনীত কিশোর-কিশোরীদের উন্নতি - অগ্রগতি যাচাই পূর্বক তদনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. **শ্রম পরিদর্শন দপ্তরের তদারকী :** কলকারখানাসমূহে সরকারের শ্রম পরিদর্শন দপ্তরের আন্তরিক তদারকী জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের নিয়োগ ও কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে শ্রম আইনের বিধান সমূহ প্রতিপালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

www.bjilibrary.com

১২. **কিশোর আইন রিফর্ম সেল গঠন :** বয়সের নিরিখে কিশোরের একটি একক আইনানুগ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কিশোরদের জন্য প্রণীত আইন সমূহকে আরও প্রাক্‌টিক্যাল ও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে বিচারপতি, আইনজীবী, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, পুলিশ কর্মকর্তা ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কাজ করছেন এমন সব এন,জি,ও -র প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় ল' কমিশনের আওতায় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি 'কিশোর আইন রিফর্ম সেল' গঠন করা যায় কী না ভেবে দেখা যেতে পারে।

১৩. **আদর্শ ও উদাহরণ স্থাপন :** সর্বোপরি সমাজের সকল স্তরের অভিভাবক ও বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সর্বক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের সামনে কথা ও কাজের সমন্বয়ে আদর্শ স্থাপন করতে হবে।

উপসংহার

আমাদের কিশোর-কিশোরীরা আমাদের গর্বের ধন, আমাদের সম্পদ। এরাই আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দেবে, এরাই হবে জাতির কর্ণধার। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি-অগ্রগতি এদের ওপরই নির্ভর করছে। সুতরাং, কৈশোর থেকে ওদেরকে সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সুনাগরিক হিসেবে, আলোকিত মানুষ হিসেবে। এ লক্ষ্যে উপরের সুপারিশমালার আলোকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। এভাবেই ক্রমশ অপরাধ ও অপরাধীদের রাহুগ্রাস থেকে কিশোর-কিশোরীদেরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সম্ভব ওদেরকে প্রকৃত জনসম্পদে পরিণত করা। অন্যায় ও অবক্ষয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সোনালী ভোরের রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক আমাদের নতুন প্রজন্ম– এই-ই হোক সবার সম্মিলিত প্রত্যাশা।

গ্রন্থপঞ্জি :

০১. ডক্টর মোহাম্মদ সাদেক, 'অপরাধ ও সংশোধন',

০২. গাজী শামছুর রহমান, 'অপরাধ বিজ্ঞান',

০৩. ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, 'অপরাধ-তত্ত্ব',

০৪. হামজা হোসেন, 'অপরাধ বিজ্ঞান', ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

০৫. ডঃ সুকুমার বসু, 'অপরাধ ও অপরাধী',

০৬. মওলানা আঃ রহীম, 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম',

০৭. আহমদুল্যাহ মিয়া ও এ এস এম আতীকুর রহমান। কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কিশোরদের বর্তমান অবস্থান উপর জরিপ। ঢাকা : সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮। পৃ: ৬

০৮. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান 'আত্মহত্যায় আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

০৯. এডভোকেট সাহিদা বেগম, 'পতিতা আইন' [The Suppression of Immoral Traffic Act, 1933] খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০৫।

১০. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা,' বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৭।

১১. মোহাঃ আবদুস সালাম, 'অপরাধ, শাস্তি, সংশোধনীমূলক প্রবেশন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর সংশোধনমূলক কার্যক্রম', আলীগড় লাইব্রেরী, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৮৯।

www.bjilibrary.com

১২. বেবী মওদুদ সম্পাদিত, 'দেহ ব্যবসায় বাধ্য কিশোরীরা', বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রকাশিত, অক্টোবর, ১৯৯২।
১৩. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ও মোঃ শাওকাত ফারুক, 'শিক্ষা ব্যবস্থা', আহমদ পাবলিশিং হাউস, মে,১৯৯৮।
১৪. ভক্তি প্রসাদ মল্লিক, 'অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩।
১৫. সি ডি আই জার্নাল, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯২, শান্তিবাগ, ঢাকা।
১৬. আলী ইবনে আবি তালিব, 'নাহজ্ আল বালাঘা' র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০
১৭. আবু মাহমুদ ঃ বাজেট ঃ পরিকল্পনা- দারিদ্র বিমোচন, হককানী পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮,
১৮. Morales A., Yvonne F. And P.R. Munford. The Juvenile Justice System and Minorities. Social Work, Boston: Allyn and Bacon INC,1986 Pp.391-3
১৯. Tappa Paul, Juvenile Deliquency. New York: Mc Graw Hill Book Company, INC. 1949.p-17.
২০. Ahmed, Salahuddin. Studies in Juvenile Delinquency and Crime in East Pakistan. Dhaka: College of Social Welfare and Research Center, 1966. P. 19
২১. Mia Ahmadullah. Criminal, Propensity of Youth: Prevention and Suppression. The Detective.Vol.II No. 1Janurary 12. 1988 Dhaka pp 4647
২২. See. Ahmadullah, A.K. Social Factors of Juvenile Offence in East Pakistan. College of Socialwelfare and Rescarch Center. 1964; Mohammad Afsaruddin.
২৩. Juvenile Deliquency in East Pakistan. Social Science Research Project. Dhaka University. 1965.
২৪. Govt. of Bangladesh. The Children Act No. XXXIX of 1974; Rules vide notification date.11 March 1976 framed under the Children Rules 1976.
২৫. Mohammad Afsaruddin, Juvenile Delinquency in Bangladesh, D.U., 1993.
২৬. Kelvin Seifert & Robert J. Hoffnung, 'Child and Adolescent Development',
২৭. Zaria Rahman khan & H.K. Arefeen, 'The Situation of Child Prostitutes in Bangladesh.', Centre For Social Studies, Dhaka, 1990.
২৮. 'Understanding Your School- Age Child', Alexandria, Virginia.
২৯. Abdul Matin : ' The Children's Law of Bangladesh' February, 1993, Dhaka.
৩০. E. Durkheim, " The Elimentary forms of Religious Life", p.47.

লেখক-পরিচিতি : শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া- বিশিষ্ট আইনবিদ ও লেখক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১১ই মে, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

ইসরাইল একটি অবৈধ রাষ্ট্র। ১৯৪৮ সালের ১৫মে মুসলিম ফিলিস্তিনে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া রূপী ইহুদী ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ইহুদীরা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল এবং তাদের কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় বাসস্থান বা দেশ ছিল না। যে দেশে তারা বাস করত, তারা সে দেশেরই নাগরিক ছিল। ইসরাইলের আয়তন ২০,৭৭০ বর্গ কিলোমিটার [৮,০২৯ বর্গমাইল]। এ আয়তনের মধ্যে গাজা, পশ্চিমতীর, গোলান মালভূমি বা অন্য অধিকৃত আরব অঞ্চলগুলিকে ধরা হয়নি। সীমান্তরেখা ১,০০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। ইসরাইলকে ঘিরে আছে মিশর [২২৫ কি.মি], জর্ডন [২৩৮ কি.মি], লেবানন ([৭৯ কি মি], সিরিয়া [৭৬ কি. মি], পশ্চিম তীর [৩০৭ কি. মি], গাজা উপত্যকা [৫১ কি. মি]। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর তটরেখা ২৭৩ কি. মি। জনসংখ্যা ৬২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮শত ৮৩ জন। জনসংখ্যা ৮৩ শতাংশ ইহুদী, ১৭ শতাংশ আরব। ইসরাইলের দখলে থাকা বিভিন্ন আরব এলাকার লোকসংখ্যা ইস রাইলের লোকসংখ্যা হিসেবে ধরা হয়েছে। অধিবাসীদের ইসরাইলি বলা হয়। সরকারি ভাষা হিব্রু। শিক্ষার হার ৯৫.১ শতাংশ। পূর্ব রাজধানী তেলআবিব। ১৯৫০ সালে ইসরাইল অধিকৃত আরব অঞ্চলের জেরুসালেমকে রাজধানী বলে ঘোষণা করে। কিন্তু জাতিসংঘের কোন সদস্য তা মেনে নেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল দেশের দূতাবাস তেলআবিব শহরেই আছে।

www.bjilibrary.com

তেলআবিব দেশের প্রধান বন্দর। হাইফা অন্য উল্লেখযোগ্য শহর। ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তে, পশ্চিম এশিয়ার শেষে, ১৯৪৮ সালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে গঠিত হয় অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল। ইসরাইলের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত জর্ডন নদীর পানিতে তার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল খুব উর্বর। দক্ষিণের নেজেভ অঞ্চল যা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ইসরাইলের ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক তা অনুর্বর মরু অঞ্চল। ইসরাইলের জাতীয় সেচ প্রকল্প নেজেভ অঞ্চলকে কর্ষণযোগ্য করে তুলছে।

ইসরাইলের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী রয়েছে। সৈন্য সংখ্যা ১ লাখ ৬৮ হাজার। এর মধ্যে স্থলবাহিনীর সদস্য হচ্ছে ১ লাখ ২৫ হাজার, নৌবাহিনীর সদস্য ৮ হাজার, বিমান বাহিনীর সদস্য ৩৫ হাজার। তার ওপর তাদের রয়েছে ৪ লাখ ৮ হাজার রিজার্ভ মিলিশিয়া। সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ট্যাংক ৪.৩০০টি, জঙ্গী বিমান ৬১৩টি, যুদ্ধ জাহাজ ১৫টি, সাবমেরিন ৩টি, ২০০টি পারমাণবিক বোমা ও অসংখ্য প্যাট্রিয়টিক মিসাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র সাম্রাজ্যবাদীরা কোন মুসলিম দেশকেই পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে দেবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অথচ ইসরাইলকে তারা করেছে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ। ইসরাইলে এমনভাবে সমরাস্ত্র কারখানাসমূহ গড়ে তোলা হয়েছে যে, তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের অন্যতম সমরাস্ত্র ও সামরিক হার্ডওয়ার রফতানীকারক দেশ। ইসরাইলের দৃষ্টিতে সে চারধারে বৈরী প্রতিবেশী যেমন- ইরান, ইরাক[১], সৌদি আরব, সিরিয়া, জর্ডন, মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া দ্বারা বেষ্টিত যাদের সম্মিলিত আয়তন ১৭ লাখ ৮৪ হাজার ৫ শত ৯৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ২৫ কোটি ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ২৩ লাখ ৯৬ হাজার ৭ শত। ট্যাংক ১৬ হাজার ৫ শত ৪৭টি। সাবমেরিন ২৫টি। ডেস্ট্রয়ার/ফ্রিগেট ৩১টি। ইসরাইলের মতে তার পাশে যেহেতু বৈরী প্রতিবেশী রয়েছে সে জন্যই সে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে। আর এ জন্য করতে হচ্ছে বিপুল অংকের বরাদ্দ। ২০০১ সালে ১০০টি দেশের বিবেচনায় ইসরাইল বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়াতে ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৮৯৫ সালে এর গোড়াপত্তন ঘটে। উক্ত আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি স্থায়ী আবাসস্থান প্রতিষ্ঠা করা।' ১৮৯৭ সালে ইহুদীদের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেস সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে[২] অনুষ্ঠিত হয়। এ

---

১. দখলদার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার আগে ইরাকের ছিল ১০ লক্ষ্য সৈন্য। ছিল ৪৬৫০টি ট্যাংক।

২. রসায়ন শিল্পের শহর খ্যাত সুইজারল্যান্ডের শিল্প সমৃদ্ধ নগরী ব্যাসেল। ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট [BIS] এর প্রধান কার্যালয় এই শহরেই অবস্থিত।

www.bjilibrary.com

সম্মেলনে ইহুদীদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫০ জন ইহুদী পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ অংশ নেন। অত:পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিয়েনাবাসী ইহুদী নেতা, দার্শনিক ও সাংবাদিক থিউডর হারজেল [Theodor Herzel] একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন এবং তা হতেই আধুনিক কালের ইহুদী জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়।

ইহুদী বিশ্বসংস্থা গঠন

ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দান করার জন্য ১৮৯৭ সালে থিউডর হারজেল বুদাপেষ্টে আন্তর্জাতিক ইহুদী আন্দোলনের [International zionism movement] জন্য একটি বিশ্বসংস্থা গঠন করেন। ফিলিস্তিনের মালিক উসমানীয় তুর্কী সালতানাতকে হারজেল স্বপক্ষে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।[৩] ১৯০৪ সালে হারজেল মারা যান।[৪] ১৯০৫ সালে বৃটেন ইহুদীদেরকে তার আফ্রিকান উপনিবেশ উগান্ডা দিতে সম্মত হয়; কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভাবাবেগগত কারণে ইহুদী কংগ্রেসের ফিলিস্তিনের প্রতি আকর্ষণ থাকায় তারা এ দান প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে আন্তর্জাতিক ইহুদী আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। ইহুদীগণ ক্ষুদ্র আকারে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করার অল্প পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী নেতা ও বিজ্ঞানী ডঃ চেইম ওয়েইজম্যান [Chaim Weizmann] ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসবাস করার অনুমতি লাভের বিনিময়ে ইহুদীদের কাছ থেকে মিত্র শক্তির গৃহীত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে তথা মওকুফ করে দিতে স্বীকৃত হন।

বেলফোর ঘোষণা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ ও মার্কিন সরকার ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রশ্নে ইহুদীদের দাবীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফোর [A.J. Balfour][৫] ঘোষণা করেন যে, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসস্থল স্থাপনে ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ

---

৩. তুরস্কে,উসমানীয় বংশের সুলতান আব্দুল হামিদ যখন ক্ষমতায় [১৮৭৬-১৯০৯], তখন ইহুদীরা তাঁর কাছ থেকে ফিলিস্তিনে জমি ক্রয় করতে চেয়েছিল। তিনি ইহুদীদের কাছে এক ইঞ্চি জমিও বিক্রি করতে রাজী হননি। এ জন্যে ফিলিস্তিন দখল করতে ইহুদীরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে।

৪. হারজেলের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক ইহুদী আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হন নাহুম সোকোলভ। তিনি ঘোষণা করেন, ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইহুদীদের আর কোন লক্ষ্য নেই। বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল, ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম, ইহুদী ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ১০৮।

৫. ওয়াইজম্যান তাঁর স্মারকে উল্লেখ করেছেন বেলফোর ছিলেন প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃস্টান ও জায়নবাদী। তিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট তাওরাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদীরা পুনরায় ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহর কাছে এর উত্তম বিনিময়ের আশা করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

সহানুভূতি আছে এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। এটিই বেলফোর ঘোষণা [Balfour Declaration] নামে খ্যাত। এ ঘোষণা বা অঙ্গীকারটি ইংরেজ ইহুদীদের নেতা ও জায়নিষ্ট সংস্থার পৃষ্ঠপোষক লর্ড জেমস রথচাইল্ডের প্রতি লিখিত হয়েছিল। এই ঘোষণার ভাষ্য ছিল সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এ ঘোষণার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২ নভেম্বর ১৯১৭

প্রিয় লর্ড জেমস রথচাইল্ড,

'মহামান্য সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদী জাতির একটি জাতীয় স্বদেশভূমি [National Homeland] সৃষ্টির বিষয়টি সহানুভূতির সাথে দেখছে। এই লক্ষ্য অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণে সে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। স্পষ্টত এ ঘোষণা ফিলিস্তিনে বিদ্যমান ইহুদী সম্প্রদায়গুলোর নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব করছে না। অনুরূপভাবে এটি অন্যান্য দেশে ইহুদীরা যে আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থায় আছে তার ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যদি দয়া করে এ ঘোষণাটি জায়নিস্ট ফেডারেশনকে জানিয়ে দেন।[৬]

আপনার বিশ্বস্ত
আর্থার জেমস বেলফোর।

বৃটেন ছিল তদানীন্তন বিশ্ব পরাশক্তি। বৃটিশ সাম্রাজ্যে তখন নাকি সূর্য অস্ত যেতনা। ইহুদীরা তাই বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারস্থ হয়। বৃটেন ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বেলফোর ঘোষণা দ্বারা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে বলে ইহুদী মহলে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। বৃটেন ইহুদী সংঘের সভাপতি লর্ড রথচাইল্ড বেলফোর ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেন। প্রকৃতপক্ষে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে ইহুদীদের সমর্থন লাভ ও মুসলিম ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে বেলফোর ঘোষণা রচিত হয়েছিল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ [১৯১৬-১৯২১] এ ঘোষণাকে ইহুদীদের জন্য বৃটিশের একটি পুরস্কার বলে অভিহিত করেন। ফিলিস্তিন সমস্যা তথা মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার ইতিহাসে বেলফোর ঘোষণা একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। লঘুচিত্তে এ ঘোষণা করা হয়নি। এ ঘোষণার পেছনে বহুবিধ কারণ ছিল। যেমন–

১. রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর বৈপ্লবিক সরকার 'বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হতে সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ ইচ্ছা কার্যে পরিণত হলে পূর্ব ফ্রন্টে নিয়োজিত বিপুলসংখ্যক জার্মান সৈন্য পশ্চিম ফ্রন্টে নিয়োজিত

৬. বেলফোর ঘোষণা বিষয়ে আরও জানার জন্য দেখুন মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

www.bjilibrary.com

হতে পারত। এর ফলে ফরাসি সীমান্তে মিত্রবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ সম্ভাবনা দূর করার জন্য যে কোন উপায়ে আরও কিছু দিন রাশিয়াকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখার নীতি গৃহীত হয়। বলশেভিক বিপ্লবে রাশিয়ার ইহুদীগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যেও বেশ কিছুসংখ্যক ইহুদী ছিল। মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেতৃস্থানীয় বলশেভিক ইহুদীদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তাদের সহায়তায় রাশিয়াকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর নেতৃত্বাধীন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখা যাবে।

২. ১৯১৭ সালের এপ্রিলের ৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বেপরোয়া ডুবো জাহাজ ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও সীমিতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করেনি। এই অবস্থায় মিত্রশক্তিবর্গ যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন [১৯১৩-১৯২১ কার্যকাল] সহ মার্কিন প্রশাসনের উপর ইহুদী বুদ্ধিজীবি ও ধনী-বণিকদের প্রভাব সম্বন্ধে সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। বেলফোর ঘোষণার একটি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীদের সহানুভূতি লাভ করে তাদের মাধ্যমে মার্কিন সরকারকে পূর্ণভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হবে বলে মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন।

৩. রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ হতে যে হারে ইহুদীগণ পাশ্চত্যদেশ সমূহে আগমন করছিল তা এ সমস্ত দেশের সরকার খুব প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। ইহুদী অভিবাসীদের ফিলিস্তিনে পাঠিয়ে এই কষ্টকর দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়া যাবে বলে তারা মনে করেছিলেন।

৪. বেলফোর ঘোষণার পশ্চাতে নির্যাতিত ইহুদীদের প্রতি মানবিক সহানুভূতি ক্রিয়াশীল ছিল বলে দাবী করা হয়। মধ্যযুগ হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের হস্তেই ইহুদীরা নির্যাতিত হয়েছে বলে ইহুদীদের ভবিষ্যত নিরাপদ করা নিজেদের দায়িত্ব বলে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন।

৫. বেলফোর ঘোষণার পশ্চাতে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও লুকায়িত ছিল। সুয়েজখাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এত প্রয়োজনীয় ছিল যে, এর নিরাপত্তার জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বৃটিশ সরকার প্রস্তুত ছিল। আরবদের উপর তারা আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ইহুদীদের যদি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে এই এলাকায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করবে বলে তাদের ধারণা হয়েছিলো।

www.bjilibrary.com

বেলফোর ঘোষণা শুধু ফিলিস্তিন সমস্যার ইতিহাসে নয় পরবর্তী সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘোষণা জায়নবাদীদের এক বিরাট বিজয়। এরপর জায়নবাদীদের লক্ষ্য হয় :

ক. অন্য মিত্র শক্তি কর্তৃক বেলফোর ঘোষণা অনুমোদন,

খ. সাইকস-পিকো চুক্তিতে ফিলিস্তিনে যে আন্তর্জাতিক প্রশাসন প্রবর্তিত হওয়ার কথা ছিল তার পরিবর্তে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি শাসন চালু করা।

প্রথম লক্ষ্য সহজেই অর্জিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ঘোষণাটি অনুমোদন করে। দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনের পথে একমাত্র ফরাসী সরকার প্রতিবন্ধকা সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু ফরাসী জায়নবাদীগণ তাদের সরকারের উপর যথেষ্ট পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়ায় সম্ভাব্য ফরাসী বিরোধিতা দূরীভূত হয় এবং স্যানারোমা সম্মেলনে ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের উপর ম্যান্ডেটরী শাসন কর্তৃত্ব প্রদান, ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহুদী এজেন্সীর [Jewish Agency] সহযোগিতায় কাজ করবে বলে ফ্রান্স একমত হয়।

তবে ফিলিস্তিন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সুস্পষ্ট নীতির অভাব ছিল। বেলফোর ঘোষণার অস্পষ্টতা ছাড়াও ইহুদীদের আবাসভূমির পরিধি সম্বন্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কোন ধারণা ছিল না। জায়নবাদীদের দাবী যে ফিলিস্তিনের সীমানার বাইরে পরিব্যাপ্ত ছিল সে সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। ১৯১৯ সালে প্যারিস সম্মেলনে জায়নবাদীগণ যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাতে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের পূর্ণ সীমানা বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়। এই সীমানার মধ্যে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শাসনাধীন সমগ্র ফিলিস্তিন ছাড়া–

ক. হারমন পর্বতে জর্ডন নদীর উৎপত্তিস্থল এবং লিতানী নদীর দক্ষিণ অংশসহ দক্ষিণ লেবানন;

খ. ইয়ারমুক নদী, কানেতরা শহর ও গোলান উচ্চভূমিসহ দক্ষিণ-পশ্চিম সিরিয়া;

গ. জর্ডন উপত্যকা, ডেডসী এবং আম্মানের পশ্চিম অঞ্চল হতে আকাবা পর্যন্ত ভূ'ভাগ এবং

ঘ. আল আরিশ হতে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭]

বৃটিশ শাসনে ইহুদীদের সুযোগ : ১৯১৭ সালে জেরুসালেম বৃটিশের দখলে চলে যায়। বৃটিশ ছত্রছায়ায় এ সময় ফিলিস্তিনে বিপুলভাবে ইহুদী আগমন শুরু হয়। ১৮৯৫ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৪৭০০০। তখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৫৩ হাজার। ১৯১৯ সাল নাগাদ ইহুদীদের সংখ্যা ৫৮ হাজারে উন্নীত হয়।

---

৭. Ben Halpern, the Idea of the Jewish state [Cambridge, Mass : Harvard university press, 1961, pp. 303-304.]

www.bjilibrary.com

ম্যান্ডেট শাসনামলে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের আগমণ ও আরবদের অসন্তোষ : বৃটিশ ম্যান্ডেট শাসনাধীন আসার পর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে এসে ভিড় জমাতে থাকে। বৃটেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে ইহুদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। তাদের জমি কেনার অধিকার দেয়া হয়। ফলে দ্রুত ইহুদী সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথম সংঘবদ্ধ আগমন [আলিয়া][৮] ম্যান্ডেটরি শাসনের পূর্বে ঘটলেও বাকি চারটি আলিয়া বৃটিশ শাসনামলেই ঘটে ও শেষ আলিয়াতেই সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক ইহুদী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

আলিয়া	বৎসর	আগত ইহুদী
প্রথম	১৮৮২-১৯০৩	৩০,০০০
দ্বিতীয়	১৯০৪-১৯১৪	৪০,০০০
তৃতীয়	১৯১৫-১৯২৩	৩৫,০০০
চতুর্থ	১৯২৪-১৯৩১	৮২,০০০
পঞ্চম	১৯৩২-১৯৪৮	৩,০০,০০[৯]

বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনের অর্থনীতিতে বহিরাগত ইহুদীদের নিয়ন্ত্রনাধিকার দিয়ে আইন প্রণয়ন করে। ধনী, শিক্ষিত, ব্যবসা বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান ইহুদীদের প্রভাবের মুখে গরীব ফিলিস্তিনী মুসলিমরা ক্রমে তাদের জমি ও ব্যবসা সম্পত্তি হারিয়ে নিজ বাসভূমেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে। বিত্তবান ইহুদীরা দরিদ্র ফিলিস্তিনীদের ভূমি ক্রয় করে তাদেরকে সর্বহারায় পরিণত করে। এভাবে ইহুদীদের আগমন ফিলিস্তিনী আরবদের স্বার্থহানি ঘটায়। এতদ্ব্যতীত ফিলিস্তিনে ইহুদী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও শোকের দেওয়াল [Wailing wall] বলে তীর্থ স্থানটি ইহুদীরা দখল করে নেয়। এটি মুসলিমদেরও পবিত্র ধর্মীয় স্থান ছিল। ইহুদীরা তেলআবিব শহর ও হাইফায় বন্দর নির্মাণ করে। আন্তর্জাতিক ইহুদী কংগ্রেসের সভাপতি নাহুম গোল্ডম্যান ঘোষণা করেন যে, বৃটেন যদি ফিলিস্তিনের শতকরা ৬৫ ভাগ এলাকায় আমাদের জন্য একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয় তাহলে আমরা ফিলিস্তিনে বৃটেনের নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর জন্য ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দিতে রাজী আছি। এসব কারণ এবং বৃটিশ ভেদ নীতির ফলে ফিলিস্তিনী মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। অপমানিত ও বঞ্চিত ফিলিস্তিনী নাগরিকরা এ অন্যায়, অবৈধ ও অপমানাত্মক পরিস্থিতির প্রতিকার প্রার্থনা করে লীগ অব নেশনসের কাছে আর্জি পেশ করে। এ অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে

৮. রাশিয়ার ইহুদী বিরোধী আন্দোলনের ফলে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ হতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আগমনকে প্রথম 'আগমন' [আলিয়া] বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচটি আলিয়ায় ইহুদীগণ ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে।

৯. S. N. Eiesnstadt, Israeali Society [Landon : Weidenfeld and Ncolson, 1967], P. 11.

www.bjilibrary.com

তোলার জন্য ফিলিস্তিনীরা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নেয়। বৃটিশ বাহিনী তা নৃশংস ভাবে প্রতিহত করে। বৃটিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীরা ১৯২০, ১৯২৮, ১৯২৯ সালে বিদ্রোহ করে। এ সময় মুসলিম-ইহুদী দাঙ্গাও দেখা দেয়। ১৯৩০ সালে শোকের দেওয়ালকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনী আরব ও ইহুদী দাঙ্গা শুরু হয়। বৃটিশরা ইহুদীদের পক্ষ নেয়। ফিলিস্তিনে অবস্থানরত বৃটিশ সৈন্য বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে জরুরী আইন প্রয়োগ করে। সমগ্র ফিলিস্তিনকে তারা বন্দীশিবিরে পরিণত করে। ১৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনীকে হত্যা, ৩০ হাজারেরও বেশি আহত এবং ১ লক্ষ ফিলিস্তিনীকে কারাগারে অথবা নির্যাতন শিবিরে প্রেরণ করে। তবুও সংঘাত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ১৯৩০ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা যুদ্ধের পূর্বেকার সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেলে ফিলিস্তিনী আরবগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ইহুদীদের জন্য রুশ কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা : ক্রেমলিন ১৯২০ সালে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট গেরিলা নেতা ভ্লাদিমির গাব্রটস্কীকে ফিলিস্তিনে পাঠায় ইহুদী যুবকদের ট্রেনিং এর দায়িত্ব দিয়ে। রাশিয়া এ সময় ইহুদীদের অর্থনৈতিক সহযোগিতাও প্রদান করে। ইহুদীদের প্রাপ্ত অর্থের ৪০ ভাগেরই যোগানদার ছিল রাশিয়া। এছাড়া ফিলিস্তিনে মস্কো প্রেরিত প্রতিনিধিদল কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফিলিস্তিনে রুশ ইহুদীদের জন্য জমি কিনে। ১৯২১-৩৯ সালের মধ্যে ফিলিস্তিনে আমদানী হওয়া প্রায় সাড়ে তিন লাখ ইহুদীর মধ্যে রাশিয়া থেকে আসা ইহুদীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৫ হাজার।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক ইহুদী পুনর্বাসন স্থগিত করণ ও সিম্পসন কমিশন[১০] গঠন : ১৯৩০ সালে ওয়ার্লড জায়নিষ্ট অর্গানাইজেশন ও ফিলিস্তিন ইহুদী এজেন্সী এ দু'টি ইহুদী সহায়ক সংস্থার সাথে বৃটিশ সরকারের মতবিরোধ দেখা দিলে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পুনর্বাসন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে স্যার জন হোপ সিম্পসনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করে। এ কমিশনকে ফিলিস্তিনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট পেশের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিত্তশালী ও স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন ইহুদীদের সাথে প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনীরা যে স্বভাবতঃই হেরে যাচ্ছে একথা রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে ফিলিস্তিনীরা উৎখাত হয়েছে তাও রিপোর্টে উল্লেখিত ছিল। ইহুদী ও ফিলিস্তিনী আরব নেতৃবর্গের সাথে সংযুক্তভাবে বৃটিশ সরকার কোন আপোষ মীমাংসায় উপনীত হতে পারলেই আরব-ইহুদী সংঘর্ষের অবসান হতে পারে এ অভিমতও রিপোর্টে ব্যক্ত করা হয়। এ কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিন নীতির কতক পরিবর্তন সাধন করে।

---

১০. লোক দেখানোর জন্য ব্রিটিশ বেনিয়ারা এরকম কয়েকটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। কিন্তু এসব কমিশনের সুপারিশ কখনই তারা বাস্তবায়ন করেনি। ১৯২০ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদী মুসলিম সংঘর্ষের পর পালিন কমিশন, ১৯২১ সালে হেক্রোফট কমিশন, ১৯২৯ সালে 'অশ্রু প্রাকারের' সংঘর্ষের পর ১৯৩০ সালে শ' কমিশন, ১৯৩৬ সালে পীল কমিশন ও ১৯৩৮ সালে উজহড কমিশন গঠিত হয়।

www.bjilibrary.com

আন্তর্জাতিক ইহুদী আন্দোলনের নেতৃবর্গের সাথে বৃটিশ মনোমালিন্য ও বৃটিশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ : সিম্পসন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিন নীতিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করলে বিশ্ব ইহুদী সংস্থা এর নিন্দা করে। ইহুদী নিয়ন্ত্রিত গণ-মাধ্যমসমূহে বৃটিশ নীতির নিন্দার ঝড় উঠে। ডঃ ওয়েইজম্যান এর প্রতিবাদে বিশ্ব ইহুদী সংস্থার সভাপতি পদত্যাগ করেন এবং বৃটিশ সরকারের ফিলিস্তিন নীতিকে ইহুদীদের স্বার্থবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিযোগ করেন। বৃটিশ সরকার ইহুদীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকা করেছে এ কথাও বলা হয়। এ সময় বৃটেনের শ্রমিক দলীয় প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড [১৯২৯-৩৫] তাঁর সরকারের ফিলিস্তিন নীতির ৩টি মূল সূত্র স্পষ্টভাবে ইহুদীদের জানিয়ে দেন। এ ৩টি মূল সূত্র হচ্ছে :

১. বৃটিশ সরকারের ফিলিস্তিন নীতির প্রথম সূত্র হচ্ছে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসবাসের সুযোগ দেয়া, ফিলিস্তিনকে ইহুদী স্থানে পরিণত করা নয়।

২. সংখ্যাগুরু আরবদের স্বার্থ রক্ষাও সরকারের কর্তব্য।

৩. ক্রমান্বয়ে ম্যান্ডেট দেশ ফিলিস্তিনকে স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী করে তোলাও বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব।

বৃটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তন : জার্মানীতে হিটলারের উত্থানে বৃটিশ সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে পরবর্তী রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী স্টানলি বলডুইন [১৯৩৫-৩৭] এর আমলে ইহুদীদের সাথে আবার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

১৯৩৫-৩৬ সালে ফিলিস্তিনে দলে দলে ইহুদীদের আগমন : ইতোমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের [১৮৮৯-১৯৪৫] ক্ষমতা লাভের পর ইহুদী দলন শুরু হয় এবং ইহুদীরা দলে দলে জার্মানী থেকে ফিলিস্তিনে আসতে থাকে। ইহুদী আগমনের সংখ্যা ১৯৩২ সালে বাৎসরিক ৯ হাজার হতে ১৯৩৫ সালে ৬০ হাজারে পরিণত হয়। জার্মানীতে ৬ লক্ষ ইহুদী বাস করত। ইহুদীরা মিত্র শক্তির পক্ষে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে হিটলার বহু ইহুদীকে বন্দী করেন, বহু নিহত হয় বাকীরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পালিয়ে যায়। শেষ তক তারা ফিলিস্তিনে গিয়ে হাজির হয়। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা অসাধারণভাবে বেড়ে গেলে ফিলিস্তিনী আরব নেতৃবর্গ প্রমাদ গুণে। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা যুদ্ধের পূর্বেকার সংখ্যার তুলনায় প্রায় চতুর্গুণে দাঁড়ায়।

১৯৩৬ সালের ফিলিস্তিনী-ইহুদী সংঘর্ষ : ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তিনীদের মাতৃভূমি রক্ষার প্রয়াস, ইহুদীবাদ বা ইহুদী পুর্নবাসন আন্দোলন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এ তিন দ্বন্দ্ব শুরু হলে ফিলিস্তিনীরা আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে। এর আগে ১৯৩৫ সালে যৌথভাবে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মারফত ফিলিস্তিনে আরব ও ইহুদীদের নিয়ে একটি আইন সভা গঠনের প্রস্তাব ইহুদী নেতাদের বিরোধিতায় বাতিল হয়ে যায়। ফিলিস্তিনীগণ ইহুদীদের নিকট জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করন, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করন এবং ফিলিস্তিনে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি দাবী বৃটিশ সরকারের নিকট পেশ করে। কিন্তু বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী এ সকল দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে

www.bjilibrary.com

ইহুদীদের পক্ষাবলম্বন করলে ব্যাপক ইহুদী-বিরোধী সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতির চাপে পড়ে বৃটিশ সরকার একটি কমিশন গঠন করে।

পীল কমিশন : ফিলিস্তিনে উদ্ভূত পরিস্থিতির মীমাংসার জন্যে ১৯৩৭ সালে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনের উপর ফিলিস্তিনী-ইহুদী দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও তদনুযায়ী সুপারিশ করার ভার দেয়া হয়। আর্ল পীল ছিলেন এ কমিশনের সভাপতি। তাই এটি পীল কমিশন নামে পরিচিত। পীল কমিশনের রিপোর্টে ফিলিস্তিনকে তিন ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়। প্রথমত: ইহুদীদের জন্য একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হবে। দ্বিতীয়ত: জেরুসালেম, বেথেলহাম প্রভৃতি পবিত্রস্থান ইংরেজদের ম্যান্ডেট শাসনের অধীনে থাকবে এবং নেজারেথ ও গ্যালিলির উপর ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম হবে। তৃতীয়ত: ফিলিস্তিনের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে একটি নতুন আরব রাষ্ট্র গঠিত হবে। এ পরিকল্পনা ফিলিস্তিনে দ্বন্দ্বমান কোন পক্ষই সমর্থন করেনি। ক্রমেই আরব-ইহুদী বিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় কমিশন ও লন্ডন বৈঠক : পীল কমিশনের ব্যর্থতার পর ১৯৩৮ সালে বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ফিলিস্তিন বিভাগের পরিকল্পনা পরিত্যাক্ত হয় এবং ইহুদী ও ফিলিস্তিনী প্রতিনিধিবর্গকে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লন্ডনে এক বৈঠকে আহবান করা হয়। কিন্তু তারা একত্রে বসতে অসম্মত হলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন [১৯৩৭-১৯৪০] তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে নিজ নিজ অভিযোগ বৃটিশ পক্ষকে জানাতে বলেন হয়। যদি আপোষ মীমাংসা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে উভয় পক্ষকে নিয়ে যুগ্ম বৈঠক বসবে বলে স্থির করা হয়। কিন্তু এবারও কোন মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভব হল না।

সমস্যা সমাধানের বৃটিশের নিজস্ব প্রয়াস : পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে বৃটিশ সরকার একটি আপোষ মীমাংসার পরিকল্পনা কার্যকর করে। পরবর্তী ৫ বছরের জন্য বৎসরে ১০ হাজারের বেশি ইহুদী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে পারবে না বলে একটি নীতি গৃহীত হয়। কঠোর সামরিক প্রহরার দ্বারা শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এর অব্যবহিত পরেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আরব-ইহুদী প্রশ্নের কোন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হল না। বিশেষ করে এসময় ইহুদীরা বৃটেনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ইহুদী-মার্কিন ষড়যন্ত্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই মধ্য প্রাচ্যে তার প্রভাব বিস্তারের পথ খুঁজছিল। ১৯৪২ সালে ড. ওয়েইজম্যান সহ কয়েকজন ইহুদী নেতার উদ্যোগে নিউইয়র্কের ইহুদী সম্মেলনে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। ১৯৪৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইহুদী সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস, ট্রুম্যানের [১৯৪৫-১৯৫৩] ওপর চাপ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেঃ ট্রুম্যান ১ লক্ষ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে গ্রহণ করতে বৃটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু আরব অসন্তোষের ভয়ে বৃটিশ প্রধামন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী [১৯৪৫-১৯৫০] তাতে সম্মত হননি।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধোত্তরকালে ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বৃটেন হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। তাই এ সময় মধ্যপ্রাচ্য সমস্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। বৃটেন যখন ফিলিস্তিন সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনা করছে ঠিক সে সময়ই হঠাৎ প্রেঃ ট্রুম্যান ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। এভাবে ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসস্থল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মার্কিন সমর্থনে বাস্তব রূপলাভের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

জাতিসংঘ প্রস্তাব : ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন ফিলিস্তিন সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন করলে সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি[11] গঠন করে। কমিটি ফিলিস্তিন পরিদর্শন করে ৩১শে আগস্ট রিপোর্ট পেশ করে। ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সদস্যবৃন্দ একমত হতে পারেনি। বিশেষ কমিটির একাংশ যেমন ইরান, ভারত, যুগোশ্লাভিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টির প্রস্তাব করে। কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্য যেমন– কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, হল্যান্ড, পেরু, সুইডেন ও উরুগুয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ফিলিস্তিন বিভাগের সিদ্ধান্ত পেশ করে। তারা জেরুসালেম শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন। জায়নবাদীগণ স্বাভাবিকভাবেই 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দান করেন এবং সাধারণ পরিষদে এ প্রস্তাব যাতে গ্রহীত হয় সে ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে। বিশেষ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘর সাধারণ পরিষদ তার ১৮১নং প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে বিভক্ত করণের পক্ষে মত দেয়। প্রস্তাবটিতে ইহুদী রাষ্ট্রে ইহুদী দখলকৃত অঞ্চলসমূহ ছাড়াও আরব অধ্যুষিত বীরসেবা ও পূর্ব গ্যালিলি জিলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দু'রাষ্ট্রের মাঝখানে জেরুসালেমসহ একটি আন্তর্জাতিক এলাকা রাখা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ ৩৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ১৩টি। আরব লীগ এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিনের শতকরা ৮ ভাগ ইহুদী [যাদের ৯০%ই বহিরাগত] পেল দেশের ৫৬ ভাগ এলাকা আর ৯২ ভাগ মুসলিম বাসিন্দারা পেল ৪৪ ভাগ এলাকা। এ ঐতিহাসিক অবিচার কর্ম বৃহৎ চতুঃশক্তির ইহুদী সখ্যতার ফলেই সম্ভব হয়।

শেষ লগ্নে বৃটেনের ভূমিকা : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ফিলিস্তিন বিভক্ত করণের প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ইহুদীরা এ সময় গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। বৃটিশ সেনাবাহিনী ইহুদীদের হাতে

---

১১. ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে কোন বৃহৎশক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কমিটির সদস্য দেশগুলি ছিল : অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, ইরান, হল্যান্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভিয়া।

www.bjilibrary.com

প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়। ইহুদী সন্ত্রাসবাদী সংস্থা 'হাগানা[১২], ইরগুন[১৩] স্টার্নের বেপরোয়া দল, পালমাক বাহিনী জাবোটিনস্কির নেতৃত্বাধীন রিভিশানিষ্টস, [Rivtionists] এ সময় বর্বর কর্মকাণ্ড শুরু করে। বাধ্য হয়ে দেশপ্রেমিক ফিলিস্তিনীরাও অস্ত্র ধারণ করে। ফিলিস্তিনীরা দেশের ৮২ ভাগ এলাকার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমা শক্তিগুলি এতে বিচলিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। ফিলিস্তিন বিভক্তির জন্য নিযুক্ত কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সাহায্য দানে সক্ষম ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে পেশকৃত উক্ত প্রার্থনাটি বৃটিশ ভেটোতে বাতিল হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের নিযুক্ত কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি।

বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা : ইতোমধ্যে বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে এর মধ্যে ফিলিস্তিন থেকে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু তার আগেই তারা ফিলিস্তিন দখলে ইহুদীদের সাহায্য করে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় ইহুদীরা আরব এলাকাগুলোতে ব্যাপক হামলা চালায়। বৃটিশ সৈন্যরা সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কসহ সর্বাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ইহুদীদের সাহায্য করছিল। বৃটিশ সৈন্যরা ইহুদীদের পক্ষে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ইহুদীদের জয় সুনিশ্চিত করে। বৃটিশ ও ইহুদীরা চক্রান্ত করে ১৯৪৮ সালের ১০ এপ্রিল দেইরইয়াসীন, ১৮ এপ্রিল টিবেরিয়াম, ২১ এপ্রিল হাইফা, ২৭ এপ্রিল সামাখ, ২৮ এপ্রিল সালামেহ, ইয়াজুর, বিতদাজুন, জাফফার পার্শ্ববর্তী এলাকা, ৩০ এপ্রিল বেইসান, ১০ মে সাফাদ, ১৩ মে জাফফা থেকে আরবদেরকে বহিষ্কার করে। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত জাতিসংঘের দেয়া কথিত ম্যান্ডেট শাসনের কাজে নিয়োজিত বৃটিশ বাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে এসব আরব এলাকা দখলে ইহুদীদের সর্বাত্মক সহায়তা করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন যখন ফিলিস্তিনে বৃটেনের ম্যান্ডেট শাসন থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে আলোচনা করছে তখন ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে বৃটেন একতরফাভাবে ম্যান্ডেট শাসন প্রত্যাহার করে নেয়। বৃটিশ সৈন্যও প্রত্যাহার করা হয়। ফিলিস্তিন ত্যাগের সময় বৃটিশরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ইহুদীদের দিয়ে যায়।

ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা : ইহুদীগণ পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারা সরকার কাঠামোও ঠিক করে রেখেছিল। ১৯৪৮ সালের ১৪মে তারিখের মধ্যরাতে ইহুদীরা তেলআবিবকে রাজধানী করে স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। বিশ্ব

---

১২. ১৯৪৬ সালের ১৬ জুন সন্ত্রাসবাদী হাগানা ফিলিস্তিনের সাথে পাশ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর সংযোগ রক্ষাকারী ১১টি সেতু ধ্বংস করে।

১৩. মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী দল ইরগুন জাই লিউমী [Ergun zvai Leumi] সংক্ষেপে ইরগুন নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখে জেরুসালেমের কিং ডেভিড হোটেলের একাংশ ইরগুন দলের সন্ত্রাসীরা ধ্বংস করে। এখানে সরকারী দফতরে কর্মরত শতাধিক বৃটিশ ও আরব নিহত হয়।

www.bjilibrary.com

ইহুদী সংস্থা ইহুদী নেতাদেরকে সংগ্রহ করে এনে প্রথম সরকার গঠন করে। ড. ওয়েজম্যান হন এ নতুন রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং ডেভিড বেনগুরিয়ান হন প্রধানমন্ত্রী। জায়নবাদীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাদের একটি ছায়া সরকার সব সময়ই ছিল। এভাবেই আরব দুনিয়ায় ইংগ-মার্কিন, ফ্র্যান্স-রুশ সাম্রাজ্যবাদের সন্তানরূপে বিষফোঁড়ার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় অভিশপ্ত ইহুদীদের এক নতুন রাষ্ট্র ইসরাইল। বৃটিশরাই মুসলিমদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বুকের উপর বসিয়ে দেয় ইহুদীদের। ইঙ্গ-মার্কিন সর্বাত্মক মদদেই তারা হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান : ইহুদীদের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণার মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুম্যান [১৯৪৫-১৯৫৩] এ রাষ্ট্রের প্রতি তার দেশের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন। স্বীকৃতি দানকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন। বৃটেন এবং ফ্রান্সও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৫০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহেরু ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেন। বহিরাগত সংখ্যালঘু ইহুদী কর্তৃক অবৈধভাবে শক্তি প্রয়োগ করে ৮০ ভাগ ফিলিস্তিনে জবর দখল প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগুরু ফিলিস্তিনীদের পৈত্রিক ভিটে মাটি থেকে বহিষ্কার, ভৌগোলিক সংহতি লংঘন, ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহের অমর্যাদা, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদ লংঘন করার মত সীমাহীন অপরাধ করা সত্ত্বেও মার্কিন, সোভিয়েত, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্র্যাজ্যবাদী সরকারগুলো তাদের প্রভাব খাটিয়ে ১৯৪৯ সালের ১১ মে তথাকথিত ইসরাইল রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করে নেয়।

ইসরাইল গঠনের পর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসদের আরেক রূপ। যখন রাষ্ট্র শক্তি আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও রীতিনীতি লংঘন করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তখন তাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূল উদ্দেশ্য তিনটি। যেমন– ১. জোরপূর্বক কারো আদায় আনুগত্য করা। ২. আত্মরক্ষা করা। ৩. আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীল কোন ইস্যু হতে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরানো।

১. ইসরাইলে ইহুদীদের ব্যাপক আগমন : ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই পৃথিবীর সব এলাকা থেকে ইহুদীদের ইসরাইলে পাঠানো শুরু হয়। আগত ইহুদীদের পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়। এ সাথেই শুরু হয় ফিলিস্তিনী মুসলিমদের হত্যা, লুণ্ঠন ও উচ্ছেদের কাজ। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী মুসলিম সব কিছু হারিয়ে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশসমূহে আশ্রয় নেয়।

২. ইরগুণ ভাই লিউমীর গণ হত্যা : ইহুদী সন্ত্রসবাদী মেনাহিম বেগিনের নেতৃত্বাধীন ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দল 'ইরগুন ভাই লিউমী' ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল জেরুসালেমের নিকটবর্তী দিইর ইয়াসিন গ্রামে এক বর্বর হামলা চালিয়ে গ্রামের মহিলা ও শিশুসহ

www.bjilibrary.com

২৫৪ জনকে হত্যা করে। এ ঘটনার সন্ত্রস্ত হয়ে ফিলিস্তীনীরা তাদের বাসভূমি ত্যাগ করতে শুরু করে। এদের মধ্যেই ছিলেন সেদিনের বালক ইয়াসির আরাফাত। তখন তারা নিশ্চিত ছিল যে ন্যায়ের পথে যুদ্ধে তাদের জয় হবে এবং তারা আবার ফিরে আসবে মাতৃভূমিতে। ইহুদী লেখক জন কিমজে দিইর ইয়সীন গ্রামের হত্যাকাণ্ডকে The darkest stain on the Jewish record বলে আখ্যায়িত করলেও এ হত্যাকান্ডের নায়ক ও পরবর্তীতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাহিম বেগিন একে এক বড় ধরনের বিজয় বলে অভিহিত করেন।[১৪]

৩. পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পদক্ষেপ : ভ্রাতৃপ্রতিম ফিলিস্তিনীদের নির্মম ভাগ্য বিপর্যয়ে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশসমূহ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাঁরা এ অবৈধ রাষ্ট্রটিকে প্রতিহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ ফিলিস্তিনীদের রক্ষায় এগিয়ে আসে। জর্ডনের সেনাবাহিনী জেরুসালেমসহ পূর্ব ফিলিস্তিন মুক্ত করে। ইরাকী বাহিনী তড়িৎ গতিতে তেলআবিবের ৩ মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে। অন্যদিকে মিশরীয়রা গাজা ভূখণ্ডের [Gaza strip] ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মিশর, সিরিয়া ও জর্ডনের ইসলামী আন্দোলন 'ইখওয়ানুল মুসলিমূন'ও ফিলিস্তিনীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নব্য ইসরাইল রাষ্ট্রের মুমূর্ষ অবস্থায় তার মুরুব্বীদের চাপে জাতিসংঘের মাধ্যমে একটা ফায়সালার স্বার্থে ৪ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বিরতি হয়। যুদ্ধ বিরতির সুযোগে মার্কিন, সোভিয়েত, বৃটেন ও ইসরাইলের অন্যান্য মুরুব্বীরা একদিকে ইসরাইলকে অঢেল অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে প্রতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং তাদের কারো কারো সাথে গোপন আঁতাত গড়ে তোলে। ফলে ইহুদীরা যখন সাম্রাজ্যবাদী মদদ পুষ্ট হয়ে যুদ্ধ বিরতি লংঘন করে নতুন আক্রমণ শুরু করল, তখন জর্ডনকে নিষ্ক্রিয় দেখা গেল, মিশর গাজা রক্ষা ছাড়া অন্য কিছুতেই এগিয়ে এলোনা। ইরাকী বাহিনীকে একা পড়ে গিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে পিছু হটতে হল। ইসরাইলীরা জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা ছাড়া ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট সব এলাকাই দখল করে নিল এবং দখলীকৃত এ গোটা এলাকাই ইসরাইল নামে অভিহিত হল। ১৯৪৯ সালের ৭ই জানুয়ারী যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধে আরব দেশগুলির পরাজয় আরব মানসিকতার উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। প্রতিটি আরব দেশেই জনমত এতবেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির পক্ষে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হয়নি। আরবদের এই পরাজয়ের ফলে জায়নবাদীগণ বিভক্তি পরিকল্পনায় তাদের জন্য যতখানি ভূখন্ডে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল তা অপেক্ষা অনেক বেশি জায়গা দখল করে। আরবগণ এই দখলীকৃত এলাকা প্রত্যার্পণের দাবি করলেও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সমর্থনপুষ্ট ইসরাইল এ দাবীর প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়নি।

---

১৪. Jon Kimche, the seven fallen pillars [New York, 1953] p. 228 এবং Menachen Bligion, the retold : Story of the lrgun [New York 1951]

www.bjilibrary.com

আরবদের এই শোচনীয় পরাজয়ের বহুবিধ কারণ ছিল। প্রথমত: আরব দেশগুলির অধিকাংশই ছিল সদ্য স্বাধীন, না হয় বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন। সিরিয়া ও লেবানন মাত্র দু'বছর পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করে। মিশর ও ইরাকে তখন পর্যন্ত বৃটেনের সেনাবাহিনী ও প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ফলে এই সমস্ত দেশের সরকারগুলির রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। দ্বিতীয়ত : অভিজ্ঞতা ছাড়াও আরবদের মধ্যে একতাবোধের অভাব ছিলো। বিভিন্ন আরবদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো সমঝোতা বা অভিন্ন কার্যক্রম ছিল না। ফলে ইহুদীগণ তাদের সুবিধা মতো স্থানে ও সময়ে আলাদা আলাদা এক একটি আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জয়ী হয়েছে। ফিলিস্তিনের মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ মুসা আলামী এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'The Jews took full advantage of our disunity and the anarchy of our setup; When the time was opportune they collected all their forces and dealt us heavy concentrated blows.... Thus the country fell, town after town, village after village, position after position, as a result of this fragmentation, lac of unity and of a common command.[১৫] এতে যাদের নিয়ে যুদ্ধ সে ফিলিস্তিনীদেরই ক্ষতি হল। এ সময় থেকেই সত্যিকারভাবে ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদের সূচনা।

এই সামরিক অনৈক্য বহুলাংশে রাজনৈতিক অনৈক্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিফলন। আরব লীগের নেতৃত্বের জন্য মিসর ও ইরাকের মধ্যে কোন্দল সামরিক ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জর্ডনের আমীর আবদুল্লাহ্ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আরব স্বার্থ বিসর্জন দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বৃটিশ সৃষ্ট 'আরব লিজিয়নের' সাহায্যে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরের কিছু ভূভাগ দখল করে নিজের রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করা। মুফতি আমিন আল হুসাইনী[১৬] তাঁর পরিকল্পনার পথে প্রতিবন্ধক মনে করে মুফতিকে শায়েস্তা করার জন্য ইহুদী সংস্থার নেত্রী গোল্ডামায়ারের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হয়নি।[১৭]

তৃতীয়ত : আরব রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি তাদের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। মিশরের রাজা ফারুক ও তাঁর পার্শ্বচরগণ সেনাবাহিনীর জন্য অকেজো অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে নিজেদের জন্য বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু এ অস্ত্র দিয়ে

---

১৫. Musa Alami, The Lesson of Palestine Middle East Journal, October, 1949.

১৬. ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের জাতীয় নেতা ছিলেন জেরুসালেমের মুফতি আমিন আল হুসাইনী, তাঁর পুরো নাম ছির মোহাম্মদ সাঈদ হাজী আমিন আর হুসাইনী। তিনি পবিত্র নগরী জেরুসালেমের হুসাইনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৭. এ সম্বন্ধে দেখুন, Pamela Ferguson, The Palestione Problem [London: Martion Brian, 1973] P. 55.

www.bjilibrary.com

মিসরীয় বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে সাফল্য প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না। সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী জামিল মারদামের ভ্রাতা ক্যাপ্টেন ফুয়াদ মারদাম সিরীয় জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থে ইতালী হতে অস্ত্রঅস্ত্র ক্রয় করে উৎকোচের বিনিময়ে অস্ত্র ভর্তি জাহাজগুলি ইহুদীদের হাতে সমর্পণ করে। এ ধরনের বহু উদাহরণ হতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীগণ যে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ও স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিল তা আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল না।[১৮]

চতুর্থত : ভৌগোলিক অবস্থা আরবদের বিপক্ষে কাজ করেছিল। কয়েকটি আরব দেশের বাহিনী বহু দূর হতে এসে এত ক্লান্ত ছিল যে, তাদের পক্ষে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এ সম্বন্ধে জর্ডনের সেনাপতি গ্লাব পাশা মন্তব্য করেছেন :

"It is not realized that the distance from Baghdad to Haifa is seven hundred miles, as far as from Calais to Vienna of London to Berlin. Moreover, the greater part of this distance is across waterless desert."[১৯]

পক্ষান্তরে ইহুদীদের সীমিত এলাকার মধ্যে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ম্যান্ডেট শাসনামলে এই এলাকায় চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ফলে ইহুদীদের পক্ষে এক রণাঙ্গন হতে অন্য রণাঙ্গনে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব ছিল। রসদপত্র ও যন্ত্রাংশের জন্য কোন ইহুদী বাহিনীকে বেশীদূর যেতে হয়নি। যুদ্ধের সময় এ ধরণের সুযোগ সুবিধাই জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে বহুলাংশে সাহায্য করে।

৪. ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

ক. ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে বৃটেন ও ফ্রান্সের মদদে ২৯শে অক্টোবর ইসরাইল মিশর আক্রমণ করে এবং সুয়েজখালের পূর্বতীর পর্যন্ত সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ এলাকা দখল করে নেয়। ৩১ শে অক্টোবর ফ্রান্স ও বৃটেন এ আক্রমণে অংশ নেয়। অবশেষে কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে যুদ্ধ বিরতি হয়।

খ. ১৯৬৭ সালের ৫ই জুন আবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়। ৬দিনের এ যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক সাহায্য লাভকারী ইসরাইলের হাতে আরবরা নিদারুনভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধের ফলে মিশরের গাজা ও সিনাই অঞ্চল, জর্ডনের জর্ডন নদীর পশ্চিমতীর ও জেরুসালেম এবং সিরিয়ার গোলান হাইটস ইসরাইলের দখলে চলে যায়। এরপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২নং প্রস্তাব গ্রহণ করে এতদঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি এবং অধিকৃত

১৮. সফিউদ্দিন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৯২।
১৯. Sir John Bagat Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, 1959, PP 94-95.

www.bjilibrary.com

এলাকা থেকে ইসরাইলী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। কিন্তু সে প্রস্তাব আজও কার্যকর হয়নি। তাই জেরুসালেম এখন পর্যন্ত ইসরাইলের জবর দখলে রয়েছে। ইসরাইল জেরুসালেমকে তার স্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে বলেছে, সে কখনও জেরুসালেম হাত ছাড়া করবে না।

গ. ১৯৭৩ সালের ৬ই অক্টোবর সুয়েজখাল সেক্টরে মিশরীয় সেনাবাহিনী ও গোলান উপত্যকায় সিরীয় বাহিনী ইসরাইলী অবস্থানের উপর আক্রমণ শুরু করলে পুনরায় ব্যাপক যুদ্ধ হয়। অকস্মাৎ পরিচালিত এ আক্রমণে ইসরাইল অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে যায়। মিশরের সেনাবাহিনী এক দুর্ধর্ষ অভিযানে ইসরাইলের অহংকার এবং অজেয় বলে কথিত বারলেভ প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙ্গে সম্মুখে অগ্রসর হয়। ইসরাইলের নিশ্চিত পতন ঠেকানোর জন্য ওয়াশিংটন তেল আবিবের মধ্যে সাহায্যের সেতু রচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশরে সাহায্য বন্ধ করে দেয় এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ১৭ দিন স্থায়ী এ যুদ্ধ অবশেষে জাতিসংঘের চেষ্টায় বন্ধ হয়।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর, গোলান মালভূমি, গাজা এলাকা ও সিনাই উপদ্বীপ দখলের পর এসব এলাকায় বসবাসকারী আরবদের উপর একই ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়। বিজিত এলাকাগুলোতে জাতিসংঘের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যে হারে ইহুদী বসতি স্থাপন করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে এ সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ও পরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে জায়নবাদকে অন্ধ জাতি বিদ্বেষ [Racism] বলে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে তা জায়নবাদীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য করেছে।

ইসরাইল নামক এই বিষাক্ত সাপটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুধ-কলা দিয়ে পুষে যাচ্ছে। ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে যে কোন অন্যায় করে বসতে পারে এবং দুনিয়ার আন্তর্জাতিক মতামত উপেক্ষা করতে পারে। এখনও আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থা বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলোকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তারা ঐ সকল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, মিডিয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। ফ্রান্স, রাশিয়া, বৃটেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও চীনে তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সাম্রাজ্যবাদী মদদে ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কত বড় এবং ভয়াবহ তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরাইল দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে। সমানে ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর ধ্বংস করছে। রাস্তাঘাটে প্রতি পদে পদে চেক পয়েন্ট স্থাপন করেছে এবং করছে। চাকরি করতে দিচ্ছে না। তারা দেয়াল নির্মাণ করছে, সে দেয়াল আবার বর্ডারে নয়, ফিলিস্তিনী ভূমির উপর। এগুলোই যে মুক্তিযুদ্ধের কারণ তাকেই তারা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী দোসরা সন্ত্রাস বলছে। যদি এটি সন্ত্রাস হয়ে থাকে তাহলে

১০—

www.bjilibrary.com

ইসরাইলের সন্ত্রাস এর থেকে একশত গুণ বড়। সাম্রাজ্যবাদীদের অবৈধভাবে সৃষ্ট ইসরাইলের উৎপাত-উৎপীড়ন-সন্ত্রাসে প্রতিনিয়ত অতিষ্ঠ হচ্ছে নির্দোষ নিরপরাধ ফিলিস্তিনীরা। জায়নিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী এই সন্ত্রাসী শক্তি তাদের মুরুব্বীদের মদদ পুষ্ট হয়ে আরব জাহান, মধ্যপ্রাচ্য তথা তামাম মুসলিম দুনিয়ার জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এক স্থায়ী হুমকি। শুধু তাই নয়, এখন খোদ মুরুব্বীদের জন্যও হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসরাইল মাথা ব্যথার কারণ, বিশ্বশান্তির জন্য হুমকির প্রতীক। তাদের অযৌক্তিক অমানবিক একগুঁয়েমীতে বাধা প্রদান করা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলেও দাম্ভিক ঘোষণা দিয়েছে সেই চরম উদ্ধত ও নিষ্ঠুর ইহুদি সাইলক গোষ্ঠী।

আল কুদ্স আশ শরীফ আজ ইসরাইলের জবর দখলে। ১৯৬৭ সালের ৫ই জুনের যুদ্ধে জেরুসালেম দখল করার পর থেকে আজ পর্যন্ত অধিকৃত ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থানসমূহের উপর ইসরাইলী আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। তাদের আচরণ দ্বারা বুঝা যায়, বাইতুল মাকদিসের ইসলামী চরিত্র পরিবর্তন করে ইহুদীকরণের আগ পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবার নয়। আর তাদের সে ইচ্ছা মসজিদুল আকসা ও কুববাতুস্ সাখরা ধ্বংস করার আগ পর্যন্ত পূরণ হবার নয়।

ইহুদীরা হাইকালে সুলাইমানী সংক্রান্ত এমন একটি নিদর্শন খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারে যে, মসজিদুল আকসা ও কুববাতুস্ সাখরা হাইকালে সুলাইমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেন তারা এই অজুহাত দেখিয়ে তা ভাংগার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পারে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর এ পর্যন্ত ১০ পর্যায়ে খনন কাজ চালানো হয়েছে।[২০] এজন্য মসজিদে আকসার পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মুসলিমদের উৎখাত করা হয়েছে।

১৯৬৭ সালের ৩১শে আগস্ট ইহুদীরা জোর করে মসজিদুল আকসার প্রধান গেইট বাবুল মাগরেবার চাবি নিয়ে যায় যেন তারা যে কোন সময় বোরাক দেয়ালের কাছে যেতে পারে। ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট ডেনিস মাইকেল মসজিদুল আকসায় অগ্নি সংযোগ করে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে মসজিদের আসবাবপত্র, দেয়াল, সালাহউদ্দিনের মিম্বার এবং মসজিদের দক্ষিণাংশ জ্বলে যায়। ১৯৮০ সালের ১লা মে ইহুদীরা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মসজিদুল আকসাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা মসজিদের নিকটবর্তী একটি ইহুদী গীর্জার ছাদের ওপর এক টনেরও বেশি বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে দেয়। মুসলিমদের সতর্কতার কারণে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অপরাধে সন্ত্রাসবাদী মায়ের কাহানাকে অভিযুক্ত করা হয়।

১৯৮৬ সালের ৯ই জানুয়ারী ইসরাইলী সেনাবাহিনীর সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মসজিদে আকসা এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করে। ইসরাইলী নেসেটের অভ্যন্তরীণ কমিটির ৮ সদস্যসহ আরো কিছু নেসেট সদস্য এবং টেলিভিশনের ফটোগ্রাফার মসজিদুল

---

২০. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, আল আকসা মসজিদের ইতিকথা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ১৯৯২, পৃ. ৯২-৯৪।

www.bjilibrary.com

আকসায় প্রবেশ করে। মসজিদের রক্ষীরা বাধা দিলে রক্ষীদেরসহ বেশ কিছু মুসল্লীকে আটক করে এবং ইসরাইলী বাহিনী মুসল্লীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ও গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে ১৬ জন মুসল্লী আহত হয়।

১৯৮৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইসরাইলী বাহিনী মসজিদুল আকসায় গুলি চালিয়ে ২৮ জন মুসল্লীকে হত্যা করে এবং ১১৫জন মুসলিমকে আহত করে।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব জেরুসালেমের সালওয়ান এলাকার ৬টি মুসলিম পরিবারকে বিতাড়িত করা হয় এবং সেগুলোতে পরে বিদেশাগত ইহুদীদেরকে পুনর্বাসন করা হয়।

ইসরাইল সরকার অধিকৃত আরব এলাকা ইহুদী করণের উদ্দেশ্যে ইহুদী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। একমাত্র পূর্ব জেরুসালেম শহরেই ৭০ হাজার ইহুদীকে পুনর্বাসনের জন্য ২০ হাজার আবাসিক ইউনিট তৈরী করা হয়েছে। মুসলিমদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করাই এর উদ্দেশ্য।

ইসরাইল জায়নবাদী ও বর্ণবাদী একটি রাষ্ট্র। ধ্বংসাত্মক ও বর্ণবাদী ইহুদীবাদ ইসরাইলকে পরিণত করেছে একটি কলোনিয়াল স্টেট'-এ। ১৯৪৮ সালে গঠিত হলো রাষ্ট্র ইসরাইল। এরপর ৬০ বছর পেরিয়ে গেল। আরব-ইহুদি বিরোধের অবসান হলো না। এই ৬০ বছর ধরে ইসরাইলের পোলারাইজেশন ঘটেছে একটি কলোনিয়েল এন্টারপ্রাইজে। এই ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের প্রতি ব্যাপক দমনমূলক।

বুলডোজারের মেসেজ

বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে ফিলিস্তিনীদের হাজার হাজার ঘরবাড়ি। সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে ২০০টি ইহুদি বসতি বা সেটেলমেন্ট। এগুলোতে ৫ লাখ ইহুদি বসবাসের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে দেড় লাখ ইউনিট বাড়ি। কখনো এগুলো গড়ে তোলা হয়েছে ফিলিস্তিনীদের কৃষি জমির ওপর। সেখানে কার্যকর করা হয়েছে জোনিং রেস্ট্রিকশন, ফলে ফিলিস্তিনীরা সেখানে কোন ভবন নির্মাণ করতে পারে না। ১৯৬৭ সালের পরবর্তী সময়ে ইসরাইল ধ্বংস করেছে ১৮ হাজার ফিলিস্তিনী বাড়ি। এখানো এ ধ্বংস প্রক্রিয়া রয়েছে অব্যাহত। নিয়মিত চলে বুলডোজারে মানুষের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়ার কাজ। এর পেছনে তেমন কোনো নিরাপত্তাজনিত কারণও নেই। জেফ হ্যালপার[২১] এর নাম দিয়েছেন 'ন্যাশনাল অবসেশন'। তাঁর মতে ইসরাইল ঘৃণাভরে আন্তর্জাতিক সব আইন-কানুন লঙ্ঘন করে একটি জাতিকে 'কালেকটিভ পানিশমেন্ট'

---

২১. জেফ হ্যালফার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম নেয়া একজন ইসরাইলি অধ্যাপক। যিনি একজন শান্তিবাদী ও মানবাধিকার কর্মী। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'ইসরাইল কমিটি এ্যাগেইনিষ্ট হোমডিমোনিউশন' তথা ICAHDI জেফ হ্যালপার এর সহপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইসরাইলের দখলদারী নীতি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনেক 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ও 'সিভিল ডিস অবিডিয়েন্স' কর্মসূচীর আয়োজন করেন।

www.bjilibrary.com

দিয়ে চলছে। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের জন্য তা মর্মপীড়াদায়ক ও ধ্বংসাত্মক। ফলে একটি ফিলিস্তিনী পরিবার তার থাকার সবটুকু জোগাড়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মহিলাদের জন্য পরিস্থিতিটা আরো খারাপ– ইসরাইলিদের এই বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়ার সময় অনেক ফিলিস্তিনী মা তার প্রিয় শিশু কিংবা কোনো প্রিয়জনকেও হারায়। প্রিয়জনকে এভাবে হারানো একজন মায়ের জন্য কতটুকু মর্মপীড়াদায়ক তা শুধু ভোক্তভোগী ফিলিস্তিনী মায়েরাই জানে। বুলডোজারের এ ধ্বংসলীলা অনেক ফিলিস্তিনী শিশুর লেখাপড়ার সুযোগটুকু বন্ধ করে দেয়। শিশুরা হারায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ। এর প্রতিকারের কোনো সুযোগ নেই ফিলিস্তিনীদের কাছে। তাদের কাছে পাঠানো হয় ডিমলিশন নোটিস। এর সাথে কোনো আনুষ্ঠানিকতা, বৈধতা ও প্রশাসনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি বাড়িঘর থেকে মালপত্র সরিয়ে নেয়ার ফুরসতও কোনো কোনো সময় দেয়া হয় না। শুধু প্রাণ নিয়ে পালানোর সুযোগটাই যেন দেয়া হয়। তাও সবার ভাগ্যে জোটে না। বিশেষ করে ইসরাইলিদের খাতায় যেসব ফিলিস্তিনী ওয়ান্টেড বলে চিহ্নিত, তাদের বেলায় এমনটি ঘটে। তাদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়া হয় অতর্কিত হামলা চালিয়ে। প্রয়োজনে গ্রেফতার ও খুনও করা হয় ফিলিস্তিনীদের।তাদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়ার কাজটি চলে তাৎক্ষণিকভঅবে। কখনো কখনো থেমে থেমে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চলে এই ভাঙচুরের কাজ। তাদের বাড়িতে হামলা চলে প্রধানত শেষ রাতে কিংবা ভোর রাত্রে, যখন বাড়ির মানুষ সাধারণত ঘুমে থাকে।

ইসরাইলের পাঁচটি সরকারি সংস্থা গ্রিন লাইনের উভয় পাশে এই পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিম তীর ও সাবেক গাজায় এ দায়িত্বে নিয়োজিত ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসামরিক প্রশাসন। জেরুসালেমের নগরে এ দায়িত্ব পালন করে ইনটেরিয়র মিনিস্ট্রি ও জেরুসালেম মিউনিসিপ্যালিটি। ইসরাইলের ভেতরে বেদুইন ঘরবাড়ির ওপর নজরদারির দায়িত্ব রয়েছে ইন্টেরিয়র মিনিস্ট্রি, ইসরাইল ল্যান্ডস অথরিটি ও অ্যাগ্রিকালচার মিনিস্ট্রির ওপর। অধিকন্তু ইহুদি প্রধান মিউনিসিপ্যালিটিগুলো এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে লড, বামলে ও জাফে'র মতো মিশ্রনগরীগুলোতে।

আরবদের তাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে জনবিচ্ছিন্ন ছোট ছোট ছিটমহলে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। এগুলোকে বলা হয় 'শ্যারনের ক্যান্টন'। সে দেশের ১৫ শতাংশ ভূমিতে গড়ে তোলা হয়েছে এসব ক্যান্টন। পশ্চিম তীরের ৪২ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে এ ধরনের 'এ' ও 'বি' এলাকা। ইসরাইলের ৩.৫ শতাংশের আছে এ ধরনের এনক্লেভ বা ছিটমহল। জোনিংয়ের মাধ্যমে এসব এলাকায় আরবদের কার্যত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। পূর্ব জেরুসালেমের এক শতাংশ এলাকায়ও গড়ে তোলা হয়েছে এ ধরণের এনক্লেভ। সামাজিক চাপ ও ভীতি নিয়ে ফিলিস্তিনীরা বসবাস করছে এসব এনক্লেভে।

www.bjilibrary.com

ইসরাইলের জোনিং ও মাস্টার প্লানে ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়ার অনুমোদন রয়েছে। এমনটি ঘটছে এমন একটি দেশে যেখানে দেশটির ৯০ শতাংশ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদিরা।

এসব ভূমিতে ফিলিস্তিনীদের প্রবেশাধিকার নেই। জেরুসালেমের কথাই ধরা যাক। পশ্চিম জেরুসালেম ইহুদিদের জন্য। জেরুসালেমের পূর্বাংশে কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ইহুদিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেখানে ইহুদি ৭২ শতাংশ। আরবরা ২৮ শতাংশ। ফিলিস্তিনীদের সংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজার। এরা সেখানে বসবাস করছে কঠোর বেষ্টনীতে বাঁধা ছিটমহলে বা এনক্লেভে। ইসরাইলি বসতিগুলো দখল করে নিয়েছে তাদের ৩৫ শতাংশ ভূমি। আর পূর্ব জেরুসালেমের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ঘোষিত হয়েছে 'ওপেন গ্রিন স্পেস' হিসেবে। সেখানে ফিলিস্তিনীরা জমির মালিক হতে পারে, তবে সেখানে কোনো নির্মাণ কাজ চালাতে পারে না। ফলে ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর ও সম্প্রদায়গত চাহিদা মেটানোর সুযোগ এদের জন্য রয়েছে শুধু পূর্ব জেরুসালেমের ১১ শতাংশ অংশে। যা পুরো জেরুসালেমের মাত্র ৭ শতাংশে। ফিলিস্তিনীরা বসবাস করতে পারে না ইহুদিদের জন্য নির্ধারিত পশ্চিম জেরুসালেমে।

পশ্চিম তীরেও বিদ্যমান একই ব্যবস্থা। এর পেছনে কারণ একই-আটক, অবরোধ, প্ররোচিত অভিবাসন ও অব্যাহতভাবে ইসরাইলের সম্প্রসারণ। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের 'মাস্টার প্ল্যানে'-পশ্চিম তীরের ৭০ শতাংশকে 'কৃষি জমি' হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে ফিলিস্তিনীদের ভবন নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৯৫ সালের দ্বিতীয় ওসলো চুক্তির মাধ্যমে এই টেরিটরিতে জেরুসালেমকে এ,বি,সি,ডি এলাকা এবং হেবরনকে এইচ-১ ও এচই-২ এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এসব বিভাজনে শুধু ইহুদিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা, নিরাপত্তা অঞ্চল ও সামরিক এলাকা সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়া পূর্ব জেরুসালেমের বেশির ভাগ অংশে শুধু ইহুদিদের জন্য 'ওপেন গ্রিন স্পেসে' নামের আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়। অপর দিকে ফিলিস্তিনীদের অবরোধ করে রাখা হয় বিচ্ছিন্ন ক্যান্টনগুলোতে। ক্যান্টনগুলোতে আসা রাস্তাগুলোতে কার্যকর রয়েছে নানা বাধা এবং আছে শত শত ভাসমান চেকপয়েন্ট। আর এ ক্যান্টনগুলোর চারপাশে রয়েছে ইসরাইলি ইহুদিদের বসতি।

ইসরাইল ফিলিস্তিনে যা করছে তাতে ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নানা আইন। এরা যেভাবে ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর ধ্বংস করছে, তা যুদ্ধাপরাধের শামিল। এরা লঙ্ঘন করছে চতুর্থ জেনেভা কনভেশন। বিশেষভাবে লঙ্ঘন করছে এ কনভেনশনের ৫৩ নম্বর অনুচ্ছেদ। এ অনুচ্ছেদে বলা আছে : Any destruction by an occupying power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons.... is prohibited.

www.bjilibrary.com

২০০৪ সালের মে মাসে গৃহীত জাতিসঙ্ঘের ১৫৪৪ নম্বর প্রস্তাবে এ প্রেক্ষাপটে ইসরাইলকে চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার কথা বলে এবং তৎকালে বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়ন ঘটাতেও বলা হয়। কিন্তু ইসরাইল তা লঙ্ঘন অব্যাহত রাখে। গ্রিন লাইনের উভয় পাশে চলে ইহুদিদের 'এথনোক্রেসি'। ফিলিস্তিনীদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়ার কাজও এরা যথারীতি চালিয়ে যায়। ইসরাইলে 'নিশুল' ডিসপ্লে-সমেন্ট পলিসি এ কাজকে আরো জোরদার করে তোলে। জেফ হ্যালপার তা উল্লেখ করেছেন এভাবে:

The Message of Bulldozers : Get Out. You do not belong here. We uprooted you in 1948, and well do it again throughout the `Land of Israil'. Palestinians have no right to claim a home in our country.[২২]

ইসরাইলি সরকারের আরেক পরিকল্পনা হচ্ছে পুরো পূর্ব জেরুসালেমকে বিভেদ দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে এর থেকে পশ্চিম তীরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। অবশ্য ইসরাইলি কর্মকর্তারা বলছে, নিরাপত্তা ও ফিলিস্তিনীদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য এই বিভেদ দেয়াল তৈরী করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালে দখল করা ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে ইসরাইল একটি জনসংখ্যা গণনা সমীক্ষা চালায়। এখন সেখানে বসবাসরত ফিলিস্তিনীদের স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা দিলে, যারা সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেনি, সেসব ফিলিস্তিনী সে অধিকার হারায়। স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা পাওয়া ফিলিস্তিনীদের ইসরাইলি নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যাপারে কিছু শর্ত পালন করতে হয়। তাদের ঘোষণা করতে হবে তাদের অন্য কোনো দেশের কোনো ধরনের নাগরিকত্ব নেই এবং তাদের কিছু হিব্রু ভাষা জ্ঞান রয়েছে। বেশির ভাগ ফিলিস্তিনী তখন রাজনৈতিক কারণে ইসরাইলের নাগরিকত্ব প্রার্থনা করেনি। ফলে দখল করা ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে বসবাসকারী ফিলিস্তিনীদেরকে ইসরাইলিরা বিবেচনা করতে থাকে প্রত্যাবাসিত বিদেশীদের মতো। যদিও এই ফিলিস্তিনীরা এ ভূখণ্ডেই জন্ম নিয়েছে। এটাই তাদের জন্মভূমি। সারা জীবন কাটিয়েছে এ ভূখণ্ডেই। অথচ নেই তাদের নিজস্ব দেশ। এসব স্থায়ী অধিবাসীদের ভোটাধিকার আছে পৌরসভার নির্বাচনগুলোতে। কিন্তু ভোটাধিকার নেই ইসরাইলি পার্লামেন্ট 'নেসেটে' নির্বাচনে। কিছু শর্তাধীনে ফিলিস্তিনী শিশুদের স্থায়ী রেসিডেন্স মর্যাদা দেয়া হয়। আবার এসব রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনীরা নন রেসিডেন্টকে বিয়ে করলে তাদের ফ্যামিলি রি-ইউনিয়নের জন্য আবেদন জানাতে হয়। ইসরাইলি নাগরিকদের জন্যই শুধু সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষিত।

ফিলিস্তিনে বসবাসকারীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের ওপর আরোপ করে নানা বৈষম্যমূলক আচরণ। আইডি কার্ডে শ্রেণীবিভাজন ও আমলাতান্ত্রিক

---

২২. উদ্ধৃত গোলাপ মুনীর, ইসরাইল তোমার ষাট বছরের পাপ [প্রবন্ধ], অন্যদিগন্ত অক্টোর ২০০৮ সংখ্যা, পৃ. ৯৪।

www.bjilibrary.com

বিধিনিষেধ তেমনি একটি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের 'ল অব এন্ট্রি টু ইসরাইল' এবং ১৯৭৪ সালের 'এন্ট্রি টু ইসরাইল রেগুলেশন' তেমনি দু'টি বৈষম্যমূলক আইনি হাতিয়ার। ফিলিস্তিনীদেরকে বিদেশ যেতে হলে ইসরাইলের কাছে থেকে রি-এন্ট্রি ভিসা সংগ্রহ করতে হয়, নইলে এরা ফিরে আসার অধিকার হারিয়ে ফেলে। ফিলিস্তিনীরা অন্য কোন দেশে পাসপোর্ট গ্রহণ করলে কিংবা গ্রহণের আবেদন করলেই ইসরাইলে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার হারায়। ইহুদিদের ক্ষেত্রে এসব শর্ত আরোপ করা হয় না। তা ছাড়া বিদেশে সাত বছরের বেশি অবস্থান করলেও ইসরাইলে বসবাসের অধিকার হারায় ফিলিস্তিনীরা। ১৯৯৬ সালে ইসরাইল সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, জেরুসালেমে বসবাসরত কোনো ফিলিস্তিনী পশ্চিম তীরে গিয়ে সাত বছরের বেশি বসবাস করলেও ইসরাইলে স্থায়ী বসবাসের অধিকার হারাবে। এমনি আরো শত বাধা অধিকৃত ফিলিস্তিনীদের ওপর প্রয়োগ করছে বর্বর ইসরাইলিরা।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হল ইসরাইল। সন্ত্রাসের মাধ্যমে এ রাষ্ট্রের জন্ম এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমেই ইসরাইল বিশ্বব্যাপী ধিকৃত। মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত শহীদ, আহত ও পঙ্গু ফিলিস্তিনীদের পরিসংখ্যান দিয়েছেন এভাবে :

২,৬১,০০০ জন শহীদ,
১,৮৬,০০০ জন আহত,
১,৬১,০০০ জন পঙ্গু।

এছাড়া প্রায় দুই মিলিয়ন ফিলিস্তিনী স্বদেশ ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের পরিবারবর্গসহ শরণার্থীতে পরিণত হয়। সে দু'মিলিয়ন দেশছাড়া ফিলিস্তিনী এখন ৫ মিলিয়নে পৌঁছে গেছে। সঠিক সংখ্যা হচ্ছে ৫ মিলিয়ন ৪ লক্ষ।[২৩]

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন মদদপুষ্ট ইহুদীরা হেবরনের ইব্রাহিম মসজিদে হামলা চালিয়ে ফজরের নামায আদায়রত শতাধিক মুসলিমকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। ১৯৯৪ সালের ২রা মার্চ ইসরাইলী বাহিনী প্রকাশ্য দিবালোকে ৬ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে। ১৯৯৫ সালের ২ জানুয়ারী সেনাবাহিনীর একটি টহলদার ইউনিট ৪ জন ফিলিস্তিনী পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহুদী সৈন্যরা বলে যে, অন্ধকারে তারা পুলিশকে সন্ত্রাসী মনে করে গুলি চালিয়েছিল।

৫ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইসরাইলী সিক্রেট পুলিশ 'শিনবেথ' এক গোপন বোমা হামলায় নেতৃস্থানীয় ফিলিস্তিনী যোদ্ধা আয়াশকে হত্যা করে। ২৫ আগস্ট ১৯৯৬ বিনা অনুমতিতে নির্মিত হবার অজুহাতে ইসরাইল সরকার পূর্ব জেরুসালেমের একটি

---

২৩. মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

www.bjilibrary.com

ফিলিস্তিনী প্রতিষ্ঠানের ভবন ভেঙ্গে দেয়। এই একই দিনে ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরব অধ্যুষিত রামাল্লা এলাকায় ইহুদী আবাসনের লক্ষ্যে নতুন ৯০০ গৃহ নির্মাণের নির্দেশ জারী করেন। পূর্ব জেরুসালেম এলাকায় ইহুদীদের আবাসনের জন্য আরও ১৩২টি ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ইসরাইলী প্রতিরক্ষারমন্ত্রী নাবলুস এলাকায় ফিলিস্তিনীদের জমি জবরদখল করে ইহুদীদের জন্য আরও ১২০০ গৃহ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন।

১৯৯৭ সালের ২৮ জানুয়ারী ইসরাইল সরকার ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখলকৃত জেরুসালেম ও বেথেলহেম শহরের মধ্যবর্তী আরব এলাকা 'হার হোমা'য় এক লক্ষ জন অধ্যুষিত একটি ইহুদী আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করার অনুমিত প্রদান করে। অথচ অসলো চুক্তির শর্তানুসারে নেতানিয়াহু সরকারই ১৯৯১ সালে গৃহীত এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। 'প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের পর পর দুটি পত্রের অনুরোধকে উপেক্ষা করে নেতানিয়াহু ১৮ মার্চ ১৯৯৭ 'হার হোমা' প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। পরদিনই বেথেলহেমে গোলযোগ শুরু হয়। ২১ মার্চ ১৯৯৭ হেবরনে ফিলিস্তি নী বিক্ষোভকারীদের মিছিলে গুলিবর্ষণ করে ইসরাইলী বাহিনী একজনকে হত্যা এবং অপর ১০০ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। ৮ এপ্রিল ১৯৯৭ ইহুদী বাহিনী ৯ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০ ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয় ১২ বছর বয়স্ক ফিলিস্তিনী বালক মুহাম্মাদ আল দুররাহ। ২৯ মার্চ, '২০০২ অপারেশন ডিফেন্সশীলড' এর আওতায় ইসরাইল ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকাগুলিতে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি ধ্বংস করে দেয়' ফিলিস্তিন অথরিটির' প্রশাসনিক কাঠামো। বন্দী করে প্রায় ৮৫০০ ফিলিস্তিনীকে। পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতকে [১৯২৩-২০০৪] গৃহবন্দি করা হয় তাঁর রামাল্লা সদর দফতর মুকাত্তাতে। ৯-১৯ এপ্রিল ২০০২ ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া যান এবং বুলডোজার সজ্জিত ইসরাইলী বাহিনী মাটির সাথে গুড়িয়ে দেয় জেনিন শরণার্থী শিবির। বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় কমপক্ষে ৫০ জন, গৃহ হারা হয় কয়েকশত ফিলিস্তিনী। ঘটনার তদন্তে গঠিত জাতিসংঘ কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করে ইসরাইল। ১৩ এপ্রিল ২০০২ আল ফাতাহ সাধারণ সম্পাদক, নতুন প্রজন্মের ফিলিস্তিনী যোদ্ধাদের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা মারওয়ান বারঘোটিকে গ্রেফতার করে ইসরাইলী বাহিনী। ২২ মার্চ ২০০৪ ফজরের নামায শেষে হুইল চেয়ারে বসা অত্যাচারিত ফিলিস্তিনী জনতার আধ্যাত্মিক নেতা আল হারকাতুল মুকাওয়ামাতুল ইসলামিয়াহ [হামাস] এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন [১৯৩৬-২০০৪] বাসায় ফেরার পথে ইসরাইলী হেলিকপটার থেকে নিক্ষিপ্ত গোলায় শহীদ হন। শহীদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয় গাজার রাজপথ। মৃত্যুমুখী ফিলিস্তিনী জনতাকে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছিলেন অবিস্মরণীয় বীর শেখ ইয়াসিন। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই তিনি বেঁচে ছিলেন।

www.bjilibrary.com

২০০৪ সালের ১৭ এপ্রিল গাজা সিটিতে যাওয়ার পথে হামাস প্রধান[২৪] আবদুল আজিজ রানতিসির [১৯৪৭-২০০৪] গাড়ি লক্ষ্য করে ইসরাইলী হেলিকপটার থেকে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। এতে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদসহ দুজন সঙ্গী শহীদ হন এবং মারাত্মক আহত অবস্থায় রানতিসিকে গাজার আস শিফা হাসপতালে নেয়ার পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। উল্লেখ্য যে তিনি ১৯৯৩-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ইসরাইলী কারাগারে আটক ছিলেন, এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রানতিসি আরও ১০ বার কারাবরণ করেন। ২০০৬ সালের ২৪ জুন ইসরাইল গাজা থেকে একজন ফিলিস্তিনী চিকিৎসক ও তাঁর ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। এই অপহরণের প্রতিশোধ হিসেবে ফিলিস্তিনী যোদ্ধারা ২৫ জুন গাজা সীমান্তে ইসরাইলী সেনা চৌকিতে হামলা চালায়। এতে ২ জন সৈন্য নিহত হয়। ফিলিস্তিনী যোদ্ধারা গিলাত শালিত নামক একজন ইহুদী সৈন্য অপহরণ করে। অপহৃত সৈন্যকে উদ্ধারের নামে ইসরাইল গাজায় বেসরকারী ভবন, বাড়িঘর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটসহ বহু স্থাপনা ধ্বংস করে দেয়। শতাধিক ফিলিস্তিনী প্রাণ হারায়। আহত হয় অনেক। ২৯ জুন ২০০৬ ইসরাইলী সেনারা ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের ৯জন মন্ত্রী ও ২০ জন পার্লামেন্ট সদস্যসহ ৬৪ জন হামাস সদস্যকে ধরে নিয়ে যায়। এ কাজ সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা। একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের মত একটা স্বাধীন দেশের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আটক করেছে ইসরাইল। বিশ্ববাসী এই বর্বরোচিত ঘটনায় বিস্মিত হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ গাজা উপত্যকায় এহুদ ওলমার্টের ইসরাইলী সেনারা আক্রমণ শুরু করে। দু সপ্তাহ ধরে একটানা হামলায় ধ্বংসযজ্ঞের চূড়ান্তপর্ব শেষ হয়। প্রায় প্রতিটি পরিবারে কেউ না কেউ হতাহত হয়েছে। ডঃ এরিক ফস[২৫] জানান, গাজার শিফা হাসপাতালে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। টেলিভিশনে তিনি কথা বলার সময়ই নারী-শিশুসহ শত শত আহত ফিলিস্তিনী ওই হাসপাতালে আসছিল। এম্বুলেন্সের সাইরেনে কেঁপে উঠছিল পুরো গাজা। এরিক ফস জানান, 'আহতদের বেশির ভাগই বেসামরিক ব্যক্তি। বহুসংখ্যক শিশু মারাত্মক আঘাত পেয়ে হাসপাতালে এসেছে।' 'নিহতদের অন্তত ২০ ভাগ শিশু।'

---

২৪. ইসরাইলী হামলায় হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ইয়াসীন শহীদ হলে রানতিসি হামাস প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান মুখপাত্র এবং ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। ফিলিস্তিনের ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের হত্যা পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ইসরাইলী হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

২৫. ডঃ এরিক ফস নরওয়েজিয়ান চিকিৎসক। এই একমাত্র বিদেশী চিকিৎসককে হামলাকালীন সময়ে গাজায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে হানাদার ইহুদীরা। ইহুদী নরহত্যার সাক্ষী এই নরওয়েজিয়ান চিকিৎসক সিএনএন টেলিভিশনে যে সাক্ষাৎকার প্রদান করছেন তা থেকে গাজায় ইসরাইলী নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিবরণ জানতে পারে বিশ্ববাসী। বিস্তারিত দেখুন সাপ্তাহিক কাগজ, ১১ জানুয়ারী ২০০৯, পৃ. ২১-২৪।

www.bjilibrary.com

অন্যান্য আরবদেশে ইসরাইলের সন্ত্রাস

ইসরাইল একক বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন মদদে বেপরোয়া ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। অধিকৃত ফিলিস্তিনে নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি ইসরাইল লেবাননের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালে ইসরাইল লেবাননে হামলা করে জেনেভা ও জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করে। ইসরাইল বৈরুতে নির্বিচার বোমাবর্ষন করেছে, সেখানে তারা যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে, নির্বিচারে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এগুলো সবই যুদ্ধাপরাধ। ১৯৮২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৮ বছরে দক্ষিণ লেবানন দখলদারিত্বের সময় ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে লিটানি থেকে লেবাননের অতিপ্রয়োজনীয় পানি, এমনকি ভূউপরিস্থ পলিমাটিও নিয়ে যায়। এছাড়া তারা লেবাননী নাগরিকদের অপহরণ ও লুটতরাজ অব্যাহত রাখে। হিজবুল্লাহর প্রতিরোধ জোরদার হওয়ায় ২০০০ সালে ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন ছেড়ে যায়।

এর আগে ১৯৬৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর ইসরাইল বৈরুত বিমান বন্দরে হামলা চালিয়ে ১৩টি বেসামরিক বিমান ধ্বংস করে দেয়। ১৯৭৩ সালের ১০ এপ্রিল ইসরাইলী কমান্ডোরা বৈরুতে হামলা চালিয়ে ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ তিন ফিলিস্তিনী নেতাকে হত্যা করে। ১৯৭৮ সালের ১৪-১৫ মার্চ একটি ফিলিস্তিনী হামলার জবাবে ইসরাইল বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালায়। লিতানি নদী পর্যন্ত বিশাল এলাকা ইসরাইল দখল করে নেয়। ১৯৮২ সালের ৬ জুন বৃটেনে নিযুক্ত ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত শ্লোমো আরগভকে হত্যা চেষ্টার বদলা নিতে ইসরাইল 'অপারেশন পিস ফর গ্যালিলি' শিরোনামে লেবাননে পূর্ণ আগ্রাসন চালায়। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ লেবাননের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বশির জামায়েল আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। পরদিন ইসরাইল বাহিনী পশ্চিম বৈরুত দখল করে। ইহুদী মদদপুষ্ট ফালানজিস্ট বাহিনী ১৬-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ পশ্চিম বৈরুতে সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনীদের নির্বিচারে হত্যা করে। এটি ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য গণহত্যা যা সাবরা-শাতিলা গণহত্যা হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৯ সালের ২৮ জুলাই ইসরাইলী জিবসিতে হিজবুল্লাহ নেতা শেখ আব্দুল করিম উবায়েদকে অপহরণ করে। ১৯৯২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ পূর্ব সিডনে ইসরাইলী হেলিকপটার গানশিপের হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহ সেক্রেটারী জেনালের শেখ আব্বাস আল মুসাবি। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য এ সময়ের সেনা কর্মকর্তা ও পরে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারণকে দায়ী করা হয়। ১৯৯৩ সালে ইসরাইল আবারো লেবাননে হামলা চালায় হিজবুল্লাহকে নির্মূল করার জন্য। ২৫-৩১ জুলাই পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী যুদ্ধ চলে। ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন এবং বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় জিলায় হিজবুল্লাহর ঘাঁটিগুলোতে ব্যাপক বোমা হামলা চালায়। এই অভিযানের নাম দেয়া হয় 'অপারেশন

www.bjilibrary.com

গ্রেপস অব র‍্যাথ' [ক্রোধের আঙ্গুর অভিযান]। প্রায় ৪০০ সাধারণ মানুষ এতে প্রাণ হারায় এবং অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮ এপ্রিল ১৯৯৬ কানায় একটি জাতিসংঘ শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলী হামলায় ১০০ এরও বেশি লেবানিজ শরণার্থী প্রাণ হারায়। ১৯৯২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী হিজবুল্লাহ মহাসচিব আচাম আল মুসাভি নিহত হন। ইসরাইলী একাধিক হেলিকপটার গানশিপ তাঁর গাড়ি বহরে হামলা চালিয়ে এ ঘটনা ঘটায়। ১৯৯৪ সালের ২১শে মে ইসরাইলী কমান্ডোরা 'আমল' থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া গ্রুপ বিলিভার্স রেজিস্টান্স [বিশ্বাসীদের প্রতিরোধ] এর প্রধান মোস্তফা দিব আল দিরানিকে অপহরণ করে তাঁর বাড়ি থেকে। ২৪শে মে ২০০০ এস এল এর পতন এবং হিজবুল্লাহ বাহিনীর দ্রুত অগ্রসর হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নেয়। ২৫শে মে দিনটিকে ২০০০ সাল হতে লেবাননে 'প্রতিরোধ ও মুক্তি দিবস' হিসেবে প্রতি বছর সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। ২০০৬ সালের ১২ জুলাই হিজবুল্লাহ দুইজন ইসরাইলী সৈন্যকে বন্দী করার পর ইসরাইল লেবাননে বিমান ও নৌ হামলা শুরু করে। ফলে অনেক বেসামরিক লোক নিহত হয়। ধ্বংস হয় বহু অবকাঠামো।[২৬] লেবাননের প্রতিরোধ সংগঠন হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় অর্জন করতে না পেরে হামলা চালিয়েছে নিরীহ জনগোষ্ঠী ও তাদের আবাসিক ভবনের উপর। এভাবেই আবাসিক কোয়ার্টার, কল-কারখানা, রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিস্ফোরণ ও বিধ্বংসী শক্তির বিচার করে বলা যায়, ইসরাইল লেবাননে এটম বোমা ফেলেছে। সুপরিকল্পিত বোমা বর্ষণের দ্বারা ইসরাইল লেবাননের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। এই হলো প্রকৃত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। ব্যাপক ধ্বংস ও সহিংসতার দ্বারা অসামরিক জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ইসরাইল এসব করছে। লেবাননে ইসরাইলের এই কৌশল নতুন কিছু নয়। ১৯৬৮ সাল থেকে ইসরাইল অন্তত পাঁচবার লেবাননে এই কৌশল প্রয়োগ করেছে। ডজন ডজন সড়ক সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বৈরুত বিমান বন্দর ধ্বংস করেছে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে হামলা করেছে। সামরিক নেতাদের গুপ্ত হত্যা করেছে।

আগ্রাসী ইসরাইল শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবাননে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পলায়নপর মানুষই নয়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদেরও টার্গেট করে বোমা মেরে হত্যা করেছে। ইসরাইল ২০০৬ সালের ২৫ জুলাই দক্ষিণ লেবাননে কৈয়ার্ম শহরে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষন চৌকিতে বিমান হামলা চালিয়ে চারজন সামরিক পর্যবেক্ষককে হত্যা করে। নিহত চার পর্যবেক্ষক ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, কানাডা ও চীনের নাগরিক। চীন সরকার

---

২৬. প্রায় ১১০০ লেবানীজ শহীদ হন। ৯ লাখ লেবানীজ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। বাড়িঘর ধ্বংস হয় ৭ হাজার। সেতু ধ্বংস হয় ৬২টি।

www.bjilibrary.com

তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানায়। তদানীন্তন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্টের নিছক দুর্ঘটনার দাবী প্রত্যাখ্যান করে একে পরিকল্পিত হামলা বলে কঠোর সমালোচনা করেন।

এন্টবী অপারেশন

১৯৭৬ সালে ইসরাইল উগান্ডার এন্টবী বিমান বন্দরে হামলা চালায় তার হাইজ্যাক করা যাত্রীবাহী বিমান উদ্ধারে। এ অভিযান সফল হয়। এন্টবী অভিযানই পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিনকে সর্বোপরি ইসরাইলের সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের আরো বেপরোয়া ও দুঃসাহসী করে তোলে।

ইরাকের 'আসিরাক' পারমাণবিক প্রকল্পে ইসরাইলের বিমান হামলা

১৯৮১ সালের ১৪ই জুন রোববার ইরাকের 'আসিরাক' পারমাণবিক প্রকল্পে ইসরাইলের বিমান হিমালা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের জঘন্য উদাহরণ। বাগদাদের কাছে আসিরাক পারমাণবিক প্রকল্পটি অবস্থিত ছিল। ইসরাইলী জঙ্গী বিমান হামলা চালিয়ে ইরাকের পারমাণবিক চুল্লী ধ্বংস করে দেয়। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন [১৯৭৭-১৯৮৩ কার্যকাল] এ অভিযানের নামকরণ করেছিলেন 'অপারেশন ব্যাবিলন'। মাত্র কয়েক মিনিট সময়ে ইসরাইলী ক্রেক পাইলটের দুটি দল একটি অত্যাধুনিক ও সুরক্ষিত এবং চারপাশে বিমান বিধ্বংসী কামান ও স্যাম ৬ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ঘেরা একটি পারমাণবিক প্রকল্প ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। কতটুকু গোপনীয়তা রক্ষা করলে কেমন দুর্ধর্ষ ও বলিষ্ঠ মনের অধিকারী হলে এবং পরিকল্পনা কতটুকু নিখুঁত হলে দুটি বৈরী দেশের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে স্বীয় ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারে বেগিনের 'অপারেশন ব্যাবিলন' তথা ইসরাইলীদের ভাষায় 'ইরাকের গোপন অভিসন্ধি' ব্যর্থ করে দেয়ার সফল অভিযান। মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এমন ২৪জন ক্রেক পাইলট এ অভিযানে এফ-১৫ ও এফ-১৬ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এমন একজন কর্নেল যিনি ১৯৬৭, ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে আরবদের বিরুদ্ধে কমব্যাট মিশনে কাজ করেছেন। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত মিশরের সিনাই অঞ্চলের ইতজিয়ন বিমান ঘাঁটি থেকে জর্ডন ও সৌদী আরবের ওপর দিয়ে গিয়ে ইরাকের পারমাণবিক চুল্লিতে হামলা করা হয়। সিনাইয়ের বিমান ঘাঁটি থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব, উষর মরুভূমির ভয়াবহতা, জর্ডন ও সৌদী আরবের রাডার যন্ত্রকে ফাঁকিয়ে দিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি বাগদাদের রাডার সজ্জিত এবং লক্ষ্যবস্তুর চারপাশে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদত্ত স্যাম-৬ ক্ষেপনাস্ত্র সজ্জিত এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী ইসরাইলীরা ফিরে আসতে সক্ষম হয়। সাড়ে ছ'শ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাগদাদে হামলা চালানো যতোই কঠিন হোক ইসরাইলী পাইলটরা

www.bjilibrary.com

সেটি করেছে। কতিপয় বিমান অত্যন্ত নিচু দিয়ে উড়ে যায়। কয়েকটি খুব উঁচু দিয়ে আর কয়েটি বিমান ঘন কুয়াশার জাল বিস্তার করে আকাশপথে, যাতে করে শত্রুপক্ষের রাডার যন্ত্রকে ফাঁকি দেয়া যায়। তাছাড়া এমন গাঢ় ধোঁয়া বিমানগুলো থেকে ছাড়া হয় যেন কয়েকটি যাত্রীবাহী ও বাণিজ্যিক বিমান আকাশে উড়ছে এমনটি মনে হয়। ১৫টি এফ-১৫ ইন্টারসেপটার ধেয়ে এলো মরুভূমি দিয়ে। পাহাড়ের দিক থেকে এলো কয়েকটি এফ-১৬ ফাইটার বম্বার। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো কি যেন ঘটে গেলো। বিনা মেঘে যেন ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্করী বজ্রপাত। মাত্র দু মিনিট সে প্রলয় নেশার তাণ্ডব চললো। তারপরই সবাই দেখলো, আসিরাক পারমাণবিক চুল্লী থেকে মারাত্মক অগ্নিকুন্ডলী বের হচ্ছে যা ক্রমে সে প্রকল্পটিকেই বিধ্বস্ত করে দেয়। সব কাজ শেষ করে পরদিন রাতে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন বলেন, ইরাক পারমাণবিক চুল্লী পুন:নির্মাণের চেষ্টা করলে ইসরাইল আবারো তা ধ্বংস করে দেবে। তিনি আরো বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় ইসরাইলের যতো নিন্দে করা হয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না। ইসরাইলের ক্ষমা চাওয়ারও কিছু নেই।

মুসলিম বিশ্বের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বাধা দেয়ার জন্য ইহুদী পরিকল্পনা কত সুদূর প্রসারী তা বুঝা যায় পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা করার সাত মাস আগে ১৯৮০ সালে ইরাকী আণবিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা ড. ইয়াহিয়া আল মেশহাদকে প্যারিসের হোটেল কক্ষে ইসরাইলী গুপ্ত ঘাতক সংস্থা কর্তৃক হত্যা করা থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে ইরাকের কাছে বিক্রীত ফ্রান্সের পারমাণবিক রিএ্যাকটর বাগদাদে নিয়ে যাওয়ার পথ থেকেই হাইজ্যাক করার প্লান ছিল ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষান্ত হয়নি ইসরাইল।

১৯৮৪ সালের ২৯শে জুন বৈরুতগামী সাইপ্রাসের ফেরী জাহাজ ইসরাইলী সন্ত্রাসবাদীদের হাইজ্যাকের শিকার হয়। যাত্রীদেরকে জিম্মী হিসেবে আটক করা হয়।

তিউনিসে পিএলওর সদর দফতরে ইসরাইলী বিমান হামলা

১৯৮৫ সালের ১লা অক্টোবর সহস্রাধিক কিলোমিটার দূরে তিউনিসে অবস্থিত ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার [PLO] সদর দফতরে ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়ে তা বিধ্বস্ত করে।

সুদানের সামরিক বহরে ইসরাইলী বিমান হামলা

১৫ জানুয়ারী ২০০৯ সুদানের মরুভূমিতে সন্দেহভাজন গাজাগামী অস্ত্রবহনকারী একটি গাড়ী বহরের উপর ইসরাইল বিমান হামলা চালায়। ইসরাইলের দুজন নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে চাইম ম্যাগাজিন এ তথ্য জানিয়েছে। ৩০ মার্চ ২০০৯ টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে বলা হয়, ২৩টি ট্রাকের একটি সামরিক বহরের ওপর হামলা চালিয়েছিল ইসরাইলের যুদ্ধ বিমান। কয়েক ডজন ইসরাইলী যুদ্ধ বিমান এ হামলায়

www.bjilibrary.com

অংশ নিয়েছিল।[২৭]

ইহুদীরা সন্ত্রাসী। এরা চুক্তিভংঙ্গকারী, অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী, কাপুরুষ, বর্বর, অকৃতজ্ঞ, দাম্ভিক, বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকির প্রতীক। দুনিয়ার দিক দিগন্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভিশপ্ত বাস্তুহারা ইহুদীরা ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ওপর অমানবিক নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে তাদেরকে বিতাড়িত করছে ঘরবাড়ি থেকে। আসলে ইহুদীরা বিচ্ছিন্ন ও বিপদাপন্ন। জেফ হ্যালপার[২৮] সন্ত্রাসী ইসরাইলী মনোভাবের একটি তালিকা পেশ করেছেন যা নিম্নরূপ :

১. ইসরাইল হচ্ছে শিকার, লড়ে চলছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। আরবরা স্থায়ী শত্রু, তারা শান্তি প্রত্যাখ্যান করে। তারা ইসরাইল ধ্বংস করতে মরিয়া, এ দ্বন্দ্ব অপরিহার্য।
২. ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসই মূল সমস্যা, ইসরাইল এর জন্য দায়ী নয়, ইসরাইল যা করে শুধু তার নিরাপত্তার জন্যই করে।
৩. ইসরাইল কোনো ধরনের দখল করেনি, ভূমিগুলো বিরোধপূর্ণ ও বিতর্কিত এবং
৪. কোনো রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়; ইসরাইলকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে বলতে হবে; দুর্গ ইসরাইল' অবস্থা বজায় রেখেই চলতে হবে; একমাত্র বেনতুস্তান ধরনের ফিলিস্তিন আলাদা রাষ্ট্র হতে দেয়া যেতে পারে; অ-টেকসই, আধা-সার্বভৌম, চারপাশ দিয়ে ইসরাইল বেষ্টিত এবং পাশের শক্তিশালী প্রতিবেশী ইসরাইলের ইচ্ছা-অনিচ্ছানির্ভর।

ইসরাইলীদের সামগ্রিক মনোভাবটাই জেফ হ্যালপার সংক্ষেপে তালিকাভুক্ত করেছেন এভাবে। এসব মনোভাব কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। আর এ ধরনের অবাস্তব আর অকার্যকর মনোভাব নিয়েই ইহুদিরা আগে থেকেই বন্ধ করে রেখেছে ফিলিস্তিন সমস্যার শান্তি-সমাধান, পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন, সত্যিকারের নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক সমাধানের যাবতীয় পথ। সে কারণেই ফিলিস্তিন সমস্যা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন সমস্যা। এখনো ইসরাইল তা অব্যাহত রাখছে তার নিজের স্বার্থে। আর তার নিজের কৃতকর্মের জন্য অভিযোগের আঙ্গুল তুলছে ফিলিস্তিনীদের ওপর। আর পাশ্চাত্যের সমর্থনপুষ্ট হওয়ার কারণে এখনো এ ব্যাপারে ইসরাইল নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। বিশেষ করে ইসরাইলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থন এ সমস্যা সমাধানের পথে বাধার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে শুধু নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করে।

---

২৭. দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ৪ এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যা, পৃ.৭।
২৮. মাসিক অন্য দিগন্ত, অক্টোবর ২০০৮ সংখ্যা, পৃ. ৯৫।

www.bjilibrary.com

বছরের পর বছর ধরে ইসরাইল সমঝোতাকে পদদলিত করে আসছে বার বার। এড়িয়ে গেছে শান্তির পথ, বেছে নিয়েছে দ্বন্দ্ব আর দমন-পীড়নের-সন্ত্রাসের পথ। তেমন উদাহরণ বিস্তর। কিন্তু পাশ্চাত্য ও বিশ্বের মানুস সে সম্পর্কে জানে খুবই কম।

ইসরাইল দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখার পথই বেছে নিয়েছে। একদিকে আরবদের বাস্তুচ্যুত করছে। অপর দিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গড়ে তুলছে ইসরাইলি বসতি। ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। সমাধানের পথ জটিলতর হচ্ছে।

জর্জ বিটারের[২৯] বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, বিশ্বশান্তির জন্য সমস্যা হচ্ছে ইসরাইল। ইসরাইলকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে সরিয়ে বিশ্বের অন্যত্র পুনর্বাসিত করলে ল্যাঠা যায়। আর তা করা হলে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা থাকবে না। আরবদের সঙ্গে ইসরাইলের ভাল সম্পর্ক স্থাপনের মূল কথা হচ্ছে, তাদের অধিকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে। ইহুদীরাই আরব ভূখণ্ড কেড়ে নিয়েছে।[৩০]

এটাই সত্য যে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ইহুদী ইসরাইলের যে আগ্রাসী ভূমিকা, তা থেকে ইসরাইলকে কখনোই নিবৃত্ত করা যাবে না। এটা ইসরাইলের সহজাত স্বভাব দোষ। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর নাম শুনলেই ইহুদীদের মধ্যে এমন এক অস্বাভাবিক বিক্রিয়া [এলার্জি] ও প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়, যার কোন উপশমও নেই, চিকিৎসাও নেই। মুসলিম উম্মাহকে আজ শক্তির উৎসমূলে ফিরে আসতে হবে। যে শক্তিবলে একদিন মদীনা থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন সম্ভব হয়েছিল, খাইবার থেকে উৎখাত সহজ হয়েছিল, জেরুসালেম কবজায় আনার সাধ্য হয়েছিল– সেই শক্তির আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন করেই ইসরাইলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। ■

---

২৯. জর্জ বিটার, ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারে নিযুক্ত লেবাননের চার্জ দ্য এফেয়ার্স।
৩০. অগাস্ট ২০০৬ প্রথম আলো পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে জর্জ বিটার এ বক্তব্য রাখেন। দেখুন মাসিক অন্যদিগন্ত, অক্টোবর ২০০৮, পৃ. ১৩২।

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম– বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৪ই মে, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

■

বর্তমান সময় থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে তখনকার বিশ্বে 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞান'-এর মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় আরব বিশ্ব, তদানীন্তন জ্ঞান-বিজ্ঞানে খ্যাতিমান বড় বড় বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের প্রায় অধিকাংশই নিজ বুকে ধারণ করে বিশ্বব্যাপী একক কৃতিত্বের স্বর্ণ শিখরে স্থান দখল করে নিয়েছিলো। তখন তাঁদের উজাড় করা অবদানের কারণে কোথাও 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞান'-এর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়নি বরং 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞান'-এর পারস্পরিক সহযোগিতামূলক হাত ধরাধরি করে চলার নীতির ফলে খুবই দ্রুতগতিতে সমাজ এগিয়ে গেছে সম্মুখ পানে। বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের সকল শাখায় আবিষ্কার করেছেন অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং মজবুতভাবে বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে সফলতা লাভ করেছেন প্রায় শতভাগ। পরবর্তীকালে সেই আরব নির্ভর জ্ঞান বিজ্ঞানই সমগ্র বিশ্ব সভ্যতাকে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

www.bjilibrary.com

পরে মাঝখানে কুরআন ও বিজ্ঞান প্রিয় মুসলিম সমাজে অন্ধকার তিমির রাত নেমে আসায় বিগত প্রায় ৫০০ বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোময় পথ থেকে তারা ছিটকে বহুদূরে অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে। অবস্থার করুণ পরিণতি এতদূর গড়ায় যে আজ আবার নতুন করে মুসলিম সমাজকে জানতে হচ্ছে– আল্-কুরআন কি? কুরআন কী বিজ্ঞানকে সমর্থন করে? কিংবা বিজ্ঞান কী কুরআনকে সমর্থন করে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'কুরআন-এ বিজ্ঞানের সমর্থন' এ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার পূর্বেই আমরা কুরআন কী ও বিজ্ঞানই বা কী সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অতীব প্রয়োজনবোধ করছি। আসুন পর্যায়ক্রমে তা আমরা জেনে নিই।

আল্-কুরআন-এর পরিচয়

'আল্-কুরআন' আমাদের এ মহাবিশ্বের একমাত্র মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ পবিত্র বাণী সম্ভব যা মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য সর্বশেষ হিদায়াত সম্বলিত আসমানী কিতাব। পার্থিব জীবনে মানবজাতির জন্য যা যা প্রয়োজন তার সমস্ত কিছুই এ সর্বশেষ কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন তিনি। মানবজীবনে প্রয়োজনীয় এমন কোনো কিছুই এতে বাদ পড়েনি। সূরা আন্ নাহ্লে-এ বলা হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

"আমি আপনার প্রতি এ কুরআন নাযিল করেছি যা সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী ও মুসলিমদের জন্য বড় হিদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক।" [সূরা ১৬ : আয়াত-৮৯]

আল্লাহ্ আল্-কুরআনকে মৌলিকভাবে লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত রেখেছেন। লাওহে মাহফুয থেকে সম্মানিত ফেরেশতা জিব্রাঈল [আ] পৃথিবীতে কুরআনকে বহন করে আনেন। দীর্ঘ ২৩ বৎসর সময়ে। 'আল্-কুরআন' অবতীর্ণ হয়েছে আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় ও মদিনায় আমাদের আখিরী নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর ওপর। তিনি অবতীর্ণ কুরআনের আলোকে প্রথমে নিজের জীবনকে সাজিয়েছেন এবং পরক্ষণে তা মানব সমাজকে মানার জন্য আহ্বান করেছেন, কুরআনকে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশমত মানবজাতির নিকট সার্বিকভাবে সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'আল্-কুরআন'-ই এ পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি, অমিল-গরমিল, সন্দেহ- সংশয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সূরা আল বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ.

"এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথনির্দেশ?"

১১—

www.bjilibrary.com

যেহেতু কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী তাই তিনি নিজেই এর সার্বিক হিফাযাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। [সূরা হিজর : আয়াত-৯]

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

"আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সম্পূর্ণ হিফাযাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।"

আল্-কুরআন-এর উদ্দেশ্য

'আল্-কুরআন' মানবজাতির প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড বুক, আর মানবজাতি এ সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মূলত:ই সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ এ মানবজাতিকে তার দুনিয়ার জীবনে সকল প্রকার মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যই পথের আলো হিসেবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 'কুরআন' নামক এই নূরের আলোময় পথে যারা পথ চলবে, তারা দুনিয়ার জীবনে যেমনি পথহারা হবে না, তেমনি এরই বিনিময়ে তারা আখিরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তখন তারা কুরআনের অনুসারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র নেককার বান্দা হিসেবে পরিচিত হবে এবং অনন্ত কালব্যাপী অফুরন্ত নিয়ামাতে পরিপূর্ণ 'জান্নাতে' আল্লাহ্‌র পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে থাকবে। অর্থাৎ কল্পনাতীত এক সফল জীবন তারা লাভ করবে।

আল্-কুরআন-এর লক্ষ্য

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত মানবগোষ্ঠীকে পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ এ পৃথিবীর সার্বিক অকল্যাণকর পরিবেশে দৃঢ় ও মজবুত নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করে তার ভেতর দিয়ে আখিরাতের সফল স্থান 'জান্নাতে' পৌঁছে দেয়াই 'আল্-কুরআন'-এর লক্ষ্য। এজন্য আল-কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সকল প্রকার দিক-নির্দেশনাসহ অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে–

فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা আমার দেয়া হিদায়াত অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোনরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ নেই।" [সূরা ২ : আয়াত-৩৮]

আল্-কুরআন-এর কর্মসূচী

'আল্-কুরআন' সমগ্র মানবজাতিকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অমানবিকতা, বর্বরতা ও জাহিলিয়াতসহ সকল প্রকার তাগুতি অন্ধকার থেকে বের করে এনে নূরে ঝলমল জান্নাতি পথে পরিচালনার লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক বৈপ্লবিক কর্মসূচী পেশ করেছে। কুরআন সূরা আল বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

www.bjilibrary.com

"যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান।"

মানবজাতি তার দুনিয়াবী জীবন ও আখিরাতের জীবন সফল করতে হলে তাদেরকে যা করতে হবে। তা হলো :

১. সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র 'কুরআন'-কে মজবুতভাবে ধারণ করা।

২. আল-কুরআনকে সাহী শুদ্ধভাবে অধ্যয়ন করা, যেন মহান আল্লাহ্র পবিত্র বাণীর সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষা হয়।

৩. কুরআন-এর সকল প্রকার বক্তব্যকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা। শিক্ষণীয় বিষয়কে বাস্তব আমলের মধ্যে আনা।

৪. কুরআন-এর শিক্ষার আলোকে সমাজকে সংশোধনের প্রচেষ্টায় পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করা।

৫. দাওয়াতে দীনের ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে পরিকল্পিত মিশন নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়া।

৬. ওয়ায-মাহফিল, বক্তৃতামালা, লিখনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রচার পত্র, পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, বই, রেডিও, টিভি, ডিশ চ্যানেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে 'কুরআন' প্রচারে সর্বোতভাবে ব্যবহার করা।

৭. সর্বক্ষেত্রে দাওয়াত পৌছাতে সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞানসহ উত্তম কথা, উত্তম ভাষণ এবং উন্নত কৌশল অবলম্বন করা।

৮. সকল অবস্থায় আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করা।

আল্-কুরআন-এর ব্যাপকতা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা মানবসমাজের জন্য একদিকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধান বুকে ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছে যা এক অনন্য, বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা এ পৃথিবীর ইতিহাসে। অপরদিকে 'আল্-কুরআন'-এর আহ্বান ও আবেদন কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় বরং সময়, যুগ ও শতাব্দির গণ্ডি পেরিয়ে সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে হতবাক করে দিয়ে পৃথিবী ধ্বংসের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে উপস্থাপন করেছে। যা কখনো কোনো জ্ঞানী-গুণী বা মানবগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। 'আল্-কুরআন'-এর সূরা জুম'আর ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ

"সকল মানুষের জন্য, যারা এখন পর্যন্ত আগমন করেনি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

www.bjilibrary.com

সুতরাং 'আল্-কুরআন' একাধারে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসানীতি, রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিসহ প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ একখানা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তুলনাবিহীন আসমানী গ্রন্থ, যা কিয়ামাত পর্যন্ত সকল যুগে, সকল পরিবেশে ও সকল অবস্থায় মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সর্বোতভাবে সক্ষম।

বিজ্ঞান কী?

বিজ্ঞান হচ্ছে– বস্তুজগত ও প্রাকৃতিক জগতের যে কোনো বিষয়ে যথার্থ পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে লব্ধ এক বিশেষ জ্ঞান, যে জ্ঞানের মাধ্যমে ঐ বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায় বা স্তর থেকে ওর সর্বশেষ পর্যায় বিশদভাবে পর্যাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করা যায়।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১. যথাযথ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বস্তুর প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার বা উদঘাটন করা।

২. নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তির মৌলিক চরিত্র জেনে তা সাধ্যমত মানব কল্যাণে ব্যবহার করা।

৩. মৌলিক বস্তুকণা আবিষ্কার করে তাদের বৈশিষ্ট্য জেনে অগণিত যৌগিক পদার্থ তৈরীর মাধ্যমে মানব কল্যাণ আরো অধিকতর নিশ্চিত করা।

৪. মৌলিক বস্তুকণার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অবহিত হয়ে যুগের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি রোগ নিরাময় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মানবসমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধন করা।

৫. শক্তি, বস্তু ও প্রতিবস্তুর মৌলিক সত্তা যথার্থভাবে আবিষ্কার করে পার্থিব সকল প্রকার যোগাযোগ, আদান-প্রদান, লেন-দেন, কাজ-কারবারসহ মহাশূন্যে সকল প্রকার অভিযান-সফরকে পূর্ণমাত্রায় সম্ভব ও সফল করে তোলা।

৬. বিজ্ঞানের উন্নত আবিষ্কার আর তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে মানব সমাজকে প্রাকৃতিক সকল প্রকার বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

৭. একাধারে মানব সভ্যতার বস্তুগত ও শক্তিগত সকল পর্যায়ে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে সভ্যতাকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছে দেয়া।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য

প্রতিদিনের বিস্ময়কর ও উন্নত আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিকে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপমৃত্যু, হিংসা, জিঘাংসা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, মারামারি ইদ্যাদি দূরীভূত করা,

www.bjilibrary.com

অপরদিকে সর্বোন্নত-জীবন উপকরণ, খাদ্র-দ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরোগ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী আলট্রা মডার্ন সাসাইটিতে মানবসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিজ্ঞানের কর্মসূচী

বিজ্ঞান তার একমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যে পৌছুতে চায়, সেজন্য বিজ্ঞান তার কর্মসূচী নির্ধারণ করেছে এভাবে-

১. মানব সমাজের সকল মানুষকেই বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী হতে হবে। যদিও এতে তারতম্য থাকা স্বাভাবিক, তবুও একটা পর্যায় পর্যন্ত অবশ্যই সবাইকে জ্ঞানী হতে হবে।

২. শিশু অবস্থা থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে শিশুকে গড়ে তুলতে হবে।

৩. শিক্ষার সকল স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. দেশের প্রতিটি শহরে Science Lab. Science Club, Science Discussion Project, Science Exibition চালু করতে হবে।

৫. বড় বড় শহরে মান-মন্দির বসাতে হবে এবং নিয়মিত আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য যোগ্য মানুষকে তা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবশ্যই সবাই সবাইকে বিজ্ঞান বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

৭. শিক্ষা খাতে প্রত্যেক দেশেই বিজ্ঞান বিষয়ে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞানের ব্যাপকতা

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতা যে অকল্পনীয়ভাবে কতটুকু বিস্তৃত হয়েছে, তা এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়- 'মাতৃজঠর থেকে কবর পর্যন্ত।' যেমন-

১. সন্তানহীন দম্পতির সন্তান লাভে ল্যাবরেটরিতে টেষ্ট টিউবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলন ঘটিয়ে তা মাতৃজরায়ুতে স্থাপন করা হচ্ছে এবং এতে উল্লেখযোগ্য সফলতা পাওয়া যাচ্ছে।

২. মাতৃজরায়ুতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলনে সৃষ্ট প্রথম কোষ 'Stem cell'-এ কোনো ক্ষতিকর বা অকার্যকর 'জিন' থাকলে তাকে অপসারণ করে সুস্থ ও কার্যকর 'জিন' প্রতিস্থাপন করে সঠিকভাবে সুস্থ মানুষ ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করছে।

৩. DNA মানচিত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বিভিন্ন রোগের প্রকৃত কারণ ও তার প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরী করে রোগ-বালাই স্থায়ীভাবে নিরাময় করা হচ্ছে।

৪. সকল বয়সের নারী-পুরুষ ও শিশুর আরাম-আয়েশ ও সুস্থ জীবন যাপনের সার্বিক উপকরণ ও ব্যবস্থা আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী তা সহজ থেকে সহজতর করে দিয়েছে।

www.bjilibrary.com

৫. মৃত মানুষকে বছরের পর বছর রিফ্রিজারেটর-এ রেখে পরবর্তীতে সুবিধামত সময়ে অবিকৃত অবস্থায় দাফন করা যাচ্ছে।

৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, খেলা-ধূলা ও তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবদানে উন্নতির শীর্ষপর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় সমগ্র পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয় স্থান করে নিয়েছে। ফলে মানুষ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা তার কাজ মুহূর্তের মধ্যেই সমাপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে।

৭. আগামীতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার কারণেই পৃথিবীর মানবমণ্ডলী অদূর ভবিষ্যতে মহাবিশ্বে গ্রহ থেকে গ্রহে, গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিতে ভ্রমণ সফল করে তুলবে, ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে মহাশূন্যের একটা অংশে সফলভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্‌-কুরআন ও বিজ্ঞান-এর মাঝে সম্পর্ক

আমাদের প্রিয় গ্রহ এ পৃথিবী চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞান তার সফল অগ্রযাত্রার মাধ্যমে যে যে বিষয়গুলো সত্য সঠিক আবিষ্কার আর উদঘাটন হিসেবে বিশ্বব্যাপী উপস্থাপন করতে সমর্থ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অগ্রিম প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই সঠিক তথ্য [Information] দিয়ে পরিপূর্ণ করে 'আল্‌-কুরআন' মানবজাতির নিকট মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা যিনি এ মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের প্রকৃতি [nature] ও প্রকৃতির বিধান [law of nature] সহ যাবতীয় সকল কিছুই করেছেন। আর এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, অনুসন্ধান ও উদঘাটন করা এবং আবিষ্কার করাই হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কাজ।

আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে আহ্বান করেছেন তাঁর এ বিশাল সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করে তাঁকে খুঁজে পেতে, তাই তিনি পবিত্র গ্রন্থ 'আল্‌-কুরআন'কে প্রকৃতি, প্রকৃতির বিধান, মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার সকল শক্তি ও বস্তুর বিষয়ে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাজিয়েছেন, যা বর্তমান পূর্ণাঙ্গতাপ্রাপ্ত বিজ্ঞান তার প্রতিদিনের আবিষ্কার আর উদঘাটনের মাধ্যমে এক এক করে প্রমাণিত করে চলেছে। সুতরাং আল্‌-কুরআন ও বিজ্ঞান-এর মাঝে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আল্‌-কুরআন মুসলিমদের হাতে

আজকে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ শুধুমাত্র আল-কুরআন-এর কিছু কিছু বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে

www.bjilibrary.com

সার্বিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম হওয়ার কারণে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তারা এ কিতাবকে ধারণ করেছে, যদিও জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে চরম উদাসীনতা প্রকাশ করে চলেছে সর্বক্ষেত্রে। আরো লক্ষণীয় যে তারা এ ব্যাপারে কোনো প্রকার গরজও দেখাচ্ছে না। এর ফলশ্রুতিতে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে যা ফিরে পাওয়ার কোনো লক্ষণও আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান অমুসলিমদের হাতে

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের যে সীমাহীন অগ্রগতি ও উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে– এর পেছনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অমুসলিম সমাজের অবদানই বেশি। ওরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে তথা আল-কুরআনকে প্রাধান্য না দিয়ে বিজ্ঞানের সাফল্যকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে বস্তুবাদী চিন্তা চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পরকালমুখী সফল কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ছে। সাথে সাথে একজন মহান সত্তা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি ও সার্বক্ষণিক তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে যে এ বিশ্বব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে, তা তাদের নিকট একটি হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের আকাশচুম্বী অগ্রগতি ও সাফল্য যেন তাদেরকে ক্রমান্বয়ে এক মহাশাস্তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, আল্লাহ্ তা'আলা বর্তমান মুসলিমদের হাতে আল্-কুরআন এবং অমুসলিমদের হাতে সাফল্যে ভরা বিজ্ঞান তুলে দিয়ে পরকালের কঠিন এক জবাবদিহিতার শিকলে যেন উভয় দলকেই বেঁধে ফেলেছেন। ন্যূনতম পক্ষে উভয় দলই এক ও একক সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পরিচয় ও বাস্তব উপস্থিতির প্রমাণ লাভ করে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করার জন্য কুরআন ও বিজ্ঞান তাদের জন্য যথেষ্ট ছিলো। অথচ বাস্তব জীবনে তারা তা করেনি। কেন করেনি? এ এক কঠিন প্রশ্ন, যে প্রশ্নের জালে তারা উভয় দলই আট্‌কা পড়ে যাবে।

এত বড় বড় দু'টি নিদর্শন দু'টি দলের ভাগ্যে জোটার পরও তারা আল্লাহ্‌র পথ মহাশান্তির পথ থেকে বহু যোজন যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়েছে। তাই সম্ভবতঃ আল্লাহ্ দু'দলকেই পরীক্ষা করার জন্যই একদলের হাতে পবিত্র আসমানী গ্রন্থ 'আল্-কুরআন' এবং অপরদলের হাতে বিস্ময়কর জ্ঞান বিজ্ঞানের বর্তমান চাবিকাঠি তুলে দিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার মূলতঃই আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আল্-কুরআনে বিজ্ঞান কেন?

আমাদের এ পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চরম উৎকর্ষতায় মণ্ডিত বিজ্ঞান তার অগ্রযাত্রার মাধ্যমে যে যে বিষয়গুলো সত্য সঠিক আবিষ্কার আর উদঘাটন হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হচ্ছে তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রিম প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বেই একশত ভাগ সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করে

www.bjilibrary.com

আল্-কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে মানবজাতির নিকট পৌঁছানো হয়েছে।

যেহেতু আল্লাহ্ এ মহাবিশ্ব নিজ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি ভালো করেই জানেন যে, সময়ের আবর্তনে এ পৃথিবীর মানবমণ্ডলী এক পর্যায়ে এমন এক কঠিন সময় অতিক্রম করবে যখন মানবসমাজ জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার মানদণ্ডে বিচার করে তবেই প্রতিটি বিষয় গ্রহণ করবে কিংবা বর্জন করবে। তাই, সে সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত গ্রন্থ যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ 'তথ্য ও তত্ত্ব' দিয়ে সমৃদ্ধ না থাকে, তাহলে তখনকার মানবসমাজ তা গ্রহণ না করে খুব সহজেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যা হবে তাদের জন্য বড়ই ক্ষতিকর বিষয়। সুতরাং উল্লেখিত অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য এবং নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোকেও সম্মুখে রেখেই আল্-কুরআনে 'বিজ্ঞান' বিষয়ক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। যথা :

১. একমাত্র মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ যে সত্য সত্যই বর্তমান আছেন, তা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অগ্রিম তথ্যের আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত করা।

২. 'আল্-কুরআন' যে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীসম্ভার তা দিবালোকের মতো আলোতে প্রমাণ করা।

৩. বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 'ঈমান' আরো বৃদ্ধি ও মজবুত করা।

৪. অবিশ্বাসীদের মনগড়া অযৌক্তিক কল্পনার প্রাসাদ ধ্বংস করে তাদের মুক্তির পথ খুলে দেয়া।

৫. মানবজাতিকে এক ও একক স্রষ্টার বিধানে সত্যিকার অর্থেই আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে গড়ে তোলা।

৬. এ মহাবিশ্বে মানব সৃষ্টির মহা উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে সফল করা।

৭. সর্বোপরি মানবসমাজ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে নিজেদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরসুখের জান্নাত লাভ করে ধন্য হওয়ার জন্যই 'আল্-কুরআনে' বিজ্ঞানকে সংযোজিত করা হয়েছে।

আল্-কুরআনের প্রতি 'বিজ্ঞানের' সমর্থন

আল্-কুরআন মৌলিকভাবে 'বিজ্ঞান'-এর পুস্তক নয়। তবে প্রাকৃতিক জগৎ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগতসহ আরো অন্যান্য জগৎ নিয়ে যা কিছু আছে, তাদের যেসব তথ্য কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানের চর্চা হতে পারে। এ পর্যন্ত কুরআনে প্রায় হাজার খানেক আয়াত সনাক্ত করা হয়েছে যেগুলো সরাসরি বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। এর মধ্যে আমাদের এ বিশাল দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয় থেকে শুরু করে গ্যালাক্সি,

www.bjilibrary.com

কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নেবুলা, ব্ল্যাক হোল, সুপার নোভা, এমনকি অণু-পরমাণু, উপ-আনবিক কণিকা, ফোটন কণিকা ইত্যাদি মহাসূক্ষ্ম কণিকা জগতও বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ বিশাল মহাবিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের মহাভাণ্ডার থেকে মানবজাতির যতটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান জানা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনে চূড়ান্ত তথ্য হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। বিজ্ঞান যখন যে বিষয়ের চূড়ান্ত আবিষ্কার আর উদঘটন সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে কেবল তখনই তাদের সেই প্রকৃত সফল আবিষ্কারের তথ্যকে আল্-কুরআনে উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে ঝল্ ঝল্ করতে দেখতে পাবে। যা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 'কুরআনের আগমন করে স্থান করে নিয়েছে।

এবার চলুন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি সত্যিই আল্-কুরআন বিজ্ঞানময় কিনা এবং সফল বিজ্ঞান কুরআনকে পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচ্ছে কিনা?

* প্রথমেই আমরা এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখতে চাই। আমাদের এ বিশাল সীমা-পরিসীমাহীন মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক আদি তথ্য দিতে গিয়ে আল্-কুরআন সূরা 'আম্বিয়ার' ৩০ নং আয়াতে প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই ঘোষণা করেছে–

أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا.

"অবিশ্বাসীরা কি গবেষণা করে দেখে না যে, আদিতে মহাবিশ্বটি মিশে ছিলো একত্রে ওতপ্রোতভাবে। এক পর্যায়ে আমি সকল কিছুকে সবেগে পৃথক করে দিয়েছি।"

এখানে স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে যে, মহাবিশ্বটি সৃষ্টির পূর্বে মৌলিক উপাদান আকারে বিশেষ পদ্ধতিতে সংকুচিত ও মিশ্রিত অবস্থায় বিরাজমান ছিলো। পরে আল্লাহ্ তাঁর নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ সংকুচিত মিশ্রণটির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেন, ফলে তা চতুর্মুখী গতিবেগপ্রাপ্ত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে পৃথক হয়ে বর্তমান দৃশ্যযোগ্য এ মহাবিশ্বে রূপ নেয়। এ হচ্ছে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক আদি তথ্য।

বিজ্ঞান বিশ্ব বিগত বিংশ শতাব্দিতে এসেই কেবলমাত্র এ বিষয়ে একটু একটু করে সঠিক পথে এগুতে থাকে। ১৯৩৩ সালে বেলজিয়ামের পদার্থ বিজ্ঞানবিদ 'জর্জ লি মেইটর' সর্বপ্রথম মহাবিস্ফোরণ তথা 'Big Bang' থিওরী উত্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'মি. গ্যামো' তার এ মহাবিস্ফোরণ থিওরী সমর্থন করেন এবং অংক কষে দেখান যে, সেই মহাবিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা [back ground radiation] এখন মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রায় 3k. বিরাজমান আছে। যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা গেলে তা আবিষ্কৃত হতে পারে। এর প্রায় ২০ বৎসর পর ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় Bell Telephone কোম্পানীতে চাকুরীতে বিজ্ঞানী 'মি. আরনো পেনজিয়াস' এবং 'মি. রবার্ট উইলসন' তাদের তৈরী এন্টেনাতে কাজ করার সময়

www.bjilibrary.com

হঠাৎ করেই 'back ground radiation' 2.73k.- কে সনাক্ত করতে সক্ষম হন এবং 'Big Bang' যে সত্য ঘটনা তা সমগ্র বিজ্ঞান বিশ্বে একযোগে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। কৃতিত্বস্বরূপ বিজ্ঞানীদ্বয় ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সুতরাং প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবিজ্ঞান যুগে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্-কুরআন যে মৌলিক তথ্যটি প্রদান করেছিল, আজকে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা হুবহু সে তথ্যটি প্রমাণিত করে কুরআনের সত্যতাকে জ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে।

'নূর' থেকে সৃষ্টি

এ মহাবিশ্ব মৌলিকভাবে কোন্ জিনিস থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করতে গিয়ে আল্-কুরআন সূরা 'নূর' এর ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখ করেছে–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ - اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ - اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ - نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ - يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ - وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ - وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী [তথা সমগ্র মহাবিশ্ব] 'নূর' [বিশেষ আলোকশক্তি] থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। নূরের উপমা এমন, যেমন একটা তাক-এ বাতি রাখা আছে। বাতিটি চিমনির মধ্যে রয়েছে। চিমনিটি এমন যে, যেন মোতির মতো চকমকে তারকা। আর বাতিটিকে যায়তূনের এমন এক বরকতময় গাছের তেল দিয়ে জ্বালানো হয়, যে গাছটি পূর্ব দিকেরও নয়, পশ্চিম দিকেরও নয়, যার তেল এমন, তাতে আগুন না ধরালেও আপনা-আপনিই আলোকিত হয়। আলোর ওপর আলো [বেড়ে যাওয়ার সব কারণ জমা হয়ে আছে]। আল্লাহ নূরের দিকে যাকে চান তাকে পথ দেখান। আল্লাহ মানুষকে উপমা দিয়ে কথা বোঝান। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসকে ভালো করেই জানেন।

'Big Bang' মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ মতবাদ গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ 'Computer simulation'-এর মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেন যে, মূলতঃ highest energetic radiation' তথা কল্পনাতীত মহাশক্তিশালী 'আলোকশক্তি'ই প্রথমে ঘনীভূত হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী মুহূর্তে সেই বিন্দুটি মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্রমান্বয়ে এ মহাবিশ্বে রূপ নেয়। বিস্ফোরণের পর মুহূর্তে আলোর কণা 'ফোটন' [Photon] ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না।

www.bjilibrary.com

অপরদিকে বিজ্ঞানীগণ ইউরোপ এবং আমেরিকায় 'Particales Collider'-এ পদার্থকে ভেঙ্গে অণু, অণুকে ভেঙ্গে পরমাণু, পরমাণুকে ভেঙ্গে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে ভেঙ্গে কোয়ার্ক, অবশেষে কোয়ার্ককে ধ্বংস করে আলোর কণা 'ফোটন'কে সনাক্ত করে প্রমাণ করেন যে, এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে মৌলিক যে শক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা মূলতঃই মহাশক্তিশালী এক প্রকার 'নূর' বা 'আলোকশক্তি'।

ছয়টি সময়কালে সৃষ্টি

* 'আল্-কুরআন' এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান রূপ ধারণ পর্যন্ত সময়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, সর্বমোট ছয়টি সময়কাল ব্যয়িত হয়েছে। সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

"তিনিই ছয়টি সময়কালে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী [সমগ্র মহাবিশ্বটি] সৃষ্টি করেছেন।"

বিজ্ঞান বিশ্ব Computer Simulation-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত যতভাবে গবেষণা করেছে তাতে 'Big Bang' মুহূর্ত থেকে 'অটল পদার্থ' পরমাণু সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব রূপ ধারণ করা পর্যন্ত সর্বমোট ছয়টি সময়কালকেই কেবল সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।
যেমন– [১] Plank time বা time Zero [২] Inflation Period [৩] Annihilation Period [৪] Proton & Netron Period [৫] Atomic Nuclei Period [৬] Stable atoms Period.

অতএব এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সর্বোচ্চ অগ্রগতিসম্পন্ন 'বিজ্ঞান' শত চেষ্টা করেও আল-কুরআনের দেয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারছে না; বরং আল-কুরআনকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

ব্লাক হোল

আমরা দেখি ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় মহাকাশীয় Black hole সম্পর্কে সর্বপ্রথম 'আল-কুরআন' সূরা ওয়াকিয়ার ৭৫ নং ও ৭৬ নং এ অবহিত করেছে এভাবে–

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ.

"শপথ নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানের। এটা একটা গুরুতর শপথ যদি তোমরা জানতে।"

অর্থাৎ– আল্লাহ্ মানবজাতিকে জানাচ্ছেন যে এ মহাবিশ্বে দৃশ্যমান বিরাট বিরাট নক্ষত্রকে ধ্বংস করার ব্যবস্থাও তাঁর কাছে আছে। আর সে ব্যবস্থা এতই ভয়ঙ্কর যে মানবজাতি যখন জানবে, তখন তাদের পিলে চমকে উঠবে, তারা বিশ্বাসই করতে কষ্ট হবে যে এত ভয়াবহ ও অবিশ্বাস্য ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

www.bjilibrary.com

'বিজ্ঞান' বিংশ শতাব্দিতেই এসে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর-এ Astronomincal Satellite 'UHORO'-র মাধ্যমে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ চরিত্রের মহাকাশীয় রাক্ষস এ 'Black hole' আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। এর ভয়ঙ্কর চেহারা এবং অকল্পনীয় ধ্বংস মানুষের জানা সকল প্রকার বিপর্যয়কেও হার মানায়।

এতে আবারও প্রমাণিত হলো আল-কুরআন যেমন সত্য তেমনি এর রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ্‌ও সহসত্যতায় বিরাজমান।

মহাকর্ষ বল

এ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার বস্তুসমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী 'মহাকর্ষ বল' [Gravitational Force] সম্পর্কে আল্‌-কুরআন বেশ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করেছে এভাবে–

সমগ্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা 'আর রূম'-এর ২৫ নং আয়াতে–

وَمِنْ ايتِه اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ بِاَمْرِه.

"আল্লাহ্ তা'আলার মহানিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে, মহাবিশ্বটি তাঁরই 'মহাকর্ষ বল' [আমর] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।"

আবার গ্যালাক্সিসমূহ ও পৃথিবী সম্পর্কে বলা হয়েছে– সূরা 'ফাতির'-এর ৪১ নং আয়াতে–

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوتِ وَالاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ. وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا

مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِه. اِنَّه كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গ্যালাক্সিসমূহকে [আকাশ জগতকে] ও পৃথিবীকে এমনভাবে [মহাকর্ষ বল দ্বারা] ধারণ করে রেখেছেন, যার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত [ধ্বংস] হয় না। ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"

একইভাবে মহাশূন্যে ভাসমান নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে সূরা 'আন্ নাহল'-এর ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرتٌ

بِاَمْرِه. اِنَّ فِىْ ذلِكَ لايتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْمَلُوْنَ.

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে, আর সমস্ত নক্ষত্ররাজিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মহাকর্ষ বল' [আমর] দ্বারা। অবশ্যই বিজ্ঞ লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।"

আবার পৃথিবীর কথা বলতে গিয়ে সূরা 'আল মুলক'-এর ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

www.bjilibrary.com

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا.

"তিনি সমগ্র পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত [এমন শক্তিসম্পন্ন] করে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা পৃথিবীর যে কোনো অংশেই সহজে চলাফেরা করতে পারো [যেন ছিটকে পড়ে না যাও]।"

অর্থাৎ মহাশূন্যে ভাসমান ও পরিভ্রমণরত এ পৃথিবীর সর্বত্র এমন এক শক্তিকে [মাধ্যাকর্ষণ বল] আল্লাহ্ কাজে লাগিয়েছেন, যে শক্তিটি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বস্তুকে বাতাসের ঝাপটায় ছিটকে মহাশূন্যে চলে যেতে দেয় না। শক্তিটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে রাখে। পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী এ শক্তি সম্পর্কে সূরা 'আন্ নাযিয়াত'-এর ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالنَّزِعٰتِ غَرْقًا.

"শপথ সেই শক্তির, যা কেন্দ্রমুখী ধাবিত করে।"

৭ম শতাব্দিতে আল-কুরআন-এ উল্লেখিত 'মহাকর্ষ বল' সম্পর্কে তথ্য মানবজাতির নিকট আগমন করার পর ৯ম শতাব্দিতে মুসলিম বিজ্ঞানী আল খারেজমী সর্বপ্রথম 'মহাকর্ষ বল' [Gravitation] সম্পর্কীয় ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছিলেন–

পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

পরে ১৬৬৫ সালে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন গাছ থেকে আপেলকে মাটিতে পড়তে দেখে 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'-র সন্ধান লাভ করেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞান প্রমাণ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রতিটি বস্তুকেই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে অনবরত টানছে। এ টান না থাকলে আমরা মাটির উপর হাঁটা-চলা করতে পারতাম না। মূলত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পৃথিবীর উপর সকল প্রকার কাজ-কর্ম সম্ভবপর হচ্ছে।

বিজ্ঞান আরো প্রমাণ করেছে– পৃথিবীর বেলায় যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করছে– মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সিসমূহ, তারকারাজিসহ অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুদের বেলায় সেই একই শক্তি 'মহাকর্ষ শক্তি' নামে আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে মহাশূন্যে বিভিন্ন কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করে ধরে রেখেছে। ফলে সবাই ভারসাম্য বজায় রেখে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। অযথা বিপর্যয় ঘটাতে পারছে না।

সুতরাং মহাকর্ষ বল-এর বেলায়ও বিজ্ঞান আল-কুরআনকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

অদৃশ্য বস্তুসম্ভার

আমাদের এ মহাবিশ্বে মানবীয় দৃষ্টির আড়ালে লুকায়িত বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম 'আল-কুরআন' মানবজাতিকে অবহিত করেছে। সূরা 'হূদ'-এর ১২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

www.bjilibrary.com

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে [সমগ্র মহাবিশ্বে] যা কিছু দৃষ্টিসীমার বাইরে [লুকায়িত] তা সমস্তই আল্লাহ্‌র এবং তাঁর নিকটই সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।"

সূরা 'আস্ সাজ্‌দা'-র ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

"তিনি [আল্লাহ্] অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।"

সূরা 'আন্ নাহ্‌ল'-এর ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই।"

সূরা 'আন্ নামল'-এর ৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.

"বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে [মহাবিশ্বে] কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"

সূরা 'আন্ নাবা'-র ৩ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে–

عٰلِمِ الْغَيْبِ. لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনি [আল্লাহ্] অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে [সমগ্র মহাবিশ্বে] তাঁর অগোচরে নেই অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু। এর প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"

সূরা 'আন্ নামল'-এর ২৫ নং আয়াতে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে–

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

"[শয়তান চেয়েছিল] ওরা যেন সিজদা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর [মহাবিশ্বের] লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন [বিজ্ঞান-এর মাধ্যমে], যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং যা তোমরা ব্যক্ত করো।"

অর্থাৎ আল্-কুরআনের উল্লেখিত বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে– মানবজাতি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে

www.bjilibrary.com

খালি চোখে যা দেখে-এর বাইরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বড় বড় বস্তু এবং ঘটনা রয়েছে। মানুষ তার সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তা দেখতে পাচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ উদ্যোগেই মানবজাতিকে জ্ঞান ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আগ্রহ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে ঐ সকল অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে থাকেন। যেন তারা তা অবহিত হয়ে ধন্য হতে পারে।

বিজ্ঞান জগৎ প্রথমদিকে দৃশ্যমান মাথার ওপর মহাজাগতিক বস্তুসমূহকে দর্শন করে ভাবতো এদের বাইরে মহাবিশ্বে বোধ হয় আর কোনো বস্তু নেই, দৃশ্যমান আকাশটুকুই হয়তো বা মহাবিশ্ব হবে। কিন্তু ১৯২০ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী 'মি. হাবল পাওয়েল' কর্তৃক টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশে লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি দর্শন লাভ করার পরই বিজ্ঞান জগতের টনক নড়ে। মানবজাতি প্রথমবারের মতো জানতে পেলো দৃশ্যমান জগৎ মূল মহাবিশ্বের মাঝে বালুকণার সমান মর্যাদাও পায় না।

ফলে তখন থেকে অদৃশ্য বিশাল মহাবিশ্বকে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়ে যায় এবং নতুন নতুন টেলিস্কোপ ও মানমন্দির বানাবার জোর প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের চোখে অদৃশ্য জগতের অসংখ্য গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, নোভা, সুপার নোভা, নিউট্রন স্টার, ব্ল্যাক হোল, নেবুলা ইত্যাদি এক এক করে প্রকাশিত হয়ে ধরা দিতে থাকে। সাথে সাথে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কারের ফলে মহাসূক্ষ্ম জগতও অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হয়ে মানবজাতির কর্মকাণ্ড ও গবেষণাকে ব্যাপক পরিসরে বাড়িয়ে তোলে।

এতদিনের দূরত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের কারণে অদৃশ্য জগৎ বর্তমানে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃশ্য জগতে পরিণত হওয়ায় প্রমাণিত হচ্ছে 'আল্-কুরআনের' প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন এক বৈপ্লবিক ঘটনা, যা কুরআনকে মহাসত্য আসমানী গ্রন্থ হিসেবে সমর্থন জানাচ্ছে।

মহাজাগতিক তার [Cosmic string]

'Cosmic string' বা 'মহাজাগতিক তার' বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা খুবই উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান সমৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এই চমক সৃষ্টিকারী, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও সর্বপ্রথম কথা বলে 'আল্-কুরআন'।

সূরা 'আয্ যারিয়াত'-এর ৭ নং আয়াতে আল্-কুরআন মানবজাতিকে শপথ-এর মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহাজাগতিক তার সম্পর্কে জানিয়ে দেয়।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ.

"শপথ ঐ আকাশমণ্ডলীর, যা মহাজাগতিক তারের অত্যন্ত দক্ষতার বুননে ধারণকৃত।"

'হুবুক'– অর্থ হচ্ছে, বুননের জন্য চিকন সুতা বা তার। অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন

www.bjilibrary.com

গ্যালাক্সি সৃষ্টির মৌলিক মাধ্যমটির বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করে আল-কুরআনে প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই উল্লেখ করে পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে জানিয়ে দিলেন। যেন একসময় তিনি যখন বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করাবেন তখন যেন অবিশ্বাসীরা মুখ ফিরিয়ে না নেয় বরং আল-কুরআনের অগ্রিম বৈজ্ঞানিক তথ্য বাস্তবভাবে প্রমাণিত হতে দেখে এক ও একক স্রষ্টা আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

বিংশ শতাব্দির ৮০-র দশকে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান বিশ্বে 'Cosmic String' তথা 'মহাজাগতিক তার' আবির্ভূত হয়ে রীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়। Big Bang model গবেষণাকারী বিজ্ঞানগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়েই মহাজাগতিক তারের উপস্থিতি এবং এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তার যাদুময়ী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে থাকে।

এ মহাজাগতিক তারগুলো [Cosmic strings] লম্বায় লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি লম্বা। কিন্তু ব্যাস এত সূক্ষ্ম যে কল্পনা করাও বেশ দুরূহ্ ব্যাপার। গাণিতিকভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় 10^{-30} c.m প্রায়। অর্থাৎ ১ সে.মি. দৈর্ঘ্যকে ১০০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তার সমান মাত্র।

এদের আকৃতি কোথাও কুণ্ডলীর মতো, কোথাও আংটির মতো, কোথাও সর্পিল আবার কোথাও দেখতে কটিবন্ধের মতো। Cosmic strings-এর পদার্থ ভর অকল্পনীয়, বিরাট ও বিশাল, মাত্র কয়েক কিলোমিটার তারের ভর সমগ্র পৃথিবীর ভরের চাইতেও কয়েক গুণ বেশি। এ তারগুলো খুবই শক্তিশালী এবং এদের ঘনত্ব 'ব্ল্যাক হোলের' ঘনত্বের চেয়েও বেশি। ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানীগণ তথ্য দেন যে এদের ঘনত্ব হলো– 10^{21}gm/c.c. যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। 'Cosmic strings'গুলোই নবীন মহাবিশ্বে প্রথম গ্যালাক্সির বীজ বপন করেছিল। তখন নবীন মহাবিশ্ব ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ ছিলো। ঐ সময় Cosmic strings ধোঁয়ার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বলের [Gravity] মাধ্যমে ধোঁয়া, গ্যাস ও ধূলিকণাকে আকর্ষণ করে করে নিজেদের দেহের সাথে জমা করতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে নবীন মহাবিশ্বটি গুচ্ছ গুচ্ছভাবে গ্যাসীয় পদার্থের মেঘখণ্ডরূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর 'মহাকর্ষ' বলের প্রভাবে মেঘখণ্ডগুলো আবর্তন শুরু করে এবং দু'মিলিয়ন বছরে প্রোটো-গ্যালাক্সি ও চার মিলিয়ন বছরে পূর্ণ গ্যালাক্সিতে রূপান্তরিত হয়ে মহাবিশ্বের মূল কাঠামোতে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানীগণ এখনও রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে কোনো কোনো গ্যালাক্সির কেন্দ্রে Cosmic strings-এর সন্ধান পাচ্ছেন। গ্যালাক্সিগুলো দিকে তাকালে ওদের গঠন অবয়বে Cosmic strings বা মহাজাগতিক তারের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং Cosmic strings বা মহাজাগতিক তার সম্পর্কে আল-কুরআন-এর অগ্রিম তথ্যকে বর্তমান বিজ্ঞান পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

মহাবিশ্বের গঠন স্তর

আমাদের এ মহাবিশ্বের এক ও একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আল্-কুরআনে বিভিন্নভাবে মহাবিশ্বের বাস্তব গঠন প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই অবতীর্ণ করেছেন।

সূরা 'আল হিজর'-এর ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ.

"আমি আকাশে গ্যালাক্সি [তারকাপুঞ্জ] সৃষ্টি করেছি এবং ওগুলোকে সুসজ্জিত করেছি প্রকৃত দর্শকদের জন্য।"

সূরা 'আল ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا.

"কত মহান তিনি, যিনি আকাশে [মহাশূন্যে] সৃষ্টি করেছেন গ্যালাক্সি [নক্ষত্রপুঞ্জ] এবং ওর মধ্যে স্থাপন করেছেন প্রদীপতুল্য সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।"

আবার সূরা আল্ 'বুরূজ'-এর ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ.

"আমি শপথ করছি গ্যালাক্সি সমৃদ্ধ আকাশ জগতের।"

উল্লেখিত পর পর তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর পরিকল্পনায় তাঁর নিজ হাতে গড়া এ মহাবিশ্বের গঠনাকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মহাবিশ্বটি মূলতঃই হচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ গ্যালাক্সি তথা নক্ষত্রপুঞ্জ বিশিষ্ট।

এ গ্যালাক্সিগুলোই মহাবিশ্বের মাঝে মূল সংগঠন। অসংখ্য অগণিত [প্রায় গড়ে ৪০,০০০ কোটি] নক্ষত্র সমষ্টি দিয়েই গ্যালাক্সিগুলো গঠিত। আমরা যে সূর্য ও চন্দ্রকে প্রতিদিন উদয় অস্ত হতে দেখি এরাও সেই মূল সংগঠন গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত।

আল্-কুরআন এ তথ্যগুলো মানবজাতিকে তখন অবহিত করেছিল যখন মানুষ মহাবিশ্বতো দূরের কথা গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়ও ভালভাবে বুঝতে পারতো না। আল্লাহ্ তাঁর বাস্তব উপস্থিতির নিদর্শনস্বরূপ অগ্রিম এ তথ্যগুলো প্রকাশ করেছিলেন।

উল্লেখিত বিষয়ে বর্তমান সাফল্যে ভরা বিজ্ঞানের বক্তব্য হচ্ছে– আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মি. ইডুইন হাবল পাওয়েল'ই ১৯২০ সালে টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আকাশরাজ্যের পর্দা উন্মোচন করে যখন মহাবিশ্বের গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, তখন কোটি কোটি গ্যালাক্সির মহাশূন্যে চতুর্দিকে উড়ে যেতে দেখতে পেলেন। প্রতিটি গ্যালাক্সি গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাস সম্পন্ন। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আছে প্রায়

১২—

www.bjilibrary.com

৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র। একটি গ্যালাক্সি থেকে অপর একটি গ্যালাক্সির গড় দূরত্ব প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ আলোকবর্ষ। এ পর্যন্ত মহাবিশ্বে প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছে বিজ্ঞান বিশ্ব।

বিজ্ঞান বলছে আমাদের এ মহাবিশ্বটির মূল সংগঠন হচ্ছে উল্লেখিত গ্যালাক্সিসমূহ। গ্যালাক্সির অভ্যন্তরেই নক্ষত্রের আবাস। আবার নক্ষত্রের আওতায় গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু ইত্যাদি পরিভ্রমণ করে তাদের লাইফ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং মহাবিশ্বের গঠন কাঠামো বা গঠন স্তর সম্পর্কেও 'আল-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন' একশত ভাগ, যা আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ

একমাত্র 'আল-কুরআনই'-ই আমাদের এ মহাবিশ্বের 'মহাসম্প্রসারণ' সম্পর্কে প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই মানবজাতিকে তথ্য সরবরাহ করেছে, যার সত্যতা উৎকর্ষিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমান বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে।

মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ সম্পর্কে আল্-কুরআন সূরা 'আয্ যারিয়াত'-এর ৪৭ নং আয়াতে উল্লেখ করেছে–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ.

"আমি মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছি আমার শক্তি-ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমি এর মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছি।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রচণ্ড ও পরাক্রমশালী শক্তি-ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁরই পরিকল্পনানুযায়ী এ মহাবিশ্ব কেবলই সম্প্রসারিত করে চলেছেন। যে কারণে প্রতিটি মুহূর্তে কেবলই মহাবিশ্ব চতুর্দিকে বর্ধিত হয়ে চলেছে। বাক্যটি বর্তমানকালে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এ মহাসম্প্রসারণ শুধু এগিয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কখন, কি অবস্থায় এ সম্প্রসারণ থেমে যাবে কিংবা আদৌ থামবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে মহাবিশ্ব ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার এ মহাসম্প্রসারণ থামবে না।

বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে মানবজাতিকে অবহিত করেছে যে, আমাদের মহাবিশ্বটি প্রতিটি মুহূর্তে সার্বিকভাবেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখেন বিজ্ঞানী 'মি. ইডুইন হাবল পাওয়েল'। তিনি ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত একটানা সাত বছর ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, মহাবিশ্বটি একক ইউনিট হিসেবে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে বিন্দু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের 'মিলকি-ওয়ে' গ্যালাক্সির দু'টি

www.bjilibrary.com

বাহুর একটি প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩ কি. মিটার [প্রায়] বেগে এবং অপর বাহুটি প্রতি সেকেণ্ডে ১৩৫ কি.মি. [প্রায়] বেগে চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রটি প্রায় ৪০ কি.মি. বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের সৌরজগতটিও প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ কি.মি. গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ এ মহাবিশ্বে সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সির ভেতর, সৌর পরিবারের ভেতর, এমনকি সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের ভেতরও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

বিজ্ঞান বিশ্ব ১৯৯২ সালে 'BOOMERANG' ও 'MAXIMA' নামে দুটি গবেষক দলের মাধ্যমেও Cobe Satellite Ballon flight ও Distant Suprernova Measured ইত্যাদি অনেক পরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে- আমাদের মহাবিশ্ব প্রতি মুহূর্তে যে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত আছে তা অদূর ভবিষ্যতে থেমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই এবং 'Big Crunch' ও ঘটার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

অতএব আমরা দেখতে পেলাম 'আল-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞান-এর সমর্থন' চরম বাস্তবতার কারণে এক মহাসত্য ঘটনা।

চোখের পলকেই সৃষ্টি

বর্তমানে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এবং প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি বুকে ধারণকারী আমাদের এ মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করেছেন এক ও একক স্রষ্টা ও মহাশক্তি-ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহ্ যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমানও। তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য কেউ নেই।

তিনি এ বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে মানবজাতিকে ধারণা দিতে গিয়ে সূরা 'আন'আম'-এর ৭৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে-

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ. قَوْلُهُ الْحَقُّ.

"তিনিই [আল্লাহ্-ই] যথাযথভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন- 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য।"

আবার সূরা 'আল কামার'-এর ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

"আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন হয়ে যায়, চোখের দৃষ্টির ঝলকের ন্যায়।"

এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি-ক্ষমতা যে কল্পনাতীত কত বিশাল তা বুঝাতে গিয়ে বললেন প্রকাণ্ড মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করতে তাঁকে শুধু মাত্র কমাণ্ড পাস করতে হয়েছে- 'হও' বলে। আর কত দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় চোখের পলক বা দৃষ্টির ঝলকের ন্যায় মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা হয়ে বর্তমান দৃশ্যযোগ্য রূপ ধারণ করেছে।

www.bjilibrary.com

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষেই তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাপরাক্রমশালী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চোখের পলকেই এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে, যা আর কারো পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

বর্তমান বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে মানবজাতিকে অবহিত করেছে যে, প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে আলোক শক্তির এক মহাউৎসে বিপুল পরিমাণ আলোক শক্তি মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে সংকুচিত হয়ে অদৃশ্য প্রায় মহাসূক্ষ্ম বিন্দু 10^{-33}cm.-এ আট্‌কা পড়ে যায়। এ সময় প্রচণ্ড চাপে বিন্দুটি প্রায় ১০,০০০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ডিগ্রি কেলভীন [K] তাপমাত্রা লাভ করায়, মহাসূক্ষ্ম এক সময়কাল 10^{-43}sec. অর্থাৎ এক সেকেন্ডের ১০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগকাল সময়ে মহাবিস্ফোরণ [Big Bang] ঘটে এ মহাবিশ্বের সূচনা শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং 10^{-43}sec. এক মহাসূক্ষ্ম সময়কালে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা আল্-কুরআন'-এ বর্ণিত 'চোখের পলক' বা 'দৃষ্টির ঝলক'-এর সমার্থকই বলা যেতে পারে। অতএব 'আল-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন' এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবেই বর্তমান বিশ্বে বিবেচিত হচ্ছে যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

আলোর ওপর আলো

আমরা ইতিপূর্বেই অবহিত হয়েছি যে, এ বিশাল মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত কিছুই 'নূর' বা 'আলো' থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

نُورٌ عَلٰى نُورٍ.

"আলোর ওপর আলো"।

অর্থাৎ 'নূর' থেকে এ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টি এমন একটি পদ্ধতিতে ঘটানো হয়েছে যে, শেষের দিকে সৃষ্ট বস্তুসমূহের অবস্থান থেকে প্রথম দিকের সৃষ্ট বস্তুসমূহের অবস্থানের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, যেনো 'আলোর ওপর আলো'-র খেলা চলছে। অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের আলোক শক্তি থেকে নিম্নপর্যায়ের আলোক শক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরনের বস্তুসমূহ সৃষ্টি হয়েছে যা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে তাকালে শুধু আলোর উপর আলোর খেলাই মনে হবে। এ যেনো একটি ঝিনুকের মাঝে এক মহাসাগর প্রবিষ্ট করিয়ে রাখার মতো অবস্থা।

১৯৬৫ সালে 'পশ্চাৎপট বিকিরণ' [back ground radiation] 2.73k. [কেলভীন] আবিষ্কারের ফলে 'Big Bang' মতবাদটি মজবুত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে Big Bang model -এর ওপর গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ অবহিত করেন যে, মহাবিস্ফোরণ পরবর্তী সময়কালে নবীন মহাবিশ্বে তখন শুধু আলো আর আলোর বন্যা বইতে ছিলো। সে আলোর গতিবেগও ছিলো বর্তমান আলোর গতির

www.bjilibrary.com

চেয়েও বহু বহুগুণ বেশি। সৃষ্ট নবীন মহাবিশ্বের আয়তন পরবর্তীতে বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রাও কমতে শুরু করে। এভাবে তাপমাত্রা কমতে থাকায় এক এক পর্যায়ে এক এক মাপমাত্রায় এক এক ধরনের বস্তু সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্ব বর্তমান রূপ ও আকৃতি লাভ করেছে।

Big Bang ঘটার পূর্ব মুহূর্তে তাপমাত্রা ছিলো 10^{32} k. অর্থাৎ, ১০,০০০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ডিগ্রি কেলভীন [k]।

মহাবিস্ফোরণ ঘটার পর যখন ঐ আলোর তাপমাত্রা 10^{28} k. থেকে 10^{17} k. তখন Highest energetic photon কণিকারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে পদার্থ কণিকা হিসেবে প্রথমবারের মতো 'কোয়ার্ক' এবং এ্যান্টিকোয়ার্ক-এর জন্ম দেয়।

অতঃপর তাপমাত্রা যখন আরো নিচে নেমে 10^{13} k. এ দাড়ায় তখন কোয়ার্ক এবং এ্যান্টিকোয়ার্ক-এর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয়ের ব্যাপকভাবে ধ্বংস সাধন ঘটে এবং অবশিষ্ট থেকে যায় কিছু 'কোয়ার্ক' [Quark]।

এরপর তামাত্রা যখন আরো কমে গিয়ে 10^{10} k. এ দাড়ায় তখন পরিবেশ অনুকূলে পেয়ে ৩টি কোয়ার্ক [১টি up Quark এবং ২টি down Quark] মিলিত হয়ে 'প্রোটন' কণিকা এবং ৩টি কোয়ার্ক [২টি up Quark এবং ১টি down Quark] মিলিত হয়ে 'নিউট্রন' কণিকা সৃষ্টি হতে থাকে।

তারপর তাপমাত্রা যখন 10^{9} k.-এ নেমে আসে, তখন পরিবেশ আরো অনুকূলে আসায় সৃষ্ট 'প্রোটন' কণিকা ও 'নিউট্রন' কণিকা পরস্পর মিলিত হয়ে প্রথমবারের মতো মহাবিশ্বে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' [Atomic nuclei] গঠন করতে থাকে।

এরপর তাপমাত্রা যখন আরো কমে গিয়ে 10^{4} k. অর্থাৎ 10,000 k. [কেলভীন] হয় তখন 'এ্যাটমিক নিউক্লি' মহাবিশ্বে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে চলা 'ইলেকট্রন' কণিকাকে চতুর্দিকের কক্ষপথে ধারণ করে প্রথমবারের মতো অটল পদার্থ 'পরমাণু' [atoms] সৃষ্টি করতে থাকে।

আরও পরে যখন তাপমাত্রা কমে 3000 k. এ উপনীত হয় তখন মহাবিশ্বের মূল সংগঠন গ্যালাক্সি সৃষ্টি হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে তাপমাত্রা যখন আরো কমে 1000 k. এ আগমন করে তখন গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হতে থাকে।

অতঃপর তাপমাত্রা যখন আরো নিম্নগামী হয়ে মাত্র 3 k. হয় তখন সার্বিক অবস্থা অনুকূলে থাকায় জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণের ব্যাপক সমাগম ঘটতে থাকে আবাস উপযোগী গ্রহ-উপগ্রহগুলোতে। এতে সময় পার হয়ে যায় প্রায় ১৫০০ কোটি বছর।

বর্তমানে সেই তাপমাত্রা আরো কমে মাত্র 2.73 k. [কেলভীন] এ উপনীত হয়েছে। এ

www.bjilibrary.com

অবস্থায় বর্তমান অবস্থান থেকে উপরের দিকে তাকালে মহাবিশ্বে সেই আদি তাপমাত্রা 10^{28} k. পর্যন্ত শুধু 'আলোর উপর আলো'-র একক খেলা-ই পরিলক্ষিত হবে, যা আল্-কুরআন মাত্র ৩টি শব্দের ১টি বাক্যের মাধ্যমে মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরেছে।

সুতরাং 'আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞান-এর সমর্থন' এক বাস্তব সত্য ঘটনা অবলম্বনে যা শুধুমাত্র সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীজনই উপলব্ধি করতে পারেন।

কিয়ামাত

আল্লাহ্ তা'আলা এ বিশাল মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার কোনো কিছুই অযথা সৃষ্টি করেননি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি আমাদের এ পৃথিবীসহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে পৃথিবীর জন্য নির্দিষ্ট করা সময়টি আগমন করা মাত্রই আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে এ পৃথিবীর প্রলয় বা কিয়ামাত ঘটাবেন। কিয়ামাতের সেই ধ্বংসলীলা হবে কল্পনাতীত ভয়াবহের ব্যাপার। সেদিন পৃথিবী তার পৃষ্ঠদেশের সকল বৈচিত্র্যের সমারোহ ও সৌন্দর্য নিয়ে মহাবিপর্যয়ে নিপতিত হবে।

আল্-কুরআন সেই ভয়ঙ্কর কিয়ামাত সম্পর্কে প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বেই মানব জাতিকে অবহিত করেছে প্রয়োজনীয় সতর্কতার জন্য।

সূরা 'আল ওয়াকিয়া'-র ১ নং থেকে ৬ নং আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে–

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ. اِذَا رُجَّتِ الاَرْضُ رَجًّا. وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا.

"যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন এর বাস্তবতা অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। সেই বিপর্যয় কাউকে করবে অপদস্ত আবার কাউকে করবে সম্মানিত। এ কিয়ামাত তখনই শুরু হবে যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। সেদিন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পর্যবসিত হবে উড়ন্ত ধূলিকণায়।"

সূরা 'আল যিল্যাল'-এর ১ নং ও ২ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে–

اِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَاَخْرَجَتِ الاَرْضُ اَثْقَالَهَا.

"পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকবে এবং পৃথিবী যখন তার ভেতরের [অগ্নি ও গলিত লাভা] সব বের করে দেবে।"

সূরা 'আদ্ দুখান'-এর ১০ নং আয়াতে কিয়ামাত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَارْتَقِبْ يَوْمَ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ.

"অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ জগৎ।"

www.bjilibrary.com

সূরা 'আল মা'আরিজ'-এর ৮ ও ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.

"কিয়ামাতের দিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো রক্তিম বর্ণ এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙীন 'পশমের মতো।"

সূরা 'আত্ তারেক'-এর ২ ও ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ. النَّجْمُ الثَّاقِبُ.

"তুমি কি জানো সেই আঘাতকারী বস্তুটি কী? ওটি একটি প্রজ্জ্বলমান জ্যোতিষ্ক।"

সূরা 'আল-হাক্কা'-র ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে–

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ.

"সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে আর তখন সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধ্বংসে নিমজ্জিত হবে।"

সূরা 'আল কিয়ামাহ'-র ১০ ও ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– তখন ধ্বংসে নিমজ্জিত মানুষগুলো চিৎকার দিয়ে বলতে থাকবে–

يَقُوْلُ الاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ. كَلاَّ لاَ وَزَرَ.

"আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, আজ কোনো আশ্রয়স্থল হবে না।"

উপরে উল্লেখিতভাবে আল-কুরআন প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই এ পৃথিবীর কিয়ামাত বা ধ্বংসলীলার চিত্র অঙ্কিত করেছে, যা সেদিন অবশ্যই ঘটবে বলে দাবিও করেছে।

আমরা এ বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান থেকেও ইতিমধ্যে বহু তথ্য অবগত হয়েছি। বিজ্ঞান আমাদের এ সুন্দর, সবুজ-শ্যামলীময় পরিপূর্ণ নয়নাভিরাম পৃথিবীর শেষ পরিণতি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণিত তথ্য সরবরাহ করে ধন্যবাদ অর্জন করার মতো অবস্থান লাভ করেছে।

বিজ্ঞানের ভাষ্য হচ্ছে– যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তাই তার একদিন ধ্বংস অনিবার্য। বিজ্ঞান বিগত প্রায় শত বৎসর গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে নিচে উল্লেখিত যে কোনো একটি বা একাধিক কারণেও এ পৃথিবীর ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ঘটে যেতে পারে। কারণসমূহ হলো ঃ

১. সূর্যের ধ্বংসের কারণে।

২. গ্রহাণুর ভয়ঙ্কর আঘাতের কারণে।

৩. ধূমকেতুর পতনের কারণে।

www.bjilibrary.com

৪. ব্ল্যাক হোলের আয়ত্তে পড়ে যাওয়ার কারণে।

৫. একাধিক নক্ষত্রের সংঘর্ষের কারণে।

৬. একাধিক গ্যালাক্সির সংঘর্ষের কারণে।

৭. মহাকাশে গ্যালাক্সি উড়তে গিয়ে 'গতিমুখের বিপরীতে চাপে সংকুচিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার কারণে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে- 'আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন' এক মহাসত্য বিষয়ের স্বীকৃতি আমাদের এ বিশ্বে।

নেবুলা

'নেবুলা'- হচ্ছে ধূলিকণাময় ধোঁয়ার স্তূপ। মহাশূন্যে এ নেবুলা দু'ধরনেরই দেখা যায়। এক ধরনের নেবুলা হচ্ছে শীতল এবং শুধু পদার্থ কণিকার তৈরী ধোঁয়ার স্তূপ। আর দ্বিতীয় ধরনের নেবুলা হচ্ছে বিরাট বিরাট নক্ষত্রের ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্ট জ্বলন্ত উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, উত্তপ্ত ধূলাবালি, গলিত তাম্র মিশ্রিত ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জ ইত্যাদির একত্রিত ভয়ঙ্কর স্তূপ। উভয় প্রকার নেবুলাই মহাজাগতিক বস্তু সৃষ্টির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার 'নেবুলা' সম্পর্কে আল্-কুরআন সূরা 'হা-মীম আস সাজদা'-র ১১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, এভাবে যে-

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا. قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ.

"এক পর্যায়ে তিনি [আল্লাহ্] নবীন মহাবিশ্বের দিকে মনোনিবেশ করেন, তখন যা ছিলো ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। অনন্তর তিনি তা থেকে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আকাশ জগৎ ও পৃথিবীর আকৃতি ও রূপধারণ করার আদেশ করলেন। ওরা বললো, 'আমরা অনুগত হয়ে ইচ্ছায় তাই করছি।"

উল্লেখিত 'নেবুলা' হচ্ছে শীতল নেবুলা। যা থেকে সৃষ্টির শুরুর পর্যায়ে আল্লাহ্ মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন। নবীন মহাবিশ্ব এ নেবুলা দিয়ে ভর্তি ছিলো।

সূরা 'আর-রাহমান'-এর ৩৫ ও ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ. وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ. فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

"তোমরা ঊর্ধ্বাকাশে গমন করতে চাইলে তোমাদের ওপর ছড়িয়ে পড়বে- ধূলা-বালি এবং তাম্র মিশ্রিত ধূম্রমেঘপুঞ্জ, যা তোমরা নিরাপত্তা সহকারে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম

www.bjilibrary.com

হবে না। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এই নিদর্শনমূলক বিজ্ঞানসম্মত বাণীকে মিথ্যা মনে করে কি অস্বীকার করতে পারো?"

উল্লেখিত 'নেবুলা' হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিকিরণ সমৃদ্ধ ও বিরাট বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশিষ্ট এবং গলিত তাম্র ও অন্যান্য ধাতব মিশ্রিত প্রচণ্ড উত্তাপ সম্পন্ন ধূলাবালির মেঘপুঞ্জ। এগুলো বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে মহাশূন্যে অসংখ্য বিরাজমান আছে। মানবজাতির মহাকাশ অভিযানের পথে এগুলো প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

বিজ্ঞানের ভাষায় অগ্নিশিখা, ধূলাবালি ও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধাতব মিশ্রণের ধোঁয়ার স্তূপ বা মেঘপুঞ্জকে 'নেবুলা [Nebula] বলা হয়। এ নেবুলাই হচ্ছে মহাবিশ্বে সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তু সৃষ্টির কাঁচামাল। নেবুলা ছাড়া মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টির কল্পনাই করা যায় না।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী 'Mr. Messier'-এ নেবুলা বিষয়ক ক্যাটালগ তৈরি করেন। তিনি তাতে প্রধানতঃ দু'প্রকার নেবুলা দেখান। এক প্রকার হচ্ছে- 'Big Bang' তথা মহাবিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট পদার্থ কণিকার ধোঁয়াময় শীতল মেঘপুঞ্জ। অপর প্রকার নেবুলা হচ্ছে মহাকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের ছড়িয়ে পড়া প্রচণ্ড উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সমৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষ, যা খুবই ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর প্রাণী জগতের জন্য। এ সকল নেবুলা প্রতি সেকেন্ডে মহাকাশে প্রায় ১০,০০০ মাইল থেকে ২০,০০০ মাইল বেগে ছুটে যেতে থাকে। ছড়িয়ে থাকে লক্ষ লক্ষ মাইলব্যাপী। এদের কেন্দ্র থেকে এক্স-রে, আলট্রা ভায়োলেট-রে, গামা-রে ইত্যাদি নির্গত হতে থাকে। সারফেস তাপমাত্রা প্রায় চার লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে থাকে। বর্তমান রকেট প্রযুক্তি এ জাতীয় নেবুলা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখে না। লম্বা দূরত্ব এবং প্রচণ্ড উত্তাপে রকেট প্রযুক্তি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পরিত্রাণের কোনো প্রকার পথ পাবে না।

সুতরাং 'আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় সাড়ে ১৪০০ বছর পূর্বে 'নেবুলা' সম্পর্কে আল্-কুরআন যা যা বলেছিল, আজকের বিজ্ঞান ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে হুবহু একই তথ্য মানব সম্প্রদায়কে অবহিত করেছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে- আল-কুরআন বিজ্ঞানময়। আর আধুনিক বিজ্ঞান তার সমর্থক।

হারিয়ে যাচ্ছে তারকাপুঞ্জ

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, আমাদের এ মহাবিশ্বের মাঝে সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে- গ্যালাক্সিসমূহ। একটি গ্যালাক্সিতে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র বাস করে। একটি গড় গ্যালাক্সির ব্যাস প্রায় এক লক্ষ [১,০০,০০০] আলোকবর্ষ। প্রস্থ প্রায় দশ হাজার [১০,০০০] আলোকবর্ষ, প্রতিটি গ্যালাক্সি অপর গ্যালাক্সি থেকে গড়ে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ [২২,৫০,০০০] আলোকবর্ষ দূরত্ব বজায় রাখে। আজ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছে বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব। উল্লিখিত সকল গ্যালাক্সিই

www.bjilibrary.com

মহাকাশের মহাশূন্যতায় প্রতিনিয়তই নিজ মেরুদণ্ডের ওপর ভর করে ঘূর্ণনরত অবস্থায় বিভিন্ন গতিতে আবার মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে কেবলই উড়ে যাচ্ছে।

আল-কুরআন দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই মানব জাতির নিকট মহাবিশ্বের বৃহৎ সংগঠন 'গ্যালাক্সিসমূহ' যে মহাশূন্যে পরিভ্রমণরত অবস্থায় এক পর্যায়ে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে দিয়েছে।

সূরা 'আত্ তাকভীর'-এর ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

"আমি শপথ করছি নক্ষত্রপুঞ্জের [গ্যালাক্সির] যারা পশ্চাদগমনেরত এবং ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে [হারিয়ে] যায়।"

সূরা 'আন্ নাজম'-এর ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى.

"শপথ ঐ তারকাপুঞ্জের [গ্যালাক্সির] যখন অদৃশ্য হয়ে যায়।"

আবার সূরা 'হূদ'-এর ৪৯ নং আয়াতে ঐ সকল অগ্রিম তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا.

"এ সকল অদৃশ্য জগতের তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করছি যা পূর্বে তোমার জানা ছিলো না কিংবা জানতো না তোমার সম্প্রদায়।"

বিজ্ঞান বিশ্ব ১৯২০ সালে আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মি. ইডুইন হাবল পাওয়েল'-এর মাধ্যমেই আমাদেরকে গ্যালাক্সির সাথে ভালভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে জানতে পারি যে মহাবিশ্বের মহাকাশে প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সবাই কম-বেশি গতিতে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে ছুটে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পর প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০ মাইল হারে প্রতিটি গ্যালাক্সির গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সূত্রমতে ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্যালাক্সি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪৫,০০০ মাইল বেগে এবং প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯০,০০০ মাইল বেগে মহাবিশ্বের প্রান্তের দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে 'OQ-172' নামে 'কোযাসার' আবিষ্কার করেছেন যার আকৃতি দেখতে তখন বিন্দুবত এবং গতি প্রায় আলোর গতির [প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল] সমান। শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী

www.bjilibrary.com

'আইনষ্টাইন' বলেছেন– গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে উড়ে চলার পথে গতিমুখের বিপরীত বাধার কারণে চাপ খেয়ে ভেতরের দিকে ভাংতে থাকে এবং আকৃতি ছোট হতে থাকে। গতি যত বাড়বে গ্যালাক্সির আকৃতি ততবেশি চাপ খেয়ে ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকবে। গ্যালাক্সির গতি আলোর গতির সমান হয়ে গেলে সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি সংকুচিত হয়ে বিন্দুবত অবস্থা ধারণ করবে। মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানায় প্রকৃতপক্ষে সে অবস্থা-ই ঘটছে।

আর তাই পৃথিবী থেকে প্রায় ১৪০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে বিন্দুবত প্রায় গ্যালাক্সি বা কোয়াসারকে আর দেখা যায় না। বিজ্ঞানের হিসাবে ঐ দূরত্বে তখন গ্যালাক্সি বা কোয়াসার-এর আর দৃশ্যমান কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

সুতরাং কুরআন 'নক্ষত্রপুঞ্জ' বা 'গ্যালাক্সি'র মহাশূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যাওয়ার অগ্রিম যে তথ্য মানবজাতিকে জানিয়েছে বর্তমান বিজ্ঞান আবিষ্কৃত উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রমাণিত করে দেখালো। তাই বলা যায় 'আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞান এর সমর্থন' চরম বাস্তবতার কারণেই ঘটে চলেছে। মূলতঃ যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, আবার তিনিই মৌলিকভাবে বিজ্ঞানকেও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

মহাকাশ অভিযান

আমাদের এ পৃথিবী থেকে 'মহাকাশ অভিযান' মানব ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ এর সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু সূত্র ও সম্পর্ক সরাসরি জড়িত। নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যে, এ মিশন পরিচালনা করতে হয়, সে কথা বর্তমান বিজ্ঞানই মানবজাতিকে অবহিত করেছে বিস্তারিতভাবে। অথচ আল্-কুরআন তা আমাদের অবহিত করেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যখন কোনো বিজ্ঞানাগার ছিলো না, গবেষণাগার ছিলো না।

সূরা 'আর রাহমান'-এর ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত হয়েছে–

يـٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا. لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ. فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

"হে জিন ও মানবসম্প্রদায়! যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তোমাদের আঞ্চলিক আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে চলে যেতে মহাকাশে, তাহলে তা করে দেখো। কিন্তু তোমরা তা কখনই করতে পারবে না 'চরম ক্ষমতা' [Scape velocity] অর্জন ব্যতিরেকে।

তোমরা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অস্বীকার করতে পারো?"

আবার সূরা 'আল জাছিয়া'-র ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

www.bjilibrary.com

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ.

"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর [সমগ্র মহাবিশ্বের] সমস্ত কিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে।"

উপরে উদ্ধৃত আয়াত দু'টিতে জিন ও মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তারা যদি পৃথিবীর আকাশসীমা অতিক্রম করে মহাকাশর দিকে চলে যেতে চায় তাহলে তারা যেতে পারবে, কেননা সৃষ্টির সেরা হিসেবে তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। তবে বহির্বিশ্বে তথা মহাকাশে যেতে চাইলে প্রথম প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হবে। অর্থাৎ মহাকাশ যানকে প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। কেননা স্থানীয় এলাকা ত্যাগ ও সীমা-পরিসীমাহীন মহাকাশ পাড়ি দিয়ে মিশন সফল করতে হলে অসম্ভব গতির প্রয়োজন হবে। তা না হলে মহাকাশ অভিযান কখনো সফল হবে না।

বিজ্ঞান ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সন্ধান পায়। এ শক্তি পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থিত সমস্ত বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। ফলে বস্তুসমূহ পৃথিবী পৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকে, মহাশূন্যে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীর এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান থেকে মুক্ত হয়ে যদি কোনো বস্তু মহাশূন্যের দিকে চলে যেতে চায়, তাহলে বস্তুটিকে মুক্তি গতি অর্জন করতে হবে। নতুবা বস্তুটি বেরিয়ে যাওয়ার পথে মাধ্যাকর্ষণ-এর টানে আবার পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর মুক্তিগতি ১১ কি: মি:/সে. অতএব কমপক্ষে ১১ কি: মি:/সে. গতিসম্পন্ন যান হতে হবে।

আবার আরো ১টি কারণেও প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতাসম্পন্ন গতি অর্জন করতে হবে, তা হলো মহাকাশ মহাশূন্য। মহাশূন্য এত বিশাল যে সেখানে মাইল কিংবা কিলোমিটার দিয়ে দূরত্ব মাপা যায় না। আলোকবর্ষ দিয়ে মাপা হয়। তাই সংক্ষিপ্ত জীবনকালসম্পন্ন মানবজাতি তাদের জীবদ্দশায় যে কোনো মিশন সফল করার জন্য অবশ্যই মহাকাশ যানকে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন আলোর গতি বা তার কাছাকাছি গতি অর্জন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে আল্-কুরআন মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে অগ্রিম যে তথ্য সরবরাহ করেছিল, বর্তমান বিজ্ঞান ব্যাপক পরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে সেই একই তথ্য আমাদের অবহিত করেছে। সুতরাং বিজ্ঞান আল-কুরআনকে সমর্থন জানাচ্ছে।

আকাশে পাথর-এর বহর

বিশাল এ মহাবিশ্বের মাঝে পৃথিবী নামক আমাদের এ গ্রহটি নিতান্তই ক্ষুদ্র একটি মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ড, যার ওপর জীব-উদ্ভিদসহ আমরা মানবজাতিও আমাদের জীবন নির্বাহ করে চলছি। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টি শক্তির মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রায় ৯৯.৯৯ ভাগই দেখতে পাচ্ছি না। তার চেয়ে বেশি দেখতে পারা প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ছাড়া সম্ভবপর নয়।

www.bjilibrary.com

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্-কুরআন মানবজাতিকে অবহিত করেছে যে, আমরা দেখতে অপারগ হলেও বাস্তবে কিন্তু আকাশে ভাসমান ও চলমান অবস্থায় আছে বিরাট বিরাট পাথর খণ্ড এবং মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল পাথরের স্তূপ। এগুলোর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ এবং এদের তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।

সূরা 'আল মুলক'-এর ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. فَسَيَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ.

"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গিয়েছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি [আল্লাহ্] তোমাদের ওপর পাথরের স্তূপ প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিলো আমার সতর্কবাণী।"

সূরা 'আন্ নামল'-এর ২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

"আল্লাহ্ই মহাবিশ্বের অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করেন।"

উপরে উদ্ধৃত আয়াতে কুরআন দীর্ঘ সময় পূর্বেই অগ্রিম তথ্য প্রদান করেছে মানবজাতিকে যে, আকাশে আছে অসংখ্য অগণিত পাথর আর পাথর, যা আমরা খালি চোখে পৃথিবী থেকে দেখতে পাচ্ছি না।"

পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানী 'Mr. Ernest Opik' এবং 'Mr. Jan Oort' যৌথভাবে আমাদের সৌরজগতের বাইরে সংলগ্ন এলাকার চতুর্দিকে বিরাট এলাকা নিয়ে পাথর খণ্ড, ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডসহ জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পরিবেষ্টিত ভয়ানক মেঘমালার সন্ধান লাভ করেন। বিজ্ঞান বিশ্ব তাদের নামানুসারে ঐ পাথুরে মেঘমালার নামকরণ করে 'Opik Oort cloud.' এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ৩২ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার যা সমগ্র সৌরজগতকে ঘিরে ফেলেছে।

এছাড়াও ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান পৃথিবীর চারপাশেও প্রায় ৫০০০ ঝুলন্ত পাথর খণ্ড আবিষ্কার করেছে যেখান থেকে বিনা নোটিশে সকালে অথবা বিকালে বিশাল পাথর খণ্ড ছুটে এসে এ পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে মানব সভ্যতার বিনাশ ঘটাতে পারে। আবার বিজ্ঞানীগণ মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে এবং শনি গ্রহের চতুর্দিকেও বিশাল পাথরের বেল্ট আবিষ্কার করেছেন, যে পাথর বেল্ট থেকেও পাথর খণ্ড ছুটে এসে এ পৃথিবীর ধ্বংসসাধন করতে পারে অবলীলাক্রমে।

সুতরাং আকাশে অদৃশ্যভাবে রক্ষিত পাথর বহর সম্পর্কে আল্-কুরআন যে অগ্রিম তথ্য মানবসমাজকে সরবরাহ করেছিল, বর্তমান বিজ্ঞান তার আবিষ্কার দিয়ে আল্-কুরআনের তথ্যকে একশত ভাগই সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

www.bjilibrary.com

'জাহান্নাম'-এর ইন্ধন মানুষ এবং পাথর

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এ বিশাল মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি এ পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে প্রাণের বাসপোযোগী করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে একে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। জীব ও উদ্ভিদের সমারোহে একে আলাদা এক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সবশেষে সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে এর উপর জীবন যাপনের সার্বিক ব্যবস্থাসম্পন্ন করে দিয়েছেন। এ মানব জাতি কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে জীবন যাপন করলে স্রষ্টা হিসেবে তিনি খুশি হবেন এবং কিভাবে চললে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন তা মানবজাতিকে ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দিয়েছেন।

মানবজাতির মধ্যে যে বা যারা আল্লাহ্‌র দেয়া উল্লিখিত সমস্ত নিয়ামত ভোগ করার পর তাঁর দেখানো পথে জীবন অতিবাহিত করবে না, তিনি তাদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য 'অগ্নিকুণ্ড' [জাহান্নাম] তৈরি করে রেখেছেন, যেখানে তাদেরকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আর সেই আগুনকে উত্তপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে- পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ তাপ ও বিকিরণ সমৃদ্ধ প্রমাণিত বস্তু, দাহ্য 'পাথর খণ্ড' দিয়ে।

সূরা 'আল বাকারা'-র ২৪ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

"তবে সেই আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হতে মানুষ ও পাথর। অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"

আবার সূরা 'তাহরীম'-এর ৬ নং আয়াতে একইভাবে বলা হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তাদেরকে।"

এখানে উদ্ধৃত আয়াত দু'টোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পরকালে বিচারের দিন যারা অপরাধী-পাপী হিসেবে সাব্যস্ত হবে তারা মহান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে গুরুতর ও ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। যে শাস্তি সকল প্রকার শাস্তিকে অতিক্রম করে যাবে। আর তার আয়োজনও সর্বোচ্চ তাপ ও বিকিরণ সমৃদ্ধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর সেজন্যই আল্লাহ্ সেদিন অপরাধী মানুষকে জাহান্নাম তথা প্রচণ্ড উত্তাপ ও অগ্নিসমৃদ্ধ ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন এবং তার প্রচণ্ড অগ্নি ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সার্বক্ষণিক বজায় রাখার জন্য জ্বালানী হিসেবে দাহ্য 'পাথর খণ্ড' অগ্নিকুণ্ডে

www.bjilibrary.com

সরবরাহ করেছেন। যাতে আল্লাহ তাঁর বড় শত্রুকে সর্বোচ্চ অগ্নি ও তাপ এবং তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে পুড়িয়ে বদলা দিতে পারেন। পৃথিবীর জীবনে তাদের আল্লাহদ্রোহিতার জন্য এমন শাস্তিই তাদের পাওনা ছিলো।

বিজ্ঞান বিশ্ব ঊনবিংশ শতাব্দিতে কঠিন পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, ফ্রান্সের বিজ্ঞানী দম্পতি 'পিরি কুরী' 'ইউরেনিয়াম' নামক কঠিন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী তাক লাগিয়ে দেন। এর আগে ভারী পদার্থরূপে ইউরেনিয়াম-এর পরিচিতি থাকায় কেউ এ পাথর খণ্ডকে ব্যবহার করতো না। কিন্তু যেদিন থেকে এ 'পাথর খণ্ড' তেজস্ক্রিয় পদার্থ হিসেবে পরিচিতি পেল সেদিন থেকে এর মূল্য সকল প্রকার পদার্থকে ছাড়িয়ে গেল। 'ইউরেনিয়াম' পদার্থের 'পরমাণু' প্রতি মুহূর্তেই ভাংতে থাকে। ফলে তা থেকে প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বেরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যা জীবন-উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনে।

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র কঠিন 'ইউরেনিয়াম' [পাথর খণ্ড] সর্বোচ্চ তাপ ও বিকিরণ সৃষ্টিকারী দাহ্য পদার্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মাত্র এক টন ইউরেনিয়াম পদার্থ প্রায় ২৫ হাজার টন কাঠ পুড়িয়ে যে তাপশক্তি উৎপন্ন করতে পারে তার চেয়েও অনেক বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন করতে পারে। সেজন্য বর্তমানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির হিড়িক পড়ে গেছে। উন্নত দেশসমূহে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ অধিক পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানে 'ইউরেনিয়াম' ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো হচ্ছে। আগামী দিনে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর একমাত্র অবলম্বন হতে যাচ্ছে 'ইউরেনিয়াম' ব্যবহৃত পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

এ পর্যায়ে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়– বর্তমান বিজ্ঞান পারমাণবিক বোমা আর পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবে প্রমাণিত করে দেখিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী সকল প্রকার জ্বালানীর মধ্যে একমাত্র 'ইউরেনিয়াম' নামক কঠিন জ্বালানী বা পাথর বস্তুই কল্পনাতীত সর্বোচ্চ তাপ সৃষ্টিকারী দাহ্য বস্তু।

সুতরাং আল্-কুরআন প্রায় সাড়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বে জাহান্নামের জন্য জ্বালানী হিসেবে যে 'পাথর খণ্ড' নামক দাহ্য বস্তুকে নির্বাচন করার তথ্য মানবজাতিকে অবহিত করেছে, বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞান সেই 'পাথর খণ্ড'কে ইউরেনিয়াম হিসেবে চিহ্নিত করে এর ভয়ঙ্কর সর্বোচ্চ তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা উদঘাটন করেছে। ফলে সর্বোচ্চ তাপশক্তিসম্পন্ন জাহান্নাম নামক অগ্নিদুর্গে যে পাপী মানুষেরা বর্ণনাতীত কঠিন শাস্তি লাভ করবে পরকালে, তাতে আর কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকছে না। সাথে সাথে 'আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন' আবারও উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে মানবজাতিকে মহাসত্যের পথে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

'কোয়াসর' জাহান্নামের নিদর্শন

মানব ইতিহাসের প্রথম মানুষটি হযরত আদম [আ] একজন নবী হিসেবেই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে নবী হিসেবে এজন্যই পাঠিয়েছিলেন যেন প্রথম মানুষটি থেকেই এ ধরার বুকে এক আল্লাহ্র বিধান কার্যকর হয়। পরবর্তীতে যতো মানুষই পৃথিবীতে আগমন করবে তারা যেন আল্লাহ্র বিধান মেনে চলা ঐ প্রথম মানুষটিকে অনুসরণ করে সফলতা লাভ করতে পারে। পরকালে সফলতা লাভকারী মানুষেরা জান্নাতে সুখময় জীবন-যাপন করবে আর বিফল, ব্যর্থ ও পাপিষ্ঠ মানুষগুলো 'জাহান্নাম' নামক ভয়ঙ্কর অগ্নিদুর্গের তাপ ও তেজস্ক্রিয়তায় জ্বলে-পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে শাস্তি পেতে থাকবে।

আল-কুরআন এক দীর্ঘ সময় পূর্বেই এ পৃথিবীবাসীকে সেই ভয়ঙ্কর জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক সাবধান করেছে এবং বলেছে তাড়াহুড়ো না করার জন্য। সময় আসবে যখন আল্লাহ্ ঐ জাহান্নামের নিদর্শন আকাশে দেখাবেন। তখন মানবজাতি একটু খানি চিন্তা করলেই সাবধান হতে পারবে।

সূরা 'আল আম্বিয়া'র ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

خُلِقَ الاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. سَاُرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।"

'জাহান্নাম'-এর প্রজ্জ্বলিত ভয়াবহ অগ্নি সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা 'আল মুরসালাত'-এর ৩২ নং আয়াতে–

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرٍ كَالْقَصْرِ.

"অগ্নিদুর্গ উৎক্ষেপণ করবে বৃহৎ অট্টালিকাতুল্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"

অর্থাৎ বিশাল বিশাল অগ্নিলেলিহান শিখা সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড আগুনের কারণে।

অত:পর সূরা 'আল ফাজর'-এর ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিচারের দিন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড ভয়ানক অবস্থাসহ মানুষের সম্মুখে আনা হবে–

وَجِاىْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الاِنْسَانُ.

"সেই দিন জাহান্নামকে সম্মুখে আনা হবে এবং সেইদিন মানুষ উপলব্ধি করবে।"

অর্থাৎ পরকালে পাপীরা সম্মুখেই 'জাহান্নাম' দেখতে পাবে। তখন তার ভয়ঙ্কর রুদ্ররোষ দেখে দেখে ভাবতে থাকবে কেন যথাযথভাবে ঈমান না এনে অহঙ্কার ও গর্ব করে কেবলই ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে? কেন অন্ধকার পথ ছেড়ে আলোর পথে চলতে পারেনি? তাহলে তো আজ এতবড় বিপদ হতো না।

www.bjilibrary.com

বিজ্ঞান বিশ্ব ১৯৬৩ সালের দিকে সর্বপ্রথম 'কোয়াসার' আবিষ্কার করে। 'কোয়াসার' আয়তনের দিক থেকে এক বা একাধিক সৌরজগতের আয়তনের সমান মাত্র। অথচ এর উজ্জ্বলতা প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সির সম্মিলিত উজ্জ্বলতার সমান এবং এর তেজস্ক্রিয়তা নির্গমন ক্ষমতা প্রায় ১০,০০০ গড় গ্যালাক্সির সমান। অর্থাৎ কোয়াসার এক ভয়ঙ্কর মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক আমাদের এ বিশাল মহাবিশ্বে, আজ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ কোয়াসার আবিষ্কার করেছেন আমাদের বিজ্ঞানীগণ, সবগুলোই আবিষ্কৃত হয়েছে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অতীতে একাধিক গ্যালাক্সির কেন্দ্রের সমন্বয়ে 'কোয়াসার' সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউ বলেন, সম্ভবতঃ 'স্টার ক্লাস্টার [Star cluster] থেকেই কোয়াসার সৃষ্টি হয়েছে। 'কোয়াসার'-এর আচার-আচরণ থেকে মনে হয় যেন একটি কোয়াসারের ভেতর হাজার হাজার কোটি নক্ষত্র প্যাকড [Packed] অবস্থায় আছে।

কোয়াসার [Quasars] Quasi staller radio source তথা 'QSRS' থেকেই নামকরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের 'QSRS' আল-কুরআনের "قصر" শব্দকেই [সূরা আল মুরসালাত-এর ৩২ নং আয়াত যার অর্থ বিরাট বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ] একশত ভাগ সমর্থন করে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। সুতরাং 'কোয়াসার জাহান্নামের নিদর্শন' আলোচনায় আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞান-এর সমর্থন' বিশেষভাবে আবারও উচ্চারিত হয়েছে ।

সমগ্র মহাবিশ্ব ভাসমান ও চলমান

প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে আমাদের এ মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছে। আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটি প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতটি একই সময় সৃষ্টি হয়েছে। রাতের বেলায় অন্ধকারে মাথার উপর তারকার যে ঝাঁক দেখা যায় তা আমাদের 'মিলকি-ওয়ে' [Milky-Way] গ্যালাক্সির একটা অংশমাত্র যেখানে কয়েক হাজার তারকা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, অথচ সমগ্র গ্যালাক্সিতে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে বাস করছে। আমাদের গ্যালাক্সিটি প্রায় ৮০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে। গ্যালাক্সি হচ্ছে মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগঠন। এ গ্যালাক্সির ভেতরই সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তু অবস্থান করে থাকে।

এখন মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের ভেতরকার গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নেবুলা, ধূমকেতু, গ্রহাণু, উল্কাসহ সবাই কিভাবে ব্যবস্থিত হয়ে কোন্ পদ্ধতিতে তাদের লাইফ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে তা সর্বপ্রথম মানবজাতিকে অবহিত করেছে 'আল্-কুরআন'।

সূরা 'আর-রাদ'-এর ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى.

১৩—

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ্-ই বিশাল মহাবিশ্বকে স্থাপন করেছেন কোনো প্রকার স্তম্ভ [খুঁটি] ব্যতীত তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো। অত:পর তিনি তাকে আরশের অধীন করলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন। [মহাবিশ্বে] সবাই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত [নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে] পরিভ্রমণ করে চলছে।"

সূরা 'ইয়াসীন'-এর ৪০ নং আয়াতেও বলা হয়েছে-

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

"প্রত্যেকেই [মহাজাগতিক সকল বস্তু] নিজ নিজ কক্ষপথে [নিজস্ব গতিতে] পরিভ্রমণ করে চলছে।।"

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সমগ্র মহাবিশ্বটি একক ইউনিট হিসেবে খুঁটিবিহীন ভাসমান অবস্থায় স্থাপন করেছেন। মহাবিশ্বের কোথাও কোনো প্রকার স্তম্ভ বা খুঁটিবিহীন অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ করার কৌশলটি হলো- মহাশূন্যের মাঝে প্রতিটি মহাকাশীয় বস্তুকে নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনশীল রাখা এবং প্রদক্ষিণরত অবস্থায় কক্ষপথে সার্বক্ষণিক গতিশীল রাখা।

এভাবে আল-কুরআন খুঁটিবিহীন মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহের ভাসমান ও চলমান থাকার তথ্য মানবজাতিকে অতীতে অবৈজ্ঞানিক যুগেই অবহিত করেছিল।

বিজ্ঞান বিগত প্রায় ৩০০ বছর থেকেই আমাদের এ মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত আবিষ্কার আর উদঘাটনের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করে আসছে। তবে বিংশ শতাব্দিতেই সরবরাহকৃত তথ্যের পরিমাণ ছিলো সবচেয়ে বেশি। এ সময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে মহাবিশ্বটি একক ইউনিট হিসেবে যে ভাসমান এবং এর ভেতরকার সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যে একইভাবে ভাসমান ও নিজ নিজ কক্ষপথে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে প্রদক্ষিণরত সেই তথ্য ও মানবজাতিকে অবহিত করেছে।

১৯২০ সালের আগে আমাদের সৌরজগতসহ বহির্বিশ্বের যৎসামান্যই বিজ্ঞান অবহিত হতে পেরেছিল, কিন্তু এরপর মহাকাশ বিজ্ঞানী মি. ইডুইন হাবল পাওয়েল টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সমর্থ হওয়ায় দেখতে পান আসল মহাবিশ্বের রূপ ও সৌন্দর্য, তিনি লক্ষ্য করে দেখেন সমগ্র মহাকাশ জুড়ে লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি ভাসমান ও ঘূর্ণনশীল অবস্থায় চতুর্দিকে কেবলই ছুটে যাচ্ছে। আবার গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু, নেবুলাসহ সবই ভাসমান ও চলমান নিজ নিজ কক্ষপথে নিজস্ব আলাদা গতিতে।

বিজ্ঞান মহাবিশ্ব ও মহাজাগতিক বস্তুগুলোর এই ভাসমান ও চলমান থাকার পেছনে সক্রিয়ভাবে কার্যকর শক্তি হিসেবে 'মহাকর্ষ বল' [Gravitational Force] কে আবিষ্কার করেছে। ১৬৬৫ সালে আইজাক নিউটন এ শক্তির প্রথম পরিচয় উদঘাটন করেন।

www.bjilibrary.com

সুতরাং আমাদের এ মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার সমস্ত বস্তু খুঁটিবিহীন ভাসমান ও গতিশীল থাকার 'আল-কুরআনের অগ্রিম তথ্যকে বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণিত করে আল-কুরআনের পক্ষেই সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

এভাবে অসংখ্য সত্য সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে আল-কুরআনকে সাজানো হয়েছে, যা বর্তমান বিজ্ঞান সফলতার সাথে এক এক করে পর্যায়ক্রমে প্রমাণিত করে চলেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উপস্থিতির এ দিকটি লক্ষ্য করেই সূরা 'ইয়াসীন'-এর ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يس. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ.

"ইয়াসীন, [হে মানবজাতি!] শপথ বিজ্ঞানময় আল্-কুরআনের।"

তাই, কেউ যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে এক ও একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহকে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে চায় তাহলে তার জন্য এ কুরআন যথেষ্ট বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

সূরা 'আল কামর'-এর ৪ ও ৫ নং আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে এভাবে–

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ.

"লোকদের সম্মুখে এসে গেছে আল্-কুরআন, যাতে আছে সাবধান বাণী। আছে পূর্ণতাপ্রাপ্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ [আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ] যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করে।"

সূরা 'আন্ নিসা'-র ১১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

"আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।"

আবার সূরা 'আল জুমুআ'-র ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে একইভাবে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই [আল্লাহ্] উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদেরই মধ্য থেকে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞান। ইতিপূর্বে তো এরা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে।"

www.bjilibrary.com

এরপর উল্লেখিত জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনকারীর অবস্থা বুঝাতে গিয়ে সূরা 'আলা বাকারা'-র ২৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الاَلْبَابِ.

"আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করলো, সে প্রকৃতপক্ষে এক কল্যাণকর বস্তু লাভ করলো। আর বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।"

এখন একজন ঈমানদার আল-কুরআন থেকে আল্লাহ্র অবতীর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানকে জানলো। জানার পর কি করবে, কি করতে হবে তা অবহিত হওয়া তার উপর দায়িত্ব এসে যায়। সে দায়িত্ব পালন না করে যদি সে চুপ হয়ে থাকে, তাহলে আল-কুরআন বলছে সূরা 'আল-বাকারা'-র ১৪০ নং আয়াতে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ مِنَ اللّٰهِ.

"তার চাইতে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান, আদেশ নিষেধ উপদেশ জানলো কিন্তু মানুষের কাছে প্রকাশ করলো না ও গোপন করে রাখলো।"

অর্থাৎ আল-কুরআন-এর জ্ঞান বিজ্ঞানকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য পরিকল্পনা করে সকল প্রকার প্রকাশনা, মিডিয়া ও মাধ্যমগুলো ব্যবহার করতে হবে। এ সকল কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এক আল্লাহ্র পথে ইসলামের পথে, শান্তির পথে মানবজাতিকে আহ্বান জানাতে হবে।

সূরা 'আন্ নাহল'-এর ১২৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

"আহ্বান করো তোমার প্রভুর দিকে মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও উত্তম ভাষণের মাধ্যমে আর পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতীব উত্তম।"

অর্থাৎ আল্-কুরআন থেকে জানার পর জ্ঞান বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সুস্পষ্টভাবে মানব সমাজের কাছে পৌছানোর দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে– 'ফরয' তথা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে। আর সেজন্য আমাদেরকে বিভিন্নভাবে আল্-কুরআন-এর জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা মানবসমাজকে অবহিত করতে হবে।

একাজ এককভাবে ফলপ্রসূ হবে না। যার যে যোগ্যতা আছে, তাই নিয়ে একটি স্থানে

www.bjilibrary.com

একত্রিত হয়ে সামষ্টিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাস্তবভাবে কাজে নেমে পড়তে হবে– এ ব্যাপারে সূরা 'আলে-ইমরান'-এর ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا.

"তোমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করো।"

অর্থাৎ সবাই একত্রিত হয়ে সামষ্টিক সিদ্ধান্তের আলোকে যার যোগ্যতা আছে বলার তিনি মুখ দিয়ে, যার যোগ্যতা আছে লেখার তিনি লিখনীর মাধ্যমে, যার যোগ্যতা আছে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে এবং যার যোগ্যতা আছে গবেষণার তিনি গবেষণার মাধ্যমে আল-কুরআনের অনুকূলে নিত্য-নতুন তথ্য উদঘাটন করে আল্লাহ্‌র পথে মানবজাতিকে ডাকার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কাজে সহযোগিতা করবেন। এটাই আল-কুরআনের আলোকে সময়ের দাবি। একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে একাজ থেকে আমাদের কোনো মুক্তি নেই।

আর একাজ কঠিন হলেও খুবই সহজ হয়ে পড়বে তখন, যখন আমরা সূরা 'আল আন'আম'-এর ১৬২ নং আয়াতকে সম্মুখে রাখবো। কি সেই আয়াত?

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"বল, আমার নামায, আমার ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য।"

পদার্থ বিজ্ঞান

'পরমাণু'-র চেয়েও ক্ষুদ্র মহাসূক্ষ্ম কণিকা

এ পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সাধারণভাবে মানুষ বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবে 'অণু'কেই জানতো। এর চেয়েও যে বস্তুর ক্ষুদ্র আকৃতি ও গঠন থাকতে পারে তখন তারা তা ভাবতেও পারেনি। আল-কুরআনই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে মহাসূক্ষ্ম কণিকাদের উপস্থিতি ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে অবহিত করেছে ৭ম শতাব্দীতে।

সূরা সাবা-র ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

عٰلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত। মহাবিশ্বে তাঁর অগোচরে নেই অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র-মহাসূক্ষ্ম অথবা বৃহৎ কিছু; এর প্রত্যেকটি বিষয় আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।"

www.bjilibrary.com

আবার সূরা ইউনুস-এর ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"সমগ্র মহাবিশ্বের অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নেই এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মহাসূক্ষ্ম অথবা বৃহত্তরও নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে উল্লিখিত নেই।"

উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের একটু ধারণা মানব জাতিকে দান করলেন পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতর অস্তিত্বসম্পন্ন অণু-পরমাণু ও মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহের তথ্য উপস্থাপন করে, যা তখনও মানব জাতি জানা তো দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারেনি।

আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী সত্তা। তিনি গোপন-প্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্যসহ মহাবিশ্বের সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। বস্তু 'অণু' হোক কিংবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হোক সেটা কোনো বিষয় নয়।

সুতরাং এখানে কুরআন স্পষ্ট করেই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে যে, এ মহাবিশ্বে দৃশ্যমান পদার্থ কণা রূপ যে 'অণু' আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ 'অণু'ই পদার্থের সর্বশেষ অবস্থা [অংশ] নয়। এরপরও পদার্থ কণাকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র করা যেতে পারে। আরো মহাসূক্ষ্ম কণিকা পর্যায়ে পর্যন্ত তার অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র করা যেতে পারে এবং তার অস্তিত্ব এ মহাবিশ্বে বিরাজমান আছে। আর সেই মহাসূক্ষ্ম পদার্থ কণিকাদের সার্বিক অবস্থা আল্লাহ্ তাঁর মহাজ্ঞান দিয়ে অবহিত আছেন এবং তিনিই তাদের তত্ত্বাবধান করছেন।

বিজ্ঞানবিশ্বে আদিকালে 'থিওরি অব অ্যাটোমিজম' নামে এক সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। তথ্যটি তৎকালীন গ্রীক পণ্ডিতদের দ্বারা সর্বপ্রথম উপস্থাপিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৩ শতকে 'ডেমোক্রিটাস' নামক একজন এ তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ মনে করতেন 'অণু' [molecule] হচ্ছে কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, এরপর বস্তুর আর কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ হতে পারে না। যা আরবগণও তখন এ মতে বিশ্বাসী ছিলো। তাই আরবী ذَرَّةٌ [যাররাহ্] শব্দটি খুবই সাধারণভাবে যত্রতত্র 'অণু' অর্থেই ব্যবহৃত হতো। এর চেয়ে আর ক্ষুদ্রস্তরে বস্তু যেতে পারে না মনে করে তারা তা করতো।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞান আল-কুরআনকে সমর্থন করে তার দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে 'অণু'কে ভেঙ্গে 'পরমাণু' [Atom] আবিষ্কার করেছে। আবার ল্যাবরেটরীতে পরমাণুকে ভেঙ্গে 'ইলেকট্রন' প্রোটন ও নিউট্রন' নামক সাব এ্যাটমিক পার্টিক্যাস্‌স বা কণিকা আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী মহাবিস্ময় সৃষ্টি করেছে। ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্ববাসীর নিকট আবিষ্কৃত এ বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিলো।

www.bjilibrary.com

অতএব, কুরআন পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ 'অণু' [Molecule] যে তার সর্বশেষ অবস্থা নয় বরং আরো ক্ষুদ্র অংশ 'পরমাণু' [Atom] এবং আরো মহাক্ষুদ্র অংশ ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামক অবস্থা যে বিরাজমান আছে এ মহাবিশ্বের সর্বত্র তা অবহিত করেছিল, বর্তমান বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করলো।

ভূগোল বিজ্ঞান

পানি চক্র [Water cycle]

জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণ সমৃদ্ধ এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কিভাবে জীবনের অপর নাম 'পানি'কে প্রতিনিয়ত সাগর-মহাসাগর থেকে ভূ-ভাগের শুষ্ক পরিবেশে মেঘরূপে এনে ঝরণার আকারে সরবরাহ করে সকল কিছুকে সজিব রেখেছেন, প্রাণবন্ত রেখেছেন, তা নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি আয়াতের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যাবে। সূরা যুমার ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَه يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِه زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُه.

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা নদী-নালা, খাল-বিলের মধ্যে দিয়ে জমিনের অভ্যন্তরে প্রবাহিত করেন? তারপর তিনি এ পানির সাহায্যে বিভিন্ন রকম ফসল উৎপন্ন করেন।"

আবার সূরা 'রূম'-এর ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْىِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর জমিনের মৃত্যুর পর তাকে এ পানির সাহায্যে জীবন দান করেন, নিশ্চয় এতে অসংখ্য নির্দশন রয়েছে সেই সকল লোকদের জন্য, যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।"

আবার সূরা 'মুমিনুন'-এর ১৮ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِه لَقٰدِرُوْنَ.

"আমি [আল্লাহ্] আকাশ থেকে সঠিক পরিমাণে পানি বর্ষণ করে থাকি এবং তাকে জমিনের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখি, [মাটিকে সিক্ত করার জন্য] এবং নিমিষে তা নিষ্কাশন করতেও আমি সক্ষম।"

www.bjilibrary.com

পানি চক্রের [Water cycle] আরো স্পষ্টভাবে তথ্য দিয়েছে কুরআন। সূরা 'আত তারেক'-এর ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.

"আমি [আল্লাহ্] শপথ করছি আকাশের, যা ধারণ করে চক্রশীল বৃষ্টির।"

উপরে উদ্ধৃত প্রথম ৩টি আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা বলে মূলত বৃষ্টির কথাই বুঝিয়েছেন, যে বৃষ্টি নামার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মেঘ আকারে বাষ্পীয় অবস্থায় থাকে। সেই বাষ্প আবার সূর্য তাপে সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে সৃষ্টি হয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায়। এক পর্যায়ে আল্লাহ্র আদেশে বৃষ্টি পানি আকারে মাটিতে পতিত হয়ে নালা-নর্দমা, খাল-বিল ও পরিশেষে নদ-নদীর মাধ্যমে বাহিত হয়ে আবার সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। এভাবে সাগরে পৌছার পর আবার সূর্য তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে পূর্বের ন্যায় বৃষ্টি পানি হয়ে সাগরে পৌছে যায়। পানির এই পুনঃ পুনঃ একইভাবে পরিক্রমণকে পানি চক্র [Water cycle] বলে। এ পানি চক্রই জমিনকে ভিজিয়ে সিক্ত করার মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলে। আল কুরআন-ই ১৪০০ বছর পূর্বের একমাত্র গ্রন্থ যা এককভাবে এ বৈজ্ঞানিক তথ্য মানব জাতিকে অবহিত করেছে।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে মানুষের বিশ্বাস ছিলো সমুদ্রের পানি বাতাসের তোড়ে স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা ধারণা করতো যে এক গোপন পথ বা এক মহা গভীর গহ্বর দিয়ে পানি পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে। দার্শনিক প্লেটো এ ধারণাকে বিশ্বাস করতেন। তার সময়কাল থেকেই একে 'টাটারাস' বলা হতো। এমনকি অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত চিন্তাবিদ 'দেকার্তে' এ ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দির অ্যারিষ্টোটলও এ জাতীয় বাস্তবতা বর্জিত ধারণাকে সমর্থন করেছেন।

অথচ বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান কুরআন বর্ণিত পানি চক্র [Water cycle] কেই সমর্থন করে একইভাবে বর্ণনা দিয়েছে। যা সত্যই বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ১৪০০ বছর পূর্বেই উত্থাপন করলো যা অবহিত হতে বিজ্ঞানের এতোদিন সময় নিতে হলো।

লোনা পানি থেকে মিষ্টি পানি বর্ষণ

বর্তমানে আমরা সবাই জানি, সাগরে লোনা পানি সূর্য তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে আকাশে মেঘরূপে জমে, পরে তা থেকে আবার মিষ্টি পানি বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে।

আল কুরআন মানব জাতিকে সর্বপ্রথম এ বৈজ্ঞানিক তথ্য অবহিত করতে গিয়ে সূরা 'ওয়াকিয়া'-র ৬৮-৭০ নং আয়াতে বর্ণনা করেছে :

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ نَحْنُ
الْمُنْزِلُوْنَ. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ.

www.bjilibrary.com

"তোমরা যে পানি পান করো, তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করেছ? তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি চাইলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানব জাতিকে এমন একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, যা ভাবতে গেলে প্রতিটি মানুষই একজন মহাজ্ঞানী সত্তার সম্মুখে বিনাবাক্যে আত্মসমর্পণ না করে পারে না। বিষয়টি হচ্ছে পৃথিবীতে বিশাল পানির ভাণ্ডার হচ্ছে– সাগর, মহাসাগর। এ বিশাল পানি রাশি কিন্তু প্রাণী জগতের পান করার অযোগ্য। কারণ এতে লবণাক্ততার পরিমাণ খুব বেশি। অথচ আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট প্রাণী জগতকে সুপেয় মিষ্টি পানি পান করার জন্য এ পানিকে বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়ে আবার বৃষ্টির আকারে নামানোর সময় তাঁর মহাজ্ঞানের ব্যবস্থাপনায় লবণাক্ততা দূর করে সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করে দেন। এতো ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী লোনা পানিকে মিষ্টি পানিতে রূপান্তর করা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয়। এটি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্র নিদর্শন।

আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যায় জানিয়েছে যে, আকাশে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সাথে সালফাইড অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে বৃষ্টি কণার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাতের উপর উচ্চ ডিগ্রিসম্পন্ন এসিডিটি প্রদান করে। এ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে থাকে PH মান যা ৫.৬ থেকে কম। ফলে সাগরের লোনা পানি উল্লিখিত প্রতিক্রিয়ায় লবণাক্ততা হারিয়ে সুপেয় মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত হয়। যা জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং আল-কুরআন লোনা পানি থেকে মিষ্টি পানি প্রাপ্তির যে প্রাকৃতিক তথ্য প্রদান করেছে ৭ম শতাব্দীতে, তা বিজ্ঞান প্রায় ১৩০০ বছর পর বিংশ শতাব্দিতে এসেই কেবল উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান

পবর্তগুলো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ জমিনের সাথে

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ পৃথিবীর গঠন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কুরআনে বিভিন্ন সূরায় পর্বতসমূহের গাঠনিক দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– সূরা নাযিয়াত-এর ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا.

"পবর্তসমূহকে তিনি দৃঢ়ভাবে জমিনের উপর সংস্থাপিত করেছেন।"

আবার সূরা নাহল-এর ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

www.bjilibrary.com

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"তিনি [আল্লাহ্] পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত হতে না পারে।"

আবার সূরা 'নাবা'-র ৬ ও ৭ নং আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا.

"আমি [আল্লাহ্] কি জমিনকে বিস্তীর্ণ শয্যা ও পাহাড়-পর্বতসমূহকে পেরেকস্বরূপ দৃঢ়তা দান করিনি?"

অর্থাৎ এ পৃথিবী পৃষ্ঠে দৃশ্যমান পাহাড়-পর্বতগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-তাত্ত্বিক ভাঁজের গভীর স্তরের উপর মজবুত ও দৃঢ় খুঁটির মতো বৈশিষ্টতা দান করেছেন। যাতে করে পৃথিবী তার কক্ষপথে চলার সময় যেনো দোল খেতে কিংবা এদিক-ওদিক অযথা নড়া-চড়া করতে না পারে। তাতে মানুষসহ সকল প্রকার প্রাণী সুস্থভাবে তাদের জীবন চালাতে সক্ষম হবে। নতুবা পৃথিবীর আন্দোলনে সমস্ত প্রাণী জগতের নাভিশ্বাস উঠে মৃত্যুবরণ করবে।

আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত সাম্প্রতিক প্রমাণাদি কুরআনের বর্ণনার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।' 'Earth' [পৃথিবী] নামক ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের লেখক 'মিঃ ফ্রাঙ্ক প্রেস' যিনি ১২ বছর যাবৎ আমেরিকার 'অ্যাকাডেমি অব সাইন্স'-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি ভূতপূর্ব আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি তাঁর ঐ বইতে পর্বতকে খুঁটি আকৃতি হিসেবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং লিখেছেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্বত হলো একটি ক্ষুদ্র অংশ, যার মূল ভূ-পৃষ্ঠের অতল গভীরে দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে আছে এবং যা ভূ-পৃষ্ঠের স্থিরতা ও স্থায়িত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সমুদ্র বিজ্ঞান

মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির মাঝে প্রাচীর

এ মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর মহাবিস্ময়কর জ্ঞানের নিদর্শন প্রদান করেছেন সৃষ্টির বিভিন্ন পরতে-পরতে। এতে তাঁর একান্ত উপস্থিতি যেন মানব সমাজ উপলব্ধি করতে পারে।

এ লক্ষ্যে কুরআনে সূরা আর রাহমান-এর ১৯ ও ২০ নং আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে :

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.

"দু'টি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেনো তারা পরস্পর মিলিত হয়, তা সত্ত্বেও

www.bjilibrary.com

উভয়ের মাঝে রয়েছে এক প্রাচীর, যা সেই দু'টি সমুদ্র অতিক্রম বা লঙ্ঘন করে না।"

আবার সূরা নামল-এর ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَجَعَلَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا.

"পানির দু'টি ধারার মাঝখানে তিনি এক বিভাজন প্রাচীর গঠন করেছেন।"

একইভাবে সূরা 'ফুরকান'-এর ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

هُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ.
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি দু'সমুদ্রকে মুক্তভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি হলো মিষ্ট-সুস্বাদু। আর অপরটি হলো লবণাক্ত যা দিয়ে তিনি দুর্ভেদ্য বিভাজক নির্মাণ করেছেন।"

উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর একটি বিশেষ কুদ্‌রতের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দু'টি সমুদ্রকে মিলিত করার পরও এক অদৃশ্য পর্দার বা বিভাজনের কারণে লবণাক্ত সাগরের পানি মিষ্টি পানির সাগরে মিশে যেতে পারছে না। সাগর দুটি তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেই পাশাপাশি বহমান, ভূ-মধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে জিব্রালটারসহ বহু জায়গায় এ ধরনের বিভাজন পানির প্রাচীর দেখা যায়। অথচ সাধারণভাবে যখন এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে জোয়ার-ভাটার কারণে তখন সে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে অন্য পানির সমগুণে গুণান্বিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার স্পষ্ট করেছে যে, যেখানে দু'টি সমুদ্র যে যার তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং ঘনত্বসহ বিভাজিত করেছে, সেখানে দুই সমুদ্রের মাঝে এক অদৃশ্য ক্রমনিম্নগতিসম্পন্ন তির্যক পানি-প্রাচীর রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে।

অপরদিকে অতি সম্প্রতি বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, মোহনা অঞ্চলে যেখানে মিষ্টি পানি এবং লবণাক্ত পানি মিলিত হয়, সেখানকার পরিস্থিতি সমুদ্রের তুলনায় ভিন্নতর। মোহনা অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ত পানি থেকে মিষ্টি পানির যে পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে তা হলো 'একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের Pycnoclinzone-এর উপস্থিতি, 'যা অনিয়মিতভাবে দুটি পানি স্তরকে পৃথক করে রাখে। মিষ্টি এবং লবণাক্ত উভয় পানি থেকে ভিন্ন এক লবণাক্ততা রয়েছে এ সীমান্ত অঞ্চলের পানির প্রাচীরের। মিশরের নীল নদ প্রবাহিত হয়ে ভূ-মধ্যসাগরে মিলিত হওয়াসহ বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা দেখা যায়।

সুতরাং কুরআন যা বলেছে আজকের বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেই বেড়াচ্ছে। তার বেশি কিছুই নয়।

www.bjilibrary.com

জীব বিজ্ঞান

সমস্ত প্রাণ পানি থেকে সৃষ্টি

আমাদের এ পৃথিবী বর্ণনাতীত প্রাণের সমারোহে ধন্য হয়ে আছে এ সৌরজগতে। আপাতত প্রাণের এতো অধিক উপস্থিতি এখনও আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।

আল্-কুরআনই সর্বপ্রথম প্রাণের আগমনের মৌলিক তথ্য মানব জাতিকে অবহিত করেছে সঠিকভাবে।

আল্-কুরআন-এর সূরা আম্বিয়া-র ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

"আমি [আল্লাহ্] প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?"

একইভাবে সূরা আন নূর-এর ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

আবার সূরা ফুরকান-এর ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَه نَسَبًا وَّصِهْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

"আল্লাহ্ তিনি যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি বংশগত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক বড়ই শক্তিশালী।"

অর্থাৎ এ পৃথিবী পৃষ্ঠে পানিতে ও মহাশূন্যে যতো প্রকার প্রাণ সমৃদ্ধ জিনিস আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের মাধ্যমে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটা একটা মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্য, মানব জাতি সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম বিধায় তা গবেষণা করে দেখে নিতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান এর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে প্রাণ কোষ-এর মধ্যে 'সাইটোপ্লাজম' নামক যে অংশ আছে তা হচ্ছে মূল অংশ, যা ৮০% পানি দ্বারা গঠিত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রায় ৯০%। প্রতিটি সজীব ও জীবন্ত সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক পানি একান্ত অপরিহার্য বস্তু। পানি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

বিজ্ঞান এককোষী প্রাণী হিসেবে 'অ্যামিবা ও হাইড্রা'কে পানিতেই আবিষ্কার করেছে।

সুতরাং ১৪০০ বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে কি ধারণা করা সম্ভব ছিলো, যে প্রতিটি

www.bjilibrary.com

সজীব প্রাণবন্ত বস্তু পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে? বরং যেখানে সর্বদাই পানির অভাব, সেই মরু আরবের একজন মানুষের পক্ষে এরূপ ধারণা করাই ছিলো অসম্ভব এক ব্যাপার।

তাই আজকের বিজ্ঞান পানি থেকে প্রাণ সৃষ্টি প্রমাণ করার মাধ্যমে 'কুরআন' যে মহাজ্ঞানী আল্লাহর বাণী তা আবারও মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন ঘোষণা করেছে এ মহাবিশ্বে আল্লাহ্ তা'আলা যতো কিছু সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটি জিনিসই তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এমনকি সেই বস্তুও যেগুলো আজো পর্যন্ত মানুষ জানতে পারেনি, অজানা সেই বস্তুসমূহ হয়তোবা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বপ্রথম কুরআনই মানব জাতিকে অবহিত করেছে। সূরা ইয়াসিন-এর ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

سُبْحَانَ الَّذِىْ الاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"মহাসম্মানিত সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যা জমিন উৎপাদন করে, এমনকি তাদের নিজেদের প্রজাতি [মানব জাতি] অথবা সেই সব বস্তু যা তারা জানেও না।"

আবার সূরা যারিয়াত-এর ৪৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ.

"প্রতিটি বস্তুর মধ্য থেকে আমি [আল্লাহ্] জোড়া সৃষ্টি করেছি।"

একইভাবে সূরা ত্বহা-র ৫৩ নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে :

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فَاَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى.

"তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন ও তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদকে জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করেছেন।"

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তার সকল কিছুকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, সেটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হোক কিংবা না হোক, এক কথায় তাঁর সৃষ্টির ভেতর সমস্ত কিছুই জোড়াসম্পন্ন।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে ইতোমধ্যে উদঘাটন করে দেখিয়েছে যে, এ মহাবিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার সব কিছুই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি যে সমস্ত বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বা অদৃশ্য, যেমন– বৈদ্যুতিক শক্তি যার মধ্যে আছে পজেটিভ চার্জ ও নেগেটিভ চার্জ, আবার পরমাণু হচ্ছে বস্তুর সর্বশেষ ইউনিট, যার গঠন উপাদান হচ্ছে– ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা। এ কণিকাসমূহের জোড় হচ্ছে–

www.bjilibrary.com

ইলেকট্রনের জন্য পজিট্রন, প্রোটনের জন্য এ্যান্টি প্রোটন ও নিউট্রনের জন্য এ্যান্টি নিউট্রন। এগুলো প্রতিবস্তু। এভাবে আমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে। এ মহাবিশ্বে এ এক মহাবিস্ময়কর বাস্তবতা যা অস্বীকার করা যায় না।

সুতরাং কুরআন যে তথ্যই অগ্রিম মানব জাতিকে অবহিত করেছে তার সবই বিজ্ঞান প্রমাণ করে মানব জাতিকে মহাসত্যের দিকে, এক আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে।

ভ্রূণ বিজ্ঞান

মানুষ 'আলাক' [জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড] থেকে সৃষ্টি হয়েছে

মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'আলাক' সম্পর্কে বলতে গিয়ে সূরা 'আলাক'-এর ১ ও ২ নং আয়াতে বলেছেন :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

"ঘোষণা করো তোমার রব এবং প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তের পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করার যে পদ্ধতি চালু করেছেন মাতৃজরায়ুতে, তাতে পিতার শুক্রাণু ও মাতার ডিম্বাণু মিলিত হওয়ার পর প্রথম যে 'জাইগট' তৈরি হয়, সেই 'জাইগট'-টি মূলত জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড ছাড়া তখন আর কিছু নয়। এ রক্তপিণ্ড ক্রমান্বয়ে উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে যেতে-যেতে এক পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ মানব আকৃতি ধারণ করে এ পৃথিবীতে আগমন করে।

কুরআন ঐ বৈজ্ঞানিক তথ্য তখন দুনিয়ার মানুষকে অবহিত করেছে যখন মানুষ এ সম্পর্কে সঠিক তথ্যের দিক থেকে শূন্যের কোঠায় ছিলো।

আধুনিক বিজ্ঞানে ভ্রূণ বিদ্যার নামকরা বর্তমান বিজ্ঞানীদের একজন হচ্ছেন প্রফেসর 'ডা. কিথ মুর', তিনি বিগত দিনে ভ্রূণ বিদ্যার প্রফেসর ও কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে 'অ্যানাটমি' বিভাগে চেয়ারম্যান ছিলেন, বর্তমানে তিনি ভ্রূণ বিদ্যার ক্ষেত্রে একজন বিদগ্ধপণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– "কুরআনে বর্ণিত ভ্রূণ বিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলো ভ্রূণ বিদ্যা শাস্ত্রে বর্তমান বিজ্ঞানের উদঘাটিত তথ্য অনুসারে একেবারে নির্ভুল, নিখুঁত ও কোনোভাবেই সেগুলোর সঙ্গে কোনো অসঙ্গতি নেই।"

'ডা. কিথ মুর' The Developing Human নামক একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কুরআন থেকে নতুনভাবে জ্ঞান অর্জন করার পর ১৯৮২ সালে তিনি ঐ একই গ্রন্থ The Developing Human এর তৃতীয় সংস্করণ রচনা ও গ্রন্থনা সম্পন্ন

www.bjilibrary.com

করেছিলেন। গ্রন্থটি একক লেখকের দ্বারা লিখিত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গ্রন্থ [Madical book] হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিল। গ্রন্থটি বিশ্বের প্রথম সারির ভাষায় অনূদিত হয়ে চিকিৎসা শিক্ষার প্রথমবর্ষে ভ্রূণ বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক হিসেবে আজও পঠিত হচ্ছে।

ডা. কিথ মুর বলেন ভাবতে অবাক লাগে, যে ভ্রূণ বিদ্যা সবেমাত্র বিজ্ঞান অনুধাবন করে পা-পা করে এগুচ্ছে সেই জটিল একটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কুরআন কেমন করে ১৪০০ বছর পূর্বেই মানব জাতিকে অবহিত করলো? এতে প্রমাণ হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ সত্যি-সত্যি আছেন।

মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে নিক্ষিপ্ত এক ফোটা থেকে মানুষ সৃষ্টি

সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী সত্তা আল্লাহ্ যে সত্যি-সত্যি আছেন তা বুঝার জন্যই তিনি ১৪০০ বছর পূর্বেই মানব সম্প্রদায়কে তাদের সৃষ্টির মৌলিক বিষয়াদি অগ্রিম জানিয়ে দিয়েছেন। যে বিষয়গুলো বিজ্ঞান তার বর্তমান সর্বোচ্চ অগ্রগতি ছাড়া পূর্বে উদঘাটনের কথা ভাবতেও পারেনি। পিতার শুক্রাণু ও মাতার ডিম্বাণুর উৎস সম্পর্কে সূরা তারেক-এর ৫ থেকে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

فَلْيَنْظُرِ الانْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.

"মানুষ লক্ষ্য করে না যে, তাকে কী জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? স্ববেগে স্খলিত পানি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষ পিঞ্জরের মধ্য হতে নির্গত হয়।"

অর্থাৎ পিতার শুক্রাণুর আগমন শুরু হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে আর মাতার ডিম্বাণুর যাত্রার সূচনা ঘটে বক্ষদেশ থেকে। এ তথ্য কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে প্রকাশ করেছে।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়টিকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উদঘাটন করে বিষয়টির যথার্থতা।

মেডিক্যাল সাইন্স সর্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, পিতার এবং মাতার প্রজনন অঙ্গ অর্থাৎ অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ ভ্রূণ অবস্থায় পিতার মেরুদণ্ড ও মাতার পাঁজরের হাড়ের মধ্যে কিডনির নিকট তাদের ক্রমবিকাশ শুরু করে। পরবর্তীতে সেগুলো ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। একপর্যায়ে মাতার জনন অঙ্গে ডিম্বাশয়ের পেলভিসে [Pelvis] এসে থেমে যায়। অপরদিকে পিতার শুক্রাণু ধারাবাহিকভাবে কুঁচকি নালিকার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে নিচের দিকে নামতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু পিতার মেরুদণ্ড এবং মাতার বক্ষপিঞ্জর থেকে যাত্রা শুরু করে এক পর্যায়ে মাতৃজরায়ুতে মিলিত হয়ে মানব সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

সুতরাং পিতার শুক্রাণু এবং মাতার ডিম্বাণুর উৎসের যে বৈজ্ঞানিক তথ্য কুরআন অন্ধকার এক অবিজ্ঞান যুগে উত্থাপন করেছিল আজকের আধুনিক উৎকর্ষিত বিজ্ঞান তা উদঘাটন করে প্রমাণিত করলো। এতে দেখা গেলো কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য একেবারেই অভিন্ন ও একই সূত্রে গ্রথিত।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে 'নুত্ফাহ' [তরল পদার্থ, তরল পদার্থের সারবস্তু, মিশ্রিত তরল পদার্থ] থেকে

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনে কমপক্ষে ১১ বার বর্ণনা করা হয়েছে যে, নুতফাহ্ থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ নুতফাহ্-র অর্থ হচ্ছে– তরল পদার্থের এক অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ অথবা তরল পদার্থের এমন এক ক্ষুদ্র ফোটা, যা পানির কাপ বা গ্লাসের তলায় অবশিষ্ট থেকে যায়।

সূরা নাহল-এর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ.

"তিনি [আল্লাহ্] শুক্রাণু হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"

আবার সূরা ইয়াসিন-এর ৭৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

اَوَلَمْ يَرَ الاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُطْفَةٍ.

"মানুষ কি দেখে না যে আমি [আল্লাহ্] তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রাণু থেকে?"

একইভাবে সূরা সাজদাহ্-এর ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَه مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ.

"অতঃপর ঘৃণ্য প্রকৃতির এক তরল নির্যাস [সারবস্তু] থেকে তিনি তার [মানুষের] বংশধর সৃষ্টি করেছেন।"

আবার সূরা দাহর-এর ২ নং আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে :

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

"অবশ্যই আমি [আল্লাহ্] মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রকণার একটি বিন্দু থেকে।"

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় কোথাও তরল পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশ, কোথাও কোনো সামগ্রিক বস্তুর উৎকৃষ্ট অংশ, আবার কোথাও সংমিশ্রিত তরল পদার্থ কণা ইত্যাদির উল্লেখ করে প্রকারান্তরে পিতা-মাতা উভয়ের নিষিক্ত যৌনরস বা তরল পদার্থকে বুঝানো হয়েছে, যা বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে আগত ভিন্ন প্রকৃতির নিঃসৃত রস দ্বারা গঠিত।

অতি সাম্প্রতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বাস্তব অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বের

www.bjilibrary.com

করতে সমর্থ হয়েছে যে, মাতার ডিম্বাণু পরাগতি [গর্ভবতী] হওয়ার জন্য প্রায় তিরিশ লক্ষ শুক্রাণুর ভেতর থেকে মাত্র কেবল একটি শুক্রাণু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তিরিশ লাখ ভাগের কেবল একভাগ অথবা শুক্রকীটের শতকরা ০.০০০০৩% ভাগ গর্ভধারণের জন্য ডিম্বাণুতে প্রবিষ্ট হয়।

সুতরাং মানব সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক তথ্যের বেলায়ও 'কুরআন' বর্তমান উন্নততর বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা থেকে ১৪০০ বছর এগিয়ে আছে জ্ঞানের মশাল জ্বেলে। কারণ এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা যিনি, জ্ঞান- বিজ্ঞানের একমাত্র উৎসও তিনি। আবার একমাত্র তিনিই মহাগ্রন্থ 'কুরআন' অবতীর্ণকারী।

এভাবে সৃষ্টি তত্ত্ব বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, সমুদ্র বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, ভ্রূণ বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় হাজার খানেক আয়াত পবিত্র গ্রন্থ কুরআন-এ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, যাতে করে মানব সমাজের মধ্যে যারা চিন্তাশীল জ্ঞানী তারা যেনো এর ভেতর দিয়ে এক আল্লাহ্র উপস্থিতি নিশ্চিত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ্ তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়ার জন্য একমাত্র কুরআনকে আঁকড়ে ধরে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে পারে। আর যদি তাই হয় তাহলে তারা এ পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প- সাহিত্যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, কৃষ্টি-কালচারে, শৌর্য-বীর্যে এককথায় সকল ব্যাপারেই সকল জাতিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, সাথে সাথে সঙ্গত কারণেই বিশ্ব নেতৃত্বও তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী সোনালী যুগের আবার আবির্ভাব ঘটবে। ৭ম শতাব্দী থেকে প্রায় ১২শ' শতাব্দী পর্যন্ত এ পৃথিবী শুধু একবার-ই সেই সোনালী যুগকে বাস্তবভাবে দর্শন লাভ করেছিল তদানীন্তন আরব জাতির জ্ঞানী-গুণীদের বিস্ময়কর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। আজও যার আলোর ঝলক বিশ্বব্যাপী মানব সমাজকে দোলা দিয়ে যায়। ■

লেখক পরিচিতি : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন– বিশিষ্ট প্রকৌশলী এবং গবেষক।

লেখা পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১১ই জুন, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

■

ভূমিকা

সম্প্রতি বাংলাদেশসহ বিশ্বের কতিপয় দেশে জঙ্গিবাদ একটি বার্নিং ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই এই নব্য জঙ্গিবাদের উত্থান। তারা ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, সত্যিকার ইসলামপন্থি, ইসলাম প্রচারক ও ইসলামী আন্দোলনকারীদের বিতর্কিত করতে জঙ্গিবাদকে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে ইসলামী দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ রোধ করতে এবং এসব দেশে তাদের সামরিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে একে কাজে লাগাচ্ছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু বিভ্রান্ত মুসলিমকে বেছে নিয়েছে। তাদেরকে দিয়ে জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে, এ সকল মুসলিম বুঝে হোক না বুঝে হোক তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। অথচ এদের অনুধাবন করা উচিত ছিল ইসলাম কখনো বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতী হামলাসহ কোন ধরনের অরাজকতা সমর্থন করে না। পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক যারাই এই পথে পা বাড়িয়েছে তারা জঘন্যতম অপরাধে জড়িত হয়েছে এবং ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বক্ষমান প্রবন্ধে জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ইসলাম তথা পবিত্র আলকুরআন ও আল হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে যেসব অনুচ্ছেদ রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা
২. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ
৩. জঙ্গিবাদের উত্থান
৪. বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান
৫. জঙ্গিবাদ বিড়ম্বনা ও জঙ্গিফোবিয়া
৬. জঙ্গিবাদ বনাম জিহাদ
৭. ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ
৮. জঙ্গিবাদ দমনে করণীয়
৯. উপসংহার

জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদী শব্দগুলোর মূল হল জঙ্গ। এটি [جنگ — ج ن گ] ফার্সী ও উর্দূ ভাষার শব্দ। পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ একটি পত্রিকার নাম দৈনিক জঙ্গ। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, তুমুল কলহ, লড়াই, প্রচণ্ড ঝগড়া।[১] জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা। সেভাবে জঙ্গিবাদ অর্থ জঙ্গিদের মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড। ইংরেজীতে বলা হয় Militant, Militancy কিংবা Military activities.[২] Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে বলা হয়েছে : Militant adj, Favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim.[৩] অর্থাৎ কারো উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ বা প্রবল চাপ প্রয়োগ। Chamber's Twentieth Century Dictionary-তে বলা হয়েছে : Militant adj, fighting, engaged in warfare[৪] অর্থাৎ সংগ্রামরত বা যুদ্ধরত। আরেক জায়গায় বলা হয়েছে : using violence,[৫] অর্থাৎ সহিংসতা অবলম্বন করা। জঙ্গিবাদ যেহেতু নতুন শব্দ তাই এর আরবী প্রতিশব্দ আরবী অভিধানসমূহে পরিলক্ষিত হয় না। তবে

---

১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২১৬।
২. মোহাম্মদ আলী ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা-ইংরেজী অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-২১৬।
৩. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 5th edition, 1995. Page-738.
৪. A. M. Macdonald, Chambers Twentieth Century Dictionary, The Pitman Press, Great Britain, 1981, Page- 430.
৫. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

এর কাছাকাছি যে শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই তা হল [الإرهاب] অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা, ভীতি প্রদর্শন করা।[৬]

পবিত্র আলকুরআনে বলা হয়েছে :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ـــ

"আর তোমরা যতদূর সম্ভব নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও পালিত ঘোড়া তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখ যেন তার সাহায্যে আল্লাহ্ এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত শংকিত করতে পার যাদেরকে তোমরা জান না। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন।"[৭]

পারিভাষিক অর্থে ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরা গোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

পূর্বের অনুচ্ছেদে জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ ত্রাস শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হল ভয়, ভীতি, শংকা।[৮] সন্ত্রাস হল আতংকগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৯] আর সন্ত্রাসবাদ হল, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি।[১০] যার ইংরেজী হল Terrorism. এর অর্থ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে :

The systematic use of violance to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.[১১]

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রণালীবদ্ধ সহিংসতার মাধ্যমে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। আরবী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে :

---

৬. আল্ কামূসুল্ আস্‌রী, ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, দারুল জাইল, বৈরুত, পৃষ্ঠা- ২৬৫।
৭. সূরা আল্ আন্‌ফাল : ৬০।
৮. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-২৬৬।
৯. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২২তম মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৬৬১।
১০. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা-৫৪১।
১১. The New Encyclopaedia Britannica, USA-2002, Vol. II, Page- 650.

www.bjilibrary.com

الارهاب هو استخدام العنف أو التهديد لإثارة الرعب ــ

"অর্থাৎ ভয়ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে হুমকি প্রদর্শন করা।"[১২]

'বিশ্ব মুসলিম সংস্থার' অধীন 'ইসলামী ফিক্হ্ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তা হচ্ছে,

العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الانسان دينه و عقله وماله وعرضه ــ

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বিবেক বুদ্ধি, ধন-সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।'[১৩]

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা যে জিনিসটি উপলব্ধি করেছি তা হল সাধারণত অন্যায়ভাবে যে কোন ভীতি প্রদর্শন, ক্ষতি-সাধন, হুমকি সৃষ্টি ইত্যাদি অপরাধমূলক আচরণকে সন্ত্রাস বলে, এটা ধর্মীয় কারণে হতে পারে অথবা অন্য কোন কারণে হতে পারে। অন্যদিকে শুধু ধর্মীয় কারণে ন্যায় হোক অন্যায় হোক উপরোল্লিখিত কর্মকাণ্ডকে জঙ্গিবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি কিছুদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসলাম ও মুসলিম নামের সাথে টেরোরিষ্ট, ফান্ডামেন্টালিষ্ট, মুসলিম এক্সট্রিমিস্ট ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে তারা এটাকে ইসলাম ধর্মের সাথে যুক্ত করেছে।[১৪] তাদের এদেশীয় ও অন্যান্য বিদেশী বন্ধুরা এটাকে জঙ্গিবাদ হিসাবে নামকরণ করেছে। কিছুদিন আগে ভোলা জিলার এক অঞ্চলে "গ্রীন ক্রিসেন্ট" নামের এক ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিছু অস্ত্র পাওয়াকে কেন্দ্র করে জঙ্গিবাদ নামে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়। একে কেন্দ্র করে ভোলা জিলার অসংখ্য কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসায় ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়, যদিও কোন একটি মাদ্রাসায় কোন অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অথচ প্রতিনিয়ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী মেডিকেল কলেজ, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অস্ত্রব্যবহার, বোমাবাজিসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে। তারা কেউ এটাকে জঙ্গিবাদ বলে আখ্যায়িত করছে না। এগুলোকে জঙ্গিবাদ বলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছে না। পক্ষান্তরে এর হাজারো ভাগের এক ভাগও যদি কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় তখনই জঙ্গি, জঙ্গিবাদ, জঙ্গিবাদী বলে প্রচন্ড হৈ চৈ শুরু করা হয়। কয়েকদিন পূর্বে বাংলাদেশের প্রভাবশালী আইন মন্ত্রী বলেছেন, 'এক শ্রেণীর কওমী মাদ্রাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র। ধর্মের নামে সন্ত্রাস রোধ করতে মাদ্রাসা শিক্ষা

---

১২. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস, নূরুল ইসলাম, মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮।
১৪. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ মার্চ ২০০৯, পৃষ্ঠা-১।

www.bjilibrary.com

পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।'[১৫] তিনি আরো বলেন, 'কওমি মাদ্রসায় ভাল হওয়ার কোন শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি বেহেস্তে যাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়। অন্যের জমি দখল যে খারাপ কাজ এ কথাটি এসব মাদ্রাসায় বলা হয় না।'[১৬]

আইনমন্ত্রী আরো বলেন, বাহাত্তরের সংবিধান থাকলে ধর্মের নামে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হতো না। ৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন সংশোধনী এনে বাহাত্তরের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে নস্যাৎ করা হয়েছে। তারই ফলে দেশে ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে সন্ত্রাস দূর করতে হলে তিনি ধর্মীয় নেতা সহ সবার গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আহবান জানান।'[১৭] সম্প্রতি এক গোল টেবিল আলোচনা সভায় সাবেক সেনা প্রধান ও সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম নেতা লে. জেনারেল [অব.] হারুন অর রশীদ বলেন, 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে এদেশের মসজিদগুলোর কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করা উচিত। মসজিদে কারা আসছে কারা যাচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তা করতে হবে।'[১৮]

উপরোল্লেখিত আইন মন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে আরো কিছু মন্তব্য উল্লেখ করে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র-সস্ত্র পাওয়া গেলে অথবা এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা কোন অস্ত্রবাজি কিংবা হাঙ্গামা বা মারামারি করলে তাকে জঙ্গিবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাদেরকে জঙ্গি বলে দোষারোপ করা হয়, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা এ সকল কর্মকাণ্ড করলে তাদেরকে বলা হয় সন্ত্রাসী। এর দ্বারা আরো একটি বিষয় আমাদের নিকট পরিষ্কার হলো, প্রতিটি জঙ্গিবাদকে সন্ত্রাসবাদ বলা যাবে কিন্তু প্রতিটি সন্ত্রাসবাদকে জঙ্গিবাদ বলা যাবে না।

জঙ্গিবাদের উত্থান

বর্তমানে মুসলিম অমুসলিম প্রায় সকলে ইসলাম ধর্মের নামে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে তাকে সন্ত্রাসবাদ না বলে জঙ্গিবাদ বলেই আখ্যায়িত করছে। জঙ্গি বা জঙ্গিবাদ নামে কোন খবর প্রকাশিত হলে ধরে নিচ্ছে এটা মুসলিমদের কাণ্ড। শুধু তাই নয়, ধরে নেয়া হয় যারা সুন্নতি লিবাস পরিধান করে, দাড়ি রাখে, টুপি পরে তারাই সাধারণত এই কাজের সাথে জড়িত।

সে যাই হোক ধর্মের নামে যে সন্ত্রাস এটি কিন্তু নতুন বিষয় নয়। প্রাচীন কাল থেকে তা চলে আসছে। ইয়াহুদী উগ্রবাদী ধার্মিকগণ ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয়

---

১৫. দৈনিক প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০০৯।
১৬. দৈনিক যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০০৯।
১৭. দৈনিক প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০০৯।
১৮. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৬মে ২০০৯, পৃষ্ঠা-১।

www.bjilibrary.com

নিয়েছেন। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধতম সন্ত্রাসী কর্ম ছিল ইয়াহুদী যীলটদের [Zealots] সন্ত্রাস। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসকারী উগ্রবাদী এ সকল ইয়াহুদী নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপোসহীন ছিল। যে সকল ইয়াহুদী রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহ অবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। প্রয়োজনে এরা আত্মহত্যা করত, কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে ধরা দিত না।[১৯]

মধ্যযুগে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা দেখা যায়। বিশেষতঃ ধর্মীয় সংস্কার, পাল্টা সংস্কার [Reformation and Counter-Reformation] এর যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ ছাড়াও সন্ত্রাসের অনেক ঘটনা দেখা যায়।[২০] ইসলাম ধর্মের প্রথম যুগে জঙ্গিবাদের কিছু ঘটনা উল্লেখ করার মত। ৩৫ হিজরী সালে [৬৫৬ খৃ.] ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান [রা] কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। এক পর্যায়ে আলী [রা] খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অধিকাংশ সাহাবী আলী [রা]-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন সিরিয়ার গবর্ণর মুয়াবিয়া [রা]সহ কিছু সাহাবী আলী [রা]-এর আনুগত্য অস্বীকার করেন। মুয়াবিয়া [রা] দাবি করেন যে, আগে উসমান [রা]-এর হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলী [রা] বলেন যে, রাষ্ট্রিয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে হত্যাকারীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে। মুয়াবিয়া [রা] এই মত প্রত্যাখান করার কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। এটাই ছিফ্‌ফিন যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হতে থাকে।[২১] এক পর্যায়ে যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে আলী [রা] ও মুয়াবিয়া [রা]-এর মাঝে আপোস-মীমাংসার পর একটি সালিসী কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু আলী [রা]-এর অনুসারীদের একদল লোক তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে মানুষের বিচার মানতে অস্বীকার করে। ইতিহাসে এ দল 'খারেজী' নামে পরিচিত।[২২]তারা আওয়াজ তোলে

---

১৯. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, আস্ সুন্নাহ পাবলিকেসন্স, ঝিনাইদহ, আগস্ট, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১১।

২০. Encyclopaedia Britannica, Articles : Terroresm, Zealet and Ideology.

২১. ইসলামের ইতিহাস, কে আলী, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, পঞ্চদশ সংস্করণ, অষ্টম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৫৬।

২২. 'খারেজী' অর্থ দল ত্যাগী। এরা হারুরীয় নামে অভিহিত হয়ে থাকে, কারণ এরা হারুরা গ্রামেই প্রথমে মিলিত হয়ে হযরত আলীর [রা] বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে এবং তাঁর দল ত্যাগ করে। খারেজী ইসলামের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়, তারা কেবল আবু বকর [রা] ও উমার [রা]কে আইন সম্মত খলীফা মনে করত এবং অপর সকলকে বলপূর্বক খিলাফত দখলকারী বলে অভিহিত করত। তারা রাজনীতিতে গণতন্ত্রী এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে গোঁড়া ছিল। [ইসলামের ইতিহাস, কে আলী, পৃষ্ঠা-১৭২]

www.bjilibrary.com

[إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ] আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন নেই।[২৩] তারা আরো দাবী করে যে, একমাত্র আল্লাহর আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু চলবে না। তারা বলে, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ —

"মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালজ্ঘন করলে তোমরা অত্যাচারী দলের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন।[২৪] তারা উল্লেখ করে, আল্লাহ্ এখানে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালজ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারা বলে মুয়াবিয়ার [রা] দল সীমালজ্ঘনকারী, কাজেই এদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ। অতঃপর তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল। বসরা ও কুফা হতে এসে সারা দেশে গোলযোগ শুরু করল। প্রথমে তারা মাদায়েন শহর অবরোধের চেষ্টা করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হয় আলী [রা]-এর সাথে যুদ্ধ করতে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০০। আলী [রা] তাদেরকে বুঝালেন অস্ত্র সংবরণ করতে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় ১৮০০ খারেজি কিছুতেই আলীর [রা] বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করতে রাজী হলো না। ৬৫৯ খৃস্টাব্দে তারা আলী [রা] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। যাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ বলা হয়। কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। নাহরাওয়ান যুদ্ধের পর খারেজীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। আলী [রা]-এর বিরুদ্ধে তারা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই খারেজীরা পরবর্তিতে আলী [রা], মুয়াবিয়া [রা] ও আমর ইবনুল আস [রা] কে একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মসজিদে হত্যার পরিকল্পনা করে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমর ইবনুল আস [রা] সেদিন মসজিদে আসেননি, তাই তাঁর জীবন রক্ষা পেল। মুয়াবিয়া [রা] বেঁচে যান, তবে তিনি সামান্য আঘাত পান। অন্যদিকে আলী [রা] মসজিদে নামায পড়তে যাওয়ার সময় আততায়ী আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম

---

২৩. সূরা ইউসুফ : ৪০ ও ৬৭।
২৪. সূরা আল্ হুজুরাত : ৯।

www.bjilibrary.com

খারেজীর তরবারির আঘাতে ১৭ই রমাদান ৪০ হিজরী তারিখে শাহাদাত বরণ করেন।[২৫] এথেকেই মুসলিদের মধ্যে জঙ্গিবাদ, ইসলামের নামে গুপ্ত হত্যা শুরু হয়। এই খারেজীদের সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো, এদের প্রায় সকলেই ছিলো যুবক, অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করতো। সারাদিন যিকর ও কুরআন পাঠে রত থাকতো। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই শুনা যেত। কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। এজন্য তাদেরকে কুররা বা কুরআন পাঠকারী দল বলে অভিহিত করা হতো। পাশাপাশি এরা অত্যন্ত হিংস্র ও সন্ত্রাসী ছিল। অনেক নিরপরাধ মুসলিম তাদের হাতে প্রাণ হারায়।[২৬] এরা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তি দেরকে গুপ্ত হত্যা করা বৈধ। শুধু তাই নয় যারা আলী [রা] কে কাফির মনে করতো না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা, পুরুষ, নারী ও শিশুদেরও এরা হত্যা করত।[২৭] ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায় যারা খারেজী ফিরকার মত ভিন্নমতালম্বীদের গুপ্ত হত্যা করত, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত, নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম মনে করত, এদেরকে 'বাতেনী হাশাশীন'[২৮] নামে অভিহিত করা হত।

এভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অসংখ্য ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য হল ১৭৪৯ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের সময় ক্ষমতা দখলকারী কিছু বিপ্লবীর তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হিংসাত্মক আচরণ। ১৮৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময় এবং উনিশ শতকে কুক্ল্যাকস ক্ল্যান নামক শ্বেতাঙ্গ গ্রুপ কৃষ্ণাঙ্গ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়।[২৯]

---

২৫. ইসলামের ইতিহাস, কে আলী, পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩।

২৬. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮।

২৮. এরা হলো ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম মুনতাসির বিল্লাহ [৪৮৭]-এর জেষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলিফা হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানীর অনুসারী। এরা প্রচার করে যে, মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে আলকুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। আলকুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে ইমামের মতামতের উপরই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুকায়িত আছেন। তার প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে হতে একদল আত্মঘাতী ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহননসহ যে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত থাকত। ইমাম যাকেই শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। হাসানের মৃত্যুর পরও এরা তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে, তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে [১২৫৬ খৃ.] হালাকু খাঁর বাহিনী এদেরকে নির্মূল করে। [ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা- ২৮]।

২৯. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস : কারণ ও প্রতিকার, বি. এম মফিজুর রহমান আল আযহারী, ইউনিক

www.bjilibrary.com

তবে সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে যাইয়নবাদী ইয়াহুদীরা ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ফিলিস্তিন থেকে ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে দেয়া। তাদের মুকাবিলায় ফিলিস্তিনিরাও নিজেদের ভূখন্ড রক্ষার লড়াই শুরু করে।

কিন্তু বিশ্বে বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থান হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে দেয়ার পর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য সৌদী নাগরিক ওসামা বিন লাদেন ও তাঁর সংগঠন আল কায়েদাকে দায়ী করে। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। অথচ একটি মিথ্যা অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা চালায়। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে আফগানিস্তানের হাজার হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে দেশটির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। অনুরূপভাবে ইরাকের কাছে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য হামলা চালায় ইরাকের উপর। সেখানেও তারা অজস্র টন বোমা নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছে। আর তারা এটাকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমরা এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত হতে পারছি না। কারণ নিজ জন্ম ভূমিকে বিদেশী দখল মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করা, অস্ত্র দিয়ে লড়াই করা কিছুতেই জঙ্গিবাদ হতে পারে না। এটা জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। নিজ জন্মভূমি বা স্বদেশ রক্ষার সংগ্রাম কোনক্রমেই জঙ্গিবাদ কিংবা সন্ত্রাসবাদের আওতায় পড়ে না। এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্মপ্রীতি এদেশের ঐতিহ্য। আমাদের সমাজ কাঠামোর ভেতর কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এদেশে কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না। কিন্তু একটি কুচক্রিমহল বাংলাদেশের এ ঐতিহ্যকে মোটেই সহ্য করতে পারছে না। তাই তারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারা বিনষ্ট করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাস কবলিত মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। এজন্য তারা ইসলামের নামধারী কয়েকটি সংগঠন বিশেষ করে "জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ' বা জেএমবিকে ব্যবহার করে গত ১৭ আগস্ট ২০০৫ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক নজিরবিহীন সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দেয়। বিভিন্ন

লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৪।

www.bjilibrary.com

ক্ষেত্রে তারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে অনেক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। শুধু তাই নয় এ সকল জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইসলামের নাম ব্যবহার করে তারা ইসলামের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। মূলতঃ তখন থেকেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়। যদিও এসকল বোমা হামলা ও বোমা বিস্ফোরণ ইসলামের নাম ব্যবহার করে কিছু বিপথগামী মুসলিম ঘটিয়েছে, কিন্তু এসবের পেছনে কয়েকটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে। প্রখ্যাত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি "ফরহাদ মজহার" দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার এক কলামে উল্লেখ করেন যে, "ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং আরেকটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশের সীমান্ত বর্তী এলাকাগুলোতে বেশ কিছু তথাকথিত ইসলামী জঙ্গি সংগঠন গড়ে তুলেছে।[৩০] যাইয়নবাদী হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদী হোক, মুসলিমদের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা কেন তাদের হাতের ক্রীড়নক হব? তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হব?

জঙ্গিবাদ বিড়ম্বনা ও জঙ্গিফোবিয়া

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি যন্ত্রনাদায়ক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসের ন্যায় জঙ্গিবাদের সর্বসম্মত সংজ্ঞা এখনো নিরূপিত হয়নি। যত তাড়াতাড়ি এই শব্দদ্বয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাবে বিশ্বের জন্য ততই মঙ্গল হবে। কোনটি জঙ্গিবাদ আর কোন্‌টি জঙ্গিবাদ নয় এনিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা যায় কেউ অস্ত্রধারণ করে নিজেকে রক্ষার জন্য, স্বাধিকার আদায়ের জন্য, কারো কাছে এটি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ, আবার কারো কাছে এটি দাবী আদায়ের পন্থা কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রাম। বর্তমানে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিশেষ করে পশ্চিমারা ইসলামকে জঙ্গিবাদের সমার্থক হিসেবে প্রচার করে চলেছে।[৩১] অনুরূপভাবে দেশীয় মুসলিম বিদ্বেষী গোষ্ঠী পশ্চিমাদের ন্যায় জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা নিজেদের ব্যর্থতা আর বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ হাসিলের গভীর চক্রান্ত আড়াল করতে জাতিকে জঙ্গিবাদের জুজুর ভয় দেখাচ্ছে। তারা দেশের ভেতরে গৃহযুদ্ধের পাঁয়তারা করছে। জঙ্গি জঙ্গি করে মানুষের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। বিদেশীরা এ জঙ্গিবাদের জিগির তুলে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চায়। তারা এদেশকে আফগানিস্তান বা ইরাক কিংবা পাকিস্তানের মত অস্থির দেশে পরিণত করতে চায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের দেশের মিডিয়াগুলো পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর অন্ধানুকরণে ইসলাম ও

---

৩০. জঙ্গিবাদ, বোমা হামলা ও ইসলাম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, প্রকাশনা বিভাবগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৬।

৩১. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১১.৪.০৯, পৃষ্ঠা-১৬।

www.bjilibrary.com

জঙ্গিবাদকে একাকার করে ফেলেছে। মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গি উৎপাদনের কেন্দ্র বলা হচ্ছে। অথচ সন্ত্রাস বোমাবাজি ও খুনখারাবির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকলেও তাকে জঙ্গিবাদ বলা হচ্ছে না। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নেতাদের হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকারীরা কি মাদ্রাসার ছাত্র? এরা কি মাদ্রাসায় পড়ে? হত্যা, খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অভিযোগে কতজন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক বা মসজিদের ইমাম-মুয়ায্যিন গ্রেফতার হয়েছেন? যদি মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানায় অস্ত্র পাওয়া গেলে জঙ্গিপনা হয় তাহলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের মত সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্র-সস্ত্র পাওয়া গেলে তা জঙ্গিপনা হবে না কেন? এসব বিষয়ে জাতি আজ বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এগুলোর সমাধান হওয়া উচিত।

জঙ্গিবাদ বনাম জিহাদ

মুসলিম জঙ্গিবাদী বিপথগামীরা সাধারণত তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামের পবিত্র পরিভাষা জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তারা জিহাদের নামেই তাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিতালের প্রসঙ্গ তুলে ধরছে। অথচ এই জিহাদ ও কিতাল বৈধ কোন কর্তৃপক্ষ ছাড়া অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সরকার ছাড়া কেউ ঘোষণা দিতে পারে না। এ বিষয় আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জিহাদ ও কিতালের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

জিহাদের মূল শব্দ হলো [جُهْــدٌ] জুহদুন। যার শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা চালানো।[৩২] পারিভাষিক অর্থ হলো চূড়ান্ত বা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।[৩৩]আর ইসলামিক পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্হে জিহাদ বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়।[৩৪] জিহাদ একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। আলকুরআন ও আল হাদীসে জিহাদকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ তুলে ধরা হলো। যেমন আলকুরআনে বলা হয়েছে–

[وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِه]

"তোমরা আল্লাহর জন্যে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।"[৩৫]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস [রা] বলেন : এখানে "হাক্কা জিহাদিহি" অর্থ হল– জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় কর এবং তিরস্কারীর তিরস্কারে কর্ণপাত কর না। দাহ্কাক ও মুকাতিল [রহ]

---

৩২. আর্ রায়েদ, জুবরান মাসউদ, দারুল ইলমে লিল্মালায়ীন, বৈরুত, লেবানন, ৩য় প্রকাশ-১৯৭৮, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩১।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১, পৃষ্ঠা-৫৩১।

৩৪. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ-৩৪।

৩৫. সূরা আল হজ : ৭৮, [অনুবাদ : মায়ারেফুল কুরআন, মুফতী শফী আহমাদ]

www.bjilibrary.com

বলেন : আল্লাহর জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত। এবং আল্লাহর ইবাদাত কর যেমন করা উচিত। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলেন : এখানে জিহাদ নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে কাজ করাকে বুঝানো হয়েছে।[৩৬]

আরেক জায়গায় কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ —

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন।'[৩৭]

কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্য ধারণের অর্থে জিহাদ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ —

'যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।'[৩৮]

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ —

"আর যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"[৩৯]

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا —

"অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন।[৪০]

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে মুসলিমদেরকে যুল্ম নির্যাতনের সময় ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে–

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ —

---

৩৬. সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ, ও এর প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোন, ড. মোঃ ময়নুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা; জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৩।

৩৭. সূরা আত্ তাওবা : ৭৩, সূরা আত্ তাহরীম : ৯, সূরা আল্ ফুরকান : ৫৩।

৩৮. সূরা আল্ আনকাবুত : ৬।

৩৯. সূরা আল্ আন্কাবুত : ৬৯।

৪০. সূরা আল্ ফুরকান : ৫২।

www.bjilibrary.com

"একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাস করলেন : সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন : অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা।"[৪১]

হজকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে–

لَكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ —

'পুণ্যময় হজ্জ হলো সর্বোত্তম জিহাদ।'[৪২]

জিহাদের আরেকটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে قتال [কিতাল]। কিতাল অর্থ পরস্পর যুদ্ধ করা, লড়াই করা।[৪৩] আলকুরআন ও আল হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় কিতালের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ —

"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৪৪] অন্য জায়গায় আল্লাহ্ বলেছেন :

وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً —

"আর তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে।"[৪৫]

উপরোক্ত আলোচনায় জিহাদ শব্দটি যে ব্যাপক অর্থবোধক তা আমাদের সামনে স্পষ্ট। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে এটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ জিহাদের কাজ শুরু হয় মানুষের ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তারপর নিজের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর মাধ্যমে। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক অব্যাহত প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া। সর্বশেষ প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর সেটি হবে সামনা সামনি যুদ্ধ যা কিতাল এবং তা হবে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের আদেশে এবং তাঁর নেতৃত্বে। সেজন্য ইসলাম জিহাদ ও কিতালের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত আরোপ করেছে। যার অন্যতম শর্ত

৪১. রিয়াদুস সালিহীন, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ আল্ নাবাবী, হাদীস নং- ১৯৫।
৪২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৭৩।
৪৩. আর রায়েদ, জুবরান মাসউদ, পৃষ্ঠা নং- ১১৩৫।
৪৪. সূরা আল বাকারাহ : ১৯০।
৪৫. সূরা আত্ তাওবাহ : ৩৬।

www.bjilibrary.com

হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। রাষ্ট্রের প্রধান বা নেতাই জিহাদের বা কিতালের ঘোষণা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه —

"রাষ্ট্রপ্রধান হলো ঢাল, তাঁর পেছনে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে।"[৪৬]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে :

اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيْرٍ كَانَ بِرًّا أَوْفَاجِرًا —

"রাষ্ট্র প্রধান ধার্মিক হোক অথবা অধার্মিক হোক উভয় ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্যে জিহাদ করা তোমাদের উপর কর্তব্য।"[৪৭] যদি কোন দল বা গোষ্ঠীকে অথবা কোন দল বা আমীরকে জিহাদ বা কিতালের ঘোষণা দেয়ার অধিকার দেয়া হয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, মারামারি ও গোলযোগ শুরু হয়ে যাবে। এভাবে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে যার পরিণতিতে দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আলী [রা] ও মুয়াবিয়া [রা]-এর মাঝে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। বৈধ চতুর্থ খলিফা আলী [রা]-এর আনুগত্য না করার কারণেই আলী [রা] মুয়াবিয়া [রা]-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তদরূপ উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর [রা]-এর যুদ্ধও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ছিল। আত্মঘাতী হত্যার মাধ্যমে মানুষদেরকে হত্যা করা, নিরীহ জনগণকে হত্যা করা, কিংবা গুপ্ত হত্যা করা, পেছন থেকে হত্যা করা, বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করা, জান-মাল ধ্বংস করা কিছুতেই জিহাদ হতে পারে না। বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে 'জিহাদ' নামে এরূপ অপকর্ম কখনোই দেখা যায়নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোন নিষ্ঠাবান মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, আত্মহত্যার মাধ্যমে মানুষ হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে, কোন জনপদে বোমাবাজি ও অরাজকতা করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদির কোন নজির দেখা যায় না। সুতরাং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডকে জিহাদের নামে চালিয়ে দেয়া মোটেও বৈধ নয়। আলকুরআনে জিহাদ ও তৎসম্পর্কিত শব্দ ৩৬বার এসেছে এবং প্রতিবারই ন্যায়নীতির সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে জঙ্গিবাদ হলো অন্যায়ভাবে মানুষদেরকে আক্রমণ করা, তাদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং নিরীহ লোকজনকে হত্যা করা ইত্যাদি।

---

৪৬. সহীহ আল্ বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ১০৮০।

৪৭. আস্ সুনান, আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৮।

www.bjilibrary.com

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ

বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদের যে উত্থান ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, তার সাথে শুধু গুটি কতেক মুসলিম জড়িত। বিশ্বের সকল বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ এবং মূলধারার সকল ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এধরনের ব্যক্তিরা বিভ্রান্ত, বিপথগামী। এরা ইসলামের শত্রুদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। ইসলামের শত্রুরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ওরা এদেরকে ইসলামের ভাব-মর্যাদা ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। এসকল ব্যক্তি কোনভাবেই ইসলামের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা। তারা ইসলামকে বিশ্ববাসীর সামনে বিকৃত ও কুৎসিতভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়।[৪৮]

জঙ্গিবাদীরা সাধারণত সে সকল জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাসিল করতে চায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে– ক. বোমাবাজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা। খ. মানুষ হত্যা ও গ. আত্মঘাতী হামলা।

বোমাবাজি ও অরাজকতা সৃষ্টি করা

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে থাকে, তার মধ্যে একটি হল বোমাবাজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা, সমাজে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ করা, দাংগা-হাংগামা করা। পবিত্র কুরআনে এগুলোকে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদয় দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ মহান আল্লাহর কাছে অতীব ঘৃণিত একটি মহাপাপ, কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সমস্ত কাজকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলোর জন্যে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا —

'পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না।'[৪৯]

وَلاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ —

'তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাংগা হাংগামা করে বেড়িও না।'[৫০]

فَاذْكُرُوْا آلاَءَ اللهِ وَلاَتَعْثَوْا فِىْ الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ —

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।'[৫১]

---

৪৮. জঙ্গিবাদ, বোমা হামলা ও ইসলাম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, পৃষ্ঠা-১৭।
৪৯. সূরা আল্ আ'রাফ : ৫৬ : ৮৫।
৫০. সূরা আল্ বাকারাহ্ : ৬০, সূরা হূদ : ৮৫, সূরা আশ্ শুআরা : ১৮৩, সূরা আল 'আনকাবুত : ৩৬।

www.bjilibrary.com

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

'তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।'[৫২]

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ —

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারী, দুষ্কর্মীদের কর্ম সার্থক করেন না।'[৫৩]

মহান আল্লাহ ফিত্না সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهٖ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ —

'আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।[৫৪]

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ —

'আর ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।'[৫৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে ফিতনা-ফাসাদ তথা অরাজকতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা, বোমাবাজি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা জঙ্গিবাদকে হত্যার চেয়েও কঠিন ও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের অপরাধ হত্যার সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "নর হত্যা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য কাজ কিন্তু কোনো মানবগোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজের স্বৈরতান্ত্রিক ও যুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সত্য গ্রহণ থেকে লোকদেরকে জোরপূর্বক বিরত রাখে এবং যুক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে জীবন গঠন ও সংশোধনের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টার মুকাবিলা করতে শুরু করে তখন সে নরহত্যার চাইতেও জঘন্যতম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়।[৫৬]

---

৫১. সূরা আল্-আ'রাফ : ৭৪।
৫২. সূরা আল্ কাসাস : ৭৭।
৫৩. সূরা ইউনুস : ৮১।
৫৪. সূরা আল বাকারাহ : ২১৭।
৫৫. সূরা আল বাকারাহ : ১৯১।
৫৬. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭,

১৫—

www.bjilibrary.com

এছাড়া পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা আল্লাহ ঘোষণা করেন :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا فِى الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ —

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[৫৭]

মানব হত্যা

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আরেকটি জঘন্য অপরাধ করে থাকে তা হলো মানব হত্যা। এটা বিভিন্নভাবে করে থাকে, গুপ্তভাবে, পেছন থেকে, বোমা মেরে কিংবা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দিয়ে। অথচ মানব জীবন মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৫৮]

সেজন্য মহান আল্লাহ একজন মানবের জীবন সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন। মানব জীবনের নিরাপত্তার প্রতি ইসলাম যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোন ধর্মে বা মতাদর্শে এর নযির নেই। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا —

'এ কারণে আমি বনী ইসরাইলকে এরূপ লিখে দিয়ে ছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিনা

১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৯।
৫৭. সূরা আল্ মায়িদাহ : ৩৩।
৫৮. সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০।

www.bjilibrary.com

অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো আর যে ব্যক্তি কোন একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করলো।'[৫৯]

যে ব্যক্তি সংগত কারণ ছাড়া একজন মানুষকে হত্যা করে সে কেবল একজন মানুষকেই হত্যা করে না, বরং সে সমগ্র মানবতাকে হত্যা করে, অর্থাৎ সে একজন মানুষকে হত্যা করে এ কথাই প্রমাণ করলো যে তার মন-মানসিকতায়, চিন্তা-চেতনায় অন্য মানুষের প্রতি সামান্যতম সম্মান, মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির চিহ্ন নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ সংগত কারণ ছাড়া মানব হত্যা যেভাবেই হোক না কেন নিষিদ্ধ করেছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ —

'আল্লাহ্ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া হত্যা করো না।'[৬০]

ন্যায়সংগত কারণ তিনটি যা ইমাম আল বুখারী [র] ও ইমাম মুসলিম [র] আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের [রা] রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'যে মুসলিম আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়।

১.] বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি।

২. সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে।

৩. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।'[৬১] [আলোচ্য হাদীসে এবং তৎসম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে কিসাস নেয়ার অধিকার নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে দেয়া হয়েছে। যদি তার রক্ত সম্পর্কিত কোন অভিভাবক না থাকে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ সরকারও একদিক দিয়ে সকল মুসলিমের অভিভাবক।]

---

৫৯. সূরা আল্ মায়িদা : ৩২।
৬০. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩, সূরা আল্-আনয়াম : ১৫১।
৬১. তাফসীর মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শাফী [র], [বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর] পৃষ্ঠা-৭৭৬।

www.bjilibrary.com

কেউ কেউ ন্যায় সংগত হত্যার কারণ উপরোক্ত তিনটির সাথে আরো তিনটি বর্ণনা করেন : তাহলো-

[৪] জিহাদের ময়দানে সত্যদ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা।

[৫] ডাকাতি অথবা রাজপথে রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা।

[৬] কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে জঙ্গিপন্থা অবলম্বন, সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি, জনজীবনে আতঙ্ক-অশান্তি সৃষ্টি করে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটানোর চেষ্টা করে তাকে হত্যা করা।[৬২]

তবে উপরোক্ত ছয়টি কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে মানুষকে হত্যা করা যায় না। কিন্তু এ সকল অবস্থায় মৃত্যু দণ্ড কার্যকর করার অধিকার শুধু রাষ্ট্রীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ আদালত রায় দেবে আর সরকার কর্তৃক নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারীরা তা বাস্তবায়ন করবে। জনগণকে কোন অবস্থাতেই আইন নিজ হাতে তুলে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। মহান আল্লাহ্ ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া মানব হত্যা নিষিদ্ধ সম্পর্কে আরো ঘোষণা করেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا ـــ

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।'[৬৩]

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ـــ يُضٰعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْه مُهَانًا

'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদাত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করবে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামাতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।'[৬৪]

নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, যা সুস্পষ্টভাবে ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া মানব হত্যাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের

---

৬২. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস : কারণ ও প্রতিকার, বি.এম. মফিজুর রহমান আল আযহারী, পৃষ্ঠা-৬৫।
৬৩. সূরা আন্ নিসা : ৯৩।
৬৪. সূরা আল্ ফুরকান : ৬৮-৬৯।

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন :

إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِى بَلَدِكُمْ هذَا، فِى شَهْرِكُمْ هذَا، ألاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ —

'হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর তোমাদের হস্তক্ষেপ হারাম করা হলো, তোমাদের আজকের এই দিন, এই [যিলহজ্জ] মাস এবং এই [মক্কা] নগরী যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পর তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না'[৬৫]

إجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ : الشِّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْـرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَاكْلُ الرِّبَا، والتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الموْمِنَاتِ —

'তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাক। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়াতের বিধিবর্হিভূত কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং সরলমতি সতী মু'মিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।'[৬৬]

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ، لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا —

'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি : আল্লাহর নিকট [বিনা অপরাধে] কোন মু'মিনের হত্যাকাণ্ড সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা।'[৬৭]

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ —

'কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর পতন আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার।'[৬৮]

لَنْ يَزَالَ الْمُوْمِنُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِه، مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا —

---

৬৫. সহীহ মুসলিম, كتاب الحج، باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم ৪/৪৩২ হাদীস নং : ১৪৪/১২১৮।

৬৬. সহীহ মুসলিম, كتاب الايمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ৩৬০, হাদীস নং : ১৪৬/৯০।

৬৭. সুনান আন নাসাঈ, كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم ৭/৮৮, হাদীস নং : ৩৯৯২।

৬৮. সুনান আত্ তিরমিযী كتاب الديات، باب ماجاء فى تشديد قتل المؤمن ৪/৫৪৬, হাদীস নং : ১৩৯৫।

www.bjilibrary.com

'মুমিন যে পর্যন্ত অবৈধভাবে কাউকে হত্যা না করে, সে পর্যন্ত সে ইসলামের উদারতার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।'[৬৯]

আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসমূহ ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যাকে কোনভাবেই সমর্থন করে না, বরং সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে, অধিকন্তু ন্যায় সংগত হত্যার বিধান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে, কোন দল বা গোষ্ঠীকে এই অধিকার দেয়া হয়নি। যারা এ ধরনের কাজ করবে তাদের পরিণাম হবে জাহান্নাম।

আত্মঘাতী হামলা বা সুইসাইড স্কোয়াড

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অপর যে জঘন্য কর্মটি করে থাকে সেটা হলো আত্মঘাতী হামলা। আর এটি করে সাধারণতঃ সুই সাইড স্কোয়াড বা আত্মঘাতী দল গঠনের মাধ্যমে। কিছু সহজ-সরল সাদাসিধে মুসলিমকে জান্নাত পাবার লোভ, কিংবা অন্যান্য পুরস্কারের কথা বলে এ কাজে নিয়োজিত করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ যে ভাবে অপরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেভাবে নিজের জীবনকেও ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। আত্মহত্যা করতে বারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করা হলো। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ـــ

'তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।'[৭০]

وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـــ

'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু।'[৭১]

وَالَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَه يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِىْ يَطْعَنُ نَفْسَه يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ ـــ

'যে ব্যক্তি নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করবে [আত্মহত্যা করবে] সে জাহান্নামে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করবে। আর যে নিজেকে আঘাত করবে [আত্মহত্যা করবে], সে জাহান্নামেও নিজেকে আঘাত করবে।'[৭২]

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَه، فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَه، فَسُمُّه فِىْ يَدِه يَتَحَسَّاه فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا

---

৬৯. সহীহ আল বুখারী, كتاب الديات، باب قول الله ومن يقتل مؤمنا ১২/১৯৪, হাদীস নং- ৬৮৬২।
৭০. সূরা বাকারাহ : ১৯৫।
৭১. সূরা আন নিসা : ২৯।
৭২. সহীহ আল বুখারী, كتاب الجنائز، باب ماجاء فى قتل النفس ৩/২৬৮, হাদীস নং- ১৩৩৬।

www.bjilibrary.com

أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُه فِىْ يَدِه يَجَاءُ بِهَا فِىْ بَطْنِه فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا —

'যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে বসেও সে অনবরত উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে বসেও সে অনন্তকাল ধরে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বসে অনন্তকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজেকে কোপাতে থাকবে।[৭৩]

كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِه جُرْحٌ، فَجَزِعَ،فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّبِه يَدَه، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِه، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ —

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আহত হয়ে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই সে এক খানা ছুরি দ্বারা নিজের দেহে আঘাত করলো। ফলে রক্তপাত হয়ে সে মারা গেল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমার বান্দা আমাকে ডিংগিয়ে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।[৭৪]

مَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِشَيْئٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِه، وَ مَنْ قَذَفَ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِه —

'যে ব্যক্তি কোন জিনিস দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামাতের দিনও তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল, আর কোন মু'মিনকে কাফির বলা তাকে হত্যা করার শামিল।'[৭৫]

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীসের আলোকে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন অবস্থায় আত্মহত্যা করা যাবে না। আত্মঘাতী হামলা করে মানুষ হত্যা তো দূরের কথা, উপরোক্ত আলোচনায় আরো স্পষ্ট হয়, যারা এই অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

জঙ্গিবাদ দমনে করণীয়

আমরা মনে করি জঙ্গিবাদ কোন বড় ধরনের সমস্যা নয়। গুটি কতেক ব্যক্তি এর সাথে জড়িত। এরা অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত। যদি সদিচ্ছার সাথে কিছু সুষ্ঠু পরিকল্পনা

---

৭৩. সহীহ্ আল বুখারী, كتاب الطب، باب شرب السم ১/৩৯৫, হাদীস নং- ১৭৫/১০৯।
৭৪. সহীহ্ আল্ বুখারী, كتاب أحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بنى إسرائيل ৬/৫৭২, হাদীস নং- ৩৪৬৩।
৭৫. সহী আল্ বুখারী, كتاب الأدب، باب ماينهى عن السباب واللعن ১০/৪৭৯, হাদীস নং : ৬০৪৭।

www.bjilibrary.com

নেয়া যায় তাহলে এ সমস্যাটি সহজে দূর করা যাবে বলে বিশ্বাস করি, নিম্নে এ লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হলো।

১. যে সকল মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদ সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের শাসকদের বুঝতে হবে এটা ইসলাম বিদ্বেষী-পশ্চিমা শক্তি, ইয়াহুদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসরদের ষড়যন্ত্র, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও মুসলিমদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য তারা এ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অতএব, তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়া যাবে না।

২. পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, এই জঙ্গিবাদের সাথে গুটি কয়েক বিভ্রান্ত মুসলিম জড়িত। এদেরকে হিদায়াতের জন্য আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে যে, জঙ্গিবাদ কোনক্রমেই ইসলামের পথ নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে জাহান্নামের পথ।

৩. যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে সত্যিকার ইসলাম পন্থিরা জড়িত নয়, তাই জঙ্গিবাদ দমনের জন্য মূলধারার ইসলামী শক্তি, ইসলামী দলগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে, এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

৪. দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের ইমাম খতিবদের সহযোগিতা নিতে হবে, তারা যেন জুমার খুতবায় ও অন্যান্য সময়ে মসজিদগুলোতে জঙ্গিবাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদেরকে অবহিত করতে পারেন।

৫. মূলধারার ইসলামী শক্তি ও দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শ, মাদ্রাসা-মক্তবকে ঢালাওভাবে জঙ্গি আখড়া, জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র, তালেবান দুর্গ, মৌলবাদী অভয়ারণ্য বলার মত উসকানিমূলক বক্তব্য বন্ধ করতে হবে।

৬. জনগণকে সাথে নিয়ে এই জঙ্গিবাদ দমন করতে হবে। তাই জনগনের বিশ্বাস, ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের লালিত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সম্মান করতে হবে। এ সবের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনক্রমে ইয়াহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সে লক্ষ্যে এদের পরিবর্তে মুসলিম বিশ্ব ও সত্যিকার ইসলামপন্থিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৮. ব্যক্তিগতভাবে আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখরা জঙ্গীবাদ দমনে এগিয়ে আসতে পারেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা, ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে সতর্ক করতে পারেন।

৯. তদরূপ বিভিন্ন ইসলামী ও অ-ইসলামী দল সংস্থা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক

www.bjilibrary.com

উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে এর ভয়াবহতা ও অনিষ্টকর দিকগুলো সম্পর্কে জন-সাধারণকে অভিহিত করতে পারেন।

উপসংহার

আমরা সকলে জানি, ইসলাম অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ও মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবকুলের শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও উন্নতির জন্য মনোনিত করেছেন ইসলাম ধর্মকে, অতএব একজন মুসলিম অপর মুসলিমের অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে না। তাইতো একজন আরেক জনের সাথে দেখা হতেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সম্বোধন করে। যার অর্থ "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" তাহলে কিভাবে সে অন্যকে অশান্তিতে ফেলে দেবে? অন্যের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে? সুতরাং ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বের এমনকি বাংলাদেশেরও কোন প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ইসলামী দল বা প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই। শান্তি পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলেও তা করা উচিত। জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা দিয়ে একে তো দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, আর করা গেলেও তার কোন শুভ ফল আশা করা যায় না। এ কথা সর্বমহলে স্বীকৃত যে, ইসলাম তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তরবারি, জঙ্গিবাদ কিংবা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়। তবে নতুন গজিয়ে ওঠা কিছু গ্রুপ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। তারা জিহাদের নামে ইসলামের নামে বিভিন্ন অরাজকতামূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করছে। অথচ এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, যা আমরা ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝতে পেরেছি। ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ হারাম। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী তৎপরতা ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এগুলো করছে তারা বিভ্রান্ত, ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়নক। এদের চিহ্নিত করে প্রতিহত করা প্রয়োজন। ■

লেখক-পরিচিতি : ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ- বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ৩০শে জুলাই, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

পর্দা-অবরোধ-প্রগতি

খোন্দকার রোকনুজ্জামান

■

ভূমিকা

পর্দা-প্রথা হল বিশ্ব জুড়ে বহুল আলোচিত এবং সমালোচিত এক বিষয়। ইসলামী আদর্শে যারা আস্থাশীল, তাদের মতে পর্দা হল সুশৃংখল এবং দায়িত্বশীল যৌনজীবনের নিশ্চয়তা, অবাধ যৌনতাজনিত অসংখ্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিষেধক এবং নারীর মান-সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ। যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, তারা মনে করেন এটি অবরোধের নামান্তর, প্রগতির পথে এক অনতিক্রম্য বাধা, নারীকে অবদমিত করে রাখবার প্রয়াস। সভ্যতার ইতিহাস আমাদেরকে বলে, কোন সভ্যতার ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি নির্ভর করে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের উপরে। বিশ্বসভ্যতার অতীত এবং বর্তমান যদি মুক্তমনে পর্যালোচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই, নর-নারীর অবাধ মেলামেশা একটি সভ্যতাকে উন্নত আদর্শ ও জীবনাচার থেকে বিচ্যুত করে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এটা থেকে শুরু হয় অবাধ যৌনতা যা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, ভ্রূণহত্যা, অবৈধ সন্তান, ধর্ষণসহ নানা প্রকার যৌন-বিকৃতি, নানা প্রকার যৌনরোগ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং তজ্জনিত অসংখ্য সামাজিক ও মানসিক সমস্যার জন্ম দেয়। এ-সব সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের উদ্যোগ গ্রহণও অসম্ভব হয়ে পড়ে; কারণ এ-ধরণের সমাজে মানুষ প্রবৃত্তির দাসানুদাসে পরিণত হয়। বিশ্ব-সভ্যতার অতীত ও বর্তমান সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ-ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে ইসলাম-নির্দেশিত পর্দা-ব্যবস্থা। এটার লক্ষ্য না নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখা, না তাকে পশ্চাদ্পদ বা পরনির্ভরশীল করা। অন্তরে শালীনতা ও লজ্জাশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানসিক পবিত্রতা অর্জনে সাহায্য করা এবং নর-নারীর যৌন-জীবনকে শৃংখলাপূর্ণ ও কলুষমুক্ত রাখাই এর লক্ষ্য।

www.bjilibrary.com

পর্দা কি অবরোধ? এই প্রশ্নের উত্তর পর্দা সম্পর্কিত কুরআনিক নির্দেশনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন:

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুসলিম নারীদেরকে বল, তারা যেন [ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময়] নিজেদের উপর চাদরের আঁচল টেনে দেয় যেন তাদেরকে [পবিত্রা নারী হিসাবে] চিনতে পারা যায় এবং উত্যক্ত না করা হয়।" [সূরা আল আহযাব, আয়াত-৫৯]

এই আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নারীদেরকে বাড়ির বাইরে যাবার সময়ে করণীয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ বাইরে যাওয়া নারীর জন্য নিষিদ্ধ নয়। অবরোধ কথাটির অর্থ যদি আটক, পরিবেষ্টন, কারাগার বা অন্তঃপুর হয় [বাংলা একাডেমীর অভিধানে এই অর্থই প্রদত্ত হয়েছে], তাহলে নারীকে এ অবস্থায় রাখার সপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্‌র সমর্থন নেই। বরং বাস্তবতা হল এর বিপরীত। আত্মিক উন্নতি, পারিবারিক প্রয়োজন, সামাজিক কল্যাণ এবং জাতীয় নিরাপত্তায় নারীর ভূমিকাকে ইসলাম অগ্রাহ্য করে না। প্রয়োজনে বাসস্থানের বলয় পেরিয়ে আসার সুযোগ তার রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্য় এর বিস্তর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

ক. মসজিদ ও ঈদগাহে গমণ: মহানবী [সা] নারীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেননি। বরং কোন নারী সেখানে যেতে চাইলে তাকে বাধা দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন: 'তোমাদের কারো স্ত্রী যদি [সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার] অনুমতি চায়, তাহলে স্বামী যেন তাকে বাধা না দেয়। [সূত্র: বুখারী শরীফ। আযান অধ্যায়] মুসলিম শরীফের সালাত অধ্যায়ে সালিমের পিতা থেকে একই ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

নারীদের ঈদের নামাজে যোগ দেবার ব্যাপারে ইসলাম নিষেধাজ্ঞা তো আরোপ করেইনি, বরং উৎসাহিত করেছে। এমনকি ঋতুবতী নারী, যাদের জন্য নামাজ নয়, তারাও ঈদগাহে যেতেন। হযরত উম্মে আতিয়াহ্ [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমনকি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দরমহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুবতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পেছনে থাকতো এবং তাদের তাকবিরের সাথে তাকবির বলতো এবং তাদের দুআর সাথে দুআ করতো— তারা আশা করতো সেদিনের বরকত এবং পবিত্রতা।' [সূত্র: বুখারী শরীফ। দু'ঈদ অধ্যায়। মুসলিম শরীফ। দুই ঈদের সালাত অধ্যায়] একই ধরণের বর্ণনা নবীপত্নী হাফসা [রা]-এর সূত্রেও উল্লেখিত হয়েছে।

এখন অনেক মুসলিম সমাজ নারীদেরকে মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করে থাকে। এর দায় ইসলামের উপরে চাপানো সঙ্গত নয়। মনে রাখা দরকার, কোন সমাজের রীতি বা প্রথা কুরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য।

www.bjilibrary.com

খ. প্রয়োজনে বাইরে গমন: হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে উম্মুল মুমিনীন সওদা বিনত জামআ [রা] কোন কারণে বাইরে গেলেন। হযরত উমার [রা] তাঁকে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে সাওদা [রা] আপনি নিজেকে আমাদের কাছ থেকে লুকাতে পারেননি। এতে তিনি নবী [সা]-এর নিকট ফিরে গেলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বললেন। তিনি তখন আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে গোশ্‌তপূর্ণ একখানা হাড় ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে ওহী নাযিল হল। যখন ওহী নাযিল হওয়া শেষ হল, তখন নবী [সা] বললেন, আল্লাহ্ তালা প্রয়োজনে তোমাদের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।[সূত্র: বুখারী শরীফ। বিয়ে-সাদী অধ্যায়]

গ] জিহাদে গমনের সুযোগ: জিহাদে অংশ গ্রহণ পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হলেও নারীর জন্য তা ঐচ্ছিক। তথাপি কোন নারী এতে অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করলে মহানবী [সা] তাকে নিরুৎসাহিত করতেন না। একবার রাসূলুল্লাহ [সা] জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরের গুরুত্ব বর্ণনা করছিলেন। এ-সময় উম্মু হারাম [রা] নামক এক মহিলা সাহাবী বললেন, 'হে রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য দোয়া করুন আমিও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।' রাসূল [সা] তাঁর জন্য দোয়া করলেন। [সূত্র: আবু দাউদ শরীফ। জিহাদের অধ্যায়।] এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, নারীর সামাজিক বা জাতীয় দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কর্মভার যেমন ইসলাম তার উপর অর্পন করে না, তেমনি কেউ সাগ্রহে এগিয়ে এলে তাকে নিবৃত্তও করে না।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা অবগত হলাম, ইসলাম নারীকে চার দেওয়ালের মাঝে অবরুদ্ধ করে রাখে না। প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে তার কোন বাধা নেই। অতএব, পর্দাকে অবরোধ ভাববার কোন যৌক্তিকতা নেই। পর্দার লক্ষ্য হল নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রতিরোধ করা।

পর্দা ও প্রগতি: প্রগতি যদি হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি সাধন, তাহলে একজন আদর্শ মুসলিম নারী এ পথে কোনই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ণ যদি হয় প্রগতির লক্ষ্য, তাহলে মুসলিম সমাজের নারীরা দেখবে, এ-পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রগতি যদি নর-নারীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে কাজ করাকে অপরিহার্য মনে করে, তবে ইসলাম এ-পথে পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেবে। কারণ, নর-নারীর অবাধ মেলামেশা অধিকাংশ সামাজিক ব্যাধির জন্ম দিয়ে থাকে। এখন আমরা দেখব, মুসলিম নারী প্রগতির পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় কি-না।

ক. মুসলিম নারীর জ্ঞানার্জনের সুযোগ: জন্মের পর একটি শিশুর অধিকাংশ সময় কাটে মায়ের সান্নিধ্যে। মায়ের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ থেকেই সে তার প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পাঠ লাভ করে। অতএব, মাকে অজ্ঞতার আবরণে আপাদমস্তক মুড়িয়ে রেখে একটি জাতি উন্নতির রাজপথে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। তাই ইসলাম

www.bjilibrary.com

নারীর জ্ঞানার্জনকে পুরুষের মতই বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। মহানবী [সা] দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন: 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।' [সূত্রঃ সুনানু ইবনে মাজাহ্। ১ম খণ্ড। হাদিস নং-২২৪] লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনই পার্থক্য করা হয়নি। ইসলাম এ ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, দাসীদেরকেও এ সুযোগ প্রদানে কার্পণ্য করেনি। হযরত আবু মুসা আল আশআরী [রাঃ] বর্ণনা করেন। রাসূল [সা:] এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী ছিল . . .সে তাকে উত্তম রূপে আদব-কায়দা এবং দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষাদান করেছে, এরপর তাকে স্বাধীন করে দিয়েছে এবং বিবাহ করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।' [সূত্রঃ বুখারী শরীফ। ইলম অধ্যায়]

ইসলামের সোনালী যুগের নারীরা মহানবী [সা]-এর নসিহত শোনার জন্য আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। জ্ঞান লাভের আগ্রহ তাদের এতটাই অধিক ছিল যে, তাঁরা রাসুল [সা]-এর নিকট দাবী করেন তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দেবার জন্য। মহানবী [সা] তাঁদের এই দাবী মেনে নিয়েছিলেন। [সূত্রঃ বুখারী শরীফ। ইলম অধ্যায়]

খ] মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড: ধন-সম্পদ অর্জন এবং তার মালিকানা ইসলাম নারীকে প্রদান করেছে। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করার বৈধতা তার স্বামীর নেই। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন: 'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।'[সূত্র: আল কুরআন। ৪ : ৩২]

স্বয়ং মহানবী [সা]-এর স্ত্রী যায়নাব [রা] কুটীর শিল্পে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করার কাজে দক্ষ ছিলেন। এ কাজে যে অর্থ উপার্জিত হত, তা তিনি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতেন। [সূত্রঃ সহীহ্ মুসলিম। কিতাবুল নিকাহ্।]

হযরত জাবির [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: 'আমার খালাকে তিন তালাক [বায়েন] প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়, যিনি তাকে [ইদ্দত কালীন] ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করীম [সা]-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর। আর তা হতে কিছু সাদকা করবে অথবা ভাল কাজ করবে। [সূত্র আবু দাউদ শরীফ। হাদিস নং-২২৯১

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় উন্নয়ণে অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ ইসলাম নারীকে প্রদান করেছে। তবে সমাজ-সভ্যতাকে রক্ষা করবার জন্য ইসলাম এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটিই হল পর্দা। এর সারকথা হল, নারী প্রয়োজনে সকল বৈধ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে, তবে স্বতন্ত্র পরিবেশে—যেখানে পুরুষের অবাধ সান্নিধ্যের সুযোগ থাকবে না। সমাজ-সভ্যতার সূতিকাগার যে পরিবার, তাকে সংশয়, অবিশ্বাস, ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে চায় ইসলাম। এজন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়েছে কুরআন-সুন্নাহয়। এটিই হল পর্দা। প্রশ্ন

www.bjilibrary.com

হতে পারে, এত সতর্কতার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে? এগুলো কি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে না? এর উত্তরে বলতে হয়, অবাধ মেলামেশা এমন এক মায়াবিনী যে সমাজ-সভ্যতাকে ক্রমশ ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। পরিশেষে ঘটে শোচনীয় পতন। মানব-সভ্যতার অতীত এবং বর্তমান এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখানে পর্দাহীনতাজনিত সামাজিক বিপর্যয়ের কিছু চিত্র তুলে ধরা হল।

গ্রীক সভ্যতায় নর-নারীর সম্পর্ক: গ্রীসের জাতীয় উন্নয়ণের প্রাক্কালে নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। কৌতূহলবশে প্যাণ্ডোরা নামক পৌরাণিক নারী যে বাক্স খুলেছিল, তা-ই মানব জাতির সমূহ দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভোগের কারণ বলে তারা বিশ্বাস করত। ক্রমশঃ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হতে থাকে। তারা নারীকে সম্মান করতে শেখে। গ্রীক সভ্যতার ক্রমোন্নতির যুগে নারীর ছিল লজ্জা-শরম এবং আত্মসম্মানবোধ। তারা খোলামেলা চলাফেরা এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকত। পুরুষদের সমাবেশ এবং হাট-বাজার তারা এড়িয়ে চলত। তারা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করত আপন সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তা-চেতনায় এবং শৌর্য-বীর্যে উন্নত করে গড়ে তুলতে। তারই ফল স্বরূপ গ্রীক সভ্যতা হতে পেরেছিল বিশ্বজয়ী। কিন্তু একটা সময় এল, যখন তারা চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বও হারাতে লাগল। পতিতাবৃত্তি ব্যাপক আকার ধারণ করল; পতিতালয়ে গমণ হয়ে উঠল সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি সাধারণ ব্যাপার। সমাজে গণিকাদের উচ্চ সম্মান প্রদান করা শুরু হল। সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি এবং তার জারজ সন্তান কিউপিডের পূজা শুরু হল দেশব্যাপী। এ-ভাবে জাতীয় জীবনে উন্নত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-অধ্যয়নের স্পৃহা ক্রমশঃ লোপ পেতে লাগল। পরিশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, সমকামিতা সমাজে বিস্তার লাভ করল। যে দুজন বন্ধু হারমেডিয়াস এবং এরোষ্টগীন এই জঘন্য রীতি সমাজে প্রচলন করেছিল, তাদেরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা শুরু হল। [সূত্র: সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। পর্দা ও ইসলাম। পৃ-৭]

এভাবে কামদেবের দৌরাত্ম্যে উন্নত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সমাজ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে লাগল। একদা শক্তিমান গ্রীকজাতি হয়ে পড়ল হীনবীর্য। সৃজনশীলতার স্থান দখল করল কামকুশলতা। ফলস্বরূপ এই জাতির শোচনীয় পতন ঘটল।

রোমান সভ্যতায় নর-নারীর সম্পর্ক: গ্রীক সভ্যতার পতনের অব্যবহতি পরে আবির্ভাব ঘটে রোমান সভ্যতার। এই সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসও গ্রীকদের অনুরূপ। এদের উত্থানকালে গ্রীকদের মত নারীসমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না। তবে নারীদেরকে সহজলভ্য ভোগের সামগ্রী মনে করা হত না। তাদের শরম-সম্ভ্রমকে সম্মানের চোখে দেখা হত। কোন নারীকে লাভ করার একমাত্র উপায় ছিল বিবাহ।

এক সময় এই জাতিতেও বিকৃতির সূচনা হয়। নারী ক্রমশ সহজলভ্য হয়ে পড়ে। শুরু হয় অবাধ মেলামেশা। ফলত যৌন জীবনের শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে। বিবাহই ছিল যৌন মিলনের একমাত্র বৈধ পন্থা। বৈচিত্র-সন্ধানী নারী-পুরুষের আকাংখার কাছে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানও নতি স্বীকার করে। শুরু হয় ব্যাপক বিবাহ-বিচ্ছেদ। বারবার জীবন-সঙ্গী

www.bjilibrary.com

পরিবর্তন নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিখ্যাত রোমান দার্শনিক সেনেকা [৪খৃ: পূ: — ৬৫খৃ:] আক্ষেপ করে বলেনঃ "রোমে তালাক আজ আর লজ্জাজনক কোন ব্যাপার নয়। নারী তার বয়স গণনা করে স্বামীর সংখ্যা দ্বারা।" [উদ্ধৃত: পর্দা ও ইসলাম। পৃ-৮]

বৈচিত্র-বিলাসের চাপে ক্রমশঃ সকল বিধি-নিষেধ বিদূরিত হয়ে গেল। শুরু হল অবাধ যৌনতার জয়যাত্রা। এপথে কীটো [২৩৪খৃ: পূ: —১৪৯খৃ: পূ:] এবং সিসেরোর [১০৬ — ৪৩খৃ: পূ:] ন্যায় বিখ্যাত দার্শনিকদেরও সমর্থন মিলল। পরিস্থিতি এতটা নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, রোম সম্রাট টাইবেরিয়াস [খৃ: ১৪— ৩৭খৃ:] আইন প্রণয়ন করে সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদেরকে পতিতাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস পান। [সূত্র: সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। পর্দা ও ইসলাম। পৃ-, পৃ-৮]

রোমান সভ্যতার দেহে যখন গ্রীকদের মত যৌনতার ব্যাধি বাসা বাঁধল, তখন তাদের পরিণতিও একই রকম হবে এতে আর আশ্চর্য কি। বিশ্বজয়ী এই সভ্যতারও করুণ অপমৃত্যু ঘটল।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার চিত্র: আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক আমরা লক্ষ্য করি, তা বেশ কয়েকটি বিপ্লবের ফল। শিল্পবিপ্লব নারীকে পুরুষের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, ফরাসী বিপ্লব নর-নারীকে দেয় অসীম ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাহিত্যে যৌনতার আন্দোলন তাকে দেয় যথেচ্ছাচারের প্রেরণা, খোদাহীনতার আন্দোলন তাকে নীতি-নৈতিকতা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে। পরিশেষে গণমাধ্যমের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে সিনেমা-টেলিভিশনের আবিষ্কারের ফলে, আর এটা সর্বপ্লাবী যৌনতার বিপ্লব অনিবার্য করে তোলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব নারীকে পুরুষের সান্নিধ্যে আসার বিরাট সুযোগ করে দেয়। এই বিপ্লবের ফলে ইউরোপে একের পর এক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। এ-গুলোর জন্য বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসতে থাকে কারখানায়। তাদেরকে চাকুরি দিলেও যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাতে তাদের পক্ষে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে শহরে বাস করা সম্ভবপর হয় না। এরপর পুঁজিপতিদের নজর পড়ে নারীর উপর। তাকে উপার্জনে উৎসাহিত করা হয়। পারিবারিক প্রয়োজনে অনেক নারী এই সুযোগ লুফে নেয়। নারীকে এ-ভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার পেছনে শিল্পপতিদের মানবতা বা মহত্ব ক্রিয়াশীল ছিল না। বরং নামমাত্র মজুরিতে কাজ আদায় করে নেবার মানসে তারা এটা করেছিল। উইল ডুরান্ট যথার্থই বলেছেনঃ "ইউরোপীয় নারীদের স্বাধীনতা এবং মালিকানা সত্ত্ব লাভের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত মানুষের প্রতি নয়, বরং যন্ত্রের প্রতি। তাদের ভক্তিতে মাথা নোয়ানো উচিত যন্ত্রের দাঁতযুক্ত চাকার সামনে, ইউরোপের পুরুষদের সামনে নয়। কোটিপতিদের লোভ এবং অর্থলিপ্সাই তাদেরকে অধিক মুনাফা করবার এবং কম পারিশ্রমিক দেবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই কারণেই তারা বৃটিশ আইন সভায় নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির খসড়া পেশ করেন।" [সূত্রঃ Will Durant. উদ্ধৃত: Women:

www.bjilibrary.com

Victim or Victor.] পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক, কল-কারখানায় অনেক নারীর আগমণ ঘটতে লাগল। তাদের দিনের অধিকাংশ সময় পর-পুরুষদের সান্নিধ্যে কাটতে লাগল। এসব পুরুষের অনেকেই এমন, যারা স্ত্রীদের রেখে এসেছে গ্রামে। ফলে শিল্প-কারখানার পরিবেশ ক্রমশ নৈতিকতার প্রতিকূল এবং অবাধ মেলামেশার অনুকূল হয়ে উঠল। এ হল সূচনাপর্ব।

শিল্পবিপ্লবের সমসাময়িক কালে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লব [১৭৮৯খৃ:] নর-নারীর মনে অনেক জোর এনে দেয়। শুরু হয় ব্যক্তিস্বাধীনতার চর্চা। এই দর্শন ক্রমশঃ মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। মানুষ নিজেকে নিয়ে বড় বেশি মগ্ন হয়ে পড়ে। প্রথমে প্রশ্ন ওঠে, তার বিয়ের পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের অধিকার তো কেবল তারই। এই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রণয়-অভিসারের চর্চা শুরু হয়। এখানেই থেমে থাকেনি। ব্যক্তিস্বাধীনতার পরবর্তী যুক্তি হল, বিবাহের পরে মানুষ কি আর মানুষ থাকে না? তার মনে কি আর ভালবাসা, কামনা-বাসনা থাকে না? সারা জীবন একজনকেই ভালবাসতে হবে, একজনের সাথে কাটাতে হবে— এ কেমন কথা! এ তো স্বাধীনতার বিপরীত ধারণা। কোন কোন মহলে সতর্কতার সাথে এ-সব কথা উচ্চারিত হতে থাকে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার এই দর্শনকে জনপ্রিয় করে তুললো সাহিত্য জগতের যৌন-আন্দোলন। এই আন্দোলনেরও সূচনা হয় ফ্রান্সে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী ঔপন্যাসিক George Sand এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই নারী তার উপন্যাসকে অবাধ যৌনতা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন বহুগামিনী। তার বিভিন্ন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মুখ থেকে তিনি অবাধ যৌনতার সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন। যেমন Lelia উপন্যাসের নায়িকা লেলিয়া স্টেনোকে লিখেছেঃ "জগতকে যতখানি দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছে তাহাতে আমি অনুভব করি যে, প্রেম সম্পর্কে আমাদের যুবক-যুবতীর ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। প্রেম শুধু একজনের জন্যই হইতে হইবে অথবা তাহার মনকে জয় করিতে হইবে এবং তাহাও চিরদিনের জন্য। এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল।" [উদ্ধৃত: সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। পর্দা ও ইসলাম। পৃ-৩৪] জাঁক [Jaucuss] নামক উপন্যাসে উদারমনা স্বামী তার স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম উদারচিত্তে মেনে নেয়। নিজের স্ত্রীকে অন্যের বাহুবন্ধনে আবিস্কার করেও সে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হয় না। তার যুক্তি হল: "যে পুষ্প আমা ব্যতীত অন্যকে তাহার সুরভি দান করিতে চায়, তাহাকে পদদলিত করিবার আমার কি অধিকার আছে?" [সূত্র: পর্দা ও ইসলাম। পৃ-৩৫] পরবর্তীকালে Paul Adam, Henry Betaille, Pierre Louis প্রভৃতি সাহিত্যিক George Sand এর আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলেন।

এতসব বিপ্লব এবং আন্দোলনের ফলে শরম, শালীনতা, সতীত্ব প্রভৃতি মূল্যবোধ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তখনো ধর্ম এবং নৈতিকতা সক্রিয় ছিল এবং ব্যভিচারের সয়লাব রোধ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এবার খোদাহীনতার দর্শন ধর্মবিশ্বাসের উপর হানল চরম আঘাত। ইংরেজ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী গ্রন্থ The Origin of Species by Means of Natural Selection হল সেই আঘাতের

www.bjilibrary.com

হাতিয়ার। এই মতাদর্শ বলে, সৃষ্টিকর্তার মহাপরিকল্পনায় নয় বরং আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করে। পৃথিবী এবং তাতে প্রাণের উদ্ভবও আকস্মিকভাবে হয়। তারপর অতিক্ষুদ্র এককোষী জীব লক্ষ-কোটি বছর ধরে রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমানের মানুষ নামক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন আপন স্বার্থে এই মতবাদকে ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলে। উল্লেখ্য, অসংখ্য বিজ্ঞানী এই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন [এঁদের মধ্যে অনেক নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীও আছেন]। যাহোক, বিবর্তনবাদ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। ফলে স্রষ্টার প্রত্যাদেশ তথা ধর্মও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই মতবাদ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবের মহিমান্বিত আসন থেকে নামিয়ে অন্যান্য জানোয়ারের মত এক জানোয়ার হিসাবে উপস্থাপন করে। অতএব, জীবন-প্রণালীকেও পশুর অনুকরণে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা চলতে থাকে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা Babel এর কথায় ঠিক এই দাবীই উত্থাপিত হয়ঃ "নারী এবং পুরুষ তো পশুই। পশু দম্পতির মধ্যে কি কখনো বিবাহের— স্থায়ী বিবাহের— প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?"[উদ্ধৃতঃ পর্দা ও ইসলাম। পৃ-৪২] এই যে ধর্মকে অর্থহীন এবং মানুষকে পশু ভাববার প্রক্রিয়া শুরু হল, যৌন জীবনে পড়ল এর অনিবার্য প্রভাব। বিশিষ্ট পণ্ডিত ড্রল ডিউরান্ট বলেন: "স্পষ্ট ধারণা করা যাচ্ছে, ধর্মবিশ্বাসের উপর ডারউইনের আক্রমণমূলক চিন্তাধারার কারণেই যৌন স্বাদ আস্বাদনের প্রবণতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। যুবকরা যখন দেখল যে, ধর্ম তাদের যৌন স্বাদ আস্বাদন প্রবণতার বিরোধী, তখন তারা ধর্মকেও অকেজো ও হীন নগন্য প্রমাণ করবার শত-সহস্র কার্যকারণ সন্ধান করে নিল।" [ড্রল ডিউরান্ট। দর্শনের বৈচিত্র্য। প্রথম খণ্ড। পৃ-১৩৪। উদ্ধৃতঃ মুহাম্মাদ কুতুব। বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত। পৃ-২৬৫]

এরপর ঘটল আরেক বিপ্লব— মিডিয়ার বিপ্লব। আবিস্কৃত হল সিনেমা এবং টেলিভিশন। ফলে এতদিন যা ছিল উপন্যাসের পাতায়, তাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলা হল। নারী-পুরুষের প্রণয়, অভিসার, ব্যভিচার প্রভৃতিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করা হতে লাগল। নগ্নতা এবং অবাধ যৌনাচার ক্রমশ গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চলতে লাগল। এভাবে চিত্র, ভাস্কর্য সাহিত্য, দর্শন, নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির অবিরাম প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে গেল। ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, মেলা-মেশা হয়ে গেল একেবারেই অবাধ। আর এ-পথ ধরে সমাজে প্রবেশ করল অসংখ্য সমস্যা। এখানে তেমন কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

ক. যৌন নিপীড়ন: এটি এক সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, নর-নারী পরস্পরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে থাকে। বিশেষ করে গোটা নারীদেহে প্রবল আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। আর পুরুষের মানসিক ও জৈবিক গঠন এমনই যে, সে এক পলকেই আকৃষ্ট হতে পারে এবং মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। সে-ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে দুর্বল নারীর পক্ষে তাকে প্রতিরোধ করা দু:সাধ্য হয়ে পড়ে। তাই, নারী যদি তার রূপ-যৌবন পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল না করে তাকে আকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহার করে, তবে সে

১৬—

www.bjilibrary.com

মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বসে। আকর্ষণের এই প্রক্রিয়ায় নারী সৌভাগ্যক্রমে সঠিক ব্যক্তিকে পেয়ে যেতে পারে। আবার ভুল কোন ব্যক্তির আগমণ ঘটতে পারে তার জীবনে। ফুলের সৌন্দর্য শুধু মৌমাছিকেই টানে না, কীটকেও ডেকে আনে। মানব রূপী কীট একটি জীবনকে কুঁড়িতেই নষ্ট করে দিতে পারে। এ কথার সত্যতা পশ্চিমা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী প্রতিদিন আপন সম্ভ্রম হারানোর মাধ্যমে প্রমাণ করে চলেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নারীর ধর্ষিত হওয়া— কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও আক্ষরিক অর্থেই সত্য। NCVS [National Crime Victimization Survey] আমাদেরকে জানাচ্ছে, ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ নয় এরূপ যৌননিপীড়ন এর ঘটনা ঘটে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লক্ষ [অর্থাৎ গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি] [সূত্র: The Encarta Encyclopaedia. Rape] ।

অর্থনৈতিক মুক্তির আশ্বাস দিয়ে নারীকে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে টেনে আনা হয়েছে। অথচ এ-জন্য যে তাকে চরম মূল্য দিতে হবে— এই কথাটা বিবেচনায় আনা হয়নি। কর্মস্থলে তাকে সহকর্মীদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এ-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানী লিজ কেলি বলেনঃ

অর্থাৎ- "যে-সব কর্মে নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে লেন দেন করতে হয়, সে-সব ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ব্যাপক, উদাহরণস্বরূপ বারের কাজ, ক্যানটিনের কাজ, শিশুদের দেখাশোনা, ধোয়ামোছার কাজ, সরকারি চাকরী, জনসেবার কাজ, হাসপাতালের কাজ, পাঠাগারের কাজ, দোকানের কাজ, সমাজকর্ম, শিক্ষকতা, ও পরিবহণের কাজ।" [Women, Violence and Male-Power. p-25.] ।

যৌন নিপীড়নের ঘটনা শিক্ষাঙ্গণেও ব্যাপক। সহশিক্ষার নামে কলেজ-ভার্সিটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের স্কুল-কলেজে এ-ধরণের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশ্বখ্যাত মাইক্রোসফট এর বিশ্বকোষে বলা হচ্ছে:

অর্থাৎ- "বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সংঘটিত যৌন হয়রানির অভিযোগও সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।" ["Rape" Encarta Encyclopedia.]

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৪.৮% ছাত্রী ছেলে-বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে [সূত্রঃ Assessment of Family Violence. p-212.] । পাঠক, ভেবে দেখুন, হাইস্কুলের চিত্র যদি এই হয়, তবে কলেজ-ভার্সিটির অবস্থা না-জানি কতটা মারাত্মক।

এই যে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য নারী, যাদেরকে বলপূর্বক ভোগ করা হচ্ছে, পর্দা তথা শালীন পোশাক এবং পর-পুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার মাধ্যমে এদেরকে রক্ষা করা যেত। বিশ্বখ্যাত ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে থাকেন। দুজন তরুণী, যারা আসলে জমজ বোন, রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। এরা খুব সুন্দরী

www.bjilibrary.com

এবং দেখতে ঠিক একই রকম। এদের একজন মিনিস্কার্ট পরিহিতা, আরেকজন ইসলামী রীতিতে হিজাব পরিহিতা। রাস্তার মোড়ে কিছু বখাটে যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কাকে উত্যক্ত করবে? খুব সহজ উত্তর: শালীন পোশাক পরিহিতাকে নয়, বরং যৌন-উত্তেজক বেশধারিণীকে। এ-ভাবে পশ্চিমা নারীরা শালীন পোশাক পরিত্যাগের মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজের রক্ষাকবচকেই ছুঁড়ে ফেলেছে।

খ] ব্যভিচারের ব্যাপকতা: পর্দাহীন নারী কোন দুরাচারের কবলে পড়লে কি পরিণতি হয় তা আমরা দেখলাম। এবার আমরা দেখব, তার উপর 'সুনজর' পড়লে কি পরিণতি হয়ে থাকে।

যে-সমাজে পর্দাহীনতার প্রচলন হয়, সে-সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করার কোনই উপায় থাকে না। কারণ, বিপরীতের প্রতি আকর্ষণ এক বিশ্বজনীন বাস্তবতা। প্রাণিজগতে তো বটেই, উদ্ভিদকূলে— এমনকি জড়জগতেও এটা লক্ষ্য করা যায়। চুম্বকের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে, বিদ্যুতের ধণাত্মক আধান [charge] ঋণাত্মক আধানকে টানে। জীবকূলে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অনুভব করে দুর্বার আকর্ষণ। বিপরীতের প্রতি এই আকর্ষণ আবার মানবকূলে অত্যন্ত প্রবল হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের জৈবিক চাহিদা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে কল্পনাপ্রবণ এবং সৌন্দর্যপিপাসু একটি মন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সে শুধু জৈবিক আকর্ষণই অনুভব করে না, তার সৌন্দর্যেও সে আকৃষ্ট হয়। আপন সৌন্দর্য-সৌষ্ঠব দিয়েও সে পছন্দের জনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এ-জন্য সে সাজ-সজ্জা, ফ্যাশান, অলংকার প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করে।

এ-ভাবে আকর্ষণ করা এবং আকৃষ্ট হবার প্রক্রিয়ায় তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। ক্রমশঃ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ঘনিষ্ঠতা। একে অপরের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে থাকে তারা। এই মেলামেশার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে তারা যৌন আকর্ষণ বোধ করতে থাকে যা এক সময় ব্যভিচারে পর্যবসিত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা তথা সমগ্র পাশ্চাত্য জগত এবং তাদের ভাবাদর্শে গড়া প্রাচ্যের অনেক দেশ একথার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে। সুইডেনের নারী-পুরুষদের শতকরা ৯৯ জন বিয়ের আগেই যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের যৌনসক্ষম নারী-পুরুষের [৪৪ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স] উপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৯৫ জন বিয়ের আগেই যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। [সূত্রঃ Premarital Sex: the Norm in America.] কানাডায়ও আমরা একই রকম চিত্র লক্ষ্য করি। এই দেশটিতে ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়স্কদের শতকরা ৯২ জন এবং ৩৫ থেকে ৫৪ বছর বয়স্কদের শতকরা ৮২ জন বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক অনুমোদন করে থাকে। [সূত্র: Teen Trends. Pp-46]

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে যে যৌন বিপ্লব [sexual revolution] সূচিত হয়েছিল তা মাত্র বিশ-পঁচিশ বছরে মহামারীর আকার ধারণ করে। প্রথম দিকে দাবী করা হয়, জীবনসঙ্গী নির্বাচনের জন্য পরস্পরকে চেনা-জানা প্রয়োজন। এজন্য পাত্র-পাত্রীকে সময়

www.bjilibrary.com

এবং সুযোগ প্রদান করতে হবে। কিছুকাল তারা যেন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এরপর বলা হল, দু'জন নারী-পুরুষের প্রণয়-অভিসার চলাকালে যৌনমিলন ঘটা খুব স্বাভাবিক এবং এটি নিন্দনীয় নয়। 'উদারতা' বৃদ্ধির পরবর্তী স্তরে দেখা যায়, প্রেম-প্রণয়কে আর শর্ত হিসাবে ধরা হচ্ছে না; বরং যৌন মিলনের জন্য ঘনিষ্ঠতাকেই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৫ ভাগ কলেজছাত্রী এবং ৪০ ভাগ ছাত্র মনে করে, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঘনিষ্ঠতা পূর্বশর্ত হওয়া উচিত। [সূত্রঃ Social Psychology : Understanding Human Interaction. pp-324] এখানেই শেষ নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর 'উদারতা' এখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেম-প্রণয় দূরে থাক, ঘনিষ্ঠতার শর্তও এখন উঠে গেছে। এখন অনেকেই ঘনিষ্ঠতা, অঙ্গীকার বা আবেগীয় বন্ধন ব্যতিরেকেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।[সূত্রঃ Social Psychology : Understanding Human Interaction. pp-326] ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিবাহ প্রকল্প ২০ থেকে ২৯ বছর বয়স্ক যুবতীদের উপর এক জরিপ পরিচালনা করেন। এতে দেখা যায়, শতকরা ৭৫ জন মনে করে, কোন রকম অঙ্গীকার ব্যাতিরেকে কেবল মজা করার জন্য যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা আজকাল সাধারণ ব্যাপার। ৪০% যুবতী জানিয়েছে, তারা কিছু লোকের সাথে যৌন সম্পর্ক গড়েছিল এমনকি তাদেরকে বিবাহ করার আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও। [সূত্র: A New Psychology of Women. Pp-400] এরকম যৌন আচরণ [অর্থাৎ অঙ্গীকার নেই, ঘনিষ্ঠতা নেই, আবেগ নেই— এরকম যৌন সম্পর্ক] কেবল একটি বিশেষ পেশার নারীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অতএব, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রমশঃ পুরুষদেরকে লম্পট এবং নারীদেরকে পতিতার পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। কথাটা শ্রুতিকটূ শোনালেও এর সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানী হিলারী এম লিপ্‌স বলেন:

"স্পষ্টত ভালবাসা কিংবা কামাসক্তি নারীর যৌন মিলনের একমাত্র কারণ নয় । দায়িত্ববোধের কারণে কিংবা একজন সঙ্গীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যৌনমিলন এক কথা, কিন্তু জীবিকার জন্য এই কাজে লিপ্ত হওয়াকে কি বলবেন? অধিকাংশ লোকই অপেক্ষাকৃত ভাল কোন সুযোগ আসার পূর্ব পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিকে সাময়িক পেশা [part-time job] হিসাবে দেখে থাকে । আর অধিকাংশেরই এই কাজের পাশাপাশি নির্দিষ্ট প্রেমিক বা প্রেমিকা থাকে। পতিতাবৃত্তি প্রায়শঃ এক খন্ডকালীন পেশা যা একজন নারীকে প্রয়োজনের সময় কিছু অর্থ উপার্জন করে নিতে সাহায্য করে।"[সূত্র: A New Psychology of Women. Pp- 413]

গ. অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ: ভ্রমর মধুপানান্তে উড়াল দেয়, আর ফুলের অভ্যন্তরে ঘটে ব্যাপক পরিবর্তন। ফল গঠনের গুরুদায়িত্ব তার উপরেই চেপে বসে। নারী-রূপ-ফুলের জীবনেও একই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। বিশেষতঃ যে নারী তার সৌন্দর্য-জৌলুস পুরুষ নামক পতঙ্গকে আকৃষ্ট করতে সচরাচর ব্যবহার করে, তাদেরকেই এর ফল তথা

www.bjilibrary.com

অনাগত সন্তানের দায় গ্রহণ করতে হয়। অবাধ যৌনতার উদ্দাম স্রোতে ভেসে চলা নারী-পুরুষ ভুলে যায় এর মারাত্মক পরিণতির কথা। ফলে অনেক সময় নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যেসব দেশে অবাধ যৌনতা প্রচলিত আছে, সেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তরুণী এই পরিণতির শিকার হয়ে থাকে। বিবাহ বহির্ভূত যৌন জীবনকে নিরুপদ্রব করতে পাশ্চাত্যের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অফিস, আদালত —সর্বত্র জন্মনিরোধক সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এতে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, রোমাঞ্চ সন্ধানী তরুণ-তরুণীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাড়া প্রদানের চেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া প্রদানে বেশি আগ্রহী। তারা ঘটনাপ্রবাহে স্বাভাবিকতা পছন্দ করে। পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে যৌন মিলনে অগ্রসর হওয়াতে যে আড়ষ্টতা, তা তাদের খুব না-পছন্দ। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ব্যারন এবং ব্রাইন বলেন:

"অনাকাংখিত গর্ভধারণ হল নব্য যৌন স্বাধীনতার প্রথম নেতিবাচক পরিণতি। যৌন সক্রিয় তরুণ-তরুণীদের বিস্ময়কর উচ্চ হার কার্যকর জন্মনিরোধক ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা নিয়ম মাফিক ব্যবহার করেনি; ফলে ১৯৭০ এর দশক থেকে প্রতি বছর শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই এক মিলিয়নের [দশ লক্ষ] অধিক অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে থাকে।. . . এই **তারুণ্যে গর্ভধারণের মহামারী** সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য দুর্দশার এক অবিরাম উৎসে পরিণত হয়েছে।" [সূত্র: Social Psychology : Understanding Human Interaction. pp-328] ১৯৯৪ সালে আমেরিকার যত নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তাদের ৪৯% অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক ছিল অনাকাংখিত গর্ভধারণ । [সূত্র: Unintended Pregnancy in the United States.]

ঘ] গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যা: ওপরের তথ্যচিত্র আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, অধিকাংশ বিবাহবহির্ভূত গর্ভসঞ্চার ঘটে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। স্বভাবতঃই এরা মানসিকভাবে এবং আর্থিকভাবে অনাগত সন্তানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে না। তদুপরি, তাদের ক্ষণিকের যৌনসাথীরাও দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় মেয়েটাকেই। এরকম পরিস্থিতিতে অনেকেই গর্ভপাত ঘটিয়ে ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়। জ্যাফি এবং ড্রাইফুজ নামক দুজন মার্কিন গবেষক অনিচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়া তরুণীদের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করেন। তাঁরা দেখতে পান, এসব তরুণীদের শতকরা ৩৮ ভাগ গর্ভপাত তথা ভ্রূণহত্যার আশ্রয় নেয়। [সূত্র: Courtship, Marriage and Family: American Style. pp-87] ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শ ৩০ টি গর্ভপাত ঘটানো হয়। [সূত্র: The World Almanac-2002. pp-88]

উত্তর আমেরিকার আরেকটি উন্নত দেশ কানাডাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ১৯৭০ সাল থেকে এদেশটিতে গর্ভপাত হু হু করে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই বছর 'বৈধভাবে' ভ্রূণহত্যা করা হয় ১১ হাজার। দশ বছর পরে ১৯৮০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় গুণ অর্থাৎ ৬৬ হাজার। আরো দশ বছর পরে ১৯৯০ সালে এসে আমরা ৯৪ হাজার গর্ভনাশের কথা অবগত হই। যুক্তরাষ্ট্রের মত এই দেশটিতেও গর্ভঘাতিনীদের অধিকাংশই ছাত্রী এবং

www.bjilibrary.com

তাদের শতকরা ৭৪ জনের বয়স ২০ বছর বা তদপেক্ষা কম। [সূত্র: Teen Trends. Pp-43] ২০০৭ সালে নিউজিল্যান্ডএ ১৮,৩৪০ টা গর্ভপাত ঘটানো হয়। [সূত্র: Statistics Newzealand. 08.01.2009] ইউরোপীয় সভ্যতার মশালবাহী ইংল্যান্ডে ২০০৬ সালে ১,৯৩,৭০০ টি গর্ভপাত ঘটানো হয়। [সূত্রঃ Abortion Statistics, England and Wales: 2006]

ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, অবাধ যৌনতার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের 'উদারতা' ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রভাব গর্ভপাতের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। বিপুল সংখ্যক তরুণী যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ছে, তখন এটাকে আইনগত বৈধতা না দিয়ে আর উপায় কি। অতএব, গর্ভের শিশুটিকে মরতেই হবে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করল। তারা ১৯২০ সালে গর্ভপাতকে বৈধতা প্রদান করে আইন প্রণয়ন করল। এরপর ১৯৪৮ সালে জাপান, ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সমূহ এবং ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে বাকি ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশ সমূহ গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করার বৈধতা প্রদান করল।[The Encarta Encyclopedia. Abortion]

ভ্রূণহত্যা সমর্থনকারীরা সর্বাপেক্ষা জোরালো যে যুক্তি পেশ করেন তা হল, ব্যক্তি স্বাধীনতা। দেহটা যেহেতু নারীর নিজের, সেহেতু এটার ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তার রয়েছে। এটা যাকে খুশি সে দান করতে পারে। দান করতে গিয়ে এর মধ্যে যদি নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়, তবে তা বাঁচিয়ে রাখা বা না রাখাও তার ইচ্ছাধীন। কী সর্বনাশা স্বাধীনতা! আপন সত্তার মধ্যে বেড়ে ওঠা নিষ্পাপ প্রাণ বলি দেওয়া হচ্ছে লাখে লাখে।

এ তো গেল গর্ভস্থ সেই মানব-শিশুটির কথা, যে জানতেও পারল না কি অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। যে নারী আপন গর্ভের সন্তান নষ্ট করে তার অবস্থা মোটেই স্বস্তিকর হয় না। সেন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের প্রশিক্ষক ড্যানিয়েল জে, মার্টিন বলেনঃ

"যে নারী গর্ভপাতের পন্থা অবলম্বন করে, তার দেহে গর্ভপাতের প্রভাব বিরাট এবং সব সময় নেতিবাচক। নারীদেহের ওপর গর্ভপাতের কোন উপকারের কথা আমি ভাবতে পারি না।" [সূত্রঃ: 'Human Life and Health Care Ethics'.]

এ, লেভিন এবং তাঁর সহ-গবেষকবৃন্দ জানাচ্ছেন, যেসব নারী গর্ভপাত ঘটায়, তাদের ডিম্বনালীতে গর্ভ সঞ্চারের [ectopic pregnancy] ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, তাদের বন্ধ্যা হয়ে যাবার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি ।[সূত্র: American Journal of Public Health. Vol.72. pp-253] জ্যানেট ডেলিং এবং তাঁর সহযোগী গবেষকবৃন্দ ১ হাজার ৮শ জন নারীর উপর গবেষণা পরিচালনার পর জোর দিয়ে বলেন, গর্ভপাত যে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এ ব্যাপারে তাঁদের হাতে জোরালো প্রমাণ রয়েছে। গর্ভঘাতিনী নারী ৪৫ বছর বয়ঃক্রমের মধ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার আশংকা ৫০% বৃদ্ধি পায়। ১৮ বছর বা তদপেক্ষা কম বয়স্ক তরুণী যদি ৮ সপ্তাহ পরে

www.bjilibrary.com

গর্ভপাত করে, তবে তার স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ৮০০ %। [সূত্র: Journal of the National Cancer Institute. Vol.86. pp-1584]

এ-তো গেল গর্ভঘাতিনী নারীর শারীরিক সমস্যার কথা। মানসিকভাবেও তারা কম সমস্যার সম্মুখীন হয় না। তাদের মানসিক সমস্যা সম্পর্কে মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াণ্ডা ফ্রানজ্ বলেন:

"যেসব নারী গর্ভপাত হতে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা জানায়, তারা ঠিকই জানে তাদের সমস্যাটা কি। তারা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কথা উল্লেখ করে যাতে তারা দেখতে পায় শিশুরা আবর্জনার স্তূপ থেকে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্তের মধ্য থেকে তাদেরকে ডাকছে। যখন তাদেরকে গর্ভপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন এই নারীরা পুনরায় সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে ভয়ানক মানসিক যাতনা সহকারে।. . . তারা নিজেদেরকে অকর্মণ্য এবং অসহায় শিকার বলে মনে করে, কারণ তারা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক মানবীয় কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে তা হল মাতৃত্বের ভূমিকা।" [সূত্র: Medical and Psychological Impact of Abortion.]

লস্ এঞ্জেলস্ টাইমস্ নামক বিখ্যাত পত্রিকা ১৯৮৯ সালে গর্ভপাতের উপর এক মতামত জরিপ করে। এই জরিপে দেখা যায়, গর্ভপাত করেছে এমন নারীদের শতকরা ৫৬ জন এজন্য অপরাধবোধে ভুগছে। শতকরা ২৬জন একাজের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। [সূত্র: The Sacramento Bee. March, 1989. pp-A7]

ঙ] অবৈধ সন্তানঃ একজন অবিবাহিতা নারী যখন অবাধ যৌনতার পরিণতি স্বরূপ গর্ভধারণ করে, তখন তার সম্মুখে তিনটি পথ উন্মুক্ত থাকে। এক, সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তানটি গ্রহণ করবে। দুই, অবাঞ্ছিত সন্তানটিকে গর্ভপাতের মাধ্যমে শেষ করে দেবে। তিন, অবিবাহিতা অবস্থাতেই সে সন্তানটি গ্রহণ করবে। মার্কিন সমাজ-গবেষক জ্যাফি এবং ড্রাইফুজ ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়স্কা কুমারী মাতাদের উপর জরিপ পরিচালনা করে দেখেন, এদের শতকরা ২৯ ভাগ বিবাহবহির্ভূত জন্মদানের মাধ্যমে শেষ হয়। [সূত্র: Courtship, Marriage and Family: American Style. pp-87]

অবাধ যৌনতার আধিক্যের কারণে অবৈধ সন্তানে পাশ্চাত্য জগত ভরে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৮ সালে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তার ৩২.৮% হল বিবাহ-বহির্ভূত যৌন মিলনের ফল। [সূত্র: The World Almanac.2001. Pp-873] এর অর্থ হল, গড়ে প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন জারজ সন্তান।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যৌনজীবন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ 'উদার' থেকে 'উদারতর' হচ্ছে। প্রথমে অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করা হল। এরপর অবাধ যৌনতাকে বৈধতা দেওয়া হল। তারপর বৈধ করা হল ভ্রূণহত্যাকে। পরিশেষে, অবৈধ সন্তান জন্মদানকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হল। কানাডার একটা তথ্যচিত্র আমাদের সামনে রয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৭৩ ভাগ নারী এবং ৬৭ ভাগ

www.bjilibrary.com

পুরুষ বিবাহিত না হয়ে সন্তান গ্রহণকে অনুমোদন করে থাকে। [সূত্রঃ Teen Trends. Pp-33]

আমরা পূর্বাহ্নে লক্ষ্য করেছি, তরুণীদের ব্যাপকহারে গর্ভধারণকে মহামারি [teenage pregnancy epidemic] হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ কলেরা, ডায়রিয়া, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর ক্ষেত্রে যা করা হয়, এক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই করা হচ্ছে। উপরোক্ত মহামারীর ক্ষেত্রে আক্রান্তদেরকে দ্রুত চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং রোগের বিস্তার রোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। অথচ, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ-রূপ মহামারীতে আক্রান্ত তরুণীদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ফলাফল স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে এবং এই মহামারীর বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ [অবাধ মেলামেশা বন্ধকরণ] গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদেরকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, তোমরা যার সঙ্গে খুশি যৌনমিলন করতে চাও? ক্ষতি কি? তোমাদের গর্ভে সন্তান এসেছে? সমস্যা নেই। তোমরা ভ্রূণহত্যা করতে চাও? করতে থাকো। বিবাহ ব্যতিরেকেই সন্তান গ্রহণ করতে চাও? তা-ও মেনে নেওয়া হল। এ যেন লোকদেরকে বলা, তোমরা ডোবা-নালা, খাল-বিল যেখান থেকে খুশি পানি পান করতে চাও? অনুমতি দেওয়া গেল। তোমাদের কলেরা হয়েছে? হোক না। তোমরা বমি করতে চাও? করতে থাকো। তোমরা বিছানাতেই পায়খানা করতে চাও? মেনে নেওয়া হল। এভাবে একের পর এক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, আর সমাধান না করে সহ্য করে যাবার বিধান দেওয়া হচ্ছে।

যাহোক, গর্ভের অবাঞ্ছিত সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যতটা সহজ, তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করাটা তত সহজ নয়। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, অন্ততঃ ২৯% ভ্রূণ স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়। এসব শিশুর অধিকাংশেরই জীবনকাল হতাদর, বঞ্চনা আর অবহেলার বিরাট যোগফল ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রতি বছর হাজার হাজার সদ্যপ্রসূত শিশু পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিস্কৃত হয়। এদের গর্ভধারিণীরা এভাবে তাদের সাময়িক আনন্দ-বিলাসের অবাঞ্ছিত ফসলকে বিসর্জন দিয়ে দায়মুক্ত হয়। এসব শিশুদেরকে পরে হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন শিশুসেবা কেন্দ্রে কিংবা দত্তক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে দৈহিক স্বাস্থের পুষ্টি সাধনের সব রকম ব্যবস্থা থাকে। তবে, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এসব স্থান মোটেই অনুকূল নয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক রাউলিং তাঁর ছোটগল্প এ মাদার ইন ম্যানভিল এ স্নেহ-মমতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে চমৎকার বলেছেনঃ "রুটি ছাড়াও অন্য খাবার রয়েছে এবং দেহের মত অন্তরও দ্রুত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তে পারে।"

শিশুসেবা কেন্দ্রে আশ্রিত শিশুদের ক্ষুধা লাগলে সুষম খাদ্য মেলে, কিন্তু স্নেহ-মমতা-ভালবাসা মেলে না। তাদের পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্সরা তাদের মুখে ফিডার তুলে দিতে পারে, কিন্তু মায়ের মমতায় বুকে জড়িয়ে নিতে পারে না। আর এটা সম্ভবও নয়। ফলে এরা জীবন ও জগতকে ভালবাসতে শেখে না। এরা এককে জন হয়ে ওঠে সমাজ বিরোধী অথবা সমাজ বিদ্বেষী।

www.bjilibrary.com

চ] যৌনরোগের ব্যাপকতা: যৌন-বিপ্লবের আরেকটা বড় অর্জন হল যৌনরোগের ব্যাপক বিস্তার। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে এসব রোগের অনেকগুলোর চিকিৎসা করা সম্ভব। তথাপি সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, জেনিটাল ওয়ার্টস, জেনিটাল হার্পিস, এইডস প্রভৃতি কঠিন রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বছর চার হাজারেরও বেশি লোক ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া এবং সিফিলিসে আক্রান্ত হয়। [সূত্রঃ Epidemiology Report. No-21] ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডে সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, জেনিটাল হার্পিস, জেনিটাল ওয়ার্টস— এই পাঁচটা রোগে নতুন আক্রান্ত হয়েছে ৩,৯৭,৯৯০ জন। এই দেশটিতে দশ বছর আগের তুলনায় গনোরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২%, ক্ল্যামাইডিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০%, ওয়ার্টস ২৮% এবং হার্পিস ৫১%। [সূত্র: STD Statistics for the UK. Avert International] আমেরিকান জনগণের প্রায় ১০ শতাংশ বিভিন্ন যৌনরোগে ভুগছে। এর সাথে প্রতি বছর যোগ হচ্ছে ৫ লক্ষ নতুন রোগী। [Social Psychology: Understanding Human Interaction. pp-329]

যৌনবাহিত রোগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হল এইডস। এই রোগের জীবানু আবিস্কৃত হবার পর পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখনো এর কোন চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। এযাবৎ কয়েক কোটি লোক এই মহামারিতে প্রাণ হারিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মার্কিন কূটনীতিক রিচার্ড হলব্রুক বলেনঃ "১১ সেপ্টেম্বরে [অর্থাৎ টুইন টাওয়ার হামলায়] যত লোক নিহত হয়েছিল, এইডস এর কারণে প্রত্যেক দিন তার তিন গুণ লোক প্রাণ হারায়।"[The Bangladesh Observer. News in Brief. 02.03.2003] পাঠক, ভেবে দেখুন। টুইন টাওয়ারে হামলার প্রতিশোধ নিতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আফগানিস্তান ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। অথচ গত পঁচিশ বছর যাবৎ যে নীরব ঘাতক প্রতিদিন ৯/১১ এর তিনগুণ লোক হত্যা করে চলেছে, তাকে মুকাবিলা করার মত নৈতিক শক্তি তো পাশ্চাত্য জগত রাখেই না, বরং তাকে সযত্নে জিইয়ে রেখেছে। যৌন জীবনে শৃংখলা ও সংযম ফিরিয়ে আনাই ছিল এইডস মুকাবিলার সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদক্ষেপ। কিন্তু এ-কাজের জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা কবেই হারিয়ে বসেছে পাশ্চাত্য জগত। এখন অবাধ যৌনতাকে বজায় রেখেই এই মহামারি থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে। যুবসম্প্রদায়কে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এইডস থেকে বাঁচতে কনডম ব্যবহার করুন। কিন্তু এতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। সমাজবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, অধিকাংশ তরুণ-তরুণী এটা ব্যবহার করছে না। রোমান্টিক তরুণ-তরুণীরা পরিকল্পিতভাবে সাড়া দেবার চেয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে সাড়া প্রদানে বেশি আগ্রহী। তারা ঘটনাপ্রবাহে স্বাভাবিকতা পছন্দ করে। পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াতে যে আড়ষ্টতা তা তাদের খুবই না-পছন্দ। [Courtship, Marriage and Family: American Style.pp-87]

www.bjilibrary.com

ছ. যৌন-বিকৃতি: যে সমাজে অবাধ যৌনতা ব্যাপকতা লাভ করে, সেখানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটা হয়ে যায় এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। চিত্রে, ভাস্কর্যে, প্রচ্ছদে, পুস্তকে, সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে, ফ্যাশনে, বিজ্ঞাপনে, সিনেমায়, নাটকে— সর্বত্র যৌনতার বাড়াবাড়ি শুরু হয়। মানুষ উঠতে বসতে শুতে সর্বক্ষণ এই একটা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত, বরং বলা যায় তাড়িত হতে থাকে। এর ফলে ক্রমশঃ যৌন-বিকৃতি ঘটতে থাকে। তাছাড়া, যৌনসঙ্গী খুব বেশি সহজলভ্য হওয়ায় অনেকে নানাভাবে বৈচিত্রের পেছনে ছোটে। অনেকে শিশু-ধর্ষণ [pedophilia] করে, অনেকে সমকামিতার আশ্রয় নেয়, কেউ আবার স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, কেউ কেউ নগ্নতায় তৃপ্তি খুঁজে পায়। অনেকের রুচি এতটা বিকৃত হয়ে পড়ে যে, তারা রক্তসম্পর্কের অতি আপনজনের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। এছাড়াও রয়েছে পশুমৈথুন [zoophilia], অন্যদের যৌনকর্ম দেখে তৃপ্তিলাভ[Peeping Tom] আরো কত বিকৃতি! এখানে কিছু যৌনবিকৃতির ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হল।

এক. শিশু-ধর্ষণ: এটা সবচেয়ে লজ্জাজনক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা যে, পাশ্চাত্যে বিপুল সংখ্যক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। এক জরিপে দেখা গেছে যত যৌন নিপীড়নের ঘটনা পুলিশে রিপোর্ট করা হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ ঘটে ১২ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের উপর [সূত্রঃ Criminology. p-39] । ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, বার্বাডোস ও নেদারল্যাণ্ডসের নারীদের প্রতি তিনজনে একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় [সূত্রঃ Social Problems. p-92] । এসব শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন কারো দ্বারা আক্রান্ত হয় যারা তাদের পরিচিত। অনেক সময় গুরুজন শ্রেণীর লোকেরা এই জঘন্য কাজটা করে থাকে, যাদেরকে সম্মান করার কথা, শ্রদ্ধার চোখে দেখবার কথা। পাশ্চাত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার খুব বেশি হবার কারণে বিপুল সংখ্যক শিশু তাদের প্রকৃত পিতা-মাতা উভয়ের সাথে বাস করার সুযোগ পায় না। এদের সৎ পিতারা অনেক সময় অসৎ কর্মটা করে থাকে। ফলে আশ্রয় হারাবার ভয়ে তাদেরকে দিনের পর দিন নীরবে সবকিছু সয়ে যেতে হয়। যৌনজীবন সম্পর্কে খুব নেতিবাচক এবং ভীতিকর ধারণা বদ্ধমূল হয় তাদের শিশুমনে যা পরিণামে তাদেরকে সুস্থ যৌনজীবনের অনুপযুক্ত করে তোলে।

দুই. সমকামিতা: যৌনবিকৃতির আরেকটা রূপ হল সমকামিতা। বিপরীত লিঙ্গ অতি সহজলভ্য হবার কারণে অনেকে বৈচিত্রের সন্ধানে সমলিঙ্গের দিকে ধাবিত হয়। আর 'উদারতা'র মন্ত্রে দীক্ষা নেবার কারণে সমাজেও এটার স্বীকৃতি মেলে। ২০০০ সালের আদমশুমারি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে সমকামী [homosexual] লোকের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি [সূত্রঃ Sociology. p-342] । এখানেই শেষ নয়, সমলিঙ্গের মধ্যে বিবাহও পাশ্চাত্যের অনেক দেশে আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই জঘন্য অপ্রাকৃতিক কাজের কারণে একদা লুত [আ] এর জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে [১৯৮৩ সালে] এই ঘৃণ্য রীতির সর্বনাশা ফল

www.bjilibrary.com

আবারও প্রকাশ পায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এইডস নামক মরণব্যাধির কারণ হিসাবে সমকামিতাকে চিহ্নিত করেন। Avert নামক ইংল্যাণ্ডের এইডস বিরোধী সংস্থা ২০০৪ সালে পুরুষদের উপর এক জরিপ পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, এই বছর ৩২,৪১২ জন সমকামী পুরুষের দেহে HIV জীবানু পাওয়া যায়। [Avert. September-2004] এই রোগে প্রতিদিন পৃথিবীর দশ হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারায়।

তিন. পতিতাবৃত্তি: এটা হল বিকৃতির আরেক করুণ ছবি। পাশ্চাত্যে যৌনজীবনে যথেচ্ছাচার এতটা ব্যাপক যে, আপন যৌনাঙ্গ হেফাজতের কথা যারা ভাবে, তাদেরকে কৃপার পাত্র মনে করা হয়। এ-সব সমাজে এমন নারী-পুরুষ খুব কমই আছে যারা কয়েকজনের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেনি। ফলে পতিতাবৃত্তিকে অনেকে 'কাম্য নয়' ভাবলেও 'উচ্ছেদযোগ্য' সম্ভবতঃ কেউই ভাবে না। তাইতো দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ লক্ষের বেশি পেশাদার পতিতা ও সমসংখ্যক খন্ডকালীন পতিতা রয়েছে। [সূত্র: Abnormal Psychology and Modern Life. P-586] । এই যে খন্ডকালীন পতিতা, এদের অধিকাংশই সমাজের সম্মানিত নারী। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, পছন্দসই চাকরী জোটানোর আগে অনেকে হাতখরচের টাকা জোগাড় করতে খন্ডকালীন পেশা হিসাবে [part-time job] পতিতাবৃত্তি করে থাকে। এটা নারীত্বের জন্য কতই না অবমাননাকর!

চার. অযাচার [Incest]: এটাকে অগম্যাগমণও বলা হয়। এর অর্থ হল, রক্ত সম্পর্কের অতি আপনজনের সাথে যৌনকর্ম। যেমন পিতার সাথে কন্যার, মাতার সাথে পুত্রের, ভাইয়ের সাথে বোনের যৌন সম্পর্ক। মুসলিম সমাজে এটা কল্পনা করাও পাপ মনে করা হয়; এমনকি জঘন্য পাপীও এটাকে মহাপাপ মনে করে থাকে। অথচ পশ্চিমা বিশ্বে এটা বিরল কোন ঘটনা নয়। বিশেষ করে ভাই-বোনের মধ্যে এই সম্পর্ক অনেকটা সাধারণ ব্যাপার। এ সম্পর্কে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী এরিক গুডি বলেন:

"ভাই-বোনের মধ্যকার যৌন সম্পর্ক বোধ হয় অতি সাধারণ ব্যাপার; রক্ত সম্পর্কের অতি ঘনিষ্ঠজনদের সাথে যৌন সম্পর্কের যত ঘটনা ঘটে এটি [অর্থাৎ ভাই-বোনের অবৈধ সম্পর্ক] তার অর্ধাংশ এবং ক্ষুদ্র পরিবারগুলিতে এ-ধরণের ঘটনা যত ঘটে তার ৯৪%।" [Deviant behavior, p-223]

আসলে পশ্চিমা জগতের অনেকে নিজেদের মানুষ না ভেবে পশু ভাবতে বেশি আগ্রহী, যে ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল বিবর্তনবাদের সাথে সাথে। পিতা-মাতা, ভাই-বোনের বাছ বিচার করাটা পশুদের মধ্যে সুলভ নয়। অতএব, মানুষ নামক পশুই বা কেন বাছ বিচার করতে যাবে।

পাঁচ. নগ্ন হয়ে বিচরণ: অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় প্রদর্শনেচ্ছা [exhibitionism]। এই সমস্যা যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তারা প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বিচরণ করতে পছন্দ করে। এই যৌনবিকৃতিও পাশ্চাত্যে ক্রমবর্ধমান

www.bjilibrary.com

হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমুদ্র সৈকত, সুইমিং পুল, পার্ক প্রভৃতি স্থানে প্রায় নগ্ন হয়ে বিচরণ করা অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী চলে আসছে। এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়। এখন অনেকে এসব স্থানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ক্যাম্প করে। ভার্জিনিয়ার হোয়াইট টেইল পার্কে ২০০৩ সালে নগ্ন তরুণ-তরুণীদের এরকম একটা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নগ্নদের তৃতীয় ক্যাম্প। [সূত্র: দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪। ০৩। ২০০৫]

জ] পরকীয় সম্পর্ক : পাশ্চাত্যে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত বৈপরিত্য রয়েছে। সেটা হল, বিবাহপূর্ব যৌনতায় [premarital sex] কোন বিধি-নিষেধ নেই; অথচ বিবাহ-পরবর্তী অবাধ যৌনতার [extramarital sex] ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা ফৌজদারী অপরাধ না হলেও নিন্দনীয় আচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। বিবাহিত নর-নারীর নিকট আশা করা হয় যে, তারা অন্য কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না; পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর প্রেরণা সে কোত্থেকে পাবে? একটা সময় ছিল— সেই সনাতন কালে— যখন ইজ্জতের মূল্য ছিল অপরিসীম। মানুষ জান দিত তবু ইজ্জত দিত না। অনেক সাধনা করে চেতনার জমিন থেকে সেই স্পৃহা সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে। সেখানে রোপন করা হয়েছে বৈচিত্রময় যৌনজীবনের চারা। সেই চারা যখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিরাট মহীরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সহসা দাবী করা হচ্ছেঃ ওটা উপড়ে ফেল। কিন্তু এ-তো এক অসম্ভব দাবী। তাই তো দেখি পাশ্চাত্যে পরকীয় সম্পর্ক দুর্লভ নয়। আমেরিকার 'দি রেড বুক সার্ভে' ১৯৭৮ সালে বিবাহ-পরবর্তী ব্যভিচারের উপর বিবাহপূর্ব ব্যভিচারের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য এক জরিপ পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, যে-সব বিবাহিতা নারী এই জরিপে অংশ নেয়, তাদের শতকরা ৩০ জনের স্বামী ছাড়াও অন্যের সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিল। এদের মধ্যে আবার ২৬ জন বিবাহের পূর্বেও যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। [সূত্র: Marriage and Family Development. Pp-35] অতএব দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে যে স্বাধীনতা তারা ভোগ করছে, তা ছেড়ে দিতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। এত দিন যা করেছ- করেছ, বিয়ের মন্ত্র পড়ার সাথে সাথে সৎ আর সতী হয়ে যাও— এটা সহজ তবে অবাস্তব দাবী [councel of perfection]।

বিবাহিত নর-নারীর এই ব্যভিচার সমাজে অনেক মারাত্মক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। এখানে তেমন কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

এক. শিশু নির্যাতন: অবাধ যৌনতার কারণে বিশেষ করে পিতৃকুলের অবচেতন মনে এক অবিশ্বাস দানা বাঁধে যা শিশু-কিশোরদের জন্য প্রভূত অকল্যাণ বয়ে আনে। সংসারে সন্তানের আগমনে পিতা-মাতার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত— এরকম দৃশ্য পাশ্চাত্যে বড় বিরল। সে সমাজে কোন পিতাই তার গৃহজাত শিশুকে আপন ঔরসজাত বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে না। একজন পুরুষ নিজে যেমন স্ত্রীর প্রতি পরিপূর্ণ নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত না হয়ে পরনারীর সঙ্গ উপভোগ করে থাকে, তেমনিভাবে অপর কোন পুরুষও তার নারীর [স্ত্রীর] সঙ্গসুখ উপভোগ করে না— এ নিশ্চয়তা সে কোথায়

www.bjilibrary.com

পাবে? নীতি-নৈতিকতার কাছে? সে-তো কোন্ কালে প্রবৃত্তির বেদীমূলে আত্মদান করেছে। আইনের কাছে? প্রবৃত্তির গতি নির্বিঘ্ন করতে সে-তো সেই কবে পথ করে দিয়েছে। বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সকল পথই রুদ্ধ। কার সন্তান কোন্ গৃহ আলো করছে সে হিসাব গোলমালে গুলিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মনের নিভৃত কোণে সংশয় যদি উঁকি দেয়, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কাক যদি বুঝত, নিজের অজ্ঞাতসারে সে সচরাচর কোকিলছানা পালন করে থাকে, তাহলে বাচ্চা পালনে তার যে নিষ্ঠা, তাতে নিঃসন্দেহে ভাটা পড়ত। সন্দেহ সম্পর্কের মধ্যে অদৃশ্য অথচ দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলে দেয়। মহামতি শেক্স্পিয়র যথার্থই বলেছেন:

"ঈর্ষা থেকে সাবধান!
এ হল সবুজ চোখের দানব
যে নিজের শিকার ধরে
আবার তাকেই ব্যঙ্গ করে।"[
Othello, Act III , Scene iii]

পিতার অবচেতন মনে যে সন্দেহ বিরাজ করে, তার প্রভাব স্বভাবতঃই তার আচরণের উপর পড়ে। এজন্য পাশ্চাত্যে বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর পিতাদের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। আমাদের হাতে এতদ্সংক্রান্ত যে তথ্য আছে তা রীতিমত আতঙ্কজনক। অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পাঠ্য পুস্তকে বলা হচ্ছে:

"অবিশ্বাস্যভাবে, প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ১ থেকে ২ মিলিয়ন [১০ থেকে ২০ লক্ষ] শিশু পদাঘাত, প্রহার কিংবা মুষ্ঠাঘাতের শিকার হয় তাদের পিতা-মাতা কর্তৃক, আর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড অন্য যে কোন প্রকার হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।" [Maladaptive Behaviour: an Introduction to Abnormal Psychology. p-334]

বিশ্বখ্যাত মাইক্রোসফট্ এর বিশ্বকোষে বলা হচ্ছেঃ

"যদিও শিশু নির্যাতনের ব্যাপকতা পরিমাপ করা কঠিন, তথাপি এটা একটা বড় সামাজিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশসমূহে।" [The Encarta Encyclopedia. Child Abuse]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিশু-নির্যাতন ও অবহেলা বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ জানাচ্ছে যে, প্রতি বছর ১৮ বছরের কম বয়স্ক প্রায় ২০০০ শিশু-কিশোর পিতা-মাতা কিংবা পরিচর্যাকারীর হাতে নিহত হয়। প্রতি বছর পানিতে ডুবে, পড়ে গিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, অগ্নিকাণ্ডের ফলে কিংবা গাড়ি দুর্ঘটনায় ৪ বছরের কম বয়স্ক যত শিশুর মৃত্যু ঘটে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক শিশু পিতা-মাতার নির্যাতন বা অবহেলায় মৃত্যুবরণ করে। প্রতি বছর ১৮,০০০ এর বেশি শিশু নির্যাতন বা অবহেলার কারণে চিরতরে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। [The Encarta Encyclopedia. Child Abuse.]

www.bjilibrary.com

দুই. পারিবারিক অশান্তি: পারিবারিক শান্তির অন্যতম পূর্বশর্ত হল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা। তাদের পরস্পরের প্রতি থাকতে হবে আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। এ-সবই সুখময় দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি। কিন্তু দাম্পত্য সুখের অপরিহার্য এই পূর্বশর্তগুলি সেই পরিবারে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য, যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী বৈচিত্রময় যৌনজীবন যাপনে আগ্রহী। স্বামী যদি তার সদ্য আবিষ্কৃত কোন উর্বশীর উষ্ণ সান্নিধ্য লাভের নেশায় মত্ত থাকে , তাহলে স্ত্রীর প্রতি অনাগ্রহী এবং উদাসীন হতে বাধ্য। উপপতির কল্পনায় বিভোর স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি নিরুৎসুক না হয়েই পারে না। এহেন বৈচিত্রবিলাসী স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি যে বিশ্বাসবোধ, তা ধসে পড়াটা অতি স্বাভাবিক। সন্দেহ আর অবিশ্বাস এককালীন উষ্ণ সম্পর্ককে করে শীতল, তিক্ত আর দুর্বিষহ। এ ধরনের পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্রমশ এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। একের অস্তিত্ব অপরের নিকট অসহ্য মনে হয়। এহেন পরিস্থিতিতে অনেক দাম্পত্য জীবন বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। যারা এর পরও বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে, তারা বড় বিপত্তিকর সময় অতিবাহিত করে। একে অপরকে আক্রমণ, প্রহার, লাঞ্ছিতকরণ তখন হয়ে ওঠে নৈমিত্তিক ঘটনা।

মার্কিন মুল্লুকের এগনেস এমনি এক পরকীয় সম্পর্কের অসহায় শিকার। তিনি একজন শিক্ষিকা। তার স্বামীও শিক্ষকতা করে। তিনি বলেন, বিয়ের কয়েক বছর পরে যখন তিনি তার স্বামীর বিছানায় এক তরুণীকে আবিষ্কার করেন, তখন থেকে শুরু হয় স্বামীর নির্যাতন। সে প্রত্যেক সন্ধ্যায় তাকে প্রহার করত। বেতনের টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিতে তাকে বাধ্য করা হত। তাকে দাসী-বান্দী বলে গালি দেওয়া হত। প্রায় দুই বছর ব্যাপী এই নির্যাতন চলেছিল। এ্যাগনেস এই প্রহারের ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ করেননি, এমনকি ঘনিষ্ঠজনদের কাছেও না। কারণ, তিনি বলেন, 'আমি খুবই আতঙ্কিত ছিলাম, এবং এতই বিব্রত বোধ করতাম যে, আমি চাইনি লোকে এটা জানুক।' [A New Psychology of Women. pp-426]

পশ্চিমা বিশ্বে এরকম এ্যাগনেস বিরল নয়। বরং এ এক অতি সাধারণ চিত্র। কলম্বিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০টি দেশে ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করে দেখা গেছে, প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন ঘনিষ্ঠ কোন পুরুষের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় [সূত্র: Social Problems. Annual Edition-02/03. p-92.] এটা কিন্তু খুব যথার্থ চিত্র নয়। নানা কারণে পারিবারিক মারপিটের অতি অল্প ঘটনাই পুলিশে রিপোর্ট করা হয়। অপরাধ বিজ্ঞানের এক বিখ্যাত পাঠ্য পুস্তকে বলা হচ্ছে:

"গবেষকগণ একমত যে, পরিবারের মধ্যে আক্রমণাত্মক আচরণ এমন অপরাধ যার রিপোর্ট করা হয় অত্যন্ত কম।" [সূত্র: Criminology. p-300]

সমাজবিজ্ঞানী এরিক গুডি বলেন: "পরিবারের সদস্যরা যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায় তা অচেনা লোদের দ্বারা সৃষ্ট সহিংসতার চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশি। পুলিশ এবং

www.bjilibrary.com

সেনাবাহিনীর কথা বাদ দিলে পরিবার হল সমাজের সর্বাপেক্ষা সহিংস প্রতিষ্ঠান।" [সূত্র: Deviant Behaviour. Pp-215]

এই যে বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন— এটা অবাধ যৌনতার সাথে সমানুপাতিক। অবাধ যৌনতার মাত্রাবৃদ্ধিতে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এর স্বাভাবিক পরিণতি যা হবার তা-ই হয়ে থাকে। অবিশ্বাসের পথ ধরে দাম্পত্য জীবনে আসে বিপর্যয়। যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতিমান মনোবিজ্ঞানীর বর্ণনায় সে দেশের অশান্ত পারিবারিক জীবনের এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছেঃ

"সকল সাংঘাতিক অপরাধের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক এবং দুর্বোধ্য হল পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি সংঘটিত অপরাধ। স্বামী-স্ত্রীর একের দ্বারা অন্যের প্রহৃত হওয়া, নিপীড়িত হওয়া কিংবা নিহত হওয়ার সংবাদ, বিশেষত পিতা-মাতার দ্বারা সন্তানের উপর এমনটি ঘটার সংবাদে আমরা গভীর মর্মযাতনা বোধ করি। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অবোধগম্য বিষয় হল এই যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত সন্ত্রাস , সকল সাংঘাতিক অপরাধের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষ্যনীয়।" [সূত্রঃ Maladaptive Behaviour: An Introduction to Abnormal Psychology. pp-334]

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ ও হানাহানির এক করুণ চিত্র ঐ একই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে এভাবেঃ

"সামগ্রিক পর্যালোচনা এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই মিলিয়ন [অর্থাৎ কুড়ি লক্ষ] স্বামী এবং সমান সংখ্যক স্ত্রী একে অপরকে বৎসরে অন্ততঃ একবার আক্রমণ করে। এর মধ্যে প্রায় ২,৫০,০০০ প্রহারের ঘটনা মারাত্মক হয়ে থাকে, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই, যদিও নারীরা সাধারণতঃ পুরুষদের তুলনায় অধিক আহত হয়ে থাকে।" [সূত্রঃ Maladaptive Behaviour: An Introduction to Abnormal Psychology. pp-334]

তিন. বিবাহ-বিচ্ছেদ: বিবাহবিচ্ছেদও অবাধ যৌনতার সাথে সমানুপাতিক। অবাধ যৌনতার ফলে সৃষ্ট সন্দেহ-অবিশ্বাসের কারণে বিপুল সংখ্যক বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সম্পর্কে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ডুভাল বলেন:

"সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, অধিকাংশ স্বামী এবং স্ত্রী দাম্পত্য বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতি এমন আবেগীয় প্রতিক্রিয়া দেখায় যে, তাতে বৈবাহিক সম্পর্কহানি ঘটে।" [সূত্র: Marriage and Family Development. pp-36]

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ব্যারন এবং ব্রাইন বলেন: "পুরুষ ও নারীর মধ্যে ঈর্ষার ব্যাপারেও পার্থক্য আছে, পুরুষ বেশি ঈর্ষাকাতর হয় যৌন অবিশ্বস্ততার ব্যাপারে, অথচ নারীর ঈর্ষা বেশি জোরালো হয় তার সঙ্গী অন্য কারো প্রতি আবেগের বন্ধনে আবদ্ধ হলে।" [সূত্র: Social Psychology: Understanding Human Interaction. pp-340]

মার্কিন সমাজে অবাধ যৌনতা প্রতিনিয়ত ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হচ্ছে। সেই সাথে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাও অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে। আমেরিকায় প্রতি বছর প্রয় ২.৪

www.bjilibrary.com

মিলিয়ন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আবার এক বছর সময়কালে ১.২ মিলিয়ন বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। অনেক যাচাই বাছাই করে অনেক মেলামেশার পরে যে জীবন সঙ্গী জুটানো হয়, বিবাহের দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে তার ৫০ % ই ভেঙ্গে যায়। [সূত্র: Social Psycholog: Understanding Human Interaction. pp-342] কানাডাতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের হার খুব বেশি। যৌন বিপ্লবের দশকে ১৯৬৮ সালে যেখানে ১০ হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল, মাত্র ২১ বছর পরে এসে সেই সংখ্যা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লক্ষ। [সূত্র: Teen Trends. Pp-30]

বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়াও অনেক দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এর কারণ হল এই যে, স্বামী বা স্ত্রী বৈচিত্রের সন্ধানে কোন সঙ্গী বা সঙ্গীনি জুটিয়ে নিয়ে চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে Duvall বলেন:

"পরিত্যাগের ঘটনা তখন ঘটে যখন স্বামী কিংবা স্ত্রী তার সঙ্গীকে ফেলে রেখে গৃহত্যাগ করে। প্রতি বছর সঙ্গী ত্যাগের ঘটনা এক মিলিয়নের মত [দশ লক্ষ] দাঁড়ায়। কিছু পলাতক কখনোই প্রত্যাবর্তন করে না; অপর কতক তত দিন দূরে অবস্থান করে, যতদিন গৃহের অবস্থা হতে সৃষ্ট বিরক্তি বা বিরাগ কাটিয়ে উঠতে না পারে।" [সূত্রঃ Marriage and Family Development. pp-435]

পাশ্চাত্যের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা প্রবৃত্তির লালায়িত রসনার তৃপ্তি বিধানে বড় বেশি তৎপর। তাই বৈচিত্রের নেশায় আজ তারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। আজ এক সঙ্গী নির্বাচন করছে, তার সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটাতে না কাটাতেই তার প্রতি নিরুৎসুক, আগ্রহহীন হয়ে পড়ছে। তারপর একদিন তাকে পরিত্যাগ করে নতুন কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে দু'দিনের খেলাঘর রচনা করে; দু'দিন পর সে-ও পরিত্যক্ত হচ্ছে।

চার. বিপর্যস্ত প্রজন্ম: স্বামী-স্ত্রী হয়ত অপর কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সান্নিধ্যে থেকে বৈচিত্রের স্বাদ আস্বাদন করে। কিন্তু তাদের মুখাপেক্ষী, অসহায় সন্তানগুলো বড় বিপত্তির মধ্যে পড়ে যায়। তারা বাধ্য হয়ে একজন মাত্র অভিভাবকের সন্নিধানে থেকে লালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত শিশু আছে, তার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি তাদের প্রকৃত পিতা-মাতা [biological parents] উভয়ের সাথে বসবাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। [সূত্রঃ Social Psychology: Understanding Human Interaction. pp-344] কানাডায় এই হার প্রতি চার জনে একজন। [সূত্রঃ Teen Trends.pp-30] এর মূল কারণ হল, হয় পিতা নয়ত মাতা পারিবারিক জীবনে পদাঘাত করে নিরুদ্দেশ হয়। সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে সৃষ্ট স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা আজ পশ্চিমা নর-নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্তানের জন্য ভাববার সময় কোথায় তাদের? এই হতভাগ্য সন্তানদেরকে তাদের পরিবার সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে তারা যা বলে তা নিম্নরূপঃ

- আমার পিতা-মাতা বিবাহিত; কিন্তু তারা আলাদা থাকেন। আমি মায়ের সাথে থাকি।

www.bjilibrary.com

- আমার পিতা আবারো বিয়ে করেছেন; মা-ও আরেকবার বিয়ে করেছিলেন কিন্তু এখন তালাকপ্রাপ্তা।
- মা কখনো আমার সত্যিকারের পিতাকে বিয়ে করেননি, যদিও এখন তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহিতা।
- তারা কখনোই বিয়ে করেননি। এটা বিয়ে করার মতই।
- তিনি আমার প্রকৃত পিতা নন, কিন্তু পিতা বলে কেবল তাকেই চিনি।
- আমি পিতা-মাতার সাথে থাকি। আর তারা একত্রে বাস [live together] করেন। কিন্তু তাদের আসলে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, আর তাদের প্রত্যেকের একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী আছে। [সূত্রঃ Teen Trends. Pp-31]

একক অভিভাবকের সান্নিধ্যে লালিত শিশুর স্নেহ-তৃষ্ণার পূর্ণ নিবৃত্তি কখনোই হয় না। দিনের কর্মব্যস্ততাই এ পথে প্রধান বাধা। শত ব্যস্ততার মাঝে অপত্যস্নেহের তাকিদ দুঃখজনকভাবে চাপা পড়ে যায়। দায়িত্বের দুঃসহ বোঝা অপসারণের সুযোগ যখন মেলে, তখন ক্লান্তি এসে দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলে। একক অভিভাবক যথেষ্ট আয়েশে তার সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন, কিন্তু চাইলেই তার শিশুহৃদয়ে স্নেহবারি সিঞ্চন করতে পারেন না। ফলে স্বভাবতঃই এ সকল শিশুর বিকাশন প্রক্রিয়ায় আবেগীয় শূণ্যতার প্রভাব পড়ে।

পরিবারই হল শিশুর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই মাধ্যমের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন তখন দায়িত্বসচেতন, ভারসাম্যপূর্ণ প্রজন্ম আশা করাটা বাতুলতা মাত্র। শিশু জীবন ও জগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করে মূলত: তার পিতা-মাতার নিকট থেকে। যখন সে পিতা-মাতাকে কর্তব্যপরায়ণ না পেয়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পায়, সন্তানের প্রতি স্নেহবৎসল না পেয়ে যৌনসঙ্গীর প্রতি কাম-উচ্ছল পায়, তখন স্বভাবতঃই সে জগত সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কানাডার মন্ট্রিলবাসী ১৬ বছর বয়সী খুব চিন্তাশীল এক তরুণী তার জীবন-ভাবনা এভাবে তুলে ধরেছে:

আমরা যত বেশি বাঁচি, জীবন তত
বেশি বিরক্তিকর হয়ে যায়
জীবন হল কালো
এটা এক কৃষ্ণ গহ্বর
নোংরা, খাদযুক্ত
দূষিত জগতের বুকে
এক কলুষিত বিন্দু
আমি হারিয়ে যেতে চাই
কোন এক কৃষ্ণ বিবরে
আর বেরিয়ে আসতে চাই
বিপরীত দিক দিয়ে

১৭—

www.bjilibrary.com

যেখানে সব কিছুই সুন্দর
কোন আত্মহত্যা নেই
সহিংসতা নেই, দূষণ নেই
যুদ্ধ নেই, কালো নেই। [Teen Trends. Pp-78]

পাঁচ. মানসিক সমস্যা: যৌবনের উদ্দামতায় নর-নারী জীবনের কিছুটা সময় উপভোগ করতে পারে সন্দেহ নেই। তবে তারা তাদের সন্তানদের জন্য জগতটাকে বড় বিস্বাদ করে তোলে । অনাদর, অবহেলার মধ্য দিয়ে লালিত হচ্ছে এসব সন্তান। ফলে স্বভাবতঃই এসব শিশুর মানসিক বিকাশ প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবারই হল শিশুর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন, তখন দায়িত্ববান, ভারসাম্যপূর্ণ প্রজন্ম আশা করাটা অযৌক্তিক । নষ্টনীড়ের বাচ্চা যে নষ্ট হয়— এটা মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সর্বজন স্বীকৃত সত্য। তাই তো পাশ্চাত্যে মানসিক ব্যাধির এত ব্যাপকতা। ২০০৪ সালে আমেরিকায় মানসিক ব্যাধির উপর এক জরিপ চালানো হয়। এতে দেখা যায়, ২ কোটি ৯০ লক্ষ লোক mood disorder এ [যেমন- major depressive disorder, dysthymic disorder, bipolar disorder] , ৪ কোটি লোক anxiety disorder এ [যেমন- panic disorder, obsessive-compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, generalized anxiety disorder এবং নানা রকম phobia] তে ভুগছে। এছাড়াও রয়েছে schizophrenia, eating disorder, attention deficient hyperactivity disorder [ADHD] ইত্যাদি। [সূত্রঃ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition.]

ছয়. আত্মহত্যাঃ অনাদর, বঞ্চনা, বিচ্ছেদ প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট জীবন যন্ত্রণার কারণে ভগ্ন পরিবারের সন্তানদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। জীবন ও জগত সম্পর্কে মোহমুক্ত তরুণেরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। জীবন থেকে একের পর এক আপনজনকে বিদায় জানানোর ফলে জীবন হয়ে পড়ে তিক্ত, বিস্বাদ। একজন মার্কিন চিকিৎসক চমৎকার বলেছেন-

"আমি নিশ্চিত, অধিকাংশ রোগী সানন্দে তিন দিন অক্সিজেন তাঁবুতে অচেতন পড়ে থাকা পছন্দ করবে তথাপি চেতনার সাথে একটি দিন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত হবে না যেখানে [জীবন থেকে কাউকে না কাউকে] বিদায় জানাতে হয়।" [সূত্রঃ Marriage and Family Development. Pp-417]

শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ ইউরি ব্রনফেন ব্রেনার বলেন:

"বিগত দুই দশকে তরুনদের মধ্যে আত্মহত্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাবার জন্য আমেরিকার পরিবারসমূহের ভাঙ্গন দায়ী।" [সূত্র: Ibid, pp-457]

www.bjilibrary.com

মনোবিজ্ঞানের এক বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক আমাদেরকে জানাচ্ছে, ১৯৫০ সালের পর থেকে মার্কিন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যা ৬০০% এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। [সূত্র: Psychology: An Introduction. Pp-420]

সাত. মাদকাসক্তি: ভঙ্গ পরিবারের শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এদের অনেকেই পলায়নপর মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা সমাজ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে। এদের অনেকে হয় মাদকাসক্ত। উন্নত বিশ্বের পুরোধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হৃদ্‌রোগ এবং ক্যান্সারের পরে মাদকাসক্তি হল মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ। এই দেশটিতে প্রতি বছর ২ লক্ষ নতুন নাম মাদকাসক্তের [সাধারণ মদ্যপায়ী নয়] তালিকায় যুক্ত হয়। মাদকাসক্তি মার্কিন সমাজকে এতটাই বিপর্যস্ত করে তুলেছে যে, এটাকে তারুণ্যের বেদনা [teen age tragedy] বলা হয়।[সূত্রঃ Abnormal Psychology and Modern Life. Pp-416]

আট. অপরাধ প্রবণতা: নষ্টনীড়ের সন্তানদের মধ্যে মানসিক কাঠিন্য, ক্ষোভ এবং তজ্জনিত অপরাধ প্রবণতাও প্রকট। এসব পরিবারের সন্তান হয় উদ্ধত এবং দুর্বিনীত। একজন মনোবিজ্ঞানী এ সম্পর্কে আমাদের নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করছেন:

"সমাজবিরোধী আচরণের সাথে অশান্ত পারিবারিক পরিবেশের সম্পর্ক সুপ্রমাণিত। গ্রীয়ার লক্ষ্য করেছেন যে, সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্বের একটি নমুনার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগের শৈশব অভিজ্ঞতায় আছে পিতা-মাতা কোন একজনকে হারানো— যার কারণ সমূহ হল বিবাহবিচ্ছেদ, পরিত্যাগ কিংবা মৃত্যু।" [Maladaptive Behaviour: An Introduction to Abnormal Psychology. pp-334—335.]

সাউদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ম্যানগোল্ড এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন:

"স্বাভাবিক আচরণের অভ্যাস গঠনের জন্য যে সকল স্থিতি উপাদান প্রয়োজন, ভেঙ্গে যাওয়া সংসারে সচরাচর তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দুষ্কৃতির সাথে ভেঙ্গে যাওয়া সংসারের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যত অধিক গৃহ ভগ্নাবস্থায় থাকবে, দুষ্কৃতিকারীর সংখ্যাও তত অধিক হবে।" [Problems of Child Welfare, pp-375.]

১৯৬০ সালের পর থেকে আমেরিকায় বিভিন্ন অপরাধের হার ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। [The Worldbook Encyclopedia. Crime] প্রতি ২ সেকেন্ডে একটা গুরুতর অপরাধ [serious crime] এবং প্রতি ১৬ সেকেণ্ডে একটা মারাত্মক অপরাধ [violent crime] সংঘটিত হয়।

পশ্চিমা জগত আজ অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। স্বস্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা আজ সেখানে সোনার হরিণ। যে সমাজ নতুন প্রজন্মকে সাদর অভ্যর্থনা না জানিয়ে বঞ্চনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করছে, সে সমাজের ওপর উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করছে নতুনেরা। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক সমাজের সুখ-স্বপ্নকে তছনছ করে দিচ্ছে ওরা। এভাবে

www.bjilibrary.com

পাশ্চাত্যে যৌনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী যত 'উদার' হচ্ছে, পারিবারিক অশান্তি এবং বিবাহ বিচ্ছেদ তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে অসহায়-বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা। বৃদ্ধি পাচ্ছে মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি। যত অধিক গৃহদাহ, তত অধিক ক্ষতধারী— সমানুপাতিক।

মুসলিম বিশ্বের অতীত ও বর্তমান: এক সময় মুসলিম জাতি শৌর্য-বীর্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিল। অমুসলিম ঐতিহাসিকদেরও অকপটে একথা স্বীকার করতে হয়েছে। পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমে স্পেন— এই সুবিশাল ভূখণ্ড মুসলিমদের পদানত ছিল প্রায় সাত-আটশ বছর। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জনক এম, এন, রায় বলেন, "মুসলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা এই অতীত ঋণের কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেন না।" [সূত্রঃ The Historical Role of Islam. pp- 90] বিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, "বিজ্ঞান হল আধুনিক বিশ্বের প্রতি আরব সভ্যতার সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান।" [Making of Humanity. Quoted in 'Wisdom of Prophet Muhammad'. pp-73] মুসলিম জাতি এই ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল পর্দাহীনতার মাধ্যমে নয়, বরং পর্দা-ব্যবস্থা এই উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সময়-শ্রম, মেধা-মনন সবকিছু প্রয়োগ করেছিল আত্মার পরিশুদ্ধি এবং জাতীয় উন্নয়ণে, পরস্পরকে আকৃষ্ট করণে কিংবা অভিসার-ব্যভিচারে নয়।

অন্যান্য সভ্যতার মত মহিমাণ্বিত ইসলামী সভ্যতার অবনতির মূলেও ছিল পর্দাহীনতা। এর সূত্রপাত হয়েছিল রাজপ্রাসাদসমূহে। রাজা-বাদশাহরা যখন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের পরিবর্তে নর্তকী-রক্ষিতাদের সাহচর্যে থাকা বেশি পছন্দ করতে লাগল, তখনই মূলতঃ সর্বনাশের বীজটা বপন করা হল। সুরা-নারীতে আসক্ত বিলাসী রাজপুরুষেরা এতটাই হীনবীর্য হয়ে পড়ল যে, আপন রাজ্য রক্ষাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফলে একের পর এক রাজ্য তাদের হাতছাড়া হতে লাগল। অন্যদিকে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষতকার অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতিও স্থবির হয়ে পড়ল। এভাবে এককালের বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতি শক্তিতে এবং জ্ঞানে হয়ে পড়ল পশ্চাদ্‌পদ।

এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুসলিম মানসে জন্ম নিল হীনমণ্যতা। তারা বিজয়ী জাতিসমূহকে সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিল। তাদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি অর্জন সম্ভব বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিল। আজ মুসলিম মানস পাশ্চাত্যের দাসত্বের নিগড়ে অসহায়ভাবে বাঁধা পড়ে গেছে। ওরা যে তত্ত্ব আওড়াচ্ছে, এরা তৎক্ষণাৎ তার প্রতিধ্বনি করছে। কোন রকম বিচার-বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা করবার প্রয়োজন তারা বোধ করছে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ যারা, তাদের থেকে এটা এসেছে; অতএব ভেবে কালক্ষেপন করা কেন? ওরা যখন কোন ইসলামী বিধানের সমালোচনা করছে, এরাও নির্দ্বিধায় কণ্ঠ মেলাচ্ছে। ওরা বলছে, "পর্দা তো অবরোধ, নারীর জন্য

www.bjilibrary.com

অবমাননাকর।" এরা বলছে, "এক্কেবারে খাঁটি কথা!" ওরা বলছে, "জাতীয় উন্নয়ণে নারীকে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মেলাতে হবে।" এরা বলছে, "হে নারী! বেরিয়ে এসো, কাঁধে কাঁধ মেলাই।" পশ্চিমা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চেতনার দাসত্ব বরণকারী এসব লোকগুলো যে সোজা কথাটি বুঝতে পারছে না তা হল, ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি সমাজকে কাঙ্খিত শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারেনি। বরং বৈজ্ঞানিক আবিস্কার যথা সিনেমা, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কোন নীতিমালা না থাকায় এগুলো নির্লজ্জতা, ব্যভিচার, বলাৎকার, অজাচার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমেরা আজ ইসলামী মূল্যবোধের ধ্বংসস্তুপের উপরে পশ্চিমা ধাঁচের সমাজ নির্মাণে বদ্ধপরিকর। শতাব্দীকাল ব্যাপী এই প্রয়াস চলে আসছে যার ফল কয়েক যুগ আগে থেকেই ফলতে শুরু করেছে। মুসলিম দেশগুলিতে আজ পর্দাহীনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা। এর পথ ধরে ব্যভিচার, গর্ভপাত, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌন-বাহিত রোগ প্রভৃতিও ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করছে। পাশ্চাত্য যেখানে চরমভাবে ব্যর্থ, সেখানে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সফলতা আসবে— এটা আশা করা বাতুলতা।

পর্দা: সমাজ-সভ্যতার রক্ষাকবচ— ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা সমাজ-সভ্যতাকে বিপর্যয়, এমনকি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ তা যেমন মানব জাতিকে রক্ষা করবার জন্য অপরিহার্য, তেমনি এই আকর্ষণ যদি হয় নিয়ন্ত্রণহীন, তবে তা কোন সভ্যতার অপমৃত্যুর কারণ হতে পারে। যুগে যুগে নানা সভ্যতা এ-কথারই প্রমাণ বহন করছে। নারী-পুরুষের এই আকর্ষণকে কল্যাণের পথে চালিত করে একটি সুখী সমাজ এবং মহান সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য ইসলাম এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটিই হল পর্দা। এর সারকথা হল, বিবাহে বাধা নেই এমন নারী-পুরুষ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবে না; সৌন্দর্য-সৌষ্ঠব দিয়ে পরস্পরকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করবে না; চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদে থাকবে শালীনতা ও লজ্জাশীলতার ছাপ। এখানে ইসলামের এই মহান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

ক] পর্দা পোশাকে সীমাবদ্ধ নয়: পর্দাকে অনেকে পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। আলোচনার শুরুতেই এই ভুল ধারণার অবসান হওয়া দরকার। আসলে পর্দার পরিধি ব্যাপক; অবচেতন মনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এর লক্ষ্য হল অন্তরে সদাজাগ্রত এক চেতনা সৃষ্টি করা যেন একজন মু'মিন চিন্তায়, আচরণে এবং পোশাকে নিজেকে লজ্জাশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে নেয়, যেন বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কোনভাবে আকৃষ্ট করা কিংবা তার দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে।

www.bjilibrary.com

চিন্তা-চেতনার সংস্কার সাধন এবং লজ্জাশীলতা সৃষ্টি যে পর্দার লক্ষ্য, সেটি পরিষ্কার হয়ে যায় তিরমিযী শরীফের একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু উমার [রা]। রাসূল [সা] বলেছেন: তোমরা কখনো উলঙ্গ হবে না। কেননা, তোমাদের সাথে ফেরেশতাগণ রয়েছেন, যারা তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হন না তোমাদের পায়খানা-প্রস্রাব ও স্ত্রী-সহবাসের সময় ব্যতীত, সুতরাং তাদেরকে লজ্জা করবে এবং তা'যীম করবে। [সূত্রঃ মেশকাত শরীফ। ৬ষ্ঠ খণ্ড] এখানে আমরা লক্ষ্য করছি, নির্জনে উলঙ্গ হওয়াকেও ইসলাম অপছন্দনীয় কাজ মনে করে। অন্তরের এই লজ্জাশীলতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটিকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত ইবন্ উমার [রা] বলেন: লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যখন ঐ দু'টির একটি তিরোহিত হয়ে যায়, তখন আরেকটিও সাথে সাথে বিদায় নেয়। [সূত্রঃ আল-আদাবুল মুফরাদ]

অন্তরকে কু-চিন্তা থেকে পবিত্র রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-জন্য বিশ্বনবী [সা] বলেছেন: তোমাদের কেউ যদি কোন মহিলাকে দেখে ফেলে আর তাকে পছন্দনীয় মনে হয়, তবে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়। কেননা, স্ত্রীরও তা আছে যা এ-মহিলার আছে। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ। শিশুদের দুগ্ধপান অধ্যায়] তাছাড়া, রাসূল [সা] মহিলাদের উপদেশ দিয়েছেন: একজন নারী আরেকজন নারীর সাথে দেখা সাক্ষাতের পর স্বামীর কাছে গিয়ে তার [রূপ-সৌন্দর্যের] বর্ণনা এমনভাবে করবে না, যেন সে [স্বামী] তাকে দেখতে পাচ্ছে। [সূত্র: বুখারী শরীফ। বিয়ে-শাদী অধ্যায়।] কোন নারী এমনটা করলে স্বামীর অন্তরে সেই প্রশংসিত নারীর প্রতি আসক্তি জাগতে পারে; এটা অন্তরের পবিত্রতার পরিপন্থী।

একজন মু'মিন সব সময় আপন অন্তরকে শালীনতা ও লজ্জাশীলতার আবরণে আবৃত রাখবে— এটাই ইসলামের লক্ষ্য। সে এমন কোন আচরণ করবে না যাতে অন্যের লজ্জাশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-জন্যই আল্লাহ্ তা'লা পরিবারের সদস্যদেরকেও হুট করে একে অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন বিশেষ করে বিশ্রামের সময়ে [যেমন ফজরের নামাজে আগে, দুপুরে এবং ঈশার নামাজের পরে]। [সূত্রঃ আল কুরআন- সূরা নূর, আয়াত-৫৮] কারো ঘরে— তা সে পিতা-মাতা হোক, ভাই-বোন হোক, কিংবা সন্তান হোক— তার অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করাটাকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশালীন আচরণ গন্য করা হয়। একবার এক ব্যক্তি হযরত হুযাইফা [রা]-কে প্রশ্ন করল, 'আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতেও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করব?' উত্তরে তিনি বললেনঃ 'যদি তুমি তাঁর কাছে যেতে অনুমতি না চাও, তবে এমন অবস্থা তোমার চোখে পড়তে পারে যা দেখতে তুমি পছন্দ কর না।' [সূত্র: আল-আদাবুল মুফরাদ] অন্য এক হাদিসে হযরত জাবির [রা] বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি তার পুত্রের কক্ষে প্রবেশ করতেও তার অনুমতি চাইবে। তার মাতার কক্ষে প্রবেশ করতে, যদিও তিনি বৃদ্ধা হন, এমনকি তার ভাই, বোন ও তার পিতার কক্ষে প্রবেশ করতেও অনুমতি চাইবে। [সূত্র: আল-আদাবুল মুফরাদ] আচরণগত পর্দার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, নারীদেরকে একাকী সফর থেকে বিরত রাখা।

www.bjilibrary.com

রাসূল [সা] বলেছেনঃ কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া এক রাতের দূরত্ব সমান সফর করাও বৈধ নয়। [সূত্রঃ আবু দাউদ শরীফ। হজ্জ এর নিয়ম-পদ্ধতি অধ্যায়]

খ] পর্দা পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য: পর্দা সম্পর্কিত আরেকটি ভুল ধারণা হল এটি মনে করা যে, পর্দা শুধু নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের এই বিধান পুরুষের জন্যও বাধ্যতামূলক। বলতে কি, পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশ নারীর আগে পুরুষকে প্রদান করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন-

"মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ্ সে-বিষয়ে সম্যক অবহিত।" [সূত্র: আল কুরআন- ২৪: ৩০]

পুরুষের দৃষ্টি সংযতকরণ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা হাদিস গ্রন্থে পাই। হযরত বুরাইদা [রা] বর্ণনা করেন, রাসূল [সা] একদা হযরত আলী [রা]-কে বলেন: আলী, হঠাৎ একবার দেখার পর পুনরায় দেখো না। কেননা, তোমার জন্য প্রথমবারের অনুমতি রয়েছে এবং দ্বিতীয়বারের অনুমতি নেই। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ। সংকলিত- মেশকাত শরীফ। ৬ষ্ঠ খণ্ড। হাদিস নং-২৯৭৬]

ব্যভিচারমুক্ত, পবিত্র সমাজ-জীবন নিশ্চিত করার জন্য দৃষ্টিকে সংযত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নর-নারী পরস্পরের প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকলে কিংবা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে তারা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে, অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, সান্নিধ্য লাভের বাসনা জাগবে। এভাবে ক্রমশঃ অবাধ মেলামেশা অনিবার্য হয়ে পড়বে আর এ-পথে ব্যভিচার এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি সমাজকে গ্রাস করবে। এ-জন্য মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল [সা] নর-নারীকে দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ-নির্দেশ পুরুষকে প্রথমে দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি আগ্রাসী, কম লজ্জাশীল। দৃষ্টিঘটিত পাপও পুরুষ বেশি করে থাকে।

পুরুষের চোখের পর্দা তথা দৃষ্টি সংযত করণের আরো কিছু ক্ষেত্র ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন, কারো বাড়িতে বা ঘরে উঁকি ঝুকি মারা ইসলামের দৃষ্টিতে খুব গর্হিত অপরাধ। রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর গোলাম সাওবান [রা] বলেন, নবী করীম [সা] বলেছেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বিনা অনুমতিতে কারো অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করা বৈধ নয়। যদি সে এরূপ করে, তবে সে যেন তাতে প্রবেশই করল।[সূত্র: আল-আদাবুল মুফরাদ]

হযরত আবু হুরাইরা [রা] বলেন, নবী করীম [সা] বলেছেন: তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন ব্যক্তি তোমার ঘরে উঁকি দেয় আর তুমি তার চক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তার চোখ কানা করে দাও, তবুও তোমার কোন দোষ হবে না। [সূত্রঃ আল-আদাবুল মুফরাদ]

পোশাকের পর্দা থেকেও পুরুষকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা তার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একদা রাসূলুল্লাহ্ [সা] মা'মার ইবনে

www.bjilibrary.com

আব্দুল্লাহ্‌র নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর উভয় রাণ খোলা ছিল। তিনি বললেনঃ মা'মার, তোমার রাণ ঢাকো। কেননা রাণদ্বয় আবরণীয় অঙ্গ। [সূত্রঃ মেশকাত শরীফ। ৬ষ্ঠ খন্ড। হাদিস নং-২৯৮০]

হযরত জারহাদ ইবনে খুওয়াইলেদ [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ [সা] একদা আমাকে বললেনঃ জারহাদ, তুমি জানো না যে, রাণ আবরণীয় অঙ্গ? [সূত্র: তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ। সংকলিত- মেশকাত শরীফ। ৬ষ্ঠ খণ্ড। হাদিস নং-২৯৭৮]

পর্দা-ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য পুরুষের আচরণকেও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। মুসলিম পুরুষের প্রতি নির্দেশ হল, সে হুট্‌ করে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে না। প্রথমে তাকে অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম হল গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা। সালামের জবাব পেলে বুঝতে হবে, অনুমতি মিলেছে। অন্যথায় তাকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিচ্ছেন-

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে তাদের সম্মতি না নিয়ে ও সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করো না। এটি তোমাদের জন্য উত্তম বিধান। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।" [সূত্রঃ আল কুরআন। সূরা নূর, আয়াত- ২৭]

মুসলিম পুরুষের প্রতি আরেকটি নির্দেশ হল, সে নির্জনে এমন কোন নারীর সাথে সাক্ষাৎ করবে না, যার সাথে বিবাহে তার কোন বাধা নেই। নর-নারীর নিভৃতে মেলামেশা চলতে থাকলে পদস্খলন ঘটা অসম্ভব নয়। বরং যে-সব সমাজে নর-নারীর এরকম সাক্ষাৎ দূষণীয় মনে করা হয় না, সেখানে সচরাচর সংযম টুটে যায়, পদস্খলন ঘটে যায়। তাছাড়া, তেমন কিছু না ঘটলেও সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, কোন দুর্মুখ ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ রটানোর সুযোগ পেয়ে যায়। এতে করে স্বামী বা স্ত্রীর মনে সংশয় জন্ম নিতে পারে এবং সুখময় দাম্পত্য জীবনের সমাধি রচিত হতে পারে। এজন্য মহানবী [সা] নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তোমরা বিবাহ করা বৈধ এরকম নারীর সাথে গোপনে ও একাকীত্বে মিলিত হবে না। আল্লাহ্‌র শপথ, যেখানেই একজন পুরুষ একজন ভিন্‌ মেয়েলোকের সাথে মিলিত হবে, সেখানেই তাদের দুজনের মধ্যে শয়তান অবশ্যই প্রবেশ করবে ও প্রভাব বিস্তার করবে।" অন্য একটি হাদিসে উকবা ইবনু আমের [রা] বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ [সা] বলেছেন: [গাইর মাহরাম] মহিলাদের কাছে একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। [সূত্রঃ বুখারী শরীফ। বিয়ে-শাদী অধ্যায়]

গ. নারীর জন্য পর্দার বিধান : পর্দার বিধানে পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষেত্রে বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটিই স্বাভাবিক, এটিই যৌক্তিক। দুর্বলতা যেখানে বেশি, সতর্কতার প্রয়োজনও সেখানে বেশি। মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নীতি মেনে চলে। যে উদ্ভিদে গবাদি পশু মুখ দেয় না, তাকে কেউ বেষ্টনীবদ্ধ করে না। গরু-ছাগলের খাদ্য যে উদ্ভিদ, তাকেই বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয়। যে-সব সম্পদ মূল্যবান, তা-ই সযত্নে আগলে রাখা হয়; যত্রতত্র ফেলে রাখা হয় না। নারী সুন্দর [fair sex], নারী শারীরিকভাবে দুর্বল [weaker sex]; তাই তার আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বেশি।

www.bjilibrary.com

অতএব, তাকে আগলে রাখার প্রয়োজনও বেশি। পর্দা সংক্রান্ত প্রথম কুরআনী নির্দেশে এ-কথাটিই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিচ্ছেন-

"হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটি অতি উত্তম ব্যবস্থা যেন তাদের [সচ্চরিত্রা নারী হিসাবে] চিনতে পারা যায় এবং উত্যক্ত করা না হয়।" [সূত্রঃ আল কুরআন। সূরা-আহ্যাব, আয়াত-৫৯]

পর্দাহীন নারীর সম্ভ্রম যে কত অরক্ষিত এবং সে যে কতভাবে নির্যাতিত হতে পারে তার কিছু চিত্র আমরা পাশ্চাত্য সমাজে লক্ষ্য করেছি। ইসলাম নারীকে পাশ্চাত্য সমাজের মত অবমাননাকর অবস্থায় দেখতে চায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা অনেক উচ্চে। তার সম্ভ্রম-শালীনতার গুরুত্ব অনেক বেশি। নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে ইসলাম অত্যন্ত যত্নবান। নারীর সম্মানের প্রতি সামান্য আঘাতও এই মহান জীবনাদর্শ বরদাশত করে না। তাই তো দেখি, কুরআন পাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কেউ যদি কোন সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ দেয় এবং সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তাকে আশিটা কষাঘাত করতে হবে এবং কখনও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীকে কিন্তু এরকম শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। যাহোক, পর্দা হল নারীর নিরাপত্তা এবং মান-সম্ভ্রমের রক্ষা-কবচ।

পর্দা-ব্যবস্থা সফল করতে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরি। আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি, পুরুষকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীকেও এই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়নি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে।" [সূত্রঃ আল কুরআন। সূরা-আন নূর, আয়াত-৩১]

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর কিছুটা ছাড় রয়েছে। পুরুষের জন্য কোন নারীর প্রতি একাধিকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ বা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা বৈধ নয়। এ-ব্যাপারে মনীষীগণ সবাই একমত। কিন্তু নারী কোন গায়ের মাহ্রাম পুরুষের প্রতি তাকিয়ে থাকতে পারে কি-না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একদল মনে করেন, মহানবী [সা] যেহেতু একবার তাঁর স্ত্রী উম্মু সালমা [রা] ও মাইমুনা [রা]-কে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম [রা] থেকে পর্দা করতে বলেছিলেন [কারণ, উক্ত সাহাবী দেখতে না পেলেও নবীপত্নীরা তাঁকে দেখছিলেন], সেহেতু নারীদের পক্ষে পুরুষদের দিকে তাকিয়ে থাকা বৈধ নয়। অপর দলের দলিল হল সেই হাদিস যেখানে রাসূল [সা] আয়িশা [রা]-কে সুযোগ দিয়েছিলেন কয়েকজন সাহাবীর অস্ত্রচালনা দেখবার। অতএব, তারা মনে করেন, পুরুষের অলক্ষ্যে নারী তাদেরকে দেখতে পারে। মুফতী মুহাম্মাদ শফী [রহ] উভয় মতের সমন্বয় সাধন করেছেন এ-ভাবে-

www.bjilibrary.com

"এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে [নারী কর্তৃক পুরুষকে] দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম।" [সূত্র: তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন। সূরা নূর এর ৩১তম আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র:]

আসলে দৃষ্টিপাত থেকে জাগে আকর্ষণ আর তা থেকে ঘটে পদস্খলন। তাই রাসূল [সা] অসংযত দৃষ্টিপাতকে "শয়তানের তীর" বলে অভিহিত করেছেন।

শালীনতাপূর্ণ পবিত্র চিন্তা-চেতনার অনুকূলে সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্য ইসলামের আরেকটি পদক্ষেপ হল সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত রাখা। বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে আকৃষ্ট করার এটা মোক্ষম হাতিয়ার। ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই দেখা যায়, নারী নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। যাহোক, এভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শন চলতে থাকলে সমাজ থেকে না ব্যভিচার নির্মূল করা সম্ভব, না অশান্তি । গোটা বিশ্বে এমন জাতি মেলা ভার, যাদের ইতিহাসে সুন্দরী নারী নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়নি। সুন্দরী হেলেনকে নিয়ে পালিয়েছিল ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস, এর ফলে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল; সুন্দরী পদ্মাবতীর জন্য চিতোরে অনেক রক্ত ঝরিয়েছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিন কোন না কোন করুণ ঘটনা প্রকাশিত হয় যার মূলে রয়েছে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ। কখনো দেখি এক সুন্দরী কোন এক যুবককে প্রত্যাখ্যান করায় এসিড-সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে, কখনো-বা একদল যুবক কোন এক সুন্দরীকে অপহরণ করে পালাক্রমে বলাৎকার করেছে, আবার কখনো মনোহারিনীকে জীবন-সাথী হিসাবে না পেয়ে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। এরকম আরো অনেক করুণ ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণই এর মূল কারণ। তাই ইসলাম এটা নিয়ন্ত্রিত করেছে। যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ কিংবা যেসব শিশুরা নারীদের গোপনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধ নেই। কিন্তু যাদের সঙ্গে বিবাহে বাধা নেই, তাদেরকে রূপের জালে আটকানোতে বাধা আছে। এ-ব্যাপারে আল্লাহ নারীদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেনঃ

"তারা [নারীরা] যেন যা স্বতঃই প্রকাশ পায়, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তারা যেন মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে। . . . তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। [সূত্রঃ আল কুরআন। সূরা-আন্ নূর, আয়াত-৩১]

আল কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

"তোমরা জাহেলি যুগের নারীদের মত নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়িও না।" [সূত্র: সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩৩]

এসম্পর্কে রাসূল [সা] বলেন : যে নারী তার পরিবারের লোকদের বাইরে সুসজ্জিতা হয়ে ঠাক-ঠমকে চলে, তার উদাহরণ হল কিয়ামাতের দিবসের আঁধারের মত। সে-দিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ। শিশুদের দুগ্ধপান অধ্যায়।]

www.bjilibrary.com

পারিবারিক পরিবেশেও নারীকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাকে তো সতর [অর্থাৎ মুখমণ্ডল এবং কব্জি থেকে হাত পর্যন্ত বাদে গোটা দেহ] আবৃত রাখতেই হবে, এছাড়াও তাকে অন্তরের পর্দা তথা লজ্জাশীলতা এবং আচরণগত পর্দাও মেনে চলতে হবে। নইলে পরিবারেও পদস্খলন বা বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে দেবরদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। কারণ, একজন নারীর এখান থেকে বিপর্যয়ের আশংকা তুলনামূলকভাবে বেশি। 'দেবরের সাথে অনৈতিক সম্পর্কের কারণে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদান', 'ভাবীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরঃ ভাইয়ের হাতে ভাই খুন', 'স্বামী-সন্তান ছেড়ে দেবরের হাত ধরে ভাবীর পলায়ন'— এধরণের খবর সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিন চোখে পড়ে। এগুলো সবই হল অসচেতনতা বা পর্দাহীনতার ফল। এজন্য মহানবী [সাঃ] দেবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেনঃ 'দেবর তো মৃত্যুতুল্য।' অর্থাৎ মৃত্যুকে যেমন মানুষ ভয় পায়, এড়িয়ে চলতে চায়, দেবরের ক্ষেত্রেও তেমনটি করা উচিত।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ছাড়াও আকর্ষণের আরো অনেক পন্থা রয়েছে। এগুলোর সবই ইসলামে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এখানে তেমন কিছু বিধি-নিষেধ উল্লেখ করা হলঃ

পর্দা পালনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চাদর, জিলবাব কিংবা বোরকা এমন পাতলা হবে না যার মধ্য দিয়ে নারীর অবয়ব ফুটে ওঠে। একবার আয়িশা [রা]-এর বোন আসমা [রা] পাতলা কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে মহানবী [সা] অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেনঃ হে আসমা! মেয়েরা যখন বয়:প্রাপ্ত হয়, তখন এমন কাপড় পরা উচিত নয় যাতে তাদের শরীর দেখা যায়। তবে এইটুকু এইটুকু ছাড়া, একথা বলার সময় তিনি মুখমণ্ডল ও দু'হাতের তালুর দিকে ইশারা করলেন। [সূত্রঃ আবু দাউদ শরীফ। চিরুণী করা অধ্যায়]

নারী এমন আঁটোসাঁটো পোশাক পরিধান করবে না, যা তার দেহ-কাঠামোকে প্রকট করে তোলে, তার শরীরের সাথে লেপটে থাকে। এতে পোশাকের যে মূল উদ্দেশ্য— শরীরকে আবৃত করা— তা পূর্ণ হয় না। বিশ্বনবী [সা] বলেন: [অনাগত ভবিষ্যতে] একদল মহিলা থাকবে, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে। যারা অন্যদের আকর্ষণকারী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার ঘ্রাণও পাবে না। [সূত্র: মুসলিম শরীফ। পোশাক ও সাজ-সজ্জা অধ্যায়]

নারী যদি সুগন্ধী ব্যবহার করে বাইরে যায়, তবে পুরুষরা আকৃষ্ট হতে পারে। তাই এটাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [উল্লেখ্য, পরনারীকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন পুরুষের জন্যও সুগন্ধী ব্যবহার করা বৈধ নয়] মহানবী [সা] বলেছেন: যখন সুগন্ধী ব্যবহার করে কোন মহিলা পুরুষের মাঝে যায় যেন তারা তার ঘ্রাণ অনুভব করে, তবে সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে তিনি শক্ত মন্তব্য করেন। [সূত্র: আবু দাউদ শরীফ। চিরুণী করা অধ্যায়]

www.bjilibrary.com

কণ্ঠস্বরেও রয়েছে প্রবল আকর্ষণী শক্তি। বিশেষকরে নারীদের এই আকর্ষণ এড়ানো পুরুষের পক্ষে বেশ কঠিন। যারা দুর্বল চিত্তের পুরুষ তারা সহজেই নারীর সুরেলা কণ্ঠের স্বরে ঘায়েল হতে পারে। এ-জন্য নারীকে পর-পুরুষের সাথে বাক্যালাপে কোমলতা পরিহার করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন-

'তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্কে ভয় করে থাকো, তাহলে কখনও কোমল [মধুর] স্বরে কথা বলবে না। [এভাবে কথা বললে] যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা লালসা-কাতর হয়ে পড়বে। বরং স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত কথাই বলবে।' [সূত্রঃ আল কুরআন। সূরা-আহ্যাব, আয়াত-৩২]

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, পুরুষদেরকেও একই ধরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শেষ কথা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অসংখ্য সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। এর কারণে নারী ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হয় যা পাশ্চাত্যে ব্যাপক। অবাধ মেলামেশার পথ ধরে আসে অবাধ যৌনতা; পাশ্চাত্যে এটাও বহুল প্রচলিত। এই অবাধ যৌনতা থেকে হয় অনাকাংখিত গর্ভধারণ, ভ্রূণহত্যা, জারজ সন্তানের জন্ম— এসব সামাজিক ব্যাধির প্রত্যেকটা পাশ্চাত্যে প্রকট। অবাধ যৌনতার আরেকটা অবদান হল যৌনবাহিত রোগ [STD] যার কারণে গত দশ বছরে যত লোক মৃত্যু বরণ করেছে, পৃথিবীর একশ'রও বেশি দেশের জনসংখ্যাও তত নয়। অবাধ যৌনতার আরেকটা কুফল হল যৌনবিকৃতি যেমন, নগ্নচারিতা, সমকামিতা, শিশুধর্ষণ, পশুমৈথুন, অযাচার ইত্যাদি। বন্ধনহীন যৌনজীবনের আরেকটা পরিণতি হল বিপর্যস্ত পরিবার; পাশ্চাত্যে এটা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পারিবারিক পরিবেশ শিশু-বিকাশের প্রতিকূল হওয়ায় মনোরোগ, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতির হার অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সামগ্রিক চিত্র সামনে রেখে যদি প্রশ্ন করা হয়, এগুলো কি প্রগতির লক্ষণ? এতসব সামাজিক সমস্যা সমাজের কোন্ উন্নয়ন ঘটাবে? এসব কি সমাজকে বিপর্যয়, বিশৃংখলা এবং অশান্তির বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করবে না? এরপরও যদি দাবী করা হয় জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ণের স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলে দুইটা কথা থাকে। এক. এই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন জাতি কি এতসব সামাজিক অবনতি মেনে নিতে প্রস্তুত হবে? ক্ষুদ্র পরিসরে [micro level] চিন্তা করুন, এমন কে আছে যে তার স্ত্রীর পরকীয় সম্পর্ক, এক মেয়ের ধর্ষণের শিকার হওয়া, আরেক মেয়ের কুমারী মাতা হওয়া— প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গর্ভপাত ঘটানো, এক ছেলের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, এক ছেলের মাদকাসক্তি, আরেক ছেলের আত্মহত্যা— সব কিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে শুধু এই কারণে যে তার প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি ঘটছে? দুই. যদি কোন দেশে কখনো এরূপ অবস্থা দেখা দেয় যে, নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশাকে এড়িয়ে কি এটা করা সম্ভব নয়? নারীদের জন্য পৃথক পরিবেশ সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

করা কি খুব কঠিন? পর্দার দাবী তো এটিই। পর্দার লক্ষ্য তো নারীকে গৃহবন্দী করা নয়, বরং সর্বনাশা অবাধ মেলামেশা থেকে তাকে বিরত রাখা।

তথ্যসূত্র

আল কুরআনঃ বঙ্গানুবাদ । ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।
মুফতী মুহাম্মাদ শফী [রঃ]। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী [র]। বুখারী শরীফ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী [র]। আল-আদাবুল মুফরাদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম [র]। মুসলিম শরীফ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী [র]। তিরমিযী শরীফ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইমাম আবু দাউদ [রঃ]। আবু দাউদ শরীফ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাজাহ্ [র]। সুনানু ইবনে মাজাহ্। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী [র]। মেশকাত শরীফ। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। পর্দা ও ইসলাম। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
মুহাম্মাদ কুতুব। বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
ইউসুফ আল কারজাভী। ইসলামে হালাল হারামের বিধান। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।
মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। নারী। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।
Women: Victim or Victor . Masoumeh Raghebi Bayat. Iranian Cultural Centre, Dhaka.
Muhammad Amin. Wisdom of Prophet Muhammad. Islamic Book Service. New Delhi, India.
M.N. Roy. The Historical Role of Islam. Ajanta Publications. New Delhi. India.
Benjamin B. Lehey & Anthony R. Ciminero. Maladaptive Behaviour: An Introduction to Abnormal Psychology. Scott, Foresman & co. U.S.A.
James C. Coleman. Abnormal Psychology and Modern Life. 5th edition. Scot Foresman & Co. U.S.A.
Erich Goode. Deviant Behaviour. 3rd edition. Prentice Hall. U.S.A.
Robert A. Baron, Donn Byrne. Social Psychology: Understanding Human Interaction. 7th edition. Prentice Hall. U.S.A.
Evelyn Millis Duvall. Marriage and Family Development. 5th edition. J.B. Lippincot Company. U.S.A.
George B. Mangold. Problems of Child Welfare. 3rd edition. The Macmillan Company. U.S.A.
Social Problems. Annual Edition-02/03. McGraw-Hill. U.S.A.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. U.S.A.
The Worldbook Encyclopedia. U.S.A.
Reginald Bibby, Donald Postersky. Teen Trends. Stoddart. Canada.
Hilary M. Lips. A New Psychology of Women. 2nd edition. McGraw-Hill. U.S.A.

www.bjilibrary.com

The Encarta Encyclopedia. Microsoft Corporation. U.S.A.
William Shakespeare. Othello. Penguin Classics.
Richard T. Schaefer. Sociology. 9th edition. McGraw-Hill. U.S.A.
Avert Magagine. September-2004. U.K.
Adler. Mueller. Laufer. Criminology. McGraw-Hill. U.S.A.
Sexually Transmitted Disease in South Australia 2007. Epidemiology Report. No-21.
The Bangladesh Observer.
The World Almanac-2001
The World Almanac-2002
George Skelton. Abortion Often Causes Guilt. The Sacramento Bee. March, 1989.
Wanda Franz, Ph.D. Medical and Psychological Impact of Abortion. 101st Congress. March 16, 1989.
Janet Daling, et al. Risk of Brest Cancer Among Young Women: Relationship to Induced Abortion. Journal of the National Cancer Institute. Vol.86. November-1994.
A.Levin, et al. Ectopic Pregnancy and Prior Induced Abortion. American Journal of Public Health. Vol.72. March, 1982.
Daniel J. Martin M.D. The Impact of Legal Abortion on Women's Minds and Bodies. Paper presented at the 'Human Life and Health Care Ethics'. National conference. April, 1993.
Statistics Newzealand. 08.01.2009
Abortion Statistics, England and Wales: 2006. Department of Health. U.K.
Stanley K. Henshaw. Unintended Pregnancy in the United States.
Warner Jennifer. Premarital Sex the Norm in America. WebMD News Archive.
Ammerman & Hersen. Assessment of Family Violence. 2nd edition. John Wiley & Sons. U.S.A.
Hester, Kelly, Radford. Women, Violence and Male-Power. Open University Press, USA.
Everett D. Dyre. Courtship, Marriage and Family: American Style. The Dorsey Press. U.S.A.

লেখক-পরিচিতি : খোন্দকার রোকনুজ্জামান- ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং লেখক।
লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২০শে আগাস্ট, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা

ড. মাহফুজ পারভেজ

■

এক.

প্রতিরক্ষা একটি জটিল এবং অনালোচিত বা অল্প-আলোচিত ধারণা।[১] সামরিক বিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, স্ট্র্যাটেজি, ভূ-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় চর্চা করা হয়।

---

১. প্রতিরক্ষার মতো একটি জটিল, বিশেষায়িত ও টেকনিক্যাল বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। পাঠক-সাধারণের কাছে এই জটিল ও প্রায়-অনালোচিত বিষয়টি তুলে ধরার ক্ষেত্রে অতিক্রম করতে হয়েছে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও। টীকা-টিপ্পনী, ফুটনোট ও রেফারেন্সের গতানুগতিক ধারার প্রতি যেমনভাবে অনুগত থাকতে হয়েছে, তেমনিভাবে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে যাতে প্রবন্ধটি যান্ত্রিকতার সৃষ্টি না-করে; সাধারণ পাঠকদের জন্য পাঠটি কষ্টকর না-হয়; প্রবন্ধের কলেবর অপরাপর বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্তিতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে না-যায়। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে খুবই স্বাভাবিকভাবে এসে আরও যোগ দিচ্ছে বহু প্রাসঙ্গিক বিষয় ও প্রসঙ্গ এবং সেসবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এতে 'ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা' বলতে মূলত যে কথা বুঝায়, সেটা বিপুল আলোচনার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে যে, অনেক কথার ভিড়ে আসল কথাটিই চাপা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আমি বেশ কিছু রেফারেন্স গ্রন্থের অসংখ্য রেফারেন্সকে ঘেঁটে এ বিষয়ে একটি সামারি বা সারমর্ম ছেঁকে আনার চেষ্টা করেছি সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনীয়তা ও বিদ্যমান বাস্তবতাকে সামনে রেখে। গুরু-গম্ভীর আলোচনার বদলে সহজ-সরল-সাধারণভাবে এই জটিল এবং কম আলোচিত অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে উপস্থাপন করাই আমি জরুরি মনে করেছি। আর গবেষণা বলতে কেবলমাত্র টীকা-টিপ্পনী, ফুটনোট ও রেফারেন্সের জটিল-যান্ত্রিকতার বদলে প্রাঞ্জলভাবে একটি বিষয়কে অনুধ্যান করাকেও গন্য করা হয়। মূল কথা হলো, যে প্রসঙ্গে আলোচনা, সেটা তুলে ধরা কতটুকু সার্থক হলো, সেটাই। একটি নতুন আলোচনার সূত্রপাতকালে সর্বাংশে সফলতার দাবি অবান্তর হবে। সফলতা তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন সাধারণ পাঠক বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে এবং এ বিষয়টিকে নিয়ে আরও আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন। যারা এ ব্যাপারে অগ্রসর পড়াশোনা এবং গবেষণা করতে চান, তাদের জন্য প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি বিশেষভাবে কাজে লাগবে বলে আশা করি। তবে যেসব টীকা-টিপ্পনী, ফুটনোট ও রেফারেন্সের উল্লেখ না-করলেই নয়, সেগুলো সম্পর্কে আমি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক স্থানের ধারাবাহিকতা ও লেখার গতি ক্ষুণ্ন না-করে পাদটীকায় প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা-অর্থ-তথ্য-নির্দেশনা-ইঙ্গিত উল্লেখ করে মূল বিষয়ের প্রতি সাধারণ পাঠকের মনোযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে সচেষ্ট হয়েছি এবং প্রয়োজনীয়-প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের আগ্রহ মিটানোরও সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা রেখেছি।

www.bjilibrary.com

প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার আড়ালে প্রায়-সময়ই প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গটি চাপা থাকে; এ প্রসঙ্গে খোলামেলা আলোচনা বলতে গেলে হয়-ই না। এটা সত্যি যে, প্রতিরক্ষার মূল কৌশল ও পরিকল্পনা সাধারণ্যে আলোচনার বিষয়ও নয়; এতে করে শত্রু পক্ষের কাছে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও এ সংক্রান্ত পুরো ব্যবস্থাটি পরিস্কার হয়ে যেতে পারে এবং এটা কোনওভাবে কাম্যও নয়।

কিন্তু একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা নীতি ও ধারণা মানুষের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে থাকা অপরিহার্য। জানা থাকা দরকার, কে বা কারা আমাদের শত্রু, কোন কোন দিক থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যাহত হতে পারে, কিভাবে প্রতিরক্ষা নিরঙ্কুশ রাখা যায়, ইত্যাদি বিষয়াবলী। কারণ যে মানুষ ও তার ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-নিরাপত্তা এবং মানুষের রাষ্ট্রটির জন্য প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার এত আয়োজন, সে রাষ্ট্রের মানুষই যদি স্বীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী না হয়, তাহলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও এর শক্তি বহুলাংশে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। মূলত রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা মানে সেই রাষ্ট্রের মানুষেরও প্রতিরক্ষা আর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য মানে রাষ্ট্রের মানুষের সম্মিলিত চেতনা এবং এরই ভিত্তিতে গড়ে উঠা বস্তুগত আয়োজন। ফলে প্রতিরক্ষার জন্য বস্তুগত-উপাদানগত আয়োজন যেমন জরুরি, তেমনিভাবে নাগরিকদের মধ্যে প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত একীভূত ও পরিচ্ছন্ন চেতনাগত ধারণা থাকাও অপরিহার্য। এই দুই-এর সুসমন্বয় হলেই একটি রাষ্ট্র অভেদ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার অধিকারী হতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম জীবনের সকল বিষয়ের মতো প্রতিরক্ষা বিষয়েও সুস্পষ্ট বিধানাবলী এবং ধারণা দিয়েছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণা এতই উন্নততর ও অগ্রসর যে তৎকালীন পৃথিবীর প্রায়-সকল পরাশক্তি ইসলামের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় এবং এরই ভিত্তিতে ইসলাম তার আদর্শগত, রাষ্ট্রীয় এবং মানুষের নিরাপত্তা নিবিঘ্ন রাখতেও সচেষ্ট হয়। বাংলাদেশের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ মানুষ যেহেতু মুসলিম, তাই এ দেশের মানুষের সকল চেতনার মত প্রতিরক্ষা চেতনা ও ধারণাতেও ইসলামের অনুভূতি থাকা অপরিহার্য এবং এভাবেই ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণার মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তার চিন্তাকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং এরই ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকেও মজবুত করতে সক্ষম হতে পারে। সোজা কথায়, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মজবুতির জন্য ইসলাম একটি প্রধান উপাদানস্বরূপ। সন্দেহ নেই, উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা ধর্মনিরপেক্ষ-প্রতিরক্ষা চেতনা গাছ-নদী-মা-মাটি-প্রকৃতিকে সামনে রেখে একটি আবেগী উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু ইসলাম প্রতিরক্ষা চেতনার মাধ্যমে এমন একটি যৌক্তিক উপসংহারে মানুষকে পৌঁছাতে পারে বলেই সে তার মানবমণ্ডলীকে একটি অপরাজেয় শক্তিতে দেখতে পায়। ইসলামী প্রতিরক্ষা চেতনায় বলীয়ান জানবাজ জনগোষ্ঠী শত্রু পক্ষের কাছে যে ভয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের শক্তিতে

www.bjilibrary.com

পরিণত হয়, তাতে বিপুল পরাশক্তিও একে একে পরাজিত হয়েছে আর বিজয় চলে এসেছে অবধারিতভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের কাছেই। ইসলামের ইতিহাসে সে সত্য দেদীপ্যমান; ইসলামের গৌরবময় জেহাদসমূহ সে সত্যের সাক্ষ্যবহ। আজকেও তাই, কেবল মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাছেই ইসলামের প্রতিরক্ষার ধারণা, এর ব্যবস্থাপনা ও কৌশল গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের বিষয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি নবাগত শক্তি হিসাবে এর অপ্রতিরোধ্য বিজয় ও অগ্রগতির বিষয়াবলী এখন পর্যন্ত গবেষণা, অধ্যয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে অনুসৃত হচ্ছে। ফলে প্রতিরক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমাদের মতো শত্রু-পরিবেষ্টিত রাষ্ট্র অটল প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হতে পারে।

দুই.

বিশ্বে যারা শক্তিমান, কোন যুদ্ধের সূচনা করে তারাই। যারা শক্তিহীন, তারা শক্তিমানের কাছে পরাভূত হয়। মানবেতিহাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত এটাই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। তবে এর ভিতরেও ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। আর তা ঘটেছে মুসলিমগণের হাতে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মুসলিমগণই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে যে, শক্তি প্রদর্শন বা নিছক আত্মরক্ষার জন্য নয়, আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়। এই যে বিশেষায়িত যুদ্ধ, সেটাই হচ্ছে জিহাদ। প্রচলিত যুদ্ধ বলতে যা বোঝা যায়, জিহাদের সঙ্গে তার রয়েছে সুস্পষ্টরূপেই বিস্তর ফারাক। সাধারণ অর্থে যুদ্ধ ও জিহাদ বলতে সশস্ত্র সংগ্রাম বোঝালেও দুটোর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রয়েছে।[২]

---

২. জেহাদের আলোচনা ছাড়া ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারনাটি অস্পষ্ট থেকে যাবে। আবার শুধু জেহাদ নিয়ে তত্ত্বগত বিশ্লেষণ মূল আলোচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ফলে আলাদাভাবে এখানে জেহাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে জেহাদ বা জিহাদ হল ধর্মযুদ্ধ বা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথে যুদ্ধ। অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদের মতে, জেহাদের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা, স্বার্থপর ও যুলুমবাজ অত্যাচারীর কর্তৃত্বের অবসান করা, মানবজীবনের সকল দিককে পরিব্যাপ্ত করে আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করা এবং সর্বোপরি মানুষের গোলামি থেকে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম প্রতিটি মুসলিমকে কুফর-শিরক-বিদআত এবং সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। পবিত্র কোরআন অনুযায়ী জেহাদ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য। বিস্তারিত, হারুনুর রশীদ [১৯৯৯]। আরও বিস্ত ারিতভাবে বললে: The word 'Jihad' comes from the word ;Jihada' which means to strive, struggle, exert oneself, being willing to strive and fight in the way of good against evil. It denotes striving in the cause of Allah [SWT] in the widest sense, including moral effort. The

১৮—

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের মূলে রয়েছে পররাজ্য গ্রাসের লিপ্সা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্য দিকে, জিহাদের উদ্দেশ্য হল দ্বীন ও আত্মরক্ষার তাগিদ এবং অন্যায়ের প্রতিকারের মাধ্যমে ন্যায়, নিরাপত্তা, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। ফলে প্রথাগত অর্থে, মুসলমানরা যুদ্ধ করে না, তারা জিহাদ করে। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণেই প্রচলিত-সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য। একইভাবে প্রতিরক্ষার ধারণাগত দিক থেকেও গতানুগতিক আর ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে রয়েছে অলঙ্ঘনীয় প্রভেদ। আজকের যুদ্ধবাজ পরাশক্তিসমূহের সামনে ইসলামের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত নীতি ও ধারণা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ–যার অনুসরণ তাদেরকে রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাভিত্তিক একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে পারে।

তিন.

ন্যায়-যুদ্ধ[৩], যুদ্ধোন্মাদনা[৪], যুদ্ধ[৫]-বিগ্রহ বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য[৬]।

Great Jihad or Jihad-an-Nafs is against one's own lower tendencies [such things as lust, greed, pride, dishonesty etc.]. it means self-purification of one's own passionsa and weakness. According to Holy Quran [29:6]. There is also the Jihad in relation to the outer world which involves helping others, teaching, improving social conditions and so forth as the Quran says: [49:15]. Finally, there is the military sense of the word, which must be justified as a 'Holy War' it must be in defence of the cause of Allah [SWT], and not for conquest; be to restore peace or freedom of worship or freedom from tyranny. See, Ruqaiyyah Waris Maqsood [2003].

৩. শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, দাসত্ব, বৈষম্য ইত্যাদির কবল থেকে মুক্তির জন্য কিংবা বিদেশী আক্রমণ, দখল, সম্প্রসারণ বা আধিপত্যের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য কিংবা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে কোনও উপনিবেশ-অধীনস্থ দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধই ন্যায়-যুদ্ধ, যার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত সফলভাবে ও সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী-দখলদার অপশক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমদের ন্যায়-যুদ্ধের ইতিহাসে।

৪. যে-সকল ব্যক্তি বা জাতি বা দেশ কোনও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করে না, বরং মনে করে যে একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর, তাদেরকে বলা হয় যুদ্ধোন্মাদ আর তাদের এহেন যুদ্ধংদেহী মনোভাবকে বলা হয় যুদ্ধোন্মাদনা, যেমন আরবের কাফের-মুশরিকগণ, পারস্যের খসরু, চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, হিটলার, মুসোলিনি, স্ট্যালিন, জর্জ বুশ।

৫. সংজ্ঞাগত আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধ হলো দুই বা ততোধিক দেশের সশস্ত্র সংঘর্ষ। আধুনিককালে প্রতীয়মান হয়েছে যে, যুদ্ধ রাজনীতিরই একটি বর্ধিত ও সশস্ত্ররূপ। বর্তমানে কোনও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বা রাষ্ট্র বা মতাদর্শগত সঙ্কট যখন আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হয় না, তখনই শুরু হয় সশস্ত্র সংঘাত বা যুদ্ধ।

www.bjilibrary.com

প্রতিটি যুগেই যুদ্ধ-বিগ্রহ কোনও না কোনও আকারে দুনিয়ার বুকে বিরাজমান ছিল। একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান কালে তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে একটি বিশ্ব-বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। 'বিশ্বায়ন' নামের এহেন বন্ধনও বিশ্বকে যুদ্ধ মুক্ত করতে পারেনি, বরং একটি যুদ্ধংদেহী পরাশক্তি জোটের লেলিহান বিপদের সম্মুখীন করেছে পৃথিবীর অপরাপর ক্ষুদ্র ও নিরীহ রাষ্ট্রসমূহকে।[৭] যুদ্ধের পেছনে খরচ হচ্ছে অপরিসীম অর্থ, যা মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানো হলে বিশ্ব ও মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হত। উদাহরণস্বরূপ, নৈতিক যুদ্ধ বা জিহাদ আর অনৈতিক যুদ্ধ বা আগ্রাসনের একটি পার্থক্যও এখানে লক্ষ্যণীয়। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৫ সালে যুদ্ধের পেছনে ব্যয় করেছে ৩২০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫ সালে সে ব্যয় বৃদ্ধ পেয়ে দাঁড়ায় ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে। এরপর থেকে এই খরচের অঙ্ক প্রতি বছর ৫০%ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৮]

তাই বর্তমানে বিশ্ব ও মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত, সম্মানজনক, প্রীতিপূর্ণ এবং মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিক হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ, মৈত্রী ও ঐক্যের বাস্তবতাগত প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদের শোষণমূলক মনোভাবের মাধ্যমে কতিপয় শক্তিশালী রাষ্ট্র যুদ্ধের ভয়াবহ ঘনঘটা গোটা মানব জাতির উপর সততই সঞ্চরণশীল করে রেখেছে।[৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অকল্পনীয় ধ্বংসের প্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশন্স জন্ম লাভ করে। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায় ১৯৩৯ সালে জার্মানির ডিকটেটর হের হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার পর। গোটা পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অগ্নিগর্ভে নিপতিত হলে লীগ অব নেশন্স-এর মৃতদেহের উপর ভর করে যুদ্ধকালীন সময়েই জন্ম নিল আজকের জাতিসংঘ। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তা-ই, যা ছিলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশন্স-এর: "দুনিয়াকে যুদ্ধের ধ্বংস ও

---

৬. প্রাচীনকাল বাদ দিয়েও কেবলমাত্র উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কয়েক শ' ছোট ও বড় যুদ্ধ এবং সংঘাতের বিবরণ পাওয়া সম্ভব। এগুলো দেশে বা দেশের ভেতরে---উভয় পর্যায়েই সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে, দেখুন,
Mahfuz Parvez [2006], Fisher [2000], Ayoob [1996], Holsti [1991], Phadnis [1990], Ryan [1995] and Luard [1986].

৭. বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাহফুজ পারভেজ [২০০৬].

৮. Frederic F. Clairmont, "Iraq: The Nemesis of Imperialism", Economic and Political Weekly, July 16, 2005, p. 2.

৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাহফুজ পারভেজ [২০০৬-ক.]

www.bjilibrary.com

রক্তাক্ত হানাহানি থেকে বাঁচানো।"[১০] কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কি যুদ্ধের স্থায়ী বিপদ কেটে গেছে? সাম্প্রতিক বিশ্বের রক্তাক্ত ইতিহাস সে কথা বলে না। বরং একটি ক্ষুদ্র, শান্তি পূর্ণ, নিরীহ দেশকে যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি দেশ এমন একটি দেশের ওপর হামলা করে বসল যে, আদৌ সে লড়াই করতে ইচ্ছুক নয়। কেউ আমেরিকাকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু আমেরিকা বিশ্বের কমপক্ষে পঞ্চাশটি দেশে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এখনও একাধিক দেশে একতরফা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পদ ও খনিজ লুণ্ঠন, প্রতিপক্ষীয় দর্শন ও আদর্শকে হত্যার সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী মতলব-বর্তমানে যার প্রধানতম শিকার মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহ।[১১] ফলে কোনও নিরীহ, শান্তিপূর্ণ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলে, এবং যা বর্তমানে আকছার হচ্ছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই ক্ষুদ্র-শান্তিপূর্ণ-নিরীহ রাষ্ট্রটিকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতেই হবে; একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও কৌশল প্রণয়ন করে রাখতেই হবে। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ এবং প্রতিরক্ষা নীতি-ব্যবস্থা-কৌশল প্রণয়ন করে রাখা এমন একটি বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং একই সঙ্গে একটি স্বাভাবিক অধিকার, যার সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রটির নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি।

চার.

আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ[১২], নিজেকে রক্ষার নীতি-ব্যবস্থা-কৌশল প্রণয়ন, একটি বাস্তবসম্মত-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে নাগরিক-রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যব্যবস্থা, সামগ্রিকভাবে যার নাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, গ্রহণের উপর ভিত্তি করেই আরবের একজন পিতৃমাতৃহীন যুবক, ইসলামের মহান প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, স্বীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রথম দিকে তাঁকে বিভিন্নমুখী বিপদ-আপদ ও ঝঞ্ঝা-মুসিবত মুকাবিলা করে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নির্দেশে কৌশলগত কারণে স্বদেশ ছেড়ে অন্য স্থানে হিজরত বা স্থানান্তর করতে হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতিপথ তিনি কখনওই হারাননি। অবশেষে বিশ্ববাসী এ দৃশ্যও অবলোকন করলো যে, প্রতিটি আগ্রাসী আক্রমণকেই তিনি শুধু পরাজিত করেন নি বরং অল্প দিন পরেই সেই হিজরতকারী ব্যক্তিই বিজয়ীর বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং স্বীয় নীতিমালা বাধাহীনভাবে প্রচার করেছেন; সমগ্র জগতকে

---

১০. জাতিসংঘের সাফল্য-ব্যর্থতার বিস্তারিত বিবরণ, দেখুন, মাহফুজ পারভেজ [২০০০].

১১. বিস্তারিত জানতে দেখুন, মাহফুজ পারভেজ [২০০৯].

১২. স্বীয় আত্মরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ বা যুদ্ধ/জিহাদ সংক্রান্ত কোরআনের ভাষ্যসমূহ পরবর্তীতে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

শান্তি ও নিরাপত্তার মহামূল্যবান সম্পদে ভরপুর করেছেন।[১৩]

এসব কীভাবে হলো-

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্য লাভের আসল কারণ কি ছিল- এই মৌলিক জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করা হলে ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে।

গভীরভাবে ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র এবং আর্থিক দিক দুশমনের মুকাবিলায় কখনও কি এক-দশমাংশও ছিল-

এর পরেও কি তিনি হতোদ্যম হয়েছিলেন কিংবা হিম্মত হারিয়েছিলেন-

যদি তা না হয় তবে কেন তা হারান নি-

এখানেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও কৌশল নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি টেকসই, কার্যকরী, মানবতাবাদী প্রতিরক্ষা ধারণা ও ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিবালোকের মতো প্রতিটি মুসলিমের সামনেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এবং তথাকথিত যুদ্ধ, আগ্রাসন ও বর্বরতার নামে অকাতরে হত্যা, লুণ্ঠন আর বিপুল অর্থ অপচয়ের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণার মানবিক ও বস্তুগত দিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আজকের যুদ্ধবাজ বিশ্বের জন্য ইসলামী প্রতিরক্ষার ধারণা পরিত্রাণের প্রধান অবলম্বন। একই সঙ্গে বিপুল আগ্রাসী আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধবাজ ও তাদের বিপুল-বিশাল রণসজ্জা ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে হিম্মত না-হারিয়ে বিজয়ী হয়ে নিরাপদ থাকতে পারার মূলমন্ত্রও আমাদের জন্য নিহিত রয়েছে ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণায়। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি ইসলামের প্রতিরক্ষাগত বিজয়ের আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা বেশি সৈন্য ও শক্তির সমাবেশ ঘটায়। সামগ্রিক জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর কোনও তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায়-উপকরণ। অন্যদিকে মুসলিমগণ অনাহারে মরছিল।

---

১৩. এখানে বিষয়টি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন সীরাতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহে।

www.bjilibrary.com

কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রসমূহ। তদুপরি মুসলিমগণ একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে চেতনা মুসলিমদেরকে ক্রমাগত বিজয়ী করছিল, তাহলো চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রুদলও এটা অনুভব করতে পেরেছিল। কারণ শত্রুদল দেখতে পাচ্ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর নির্মল, নিষ্কলুষ চরিত্র; এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা, যা মানুষের দেহ অপেক্ষা হৃদয়কে পূর্বাহ্নেই জয় করে চলেছিল। একই সঙ্গে এটাও দেখা যাচ্ছিল যে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলিমদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল, শোষণমূলক ও নিপীড়নভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা কেবল যুদ্ধাবস্থাই নয়, শান্তির স্বাভাবিক সময়েও পরাজিত হতে বাধ্য হচ্ছিল।[১৪] এখানেই নিহিত ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অপরাজেয় শক্তিমত্তা আর শ্রেষ্ঠত্ব।

পাঁচ.

প্রথমেই যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তা হলো, ইসলামের আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের ফলে মুসলিম/ঈমানদারগণ একদিকে হয়ে যান আর কাফের ও সত্যদ্রোহীদল অপর দিকে।[১৫] মুসলিমদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কিংবা কোনও প্রকার আলাদা বৈশিষ্ট ছিল না। সবাই এক ও অভিন্ন, ভাই-ভাই এবং সবাই বরাবর–এভাবে সকলেরই লাভ ও ক্ষতি, নিরাপত্তা ও বিপদ একাকার হয়ে যায়। সকলের চিন্তা ও কর্মের নীতি-পদ্ধতিও এক হয়ে যায়। ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ ও সুসংহত হওয়ার ফলে তাদের ভেতর প্রবল শক্তির সঞ্চার হলো এবং এই সম্মিলিত মানব গোষ্ঠীর সামনে অপার সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হলো। রক্ত, গোত্র, সম্পর্ক, চিন্তা, কর্মের সকল যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম এবং কাফের-মুশরিক দু'টি পৃথক জাতিসত্তায় দাঁড়িয়ে গেলো। কাফের-মুশরিকরা মুসলিমদের সত্যপন্থী কথা ও কাজ মানতে পারে না, ন্যায়ানুগ আয়-উন্নতি বরদাস্ত করতে পারে না। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনের এহেন সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি মুকাবেলার জন্য অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচয়

---

১৪. বিস্তারিত দেখুন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন [৯ম খণ্ড], ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৬০.

১৫. ইসলামী দাওয়াত জাহেলিয়াতের সমাজকে কিভাবে ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত করে এবং ঈমানে দীপ্ত মানবসম্পদের বিকাশ ঘটায়, দেখতে, পড়ুন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ঈমানের হাকিকত।

www.bjilibrary.com

দিয়ে হিজরতের প্রথম বছরেই "Nation at War"-এর মূলনীতির বাস্তব শিক্ষা দিতে থাকেন, যে উদ্যোগের হেকমত ও ফলপ্রসূতা অচীরেই সর্বাত্মক বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতপক্ষে, "Nation at War" এবং জিহাদ একই মূলনীতি থেকে উৎসারিত একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দু'টি ভিন্ন নাম মাত্র। ফলে প্রতিরক্ষার কাজে মুসলিমগণ যে তিনটি নেয়ামতের প্রয়োগ সশস্ত্র যুদ্ধের আগেই প্রয়োগ করে নিজেদের নিরাপত্তাকে মজবুত এবং শত্রুর উপর নিজেদের প্রাধান্য পূর্বাহ্নেই নিরঙ্কুশ করতে সক্ষম হন, তা-হলো:

ক] কোরআন-সুন্নাহ অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যা পালৌকিক জীবন ছাড়াও দুনিয়ার সকল সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নিয়ামক;

খ] ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য; এবং

গ] "Nation at War" বা জিহাদ, যা শুধু যুদ্ধগত সশস্ত্র অর্থে নয় অন্তরের-মুখের-হাতের-অস্ত্রের ধারাবাহিক ও সময়োপোযোগী ব্যবহার।[১৬]

ছয়.

তিনটি নেয়ামতের বরকতে মদীনার ছোট রাষ্ট্রটি সকল দিক থেকে নিরাপদ, পরিপূর্ণ এবং সুসংহত হয়ে গেল। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগলোর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন। একই সাথে মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণও দিতে থাকেন। অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়িত করার পর জাতিসত্ত্বাকে মুজাহিদ কওম বানাতে শুরু করেন। আর রাষ্ট্রকে চোখ-কান খোলা একটি জীবন্ত সত্ত্বায় পরিণত করেন, যারা নিজেরা যোগ্য, প্রশিক্ষিত এবং পারিপার্শ্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

উন্নত নীতিমালাশ্রিত রাষ্ট্র কাঠামোয় আরবরা পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং নৈতিক-চরিত্রবান মানুষ থেকে আরও উন্নততর আল্লাহওয়ালা মানুষে পরিণত হতে লাগলেন। এ পর্যায়ে কোরআন তাদের জন্য যে সমরনীতি প্রণয়ন করেছে, মুসলিমগণ সর্বদা গর্বের সঙ্গে তা সভ্য দুনিয়ার কাছে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রদর্শন করতে পারে।[১৭]

---

১৬. পবিত্র মক্কা ও মদীনা-কেন্দ্রীক ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শিক মানদণ্ড রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আজমায়িনের সময়কাল পর্যন্ত অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে বিকষিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, সীরাতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী।

১৭. এই বিষয়ে পবিত্র কোরআনের যুদ্ধ-জিহাদ-সংক্রান্ত আয়াত বা নির্দেশনা বিশেষভাবে প্রণিধান্যযোগ্য, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের জন্য, দেখুন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন।

www.bjilibrary.com

কারণ, যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে ঐশী নিদের্শের অধীন, আর তা হলো, সে সমস্ত লোকের যুদ্ধের অনুমতি, যাদের উপর যুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ নিজেদের হেফাজত এবং যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ ও অবসানের জন্য করো, যাতে যালিমের যুলুম বৃদ্ধি পেতে না পারে এবং অপর কোন কওমকে যুলুমের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না করে দিতে পারে। মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করা শুধু আত্মরক্ষা, যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং মজলুম/নির্যাতিতের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সমীচীন বলে অভিহিত করা হয়েছে ঐশী বিধানে।

কিন্তু কী মহানুভবতার সঙ্গে এ-ও নিদের্শ এসেছে যে, অপরাপর ধর্মের উপাসনালয় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এমনিভাবে অন্য ধর্মের বুযুর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্যও তাকিদ এসেছে, যাতে মুজাহিদ বাহিনী যুলুম অবসানের জোশে সীমা অতিক্রম না করে। পবিত্র কোরআনের নিদের্শাবলী মূলভাবগুলো লক্ষ্যণীয়:[১৮]

মালে গনিমত বা যুদ্ধ-লব্ধ মালামাল সম্পর্কেও সতর্কতামূলকভাবে বলা হয়েছে: "তোমাদের প্রবৃত্তির কোনও অধিকার সেখানে নেই।" আরও বলা হয়েছে: "এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের; বাকী অংশ আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।"

যুদ্ধে সাহস ও মনোবল অটুট রাখার তাকিদ দেওয়া হয়েছে: "যখন তোমরা যুদ্ধেও ময়দানে কাফেরদের মুকাবিলা করবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। যে কেউ লড়াইয়ের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

যুলুম প্রতিরোধ ও অবসানের লক্ষ্যে লড়াইকে অর্থাৎ জিহাদ করাকে 'জীবন' বলা হয়েছে এবং তার গুরুত্ব এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে: "হে মু'মিনগণ, আল্লাহ এবং রসূলের হুকুম মেনে চলো, যে সময় তোমাদের সেই কর্মের দিকে আহ্বান করা হয় যার ভেতর রয়েছে তোমাদের জীবন।

বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছাকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে: "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে আল্লাহ পাক তোমাদের

---

১৮. এখানে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ সরাসরি উল্লেখ না করে, এর মূল বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত আয়াতসমূহ দেখুন: সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬; আল ইমরান ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৫৪, ১৭৭, ২১৭, ২৪৪, ১৩, ১২১, ১২৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৮, ১৭২; আন নিসা ৭৪, ৭৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০২; আন ফাল ৭-১৯, ৩৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭; আত তাওবা ৫, ১২-১৬, ২৪-২৬, ২৯, ৩৫, ৩৮-৪২, ৭৩, ১২৩; হাজ্জ ৩৯, ৪১, ৭৮; ফোরকান ৫২, আন কাবুত ৬৯, আহযাব ২৫-২৭; মুহাম্মদ ৪, ২০; ফাতাহ ২৫; হুজুরাত ১৫; হাদীদ ১০, ১৯; মোমতাহেনা ১, ৮, ৯; সফ ৪, ১১; তাহরীম ৯; মোযযাম্মেল ২০.

www.bjilibrary.com

ফয়সালার বস্তু প্রদান করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি দূরীভূত করবেন আর দেবেন মাফ করে।"

জিহাদ কতোদিন পর্যন্ত করা হবে, সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "আর তোমরা সেই সময়-সীমা পর্যন্ত লড়তে থাকো যতদিন প্রাধান্য লুপ্ত না হয় শিরক ও ফেৎনা-ফাসাদের এবং সমস্ত দীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।"

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশনাস্বরূপ সূরা আন-ফালে পরিস্কার আহকাম নাযিল হয়েছে: "আল্লাহ ও রসূলে নির্দেশ মান্য করো, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা দূর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাবে বিনষ্ট হয়ে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে: "শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য যথাসাধ্য সমরাস্ত্র ও সিপাহিসুলভ শক্তি সদা-সর্বদা প্রস্তুত রেখো, যেন দুশমনের উপর তোমাদের ভীতিকর প্রভাব কায়েম থাকে।"

জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল যুলুমের অবসান। এক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গামবাহী এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য আপাদমস্তক রহমতস্বরূপ। কোরআনুল কারীমের নির্দেশ: "যদি দুশমন সন্ধির প্রস্তাব করে তবে তোমরা তাতে সাড়া দেবে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা শক্তির মোহে সীমা অতিক্রম করো এবং দুশমনের আগ্রহ সত্ত্বেও তোমরা সন্ধি স্থাপনে এগিয়ে না যাও।"

এগুলো কোরআনুল কারীমের সরাসরি ও প্রকাশ্য হুকুম-আহকাম। বস্তুত এটাই হল মূল বুনিয়াদ, যার উপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিক-নির্দেশ দেয়। এবং এরই ভেতরে জায়েজ ও না-জায়েজ, নিষিদ্ধ ও উত্তমের সীমারেখা পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও অনিচ্ছা চর্চার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। খুলে দিয়েছে সকলের জন্য কল্যাণের পথ।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রতিরক্ষা নীতি ও বিধানের সঙ্গে মুজাহিদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিশ্বজয়ী অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেন। এবং এভাবে এই নীতিমালা অনুসৃত প্রশিক্ষণই মুষ্টিমেয় মরুচারী মুসলিমকে এমনই শক্তি, একতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে যে, সমকালীন অপরাপর শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ একেকজন মুজাহিদ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগণিত দুশমনের বিরুদ্ধে অধিকতর কঠিন ও বিজয়ী হয়ে দাঁড়ান।

যুদ্ধরত বাহিনীর জন্য সমরোপকরণ ও মারণাস্ত্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জরুরী। এসব ছাড়া যুদ্ধের কল্পনা খুবই হাস্যকর। কিন্তু উত্তম কর্ম এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য ব্যতিত বিপুল

www.bjilibrary.com

সমরোপকরণের অধিকারও ফলপ্রসূ হয় না। যুদ্ধের এই নিয়ম-নীতি, বিশেষত আল্লাহর সাহায্যের খোশ-খবর এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যোগ্য কমান্ড, সত্যের পক্ষে উন্নত-মস্তক অবস্থান ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণার মূল ভিত্তি এবং এভাবেই ইসলাম নিজেকে নিরাপদ রেখেছে, দৃঢ় প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অধীনস্থ করেছে আর বাতিলের পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে। অতএব দুনিয়া এর বিস্ময়কর প্রদর্শনী দেখলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই দেখে নি বরং মুসলিমরা তাদের আসল ও মৌলিকত্বের দিকে যখনই প্রত্যাবর্তন করেছে এবং কিতাব ও সুন্নাহকে যখনই কর্ম-নির্দেশিকা বানিয়েছে, ফলাফল তখন এমনই বিস্ময়করভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে গিয়েছে।[১৯]

সাত.

ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষাগত ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কৌশল, তাঁর আওতায় পরিচালিত সমস্ত যুদ্ধ ও অভিযান ইত্যাদি সব কিছুই কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্যই নয়, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, সমরশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠক-গবেষক-বিশেষজ্ঞদের জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে বর্তমানেও অনুসরণীয়[২০]:

- প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা হবে সাদাসিধে কিন্তু পরিপূর্ণ। সাদাসিধে হওয়ার অর্থ হলো, এর ভেতর এমন সুযোগ রাখতে হবে যে, যুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী যেন খুব সহজে উপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। কারণ কোনও বিশেষজ্ঞই আগাম ও সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, যুদ্ধের মধ্যে কখন কিরূপ অবস্থা হবে। ফলে নানা সম্ভাবনা ও আশঙ্কাকে সামনে রেখে এমন পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে সেটাকে প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী বা প্রতিপক্ষের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী অদল-বদল করা যায়। স্থবির ও অনড় যুদ্ধনীতির বদলে চলিষ্ণু ও পরিবর্তনযোগ্য যুদ্ধনীতি শ্রেয়।
- প্রতিরক্ষার মূল নীতি অল্প, অপরিবর্তনীয় এবং পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে অলঙ্ঘনীয়ভাবে প্রণীত। তবে সেটা বাস্তবায়নের উপায়-উপকরণগত ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে নানা পরিবর্তন হয় এবং এহেন

---

১৯. ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধ এবং এর বিজয়-কৌশল এক-একটি যুদ্ধের নিরিখে পর্যালোচনা করা হলে উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

২০. বিভিন্ন সামরিক বিশেষজ্ঞ ও ইসলামের প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ বিষয়ের পণ্ডিতগণের মতামত, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও কর্মের নিরিখে প্রণীত হয়েছে, তারই ভিত্তিতে রচিত। বিস্তারিত জানতে, দেখুন, লে. ক. এম.এম কোরেশী [২০০৩], জেনারেল আকবর খান [১৯৮৪]।

www.bjilibrary.com

পরিবর্তন হতেই থাকবে। সে কারণে প্রতিরক্ষাগত পরিস্থিতির নানা পরিবর্তন ও গতিপ্রবাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের কাজে স্থায়ী, প্রশিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ জনশক্তির মাধ্যমে মানুষকে প্রতিরক্ষার গতি-প্রকৃতিগত আপ-টু-ডেট ধারণা প্রদান ও সচেতন-সপ্রস্তুত রাখার কাজটি অব্যাহত রাখতে হবে।

- যুদ্ধের পক্ষ কোনও রাষ্ট্র বা একক শক্তি হতে পারে কিংবা একের অধিক রাষ্ট্র বা শক্তি মিলিত ফ্রন্ট বানিয়েও আসতে পারে। অতএব সব ধরনের বিবেচনা সামনে রাখা খুবই জরুরি।
- প্রতিরক্ষার বিষয়টি কেবল যুদ্ধের সময় নয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই তৈরি করে রাখা জরুরি। এবং সেটা যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত হওয়া দরকার।
- প্রতিরক্ষার মূল বিষয় গোপন থাকা প্রয়োজন।
- প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলী মেধাগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
- প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্ব প্রকারের ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।
- প্রতিপক্ষের কৌশল সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব পূর্ব-জ্ঞান লাভ করা দরকার, যাতে তাদের চেয়ে অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শত্রুপক্ষকে স্তম্ভিত ও অসহায় করে সহজ বিজয় অর্জন করা যায়। এজন্য গুপ্ত সংবাদদাতা, গুপ্তচর, কমান্ডো ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।
- যোদ্ধা ও নাগরিকদের মনে ইচ্ছার দৃঢ়তা, নির্ভিকতা, সাহসিকতা, এবং নেতৃত্ব মান্য করার গুণাবলী সম্পন্ন করতে হবে। শত্রুকে ছোট জ্ঞান না-করার পাশাপাশি নিজস্ব আস্থায় বলীয়ান হতে হবে। কোনওরূপ হীনমন্যতাকে স্থান দেওয়া যাবে না।
- শারীরিক ও উপাদানগত প্রাধান্যের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিজয় কিংবা আত্মোৎসর্গের মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের বিষয়টিকে অত্যান্ত প্রাধান্যের সঙ্গে সামনে এগিয়ে দিয়ে–এমন চেতনাই সকল চেতনার সামনে ইসলামকে বিজয়ী ও অপরাজেয় করেছে।
- প্রতিরক্ষার চূড়ান্ত সময়ে সিপাহি যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করেন আর জাতির প্রতিটি সদস্যই কোনও না-কোনও ক্ষেত্রে লড়ে যান। কেউ অস্ত্র চালান,

www.bjilibrary.com

কেউ কলম চালান, কেউ অর্থ-বিত্ত-মেহনত দিয়ে সহযোগিতা করেন। এভাবেই সকলে নানা ক্ষেত্র থেকে ফরয আদায় করেন। এক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সকলে সম্মিলিত অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

- সকল পূর্ণ বয়স্ক নর-নারীসহ নাগরিক সমাজের সকলের মধ্যে ইসলামের প্রতিরক্ষাগত প্রাথমিক ধারণা, সে ধারণার আলোকে স্ব স্ব শরিয়তী দায়িত্ব এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরক্ষা কৌশল, যুদ্ধ নীতির পরিচ্ছন্ন বিবরণ ও জ্ঞান সঞ্চার করা একান্ত অপরিহার্য।
- এই বাস্তবতা ও বিশ্বাসকে স্মরণে রাখা দরকার যে, যদি কোনও জাতি প্রতিরক্ষা ধারণা, ব্যবস্থাপনা ও কৌশল না-বোঝে; সমরাস্ত্র, সমর শাস্ত্র, আন্তর্জাতি সম্পর্ক, বিশ্ব পরিস্থিতি, শত্রু-মিত্র চিহ্নিতকরণের জ্ঞান অর্জন না-করে; ঈমান, দেশপ্রেম, ঐক্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে না-থাকে; যুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটনের কাজে উৎসর্গীকৃত না-হয়; জীবন ও মৃত্যুকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে না-পারে---তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে তারা কখনও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে না; শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে না বরং পদানত হয়।
- ইসলাম কখনওই পদানত হওয়ার শিক্ষা দেয় না, শিক্ষা দেয় কল্যাণ, মানবতা, শোষণমুক্ত মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে যে-কোনও শত্রুপক্ষ ও বাধাকে পরাজিত করে বিজয়ী হতে। প্রতিরক্ষার জ্ঞানগত ধারণা ও প্রস্তুতি এমন বিজয়ের পথকে দেশ-কালভেদে বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের সামনে সহজ ও নিশ্চিত করে।
- ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি স্বাধীন ও সাবলম্বী মুসলিমের এ কথা মনে রাখা জরুরি যে নিজের দেশ ও নিজেকে রক্ষার জন্য, মযলুমের সাহায্যের জন্য, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী তাগুতকে পরাজিত করে শান্তি-নিরাপত্তা-কল্যাণ প্রতিষ্ঠার্থে সামগ্রিক প্রতিরক্ষায় তার একটি নির্ধারিত ভূমিকা রয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিকে জীবনের একটি স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে পালন করতে হবে এবং প্রতিরক্ষার নীতি-কৌশল সম্পর্কে ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে অভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমুক্ত স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে।

আট.

ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে সকল ঐতিহাসিকই বলেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমগণ পার্শ্ববর্তী উপজাতি ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে

www.bjilibrary.com

যেসব যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেগুলো ঘটেছিলো পৌত্তলিকদের আগ্রাসী ও নিষ্ঠুর শত্রুতার কারণে আর এজন্যই দরকার হয়েছিল ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার।[২১] প্রথম আক্রমণ আসলো কাফিরদের পক্ষ থেকে এবং বদরের প্রান্তরে তারা পরাজিত হলো। পরাজিত ইসলামবিরোধী অপশক্তি দেখতে পেলো যে, বদর থেকে খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই মুসলিম শক্তির উত্থান ব্যাপকতর হতে শুরু করেছে। ফলে মুশরিক, কাফের, ইহুদি, মুনাফিক ও দোমনা-সংশয়ী নির্বিশেষে সকল ইসলাম-বিরোধী পক্ষ এ কথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে [ইসলাম] শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে প্রতিপক্ষ একজোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনার উপকণ্ঠে এক মাস ধরে মাথা কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পিছু ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে যুদ্ধাঙ্গনে মুসলিম শক্তি এবং মুসলিমবিরোধী অপশক্তির মনোভাবটি স্পষ্ট হয়।[২২]

বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধের বিবরণেও আত্মরক্ষা, আগ্রাসী-যুলুমবাজদের প্রতিরোধ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে চলে আসতে দেখা যায়। ইসলামের ইতিহাসে বিদেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উত্থান মূতার যুদ্ধ[২৩], আর তাবুকের অভিযান[২৪] করা হয়েছিলো গ্রীকদের হাতে মুসলিম দূতের হত্যার

---

২১. দ্রষ্টব্য, সীরাতের গ্রন্থসমূহ এবং ইসলামের ইতিহাসের সকল গ্রন্থেই এ বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। উদাহরণ স্বরূপ, হুনায়ন বা হাওয়াযিন যুদ্ধ-এর কথা উল্লেখ করা যায়। মক্কার কাফের-মুশরিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয়ের অর্ধ মাসের মধ্যেই আরবের নবউত্থিত শক্তি ইসলামকে
পরাজিত করার জন্য বনী হাওয়াযিন ও বনী ছাকীফের ঐক্যবদ্ধ বাহিনী হুনায়নের প্রান্তরে সমবেত হয় এবং বিপুলতা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

২২. বিস্তারিত দেখুন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন [৯ম খণ্ড], ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৫৯.

২৩. এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় 'মৃত সাগর'-এর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে মু'তা নামক স্থানে ৮ হিজরিতে [৬২৯ সাল]। যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে সাহসিক নেতৃত্বের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতি খালিদকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তলোয়ার খেতাবে ভূষিত করেন।

২৪. তাবুকের যুদ্ধে কোনরূপ মুকাবিলা হয় নি। কোন রক্তপাত ও জীবনহানি ঘটে নি। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, বিজয় ও সাফল্য দু'টিই হাসিল হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুর বিরুদ্ধে এমনই কৌশলী ভূমিকা অবলম্বন করলেন যে, প্রতিপক্ষ কিছুই বুঝতে পারলো না। ফলে তিনি যখন এসে পৌঁছালেন, তখন শত্রুপক্ষ অসহায়ত্ব প্রকাশ ছাড়া কিছুই করতে পারলো না। তিনি পরাজিত পক্ষের প্রতি কোনরূপ নৃশংসতা করা তো দূরের কথা, তাদেরকে ইসলামী সীমানার নিরাপত্তার মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ যুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে মদীনা ও মক্কাকেন্দ্রীক ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত একদিকে ইরান এবং অন্যদিকে মিসর রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

www.bjilibrary.com

কারণে; ইসলামের সীমান্তকে নিরাপদ করার জন্য। মুসলিমগণ যদি প্রাচ্যের খ্রিস্টানদের এই নরহত্যার জন্য শাস্তি না দিত, তাহলে যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামের সুমহান মর্যাদা এতোটা সমুজ্জ্বল হতে পারতো না; হেরাক্লিয়াসের আগ্রাসী-আধিপত্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসের গৌরবময় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এটাই যে, শত্রু ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এত অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতার সকল তথ্য-সংবাদ জেনে ফেলার পরও মুসলিম বাহিনী সংযত এবং ইসলামের নীতিমালার অধীনে থাকতে সমর্থ হয়েছে। বরং যুদ্ধই মুসলিমদের উপর এসে পড়েছে। যুদ্ধ কীভাবে মুসলিমদের উপর এসে পড়েছে, সেটা মদীনায় কাফের-মুশরিক আক্রমণকারীদের তৎপরতার মাধ্যমে প্রমাণযোগ্য।

একইভাবে গ্রীক সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা মুসলিমদেরকে খ্রিস্ট জগতের অধিকাংশের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে টেনে আনে। কারণ, বাইযান্টাইন সম্রাটের ক্ষীয়মান কর্তৃত্বের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মর্যাদা এমন জগা-খিচুড়ি মার্কা ছিলো যে, তাদের কারও সাথে সন্ধি-চুক্তি করে বিবাদ নিষ্পত্তি করা মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একজনকে পরাভূত করে চুক্তির মধ্যে আনতে-না-আনতেই আরেকজন শত্রুতামূলক একটা কিছু করে বসে, আর মুসলিমগণ এর শাস্তিবিধান করতে বাধ্য হয়। ফলে মুসলিমগণ প্রায় সমগ্র খ্রিস্ট জগতের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় নিপতিত হয়।[২৫]

অর্থাৎ আত্মরক্ষা আর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার বাইরে আক্রমণকারী হিসাবে কখনওই মুসলিম শক্তিকে দেখতে পাওয়া যায় নি এজন্যই যে, ধর্মের বিধানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই প্রতিরক্ষার বিধান ও আন্তর্জাতিক আইন-নীতি-নিয়মকেও লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ ও অন্তর্ভূক্ত করা রয়েছে ইসলামে। কাজেই মুসলিমগণ তাদের শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যাহ্নকালেও শত্রুদেরকে সব সময়ই বলতে পেরেছে:

> "আমাদের প্রতি শত্রুতা বন্ধ করো, আর আমাদের মিত্র হয়ে যাও, আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো; অথবা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে কর দাও, আমরা তোমাদের সকল অধিকার নিশ্চিত করবো আর রক্ষা করবো; অথবা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো, তাহলে আমাদের যা আছে তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই তোমরা ভোগ করতে পারবে।"[২৬]

মুসলিমদের যুদ্ধ আইনের ভিত্তি আল্লাহর যেসব প্রধান নির্দেশাবলী এবং যা রসূল

---

২৫. এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন উরকুহার্ট নামে একজন অমুসলিম তার ইসলাম অ্যাজ অ্যা পলিটিক্যাল সিস্টেম নামক গ্রন্থে।

২৬. সৈয়দ আমীর আলী [২০০৫: ২৬১]

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিখিয়েন অপরাজেয় মানুষগুলোকে এবং এর মধ্যেকার জ্ঞানবত্তা ও মানবতাবোধ ইসলামী ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে, সেই ঐশী নিদের্শনা অলঙ্ঘণীয়। আর এ সকলই আজ-কাল-আগামীর প্রতিরক্ষাগত চিন্তা ও বিবেচনার মৌলিকভিত্তি, যাকে কেন্দ্র করে এবং মূলাদর্শ ধরে বিদ্যমান বাস্তবতায় প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল প্রণয়নের দাবি রাখে:

> "আর তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, আল্লাহর ধর্মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু তাদেরকে প্রথমে আক্রমণ করে বাড়াবাড়ি করতে যেও না, কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর যেখানেই আক্রমণকারীকে পাও সেখানেই তাদেরকে হত্যা করো, আর যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছিলো সেখান থেকে তোমরাও তাদেরকে বের করে দাও, কারণ নির্যাতন হত্যার চেয়েও খারাপ; আর কাবা-প্রাঙ্গনে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না, কিন্তু তারা যদি আক্রমণ করে তবে তাদেরকে হত্যা করো; ওই হচ্ছে অবিশ্বাসীদের উচিত পুরস্কার। ... আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যাবৎ তা নির্যাতনে পর্যবসিত না হয়, কারণ ধর্মটা তো কেবল আল্লাহরই ব্যাপার; কিন্তু তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে আর যেন শত্রুতা করা না-হয় শুধু উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ছাড়া।"[২৭]

মুসলিমগণ যে পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘোরায়, তা কেবল অবস্থার গতিকে বাধ্য হয়েই। মুনযির বংশ নামে একটি আধা-আরব পরিবার পারসিক রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় হিরায়[২৮] রাজত্ব করছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে শত্রু ভাবাপন্ন হলেও তারা ধর্ম আর সম-স্বার্থের বন্ধনে বাইযান্টাইনদের সাথে মিত্র-ভাবাপন্ন ছিল। গ্রীকদের সাথে মুসলিমদের প্রথম সংঘর্ষের ফলেই মুনযির শাসনাধীন প্রজাদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা উচ্ছৃঙ্খলার অঙ্গ হিসাবে পার্শ্ববর্তী উপজাতিগুলোর উপর লুটতরাজমূলক হামলা শুরু করে, আর ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একক শাসনকর্তার পরিচালনাধীন একটি শক্তিশালী সরকার, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁরই নীতি-আদর্শ-প্রশিক্ষণে দীপ্ত হয়ে নানা বিদ্রোহ দমনের আরও সুসংবদ্ধ একটি সরকার, একটি ভেঙ্গে-পড়ো-পড়ো সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের হাতে অন্যায়ভাবে অপমান নীরবে সহ্য করতে পারে নি।

---

২৭. আল কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৯০-১৯৩.

২৮. হিরাবাসীদের এলাকা বিস্তৃত ছিল বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে---ফোরাত নদীর তীর থেকে পশ্চিম দিকে ইরাকি মরুভূমির অনেকখানি নিয়ে গাস্‌সানি আরবদের পশুচারণ ভূমির প্রায় সীমা পর্যন্ত। গাস্‌সানিরা আবার আনুগত্যের সূত্রে আবদ্ধ ছিল বাইযান্টাইনদের সাথে। বিস্তারিত, দেখুন, সৈয়দ আমীর আলী [২০০০]।

www.bjilibrary.com

হিরা বিজয়ের ফলে মুসলিম বাহিনী এসে পড়ে পারস্য সাম্রাজ্যের অঙ্গনে। পারস্য তখন দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর নিষ্ঠুরতার ইতিহাসের পর একজন তেজোদীপ্ত শাসনকর্তারূপে পেয়েছিল ইয়াযদজর্দকে। এই সম্রাটের নিদের্শে পারসিক সেনাপতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বস্ত সাথী হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মদীনার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা বিধানের একনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে পারসিকদের যুদ্ধে আহ্বানের সশস্ত্র জবাব দেওয়ার আগে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইয়াযদজর্দের কাছে দূত মারফত 'সাধারণ শর্তাবলী'[২৯] প্রেরণ করেন।

এই শর্তাবলী ছিল ইসলাম কবুল করা, যার অর্থ ছিল যে-সমস্ত রাজনৈতিক অনাচারের ফলে চরম নীচ স্তরে নেমে যাওয়া সাসানীয় সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার সংস্কার, যে-সমস্ত খাজনার ভারে জাতির জীবন শুকিয়ে যাচ্ছিল তার উচ্ছেদ, ইসলামের সাম্য ও ন্যায়-নীতির অনুসারে বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন, যার ফলে আইনের চোখে সমস্ত মানুষ পদ ও মর্যাদা নির্বিশেষে সমান বলে গণ্য হবে। বিকল্প শর্ত ছিল বশ্যতা স্বীকারমূলক কর প্রদান, যার পরিবর্তে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে।

এই শর্তাবলী পারস্য সম্রাট প্রত্যাখ্যান করেন–ফলে আসে কাদিসিয়ার দিন।[৩০]

বিজয়ের পর খলীফা কঠোর নিদের্শ দান করেন যে মুসলিমগণ যেন কোনও ক্রমে তাইগ্রিস নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর না হয় এবং ঐ নদী চিরতরে পারসিক আর সারাসেনিক সাম্রাজ্যের সীমা নিদের্শ করবে। মেসোপটেমিয়ায় পরাজিত হয়ে পারসিকদের গাত্রদাহ শুরু হয় এবং তারা আরও বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা অব্যাহত রাখে। ফলে মুসলিমদের প্রচণ্ড প্রতিরোধমূলক-আক্রমণে পারস্য-রাজের ক্ষমতা অনুদ্ধরণীয়ভাব বিচূর্ণ হয়ে যায়। যে-সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আর পুরোহিত শ্রেণীর নেতাদের স্বার্থ ছিল বিশৃঙ্খলা আর অত্যাচারের রাজত্ব বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে, তাদের অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমগ্র সাধারণ পারসিকরা মুসলিমদের তাদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে অভ্যর্থনা জানায়। তাইগ্রিস থেকে আলবুর্জ, আর আলবুর্জ থেকে ট্রান্সঅক্সিনিয়া পর্যন্ত বিপুল ভূখণ্ড আর এর জনগণ মুসলিমদের বিজয়ে প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা অমৃত পান করে।

---

২৯. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনরা কোন শত্রুপক্ষকেই তাদের সীমাহীন শত্রুতা ও জুলুমের জন্য প্রথমেই আক্রমন করেন নি। প্রতিপক্ষকে দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হতো।

৩০. ৬৩৭ সালের মার্চ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এতে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ফলে সহস্রবর্ষব্যাপী প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের স্বৈরশাসনের অবসান হয় আর ইসলামের বিজয় পতাকার সুশীতল শান্তির ছায়াতলে বিপুল-বিশাল অঞ্চলের লাখো নির্যাতিত মানুষের পরম আশ্রয় লাভের সুযোগ ঘটে।

www.bjilibrary.com

নয়.

প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ নীতির পর্যালোচনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ইসলাম তরবারিতে হাত দিয়েছে আত্মরক্ষার জন্য, তরবারি হাতে ধরে রেখেছে আত্মরক্ষার জন্য, আর তা করবেও চিরকাল—এটা ইসলামের বিধান। ইসলাম কখনও কারও নৈতিক বিশ্বাস বা অধিকারের উপর আগাম হস্তক্ষেপ করে নি, কখনও ধর্মীয় নির্যাতন করে নি, কখনও যাজকীয় তদন্ত-সভা স্থাপন করে নি—যেমনটি করেছে গোড়া খ্রিস্টরা। মতভেদকে শ্বাসরোধ করে মারার জন্য, কিংবা মানুষের বিবেককে গলা টিপে হত্যার জন্য, অথবা বিরোধী ধর্মমত নিপাতের জন্য ইসলাম কখনও 'র‍্যাক'[৩১] বা 'স্টেক'[৩২] আবিস্তার করে নি—ব্যবহার করা তো দূরের কথা।

ইতিহাসের উপযুক্ত জ্ঞান আছে, এমন কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, খ্রিস্টান গির্জা যখন নিজেদেরকে পরম অভ্রান্ত বলে প্রচার করছে তখনও তারা নিরাপরাধ মানুষের রক্তপাত করেছে মানব জাতির মধ্যে সৃষ্ট যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি মাত্রায়।[৩৩] যেসব নর-নারী গির্জার অধীনতা থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে, এমনকি অন্য ধর্মমতে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে, তাঁদের ভাগ্যও কোনও অংশে কম নিষ্ঠুর ছিল না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এমন অনেককে পুড়িয়ে বা ফাঁসি দিয়ে মারা হয়, কারণ তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজন খারাপ লোক বলে মনে করতে পারেন নি। এমনকি, ১৫২১ সালে খ্রিস্ট জগতের দেশগুলোতে চরম ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের স্বার্থে ভিন্নমত প্রকাশকদের মৃত্যুদণ্ড দানের ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পুড়িয়ে মারা আর ফাঁসি দিয়ে মারা, জিহ্বা টেনে ছেঁড়া আর জিহ্বা মোচড়ানো ইত্যাদি ছিল গোঁড়া যাজকতন্ত্রী-খ্রিস্টধর্মমত গ্রহণ করতে অস্বীকারকারীদের প্রতি প্রদত্ত সাধারণ শাস্তিও নমুনা। গণতন্ত্রের তথাকথিত সূতিকাগার ইংল্যান্ড প্রোটেস্টান্ট হয়ে যাওয়ার পর প্রেসবাইটারিয়ানপন্থীদের পরপর বহু বছর বন্দি করে রাখে; তাদের দেহ পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দেয়; অঙ্গহানি ঘটায়; চামড়া খসানো হয়; এবং 'পিলোরি'তে[৩৪] আটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। স্কটল্যান্ডে তাদেরকে ধরার জন্য চোর-ডাকাতের মতো পাহাড়ে-পর্বতে তাড়িয়ে নিয়ে নিভৃত্যে গিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে তাদের কান গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে;

---

৩১. মধ্যযুগের খ্রিস্ট জগতে প্রচলিত শাস্তি দেওয়ার জন্য মানুষের দেহ টানটানভাবে আটকে রাখার যন্ত্র।

৩২. মধ্যযুগের খ্রিস্ট জগতে পুড়িয়ে মারার জন্য মানুষকে বেঁধে রাখার শক্ত খুঁটি।

৩৩. যে রেকর্ড বৌদ্ধ-মুসলিম নিধনের মাধ্যমে ভারতের হিন্দুরা আর মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম নিধনের মাধ্যমে ইহুদিরা স্পর্শ করেছে।

৩৪. গলায় আটকানোর জন্য ফাঁকওয়ালা তক্তাখণ্ডযুক্ত যন্ত্র-বিশেষ, উঁচু খুঁটির সঙ্গে লাগানো থাকে, যেখানে ঝুলিয়ে বিরুদ্ধবাসী মানুষকে লটকিয়ে রেখে নির্যাতন করা হতো।

১৯—

www.bjilibrary.com

লোহা পুড়িয়ে গায়ে দগদগে দাগ দেওয়া হয়েছে; আঙুলচাপা যন্ত্র দিয়ে আঙুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে; পিটিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে গুড়া করা হয়েছে। মেয়েলোককে খোলা রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাবুক মারা হয়েছে। আনাব্যাপটিস্ট আর অ্যারিয়ানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আবার অ-খ্রিস্টানদের [ইহুদি ও মুসলিম] বেলায় ক্যাথলিক-প্রোপেস্ট্যান্ট, গোঁড়া আর অ-গোঁড়া, সমগ্র খ্রিস্ট জগত পূর্ণ ঐক্যমতের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরম উল্লাসে সম্মিলিতভাবে নির্যাতন করেছে। ইংল্যান্ডে ইহুদিদেরকে পশুর মতো পেটাতে-পেটাতে নিঃস্বভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্পেনে মুসলিমদেরকে মসজিদের ভেতরেই নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অশ্বেতাঙ্গদের বেলায় কি নির্মম আচরণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করার মধ্যেও আতঙ্ক জেগে ওঠে।

মানুষের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যান্ত অমানবিকভাবে পায়ে পিষে ফেলার এই ভয়ঙ্কার-নিবর্তনমূলক ইতিহাস থেকে তুলনামূলক বিবেচনায় ইসলামের দিকে চোখ ফেরানো হলো সুস্পষ্ট পার্থক্যটি কারও পক্ষে অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টধর্ম যখন ইহুদি আর নেস্টোরিয়ানদেরকে সমান হিংস্রতা সহকারে নির্যাতন করে---তাদের বিমূর্ত ঈশ্বরকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, ইহুদিরা তাদের বংশধর বলে, আর নেস্টোরিয়ানরা তাঁর মাকে উপাসনা করে না বলে---ইসলাম তখন উভয়কেই আশ্রয় আর নিরাপত্তা দান করে। খ্রিস্টান ইউরোপ যখন ডাইনি ও বিচ্যুতমতাবলম্বীদেরকে পোড়ায় আর ইহুদিদেরকে ও খ্রিস্ট-ধর্মে-অবিশ্বাসীদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করে, মুসলিম শাসনকর্তারা তখন তাদের তরবারিকে অধীনস্থ অমুসলিম প্রজাদের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার্থে ব্যবহার করে। সুবিবেচনা ও সহনশীলতার চরম পরাকাষ্ঠার এমন নজির বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। যে খ্রিস্টান জগতে ধর্মের পার্থক্য যুদ্ধ ও হত্যার কারণ[৩৫], ইসলামে সেটা চরম উদারতা, সহনশীলতার বিষয়। খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পরাজিত জেরুসালেমের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি নগরীতে প্রবেশ করেন প্যাট্রিয়ার্ক সফ্রেনিয়াসের পাশাপাশি অশ্বারোহণ করে, নগরীর প্রাচীন নিদর্শনাদি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে। নামাযের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন চার্চ অব রিসারেকসন-এ, কিন্তু সেখানে তিনি নামায আদায় করতে অস্বীকার করেন, নামায আদায় করেন তিনি চার্চ অব কনস্ট্যান্টান-এর সিঁড়ির উপর। তিনি প্যাট্রিয়ার্ককে বলেন: "আমি যদি

---

৩৫. শুধু পর ধর্ম নয় বা মুসলিম-ইহুদিদের ক্ষেত্রেই নয়, নিজ ধর্ম ও জাতিতে ভিন্ন ধর্মবলম্বীদের প্রতিও ভয়াবহ যুদ্ধ ও নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া হয়। শার্লেমানি কর্তৃক স্যাক্সন ফ্রিসিয়ান ও অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলোকে হত্যা করা, আরিয়ান ও পলিসিয়ানদের পুড়িয়ে মারা, আলবিজেন্স ও হিউগেনটনদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে মারা, ম্যাগডিবার্গ ও রোম নগরের হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন, কালভিন্পন্থী ও লুথারপন্থীদের পারস্পরিক রক্তপাত, কালোদের নিধন---সবই হয়েছে খ্রিস্ট জগতে ভিন্নমতের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতার ফলস্বরূপ।

www.bjilibrary.com

কোনও গির্জায় নামায আদায় করি তাহলে ভবিষ্যতে মুসলিমগণ আমার উদাহরণ অনুকরণ করে সন্ধিভঙ্গ করতে পারে।' অর্থাৎ গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার মতো ব্যাপার ঘটে যেতে পারে---তা-ই পরধর্মের প্রতি এমন সহনশীলতা ও সতর্কতা। অথচ খ্রিস্ট-ক্রুসেডকারীরা যখন জেরুসালেম জয় করে তখন ছোট শিশুদের মাথা দেয়ালে আছড়ে ঘিলু বের করে দেয়। কচি কিশোরদের নগরীর উঁচু দেয়াল থেকে নিচে নিক্ষেপ করে অকাতরে হত্যা করে। পরাজিত মানুষদেরকে আগুনে সিদ্ধ করে মারে। সোনা গিলে পেটে রেখেছে কি-না, সেটা দেখার জন্য জীবিত মহিলাদের পেট চিরে ফেলে। ইহুদিদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে তাদের উপাসনালয় সিনাগগে ঢুকিয়ে হত্যা করে। প্রায় সত্তর হাজার লোক তথাকথিত বিজয়ী দলের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। এমনকি মান্যবর পোপের দূতকেও দেখা যায় এ বিজয়-পরবর্তী হত্যা-লুণ্ঠনে বীরদর্পে অংশ গ্রহণ করতে।[৩৬] আর গাজি সালাহউদ্দিন যখন নগরী পুনরুদ্ধার করেন, তখন তিনি সকল খ্রিস্টানকে ছেড়ে দেন; তাদেরকে অর্থ ও খাদ্য দান করেন; তাদের জন্য পাহাড়ার ব্যবস্থা করেন।[৩৭]

ইসলাম স্বীয় প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য 'তরবারি ধারণ করে'; মানবতাকে মুক্তির জন্য মানবতার স্বার্থে যুদ্ধে যোগ দেয়; যুলুম-নিপীড়ন উচ্ছেদের জন্য যালেমের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার উচ্চারণ করে---এটাই প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে ইসলামের মূল ধারণা। অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদ অস্ত্র ধারণ করে চিন্তার স্বাধীনতা আর বিশ্বাসের মুক্তিকে শ্বাসরোধ করে মারার জন্য; মানবতাকে রক্তাক্ত করার জন্য। অতীতে এ কথা যেমন সত্য, বর্তমানে সেটা আরও সত্যরূপে প্রতিভাত। বিশ্ব ইতিহাসের পাঠকদের কাছে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট, কারণ তারা পুরো রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

দশ.

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের মাত্র দু' বছর পরে ৬২৪ সালে সংঘটিত ইসলামের প্রথম যুদ্ধ 'বদর' থেকে শুরু করে ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল বিজয় পর্যন্ত ছোট-বড় শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুদ্ধ পর্যালোচনা করলে[৩৮] আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই যে, সেগুলোতে তদানীন্তন আমলের বৃহৎ শক্তির প্রায় সবগুলো জাতিই সম্পৃক্ত ছিল। যুদ্ধের এক পক্ষে ছিল নবাগত মুসলিম শক্তি আর অন্য দিকে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শক্তি। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে ছিল তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী নানা জনগোষ্ঠী---আরব, বারবার, তুর্কী, ইরানি, হাবশি, কুর্দি,

---

৩৬. ড্রেপার [১৯৭৮]

৩৭. সৈয়দ আমীর আলী [২০০০]

৩৮. বিস্তারিত দেখুন, লে. ক. এম.এম কোরেশী [২০০৩], জেনারেল আকবর খান [১৯৮৪], সৈয়দ আমীর আলী [২০০৫], Muhammad Abdullah Enan [2002].

www.bjilibrary.com

আফগানসহ অনেকেই। বিপক্ষে ছিল রোমান, পারসিক, ভিসিগোথ, পারশিক, ক্রুসেডার, মোঙ্গল ও রাজপুতেরা। যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মুসলিম পক্ষ বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছে, প্রমাণ করতে পেরেছে তাদের নৈতিক, আদর্শিক ও উপকরণগত উপযুক্ততা এবং বিজয়ও তারাই ছিনিয়ে এনেছে। প্রতিটি যুদ্ধের জন্যই এ কথা সমানভাবে সত্য।

প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা ছিলেন মরুভূমির সন্তান। ইসলাম তাদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা আর সাম্যের সহজাত অনুভূতি জাগ্রত করে। এবং সেই সহজাত প্রবণতাকে তীব্রতর ও বেগবান করে ঈমান, একতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-এর অনুপম চেতনা-শক্তি।

পক্ষান্তরে মুসলিমগণ যে সমস্ত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল সুবিধাভোগীর দল আর অন্যদিকে নিপীড়িত-নির্যাতিতগণ। সুবিধাভোগীদের দলে ছিল সামন্ত প্রভু এবং গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। অপরদিকে ভূমিদাসগণ। ধর্ম ও নৈতিকতার সাম্য ও মানবিকতায় ঐক্যবদ্ধ মুসলিমগণ যখন বিজয়ীর বেশে অবতীর্ণ হন তখন নির্যাতিত ও বঞ্চিতরা তাদেরকে গ্রহণ করে ত্রাণকর্তারূপে। মুসলিমদের বিজয়ের মধ্য দিয়েই তাদের মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বিরোধী পক্ষের এই অনৈক্যকে মুসলিম শক্তি খুব ভালোভাবে কাজে লাগায় কারণ তাদের যুদ্ধের অন্যতম মূল কথাই হলোঃ 'শোষণ/যুলুমের অবসান'।

এই আদর্শিক অগ্রসরতার জন্যই মুসলিম শক্তি সামরিক দিক দিয়ে এবং মনোবল আর সরঞ্জামের প্রাগ্রসরতার বিবেচনায় শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিভক্ত-ভঙ্গুর শত্রু পক্ষকে সহজেই বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে যখন মুসলিম বাহিনী যে এলাকাতে গেছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী মুক্তির দিশারীরূপে তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। তারা প্রমাণ পেয়েছিল যে, মুসলিমগণই তাদেরকে সামন্ত প্রভু এবং যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ ও উৎপীড়ন, অজ্ঞতা এবং অসহিষ্ণুতার কঠোর শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি দিতে সক্ষম।

বস্তুতপক্ষে শত্রু জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের উপর আগাম নিয়ন্ত্রণ ও আস্থা অর্জনের বিষয়টি মুসলিমদের বিজয় লাভের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ অবস্থা যতদিন বজায় ছিল, মুসলিম বাহিনী ততদিন দুর্জয় ও অপরাজেয় গতিতে এগিয়ে গেছে।

কিন্তু কালের বিবর্তনে গোটা পরিস্থিতি ভিন্নরূপ ধারণ করলো। মুসলিমরা যে শুধুমাত্র অপরের বন্ধন-শৃঙ্খলকে উন্মোচন করতে ব্যর্থ হল তা-ই নয়, বরং তারা নিজেরাই

www.bjilibrary.com

শৃঙ্খলিত হয়ে গেল। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় এককালে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদও শুরু হলো। তারা বিভক্ত হয়ে গেল আরব, আযম, উত্তর আরব, দক্ষিণ আরব, বারবার প্রভৃতি দল-উপদলে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের ফলে স্বীয় মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা সংরক্ষণে তাদের সুউচ্চ চেতনাগত মনোভাবেরও তিরোধান ঘটলো।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের অজেয় প্রতিরক্ষা শক্তি এবং এরই ভিত্তিতে বিস্ময়কর বিজয়ের পেছনে এমন কোনও পারলৌকিক ফর্মুলা ছিলো না, যা আবৃত্তি করায় ম্যাজিকের মতো ফল পাওয়া গেছে। বরং তখনকার মুসলিমদের মনে প্রতিরক্ষা চেতনা ছিলো খুবই প্রবল ও স্পষ্ট। এই প্রেরণাই তাদেরকে উন্নতমানের যোদ্ধা আর গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে অগ্রসর সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিল।

ইতিহাসের শিক্ষা থেকে জানা যায়, মুসলিমগণ প্রতিরক্ষা ধারণার মূল প্রেরণা থেকে সরে আসার মাধ্যমেই সূচিত হয় পরাজয়, বিপর্যয়, অধঃপতন। যে নিয়ম-পদ্ধতি বা কৌশল-কর্মপন্থার বদৌলতে তারা সকলের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন, সেই সূত্রগুলোর পেছনের চেতনাগত বা আদর্শিক প্রণোদনা না-থাকায় অচীরেই সেগুলোই অকার্যকর প্রমাণিত হলো। শাসক মুসলিমগণ শাসিতে আর স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পরাধীনে পরিণত হলো। যে বিপর্যয়ের ধারা এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে।

মূলত এটাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং যুগ যুগ ধরে মানবেতিহাসে এই শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, যা সতর্কবাণীরূপে আল-কোরআন বার বার উল্লেখ করেছে এই বলে যে, যারা সবচেয়ে বেশি যোগ্য, তুলনামূলকভাবে যাদের উপযুক্ততা বেশী, আল্লাহ তাদের উপরই পৃথিবীর নেতৃত্ব-শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং যতদিন তারা আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গে তাদের জন্য নির্দেশিত যোগ্যতা ধরে রাখতে পারবে, কেবলমাত্র ততদিনই এই সুযোগ পাওয়া যাবে। প্রতিরক্ষার মতাদর্শিক ও ধারণাগত ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করবার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে এই অমোঘ সত্য মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আগ্রাসনমূলক বাস্তবতায় আমাদের স্বাধীন, আত্মসম্মানজনক ও নিরাপদ বেঁচে থাকার তাগিদেই। ■

তথ্যপঞ্জি

- আল কোরআন।
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী [২০০২], তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী।
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ঈমানের হাকিকত।
- লে. ক. এম.এম কোরেশী [২০০৩], গৌরবদীপ্ত জিহাদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- জেনারেল আকবর খান [১৯৮৪], ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

- সৈয়দ আমীর আলী [২০০৫], দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনূদিত, ঢাকা: প্যাপিরাস।
- সৈয়দ আমীর আলী [২০০০], আরব জাতির ইতিহাস [অ্যা শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য সারাসেন্স], রেয়াজুদ্দিন অনুদিত, ঢাকা: প্যাপিরাস।
- হারুনুর রশীদ [১৯৯৯], রাজনীতিকোষ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।
- মাহফুজ পারভেজ [২০০৯], "বাংলাদেশে রাজনৈতিক-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস: কতিপয় ঐতিহাসিক-তত্ত্বগত সংযোগ সূত্র", সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
- মাহফুজ পারভেজ [২০০০], একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, ঢাকা: গতিধারা।
- মাহফুজ পারভেজ [২০০৬], "বিশ্বায়ন: ইসলাম ও বাংলাদেশ", সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৩-২০০৫, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
- মাহফুজ পারভেজ [২০০৬-ক], "যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ", সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৩-২০০৫, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
- উরকুহার্ট, ইসলাম অ্যাজ অ্যা পলিটিক্যাল সিস্টেম
- ড্রেপার [১৯৭৮], হিস্টি অব ইনটেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অব ইউরোপ
- Muhammad Abdullah Enan [2002], Decisive Moments in the History of Islam, New Delhi: Goodword Books.
- Mahfuz Parvez [2006], Management of Ethnic Conflicts in South Asia: A Comparative Study of Tamil and Chittagong Hill Tracts Problems, Ph.D Dessertation, Chittagong: University of Chittagong, Bangladesh.
- Fisher, Simon [2000], Working with Conflicts: Skills and Strategies for Action, London: Zed Books.
- Ayoob [1996], "State-Making, State-Building and State-Failure: Explaining the Roots of 'Third World' Insecurity" in Lue Van de Goor et. Al. [eds.], Between Development and Destruction: An Enquiry into the Causes of Conflict in Post-colonial States, London: Macmillan.
- Ryan, Stephen [1995], Ethnic Conflict and International Relations, London: Dartmouth Publishing Company.
- Phadnis, Urmila [1990], Ethnicity and Nation-building in South Asia, New Delhi: Sage Publications.
- Holsti, Kalevi J. [1991], Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ruqaiyyah Waris Maqsood [2003], A Basic Dictionary of Islam New Delhi: Goodword Books.
- Luard, Evan [1986], War in International Society: A Study in International Sociology, London: Tauris.
- Frederic F. Clairmont, [2005], "Iraq: The Nemesis of Imperialism", Economic and Political Weekly, July 16, 2005.

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ– কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান

■

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩৭টি বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো এদেশের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৩ সনে গঠিত ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি অবলম্বন করে এগুতে গিয়ে সেই কমিটিগুলোও জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। বর্তমান আওয়ামী সরকার আরেকটি শিক্ষা কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু কুদরাত-ই-খুদা কমিশন কর্তৃক প্রণীত এবং জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সেই শিক্ষা নীতিকেই ভিত্তি বানিয়ে নতুন দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এই কমিটিকে বলা হয়েছে। একটি প্রত্যাখ্যাত শিক্ষানীতিকে নতুন কমিটির জন্য ভিত্তি বানানোটাও অযৌক্তিক।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় চিন্তা-চেতনার নিরিখে একটি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের শিক্ষানীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশের শিক্ষানীতির ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা পেশ করা দরকার। মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অঙ্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে: মক্তব ও মাদ্রাসা, মসজিদ ও মঠ এবং ব্যক্তিগত বাড়িতেও শিক্ষা কর্ম চলতো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১. এডামস রিপোর্ট [১৮৪৪] : ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধিত হয়। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিং-এর আমলে এডাম নামে জনৈক স্কটল্যান্ডবাসীকে দিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি এডামস রিপোর্ট নামে সরকারের কাছে সে রিপোর্টটি জমা দেয় তাতে সাত শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ছিল। যেমন : ১. দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ২. মিশনারী বিদ্যালয় ৩. পারিবারিক বিদ্যালয় ৪] ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজ ৫. দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় ৬. দেশীয় মাইনর বিদ্যালয় ও ৭. বয়স্ক বিদ্যালয়। এছাড়া হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় ছিল। তাছাড়া ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

২. উডস ডেসপাস [১৮৫৪] : ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য হাউস অব কমন্স 'উডস ডেসপাস' নামক ব্যক্তিকে প্রধান করে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করে এবং এ কমিটির সুপারিশসমূহকে উডস ডেসপাস শিক্ষা রিপোর্ট বলে। এই রিপোর্টে ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইউরোপে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষার অনুকরণে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

৩. হান্টার কমিশন [১৮৮২] : বৃটিশ সরকার ডেসপাস কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি মূল্যায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে দিয়ে একটি কমিশন গঠন করে।

৪. লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার [১৮৯৮] : যে সময় ও যে সব অঞ্চলে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা সংস্কার ও ব্যবস্থা নিয়ে গণরোষ সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন যিনি উইলিয়াম হান্টার কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং তা আরো বেগবান করার জন্য একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

www.bjilibrary.com

৫. স্যাডলার কমিশন [১৯১৭] : লর্ড কার্জনের সংস্কার রিপোর্টটির অব্যবহিত পরে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কতিপয় জটিল সমস্যা দেখা দেয়ায় লিডস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়।

৬. সার্জেন্ট পরিকল্পনা [১৯৪৪] : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং এ প্রেক্ষিতে ভারতে বড়লাটের নির্দেশে শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়।

৭. আকরাম খান কমিটি [১৯৫২] : ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালে একটি কমিটি গঠন করে।

৮. আতাউর রহমান খান কমিশন [১৯৫৭] : আকরাম খান কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় গণরোষ সৃষ্টি হয় এবং তদানীন্তন সরকার আতাউর রহমান খানকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে।

৯. শরীফ কমিশন [১৯৫৮] : পাকিস্তান হওয়ার পর এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা জটিলতা, অভিযোগ ও অনুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে জনাব এস.এম. শরীফের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।

১০. এয়ার মার্শাল নূর খান শিক্ষা কমিশন [১৯৬৯] : পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে এয়ার মার্শাল নূর খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং কমিশন পাকিস্তান সৃষ্টির পটভূমিকা ও জনগণের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করে এবং পর্যায়ক্রমে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয় যার প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি. তে একটি সেমিনারে বক্তব্য দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আবদুল মালেক শাহাদাত বরণ করেন। এরপর শুরু হয় গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশ আন্দোলন এবং পরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

বক্তব্য

একটি দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি সেদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। মূলত শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত করার প্রধান সোপান, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি, জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, জনগণের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের বিভাজন দূরীকরণের সফল সহায়ক শক্তি এবং জাতীয় মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নের রূপকার। জনগণকে সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা

www.bjilibrary.com

সমাধানের উদ্দীপক ও প্রেরণাদানকারী শক্তি হিসেবেও কাজ করবে এহেন শিক্ষাব্যবস্থা। শুধু তাই নয় জনগণকে তার সর্বোচ্চ ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপিত করবে এ শিক্ষা ব্যবস্থা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন ও প্রতিষ্ঠায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তি যোগাবে জনগণের মধ্যে অদম্য প্রত্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে। মূলতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে গোটা জাতীয় সত্তার কাঠামো। কিন্তু বিগত ৩৬ বৎসর দেশে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা, যা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য উপযুক্ত ও প্রযোজ্য, তা চালু না থাকার কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট আদর্শিক শূন্যতা, নৈতিক দুর্বলতা, ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিভাজন, আগামী প্রজন্মের মধ্যে হতাশা, জাতীয় উন্নতিতে স্থবিরতা, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অশান্তি বিশৃংখলা ও অস্থিরতা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই উল্লেখিত অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং স্বাধীন শক্তিশালী দেশ হিসেবে দুনিয়ার বুকে দাঁড়াতে হবে এবং টিকে থাকতে হবে- এটা নির্ভর করছে স্বাধীন, সর্বজনীন, বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় চেতনার উদ্দীপক, গ্রহণযোগ্য ও সমন্বয় সাধনকারী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর।

বাংলাদেশে প্রণীত শিক্ষানীতিসমূহ

বাংলাদেশে বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং শিক্ষা কমিশনসমূহ শিক্ষানীতিও প্রণয়ন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ যাবৎ কোন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি সঙ্গত কারণেই। এ সমস্ত কমিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪-কে ভিত্তি করে যা কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট নামে তখন থেকে খ্যাত।

সুতরাং তখন ছিল ১৯৭৪ সাল আজ ২০০৯ সাল; প্রায় তিন যুগের ব্যবধান সময়ে সমগ্র দেশ ও দুনিয়ায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বিধায় সে রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমানে নতুন কোন শিক্ষানীতি প্রণয়নের চিন্তা যথার্থ হবে না।

বর্তমান সরকার হয়তো বা এহেন প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করেই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সরকার সেই ১৯৭৪ সনে প্রদত্ত ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশমালাকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে। ১৯৭৪ সন ও ২০০৯ সনের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; সুতরাং সঙ্গত কারণেই ১৯৭৪ সনের শিক্ষা কমিটির রিপোর্টকে টার্মস অব রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ ঠিক নয়। কেননা সে কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তি ছিল তখনকার রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। কিন্তু ১৯৭৫ সনে এ চার মূলনীতির তিনটির মধ্যে বিরাট সংশোধনী আনয়ন করা হয়। মূলতঃ কুদরাত-ই-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের

www.bjilibrary.com

শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল : ক. সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির কর্মী তৈরি করা এবং খ. ধর্মীয় চিন্তা চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি ও এর আলোকে ব্যবহারিক জীবন গড়ে তোলা। কমিশনের ভাষায় আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থী চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তাদের বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে....................[অধ্যায় ১ :২]। এ ছাড়া কমিশনের রিপোর্টে জাতীয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও চরিত্র গঠনের জন্য ধর্মশিক্ষা ও নীতি শাস্ত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়নি; বরং চরিত্র গঠন ও সুনাগরিক তৈরির জন্য চার মূলনীতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য..........[অধ্যায় ২ : ৪]। অধিকন্তু কমিশন দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্য বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে......[অধ্যায় ২ : ১৩]। কুদরাত-ই-খুদা কমিশন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আদর্শ বিবর্জিত করার লক্ষ্যে যে রূপরেখা দিয়েছে তার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে : ক. সেকুলার পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, খ. নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত শিক্ষক নিয়োগ, গ. প্রাক-প্রাথমিক স্তর হবে ধর্মের প্রভাবমুক্ত [ঘ] প্রাথমিক শিক্ষা-প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক এক ও অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা........[অধ্যায় ৭ : ৯], [ঙ] মাধ্যমিক শিক্ষা [৯ম-১২শ শ্রেণী]-মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্মশিক্ষা থাকবেনা.....[অধ্যায় ৮ : ১১], ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ঐচ্ছিক হিসেবেও ধর্মশিক্ষা থাকবেনা........[অধ্যায় ৮ : ১১], একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কোন বিভাগেই ঐচ্ছিক হিসেবে 'ধর্মশিক্ষা' নেয়া যাবে না......[অধ্যায় ৮ : ১১], বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত মৎসশিল্প, তাঁত শিল্প, কাফে কাজ, কেশ বিন্যাস, নৃত্য ইত্যাদি ৪১টি বিষয়ের মধ্যে 'ধর্ম' শিক্ষা হবে একটি এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদির মধ্যে একটি ধর্ম বিভাগ রাখা হয়েছে, চ. মাদ্রাসা শিক্ষা স্কুল শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কমিশন চরম অবজ্ঞা করেছে এবং কমিশনের ভাষায় মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী; কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য....[অধ্যায় ১.২] সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্রাসায় ও ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ইসলামী শিক্ষা দেয়া যাবে না, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে ইসলামী শিক্ষার জন্য মাত্র দুটো পিরিয়ড থাকবে এবং মাধ্যমিক স্তরে মাদ্রাসা ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক ধর্মশিক্ষা লাভ করতে পারবে, তবে তদসঙ্গে অবশ্যই বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও বিজ্ঞান পড়তে হবে [৭ম অধ্যায়]। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা

www.bjilibrary.com

থেকে এটা স্পষ্ট যে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলার ভাবধারায় গড়ে তোলাই ছিল ড. কুদরাত-ই খুদরা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট-এর মূল টার্গেট ও লক্ষ্য।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা যুক্তিপূর্ণভাবেই বলা যায় যে নবনিযুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি কিছুতেই ১৯৭৪ সনে প্রণীত কুদরাত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যা জাতি কর্তৃক সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যাত, একটি মুসলিম প্রধান দেশের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও যে রিপোর্টের মেয়াদ ৩৪ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তা কিছুতেই ভিত্তি হিসেবে বা টার্মস অব রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনা। অধিকন্তু এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের শুরুতেই যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল যার অতীত ছিল বৃটিশ আমলের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানী আমলের সংশোধনীমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা যা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। এহেন সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ দ্বিবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যার একটি ছিল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চালুকৃত তথাকথিত আধুনিক বা ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা আর অন্যটি ছিল মাদ্রাসায় [আলীয়া ও কাওমী] চালুকৃত ধর্মীয় বা উর্দু-আরবী শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি পরিবারের দুই ভাই এক ভাই আধুনিক বা ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত আর অন্য ভাই মাদ্রাসায় উর্দূ-আরবী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত- এ দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য, একজন মিষ্টার অন্যজন মোল্লা নামে অভিহিত; এক ভাই সমাজ পরিচালক বা সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা সাহেব, আরেকভাই মসজিদ মাদ্রাসায় ইমাম-মোয়াল্লেম হিসেবে সমাজে ভূমিকা রেখে আসছে; অথচ একই সমাজে এভাবে সৃষ্ট-সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো স্রোতধারা আদৌ কাম্য নয়। তবে বিগত ৩৬ বৎসর কিছু কিছু সংস্কারের মাধ্যমে মাদ্রাসার আলীয়া নেছাবের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যেমন মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম-কে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি সমপর্যায় এবং সর্বশেষ ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখনও শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই দুটো স্রোতধারার মধ্যে বিরাট বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় যা স্বাধীন দেশের জন্য কল্যাণকর নয়। যদিও আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসায় উক্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু বৃটিশ পাকিস্তানী আমল থেকে চালুকৃত কওমী বা খারিজী নেছাবের মাদ্রাসায় আদৌ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থার উক্ত দুটো ভিন্ন ধারা ছাড়াও বর্তমানে যেটি সবচেয়ে বেশি জোরদার ব্যক্তিক্রমধর্মী ধারা সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন, ও-লেভেল এবং এ-লেভেল যার প্রোডাক্টসমূহ আমাদের প্রচলিত উক্ত দুই ধারার প্রোডাক্টসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং বাংলাদেশের সমাজের সাথে বিপরীত ধর্মী।

এহেন অবস্থায় বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি উল্লেখিত তিনটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সমন্বিত, কার্যকরী, সর্বজনীন, বিজ্ঞানসম্মত, স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি বা একক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য

www.bjilibrary.com

আদৌ কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও ঘোষণা দিতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে বিজ্ঞ মহলে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা উক্ত জাতীয় কমিটিতে ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত শিক্ষাবিদকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি অপর দিকে কমিটি এ যাবৎ জনমত যাচাই বা কোন মত বিনিময় অনুষ্ঠান বা কোন প্রশ্নমালাও পত্রিকায় প্রকাশ করেননি। এতে মনে হচ্ছে উক্ত কমিটি এককভাবে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে কিছু একটা রিপোর্ট তৈরি করে ফেলবে এবং সরকারের ক্ষমতাসীন কালে সুপারিশমালা প্রকাশ বা বাস্তবায়ন করতে পারলেও পারে নাও পারে, যেমন অতীতে কোন কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে উল্লেখ্য, উল্লেখিত তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ যা কঠোর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা দাবি করে। যদি তাড়াহুড়া করে অতীতের কমিশনগুলোর মত একদেশদর্শী, অপূর্ণাঙ্গ, সমন্বয়হীন এবং স্বাধীন দেশের জন্য অনুপযুক্ত কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় এবং এর আলোকে কোন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় তবে তা অতীতের মত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই সুধী মহলের প্রত্যাশা এমনটি যেন না হয়। কেননা তিন যুগ অতীত হয়ে গেল এখনও আমাদের দেশের উপযোগী কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি আমরা প্রণয়ন করতে পারলাম না এর চেয়ে চরম হতাশার বিষয় আর কি হতে পারে এবং আর কত যুগ আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হব। অথচ চলমান ও পরিবর্তনশীল দুনিয়া সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন যুগ সূচিত হচ্ছে ও উন্নয়নের ধারা এগুচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি'-তে বলা হয়েছে একদিকে ১৯৭৪ সালে সেকুলার ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার আলোকে প্রণোদিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে, অপরদিকে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত প্রফেসর ড. এম শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর রিপোর্টকেও গাইডলাইন হিসেবে অনুসরণ করতে। মূলতঃ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর প্রতিবেদন ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট-এর নব্য সংস্করণ। কেননা উক্ত শিক্ষানীতিতেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হৃদয়ে লালিত আদর্শ ইসলামের প্রতিফলন ঘটেনি; বরং নামে মাত্র ধর্মীয় শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা রেখে জাতির নব প্রজন্মের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা লালন করে দেশকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানানোর হাতিয়ার ও মাল-মসলা তৈরির দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূর প্রসারী কৌশলের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এতে ভূমিকাসহ ২৮টি অধ্যায়, ২টি সরণী ও ৫টি সংযোজনী রয়েছে যেগুলোর বিশ্লেষণ অত্র সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আদৌ সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০ প্রণয়নে মূলতঃ গ্রহণীয় ও জাতীয় পর্যায়ে

www.bjilibrary.com

কোন মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল না। ১৯৭৬, ৭৮, ৮৩ ও ১৯৮৭ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টগুলোর কোন রিপোর্টের পর্যালোচনা হয়নি বরং ১৯৯৭ সালে গঠিত কমিশন রিপোর্ট এর মূল্যায়নের উপর বিভিন্ন মহল থেকে সংগৃহীত মতামত নিয়ে শিক্ষানীতিকে ভাষা, বাক্য ও শব্দের মারপ্যাচে আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা সর্বজনীন আদর্শ ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণীত হয়েছিল। এ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর রিপোর্টের ২৮টি অধ্যায়ের ক্রটিসমূহ এখানে সংক্ষিপ্ততার কারণে উল্লেখ করা গেলনা। এমতাবস্থায় ২০০৯ সালের জন্য গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ যুক্তিসঙ্গত কারণেই কোন গাইড লাইন হতে পারে না।

অত্র প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে যাতে করে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ২০০৯ এগুলোকে বিবেচনায় রাখতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে কতিপয় সুপারিশ

বিষয়ভিত্তিক

এক : শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা।

৩. মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ এবং শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর [যেমন : আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃংখলা, সামাজিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদির] বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদন সহায়ক ও সৃজনধর্মী করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, বস্তুগত ও নৈতিক শক্তির সমন্বিত জ্ঞানসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

www.bjilibrary.com

৫. শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং ইসলামের সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার যাথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত [শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ] জ্ঞান, দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদেকে সমর্থ করে তোলা। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৯. শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

১০. শিক্ষাকে জাতি, ধর্ম, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা।

দুই : প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা

১. দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মসজিদকে কেন্দ্র করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটানো সম্ভব। এতে নতুন করে অবকাঠামো তৈরির বাড়তি খরচ ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত অতি দ্রুত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। তাই শিশুমনে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষাদানের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে দেশব্যাপী মসজিদভিত্তিক আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব চালু করা দরকার। প্রাথমিকভাবে বাংলা, অংক ও আরবী এবং পরবর্তিতে ইংরেজি লেখা ও পড়া শেখানো এর আওতায় থাকবে।

২. দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণে আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে। এতে করে নির্দিষ্ট কোর্স সমাপ্ত করে যে কেউ সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনের মূল্যবান দুটি বছর বেঁচে যাবে। অন্য দিকে যারা আর পড়তে পারবে না তারাও মোটামুটি শিক্ষিত হিসেবে জীবন-যাপন করতে পারবে।

www.bjilibrary.com

তিন : প্রাথমিক শিক্ষা

১. প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হতে পারে :

ক. শিশুর যথাযথ মানসম্পন্ন ব্যবহারিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী ও আগ্রহী করে তোলা।

খ. শিশুকে জীবন-যাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণের সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

গ. শিশুর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞান দান করা।

ঘ. সুপ্ত ও সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ও অর্থপূর্ণ শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে শিশুকে তার জীবন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করা।

ঙ. শিশুমনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃংখলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং ধার্মিক ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।

২. মেয়াদ : প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হতে পারে।

৩. বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

ক. দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরাজমান নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে এবং সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন ও বিভিন্ন এন.জি.ও পরিচালিত বিদ্যালয়/শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা। একইভাবে ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেন, ও-লেভেল এ-লেভেলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো।

খ. ইবতেদায়ী মাদরাসায় স্বাতন্ত্র বজায় রেখে শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ. কিন্ডারগার্টেনগুলো সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের আওতায় নিয়ে আসা। এসব বিদ্যালয় সরকার নির্ধারিত শর্ত পূরণ করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে বেসরকারী বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৬২ অনুসারে এসব বিদ্যালয়ের বিষয় বিবেচনা করা।

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু : প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হতে পারে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, বিজ্ঞান এবং আরবী ও ইসলাম শিক্ষা/ধর্মীয় শিক্ষা। এছাড়া থাকবে শারীরিক শিক্ষা। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন

www.bjilibrary.com

ও পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা, যাতে যারা আর বিদ্যালয়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

চার : গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা-বিষয়কে ভিত্তি করে গণশিক্ষার দুটি ধারা থাকতে পারে : বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখাপড়া, হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানবিক গুণাবলীর চেতনায় উদ্দীপ্ত এবং স্বাস্থ্য-পরিবেশ সচেতন করে তোলা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, ঝরে পড়ে যায়, তারা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাসহ মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স ৪ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে।

৪. বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।

৫. দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য পৃথকভাবে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছর তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৬. বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য মসজিদকে অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে ও শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে এ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে মসজিদভিত্তিক আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, এ ছাড়া স্থানীয় ক্লাব, কাচারী ঘরকেও কেন্দ্র বানানো যেতে পারে।

পাঁচ : মাধ্যমিক শিক্ষা

১. **মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

ক. শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।

খ. কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

গ. উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা।

www.bjilibrary.com

ঘ. শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

ঙ. শিক্ষার্থীকে মৌলিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান দান করা।

চ. ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন এবং নৈতিকমান সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলা।

২. **শিক্ষার মাধ্যম :** শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি/আরবী মাধ্যম চালু থাকবে এবং সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৩. **শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক**

ক. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের তিনটি ধারার মধ্যে ২টি ধারা অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে। তবে দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ মাদরাসা শিক্ষায় স্বতন্ত্র ও সমমান বজায় রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

খ. মাদরাসা শিক্ষার সকল বিষয়ে পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব দিতে হবে প্রস্তাবিত মাদরাসা টেক্সটবুক বোর্ডকে।

গ. ও লেভেল এ লেভেলসহ ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৪. **শিক্ষক নিয়োগ**

ক. শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বর্তমান অবস্থা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং মেধাবী যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

খ. সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের চাকুরী বিধির অনুরূপ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের জন্য চাকুরী বিধি প্রণয়ন করা। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদোন্নতি, এসিআর লেখাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচলন করতে হবে।

গ. বেসরকারী স্কুল কলেজের ন্যায় সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর করতে হবে।

ছয় : বৃত্তিমূলক [ভোকেশনাল] ও কারিগরি শিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী অসম প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অদক্ষ জনশক্তিকে বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তি ও

www.bjilibrary.com

বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে। বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সম্প্রসারণ গ্রাম বাংলায় কৃষি থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত ঘটছে। এ সকল ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনশক্তির খুবই প্রয়োজন। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা থাকবে অধিক। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি সরবরাহ করতে না পারলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ সংকুচিত হবে। কাজেই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রেরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হলে কেন্দ্রীয়ভাবে ১টি এবং সারা দেশে প্রতি জিলায় ১টি করে National Training Institute স্থাপন করতে হবে। এভাবে অদক্ষ জনশক্তির পরিবর্তে দক্ষ জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে শীঘ্রই দেশের অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে।

২. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষাসহ মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক করা দরকার।

৩. বৃত্তিমূলক [ভোকেশনাল] ও কারিগরি শিক্ষার সকল পর্যায় ও সেক্টরে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষা [বিশেষ পাঠ] অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

সাত : মাদরাসা শিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এ বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা এবং পার্থিব কল্যাণ, পরকালীন শান্তি ও আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি লাভ করা। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে, সে অনুসারে সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ও তার উন্নয়ন বিধানে উদ্যোগী হয়। পাশাপাশি জীবন ধারণ সংক্রান্ত ও বিভিন্ন জাগতিক কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

২. বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও

www.bjilibrary.com

যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার যাতে এটি নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

৩. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগ ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোর জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. মাদরাসা শিক্ষা ধারায় শিক্ষার্থী মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্বে রাখতে হবে।

৭. মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দিয়ে তার শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা পরিচালনসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ এপিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

৮. প্রতি জিলায় ১টি করে মাদরাসাকে সরকারীকরণ করতে হবে।

৯. মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১০. মহিলা মাদরাসার জন্য মহিলা শিক্ষক এবং বালক মাদরাসার জন্য পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

১১. মাদরাসার সকল পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। বর্তমান মাদারাসা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে মানসম্পন্ন করা ও মহিলা শিক্ষিকাদের আলাদা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. প্রতি বিভাগে একটি করে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

www.bjilibrary.com

১৩. মাদরাসার জন্য আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন করতে হবে।

১৪. স্কুলের অনুরূপ ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য উপজিলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ১ম শ্রেণী থেকে মাতৃভাষার সাথে আরবী ও ইংরেজী বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে পড়াতে হবে। যেমন : তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, তাকওয়া, চিকিৎসা, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি অধ্যায় ভাগ করে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. আকাইদ বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ সন্নিবেশ করতে হবে।

১৮. বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদানের বিষয়গুলোকে পড়াতে হবে।

১৯. প্রচলিত ধর্মগুলোর সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনার বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

২০. ব্যবস্থা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা পরিবেশন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আট : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতার সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। বিশেষভাবে মুসলিম শিক্ষার্থীগণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীন পালনে উজ্জীবিত হবে। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ সকল ব্যবস্থা সুসংহত ও গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান হবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

২. ইসলাম শিক্ষা

ক. শিক্ষার্থীদের মনে যাতে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান গড়ে ওঠে সেভাবে ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে।

খ. ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

গ. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলী অর্জন ও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

ঘ. প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল পর্যায়ে ও স্তরে ইসলামী শিক্ষার বিশেষ কোর্স বাধ্যতামূলক রাখতে হবে।

৩. হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য শিক্ষা ঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব স্ব ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

নয় : উচ্চ শিক্ষা

১. লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ক. নিরলস জ্ঞান চর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।

খ. জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি।

গ. দেশের অদক্ষ ও স্থবির জনসংখ্যাকে এই যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের উপযোগী কর্মচঞ্চল জনশক্তিতে রূপান্তরিত করণ।

ঘ. উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য উচ্চ শিক্ষার নীতিমালা হতে হবে নিম্নরূপ :

* ধর্মীয় ও বৈষয়িক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, পরমত সহিষ্ণু, মানবমুখী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।
* বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান চর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার প্রসারতা বিকাশে সহায়ক।
* সম্পূর্ণ সমাজমুখী অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্তকরণে সচেষ্ট ও সমাধান প্রয়োগে উপযুক্ত।
* আধুনিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের উন্নয়ন ও প্রগতির অনুষঙ্গী।
* উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সমাজের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে একে সমাজ সংযুক্তকরণে প্রতিশ্রুত।
* শিক্ষকতা ও গবেষণার মান উন্নত করতে সমর্থ এমন ব্যবস্থা থাকা।

২. মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। এক্ষেত্রে মেধাগত সমতা নিশ্চিত করার জন্য মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সমমানের হতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩. শিক্ষার গুণগত মান 'নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও কলেজে, উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা যাবে না।

৪. প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে।

৫. দেশের উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের '৭৩-এর অধ্যাদেশ' সর্বোতভাবে পরিবর্তন করে বর্তমান সময় উপযোগী করতে হবে।

দশ : প্রকৌশল শিক্ষা

প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র বিমোচনে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখবে। নৈতিক মান উন্নত করার জন্য ও শিক্ষায় প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এগার : চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

১. চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে হবে নিম্নরূপ ঃ

ক. দেশের সমস্ত অধিবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত মানের চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী ও সকল প্রকারের বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

খ. চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা সকল স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সে জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

গ. দেশের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলীর মুকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

www.bjilibrary.com

ঘ. চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ, সেবক-সেবিকা ও স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা কৌশলীদের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা ও এদের সবাইকে দীনি দৃষ্টিভঙ্গি দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ও মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করা।

২. আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে যাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান উপযুক্ত মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদান এবং এ বিষয়ে কুরআনের শিক্ষা নিয়ে একটি বিশেষ কোর্স চালু করতে হবে।

বার : বিজ্ঞান শিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভা বিকাশে, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতার আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার যে পারস্পরিকতা ও পরিপূরকতা তা উপলব্ধি করে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অংশরূপে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রক্রিয়া চলবে। বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা উক্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে।

২. বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু করতে হবে। শিশুদেরকেও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রাকৃতিক ঘটনামালা ও নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিশুরা যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেজন্য নানা চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নানাবিধ সহজ পরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. প্রাথমিক স্তরের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকতে হবে।

৪. মাধ্যমিক স্তরে যাতে করে শিক্ষার্থী পঠিত বিজ্ঞান শাখাগুলোর মৌলিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এবং এগুলোর ব্যাখ্যা বাস্তব জীবনের

www.bjilibrary.com

কার্যকারিতার দিকগুলো জানতে পারে সেভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে এবং পাঠদান করতে হবে। বিজ্ঞানের বইয়ে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের যথাসম্ভব আধুনিকতম আবিষ্কারের ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বিজ্ঞান গবেষণার জন্য উন্নত আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে।

৭. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান দানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজী ও আরবী ভাষার জ্ঞান দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. বিজ্ঞানে ও গণিতে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে প্রতি শ্রেণীতে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীগণ পূর্ববর্তীদের অবদানের কথা জেনে নিজেরাও অনুপ্রাণিত হবে।

তের : কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা

১. সকল সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিআইটিসমূহে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ থাকতে হবে।

২. ডিগ্রী প্রদানকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য কোর্স কারিকুলাম আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে।

৩. তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জিলা ও উপজিলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার মান সংরক্ষণের জন্য জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতির আওতায় মান নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬. কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

চৌদ্দ : কারবার [বিজনেস] শিক্ষা

১. কারবার শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হতে পারে :

* কারবার শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া।

www.bjilibrary.com

* প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নস্তরে দক্ষ কর্মী তৈরি করা ও সহায়তা করা।

* আত্মকর্মস্থানে সহায়তা করা।

* আত্মকর্মসংস্থান উদ্যোক্তা হতে সহায়তা করা।

* একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করা।

২. দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে কারবার শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. কারবার শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন চাহিদার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের জন্য স্তর ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে।

৪. কারবার শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবসা ও কারবার সংক্রান্ত ইসলামী নীতিমালাসহ মৌলি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পনের : কৃষি শিক্ষা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি বলতে বুঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। কৃষি শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

- দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।
- জাতীয় উন্নয়ন কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থার দ্বারা কৃষি সম্পদের যথাযথ বিকাশ।
- পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্থলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- কৃষিকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবি-কাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।
- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।

www.bjilibrary.com

- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র বিমোচন।
- গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ এবং আদর্শ কৃষিবিদ তৈরির জন্য কৃষি শিক্ষার সকল পর্যায়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা।

ষোল : আইন শিক্ষা

১. আইন শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে নিম্নরূপ

ক. জনগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা।

খ. সুদক্ষ, আইনজীবী ও আইনবিদ তৈরি করা।

গ. এমন উচ্চ যোগ্যতা, উন্নত চরিত্র, ধীশক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করা যারা–

- আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে।
- পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করবে।
- আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে পারবে।
- আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইনশিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে।

ঘ. ইসলামের ফৌজধারী ও দেওয়ানী আইনসহ ইসলামী আইন দর্শন সম্পর্কে পারদর্শী হবে।

সতের : নারী শিক্ষা

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এদেশের দরিদ্র মানুষ যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারীও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর সার্বিক উন্নয়নে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন ও সে আলোকে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে স্বতন্ত্র মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন করা, স্বীয় অধিকারের ব্যাপারে প্রত্যয়ী করা, নারীর উপযোগী পেশায় দক্ষ করে তোলা, সুখী ও কাঙ্ক্ষিত পরিবার গঠনে উৎসাহিত করা।

২. নারীদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে পাঠ্যসূচীতে ইসলামের আলোকে নারীর মর্যাদার কথা তুলে ধরতে হবে।

www.bjilibrary.com

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে মহিলা সাহাবী ও অন্যান্য প্রখ্যাত আদর্শবান নারীদের জীবনী ও লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

আঠার : বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : যে সব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না তাদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা। বিশেষ শিশুদের আওতায় পড়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত শিশুরা। প্রতিবন্ধীত্বের ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা বিশেষ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

২. বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

উনিশ : সামরিক শিক্ষা

১. সামরিক শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকে জন্য বাধ্যতামূলক করা।

২. প্রাথমিক স্তর থেকে এ শিক্ষা শুরু হবে। মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক বিভাগের সাথে এটা সাধারণভাবে সংযুক্ত থাকবে।

বিশ : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয়, ইসলাম, মুসলিম বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজ লভ্য করার দায়িত্ব হল দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর, এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২. মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক মানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরী দিতে হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারকে তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য গ্রন্থ ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

www.bjilibrary.com

৪. বিভাগীয় শহর, জিলা এবং প্রত্যেক উপজিলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

একুশ : শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১. প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. কর্মরত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়ণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যবস্থায় দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরী বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. শিক্ষকদের ধর্মীয় ও নৈতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান সম্বলিত ১০০ নম্বরের ১টি বিষয় বাধ্যতামূলক রাখতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাইশ : শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটিও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়, তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলতঃ শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী :**

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সামাজিক, মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

খ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও

www.bjilibrary.com

পাঠ্যসূচীতে জাতীয় আদর্শ ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মাতৃভাষা, দেশজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

৩. **পাঠ্যপুস্তক :**

ক. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপার বর্তমানে অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকবে।

খ. মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে তার অধীনে এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করণের দায়িত্ব থাকবে প্রস্তাবিত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ বোর্ডের অধীনে।

৪. **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা :**

ক. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

খ. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৫. **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড :**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে বিভক্ত করে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের জন্য ২টি পৃথক সংস্থা গঠন করতে হবে।

তেইশ : শিক্ষা প্রশাসন

সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে গতিশীল, ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সৎ, ধার্মিক ও যোগ্য লোকদের নিয়োগ দিতে হবে।

চব্বিশ : শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ

১. শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নন এমন কোন ব্যক্তি যদি কোচিং সেন্টার চালাতে চান তা করতে পারবেন, তবে তা যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে এবং চালু করার/রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

২. শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

৩. ট্রাস্ট/সোসাইটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান যেহেতু তুলনামূলকভাবে উন্নত, সেহেতু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সহযোগিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে ছোট্ট একটি ভূ-খণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে দেশটি। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে লালিত পালিত হয়ে আসছে এমন একটি আদর্শ যা সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন যা যুগ ও কালের আবর্তে বিলীন হবার নয়। সকল দেশের মানুষের মতো এ দেশের মানুষও শুধু শরীর বা জড় সর্বস্ব মানুষ নয়। বরং তারাও আত্মাসম্পন্ন মানুষ। ঘোষিতব্য শিক্ষানীতিতে জড় ও আত্মার সমন্বয়, মৌলিক মানবীয় ও নৈতিক গুণাবলীর সমন্বয়, ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনের সাথে গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের সমন্বয়, অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সাথে জীবনবোধ, নীতিবোধ, আদর্শবোধ ও ঐতিহ্যবোধের সমন্বয়, ইহলৌকিক জীবনের সাথে পারলৌকিক জীবন [যা অত্যন্ত সীমিত হাতেগোনা কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করে না যাদেরকে নাস্তিক বলা হয়] এর সমন্বয়, চলমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে স্রষ্টার সৃষ্টি তত্ত্বের বা সৃষ্টি রহস্যের সমন্বয় এবং ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতিতে প্রাধান্য পেতে হবে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা, মনন ও চিন্তাধারা, আমাদের জাতীয় আদর্শের অনুকূলে প্রভাবিত করে তাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশের আগামী দিনের সুযোগ্য নাগরিক ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের আসনে পৌঁছিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদেরকে জনশক্তি ও মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার কৌশল।

এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সামনে রেখে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি সাজিয়ে নিলেই তা হবে উপযোগী ও বাস্তব ধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা আশা করবো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। ■

লেখক-পরিচিতি : ড. মোহাম্মদ লোকমান– বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রফেসর এবং গবেষক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১০ই অকটোবর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

১৮৫৭ ঃ সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম

ড. মাহফুজ পারভেজ

■

ভূমিকা :

ফিরে দেখা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের মহাসংগ্রাম-মহাবিদ্রোহ-১৮৫৭।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকামী মহাবিপ্লব-বিদ্রোহের দেড় শতবর্ষ [১৮৫৭-২০০৭] উপলক্ষে বাংলাদেশের ভাবুক-চিন্তক-মননশীল মানুষের অভিব্যক্তি ও পর্যালোচনার খুব বেশি উদ্যোগ, সরকারী দিক থেকে তো নয়ই, বেসরকারী পর্যায় থেকেও আমাদের নজরে আসে নি। একটি প্রায়-ব্যক্তিগত প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় একমাত্র সঙ্কলন মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ প্রকাশ পায়, যেটি কাঠামোগত এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে একাডেমিক বাধ্যবাধকতামুক্ত থেকে অনেক অপ্রথাগত লেখাও মৌলিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে স্থান দিয়েছে। ফলে ১৮৫৭ সম্পর্কে একটি বারোয়ারী স্মারকরূপে সঙ্কলনটি প্রায় তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট নানা সঙ্গ-অনুসঙ্গকে স্পর্শ করেছে বটে কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটি কমপ্রিহেন্সিভ নলেজ সোর্স হিসাবে পরিণত হতে পারে নি। উল্লেখ্য, উক্ত সঙ্কলনে "১৫০ বছর পর ফিরে দেখা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ ১৮৫৭" শিরোনামে আমার একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। বর্তমান লেখাটি সেই প্রবন্ধেরই একটি বর্ধিত ও পরিমার্জিতরূপ, যেখানে ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহের অনুপুঙ্খ ধারাক্রমকে বর্তমান আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী-লুটেরা অপশক্তির হস্তক্ষেপজাত পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসমনস্ক পাঠকের বাস্তব-প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিন্যস্ত করে উপস্থাপনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

যদিও আজ থেকে দেড় শতাব্দী আগেকার ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসিত ভারতবর্ষের সেই গৌবরময়, বিপ্লবী, স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারকামী এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্য এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কমে নি, তথাপি বিষয়টিকে নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা বা আলাপ-আলোচনা লক্ষ্য করা যায় নি। যেমনভাবে ১৮৫৭ সালের ঘটনা-প্রবাহে ভীত-শঙ্কিত ইংরেজ দখলদার-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মাতাল-আক্রোশে নরহত্যা, অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামীদের নির্মূল করেছিল এবং সিপাহি-জনতার দেশপ্রেমিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে মিথ্যা ইতিহাস বিনির্মাণ করেছিল, তেমনিভাবে আমাদের নির্লিপ্ততা প্রকারান্তরে ইংরেজ কলোনিয়াল ডিসকোর্সকেই মেনে নেওয়ার শামিল বলে মনে করা দরকার। কিন্তু সবাই চুপ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রচারণা এবং ধারাকে মেনে নেবেন, ইতিহাস এমনটি কখনই বলে না। যে কারণে ভারতের বোম্বে থেকে প্রকাশিত ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ১৮৫৭ সাল সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বিশাল সঙ্কলন প্রকাশ করেছে; বাংলাদেশ থেকেও দেশপ্রেমিক-স্বদেশপ্রেমীরা বিচ্ছিন্ন লেখালেখি এবং সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন এ কারণেই যে, ১৮৫৭ সালের চেতনাগত আন্দোলন-সংগ্রামের পথেই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং ১৯৪৭ কিংবা পরবর্তীতেও উপমহাদেশের আপামর মানুষ স্বাধীনতার অভিমুখটি সনাক্ত করতে পেরেছে ১৮৫৭ সালের মহাচৈতন্যের শিক্ষা থেকেই। অতএব আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও পরম্পরায় ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের যাবতীয় ঘটনাবলী ও শিক্ষা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রেরণাস্থল। ভবিষ্যতেও আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্ত রাখতে ১৮৫৭-এর অনুপ্রেরণা অপরিসীম শক্তিস্থল। বিশেষত, বিশ্বায়নের নামে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি যেভাবে উন্নয়নকামী দেশসমূহের দিকে লোলুপ কালোহাত বিস্তার করছে এবং ২০০৭-২০০৮ সময়কালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদেরকে যেভাবে অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ করতে দেখা গেছে, সেই সূত্রে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য, সাফল্য-ব্যর্থতা নতুনভাবে পাঠ এবং অনুধাবণ করে নেওয়ার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত এটাও মনে রাখতে হবে যে, ১৮৫৭ সালে দিল্লি, লাখনৌ, মিরাট, অযোধ্যা, বুন্দেলখণ্ডসহ সমগ্র উপমহাদেশে যা ঘটেছিল, আজকে তেমনটিই ঘটছে বাগদাদ, বসরা, কাবুল, কান্দাহারে। আমরা নিজেরাও আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায়। এটা ঠিক যে, দেড় শতাব্দীতে রূপ-চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের বদলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখ-মুখোস-পরিচয়ের বদল হয়েছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের শোষণমুলক-ইসলামবিরোধী অভিমুখটি ঠিকই রয়ে গেছে। সেদিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-প্রতিনিধি ব্রিটিশরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লুণ্ঠন করতে, খ্রিস্ট ধর্ম চাপিয়ে দিতে, ইউরোপিয় শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বলয়ে দেশবাসীকে বন্দী

২১—

www.bjilibrary.com

করতে এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা কেড়ে নিতে। একালে একই কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শক্তির আসনে বসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা। এরা ইরাকে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে হানা দিয়েছে একইভাবে লুণ্ঠন করতে, স্বাধীনতা কেড়ে নিতে এবং খ্রিস্ট ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজাতে। প্রেসিডেন্ট বুশ জানিয়ে গেছেন যে, তিনি যিশুর প্রেরণায় ক্রুসেডে নেমেছেন যদিও যিশু ছিলেন রক্তপাতের ঘোরতর বিপক্ষে। সাম্রাজ্যবাদী-হানাদাররা সারা দুনিয়াকে এবং এমন কি তাদের ধর্মপুরুষকে পর্যন্ত বিকৃত তথ্যের আড়ালে রেখে যতই সাধু সাজবার চেষ্টা করুক না কেন, আমেরিকা-ইসরায়েল-ভারতের মৈত্রী ১৮৫৭ সালের মতোই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কারা আমাদের স্বাধীনতার পক্ষ আর কারা স্বাধীনতা-হননকারীদের দোসর এবং ঔপনিবেশিক যুদ্ধ শেষতক ঔপনিবেশিক-আধিপত্যবাদী যুদ্ধ বলেই প্রকৃত দেশপ্রেমিক-স্বাধীনতাকামীদের চোখে ধরা পড়বেই।[১]

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, সেকালের মতো একালেও সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস আর গোলামের কোনও অভাব আজকেও হয় নি। সেকালের মতো একালের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, মিডিয়ার একটি অংশ দৃশ্যমান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যারা মোটেই তখনকার তুলনায় এখনও সাম্রাজ্যবাদের কম গুণগান করছে না। চিরকালই একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী উদারনৈতিকতার মুখোস চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদের লজ্জাহীন দালালি ও লেজুড়বৃত্তি করে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যারা সেদিন দাঁড়িয়েছিল, তাদের বক্তব্য, বিবৃতির সাথে আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকদের মতামতের কি আশ্চর্য মিল! কলকাতার তৎকালীন প্রধান পত্র-পত্রিকা এবং অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের প্রেতাত্মা ঢাকায় কিভাবে এসে ভর করেছে সেটা এক মহাবিস্ময়! আরও উল্লেখ্য যে, তখন স্বাধীনতাকামী না-বলে ইংরেজ ও কলকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবী-মিডিয়া বলতো In 1857 a Muslim meant a rebel আর এখন মুসলিমদের দেখলেই বলার চেষ্টা করা হচ্ছে জঙ্গি বা মৌলবাদী! ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! শতবর্ষের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত বিপ্লবী-স্বাধীনতাকামী-মুক্তিযোদ্ধার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার কাজটি এখনও সম্পন্ন হয় নি। এসব হতাশা আর অবক্ষয়ের মধ্যেও আশার আলো আছে। কেননা, ১৮৫৭ সাল আমাদেরকে শত্রু-মিত্র চিনিয়ে গেছে, পথে দিশা রেখে গেছে। সেটি সর্বাংশে সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামের চিহ্ন। কোনও সন্দেহ নেই আজকেও মানব জাতির প্রধান সমস্যার নাম সাম্রাজ্যবাদ আর আধিপত্যবাদ, যার থেকে মুক্তির জাতীয় মহাসড়কে পৌছানোর প্রধান অবলম্বন অবশ্যই ১৮৫৭ সালের শিক্ষা ও প্রেরণা। দৃশ্যত ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লব পরাস্ত হয়েছিল নেতৃত্বের দুর্বলতাসহ হিন্দু, শিখ, নেপালি শক্তির ষড়যন্ত্র ও আপোসকামিতার জন্য। তারপরেও ১৮৫৭-এর ঘটনা-প্রবাহ সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ উৎখাতের

---

১. বর্তমানে যারা ১৮৫৭ সালের ঘটনা-প্রবাহ নিয়ে গবেষণা এবং লেখালেখি করছেন, তাদের সকলেই বিভিন্ন পর্যায়ে এই মতামতই অভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন।

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে মুক্তি আর স্বাধীনতার অনন্ত প্রেরণা জাগিয়ে রেখেছে উপমহাদেশের প্রতিটি মুক্তিকামী, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য। আমরা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে, আন্দোলন-সংগ্রামে, মুক্তি মিছিলে শুনতে পাই ১৮৫৭ সালের অনিঃশেষ আহ্বান।

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ

'খালক-ই-খুদা/মুলক-ই-পাদশা/হুকুম-ই-সিপাহ' [পৃথিবী আল্লাহর, সাম্রাজ্য বাদশাহর এবং নেতৃত্ব/আদেশ সিপাহিদের][২] শ্লোগান দিয়ে আজ থেকে ঠিক ১৫০ বছর আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে যে সর্বভারতীয় 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' শুরু হয়, তাকে নানাজন নানাভাবে দেখেছেন। ইংরেজরা এই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' হিসাবে না দেখে, দেখেছেন 'বিদ্রোহ' হিসাবে। তারা স্বাধীনতাকামী সিপাহি-জনতার সম্মিলিত গণযুদ্ধকে 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে খণ্ডিত পরিচয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কমিউনিস্টরা একে দেখেছেন 'শ্রেণী যুদ্ধ' হিসাবে। মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ একাডেমিশিয়ানরা বলেছেন, এটি একটি 'শ্রেণী চরিত্রবিহীন জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ'। মুসলিম-জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী-পুনরুজ্জীবনবাদীরা এই যুদ্ধকে দেখেছেন 'ইসলামী শাসন পুনপ্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা' হিসাবে।

অন্যদিকে, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব বা মহাবিদ্রোহকে অনেকে ঔপনিবেশিক-পরাধীন ভারতবর্ষের 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে চিহ্নিত করেন। সন্দেহ নেই, ১৮৫৭ সালের বিপ্লব-বিদ্রোহ সমগ্র ভারতকে আন্দোলিত করার মাধ্যমে জাতীয়ভিত্তিক সংগ্রাম প্রচেষ্টার অংশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এটিই স্বাধীনতার জন্য প্রথম উদ্যোগ ছিল না।

বস্তুতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম শুরু হয় পলাশীর আম্রকাননে ১৭৫৭ সালে স্বদেশের স্বাধীনতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, যার প্রথম নায়ক ছিলেন মীর কাশিম।[৩] নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহর বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁর

---

২. যুদ্ধকালীন সময়ে একজন ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, এলাহাবাদের ফতেপুরে অনিয়মিত অশ্বারোহী সিপাহিগণ প্রথমে এই শ্লোগান দিয়েছিল। পরে এটি সমগ্র যুদ্ধকালে জাতীয় শ্লোগান হিসাবে উচ্চারিত হয়। বিস্তারিত দেখুন, J.W. Sherer, [1898: 29].

৩. মীর কাশিম আলী খান গোড়াতে ছিলেন ষড়যন্ত্রের অন্যতম সহযোগী। কিন্তু প্রথমে তিনি ষড়যন্ত্রের গভীরতা ধরতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, জগৎশেঠ ও তার সহযোগীরা শুধু সিরাজকে সরিয়ে তার শ্বশুড় মীর জাফরকে নবাব বানাবে, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ইংরেজদের কাছে দুইশত নৌকা সোনা-চাঁদিসহ দফায় দফায় যুদ্ধের কথিত-ক্ষতিপূরণ বাবদ ঘুষ দিতে দিতে মীর জাফর ফতুর হয়ে গেলে খোদ তাকেই নবাব করা হয়। তখন তিনি ইংরেজ এবং সহযোগী শেঠ-রায়-চাঁদচক্রের সর্বগ্রাসী-আগ্রাসী রূপটি ধরতে পারেন এবং দেখতে পারেন যে, ইংরেজের সঙ্গে হিন্দু মারোয়ারি গোষ্ঠীর আঁতাতটি মূলত ইসলামবিরোধী সুগভীর চক্রান্তের ফল এবং শোষণের মতলবেপূর্ণ। ফলে তিনি কালবিলম্ব না-করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। লড়াই করতে করতে তিনি ইংরেজ-কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বনে-জঙ্গলে

www.bjilibrary.com

জামাতা হওয়ার কারণে মীর কাশিমের প্রাথমিক ভূমিকার ফলে ইংরেজ শাসকরা কিছুটা উপকৃত হলেও তিনি যখন নিজে নবাব হন তখন ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি অনুধাবণে সক্ষম হন এবং আগ্রাসী-উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির কবল থেকে স্বাধীনতা-পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।[৪] নানা শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের কারণে মীর কাশিম সফল হতে না-পারলেও তাঁরই পথ ধরে পরবর্তী শতবর্ষে ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধ যুদ্ধ, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন, দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতানের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির জিহাদ আন্দোলন প্রভৃতির পাশাপাশি বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহ ও বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহে নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভূমিকাই ছিল প্রধান।

মূলত ১৭৫৭ সালের পলাশীর ঘটনার পরবর্তী শতবর্ষের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত এসব অসংখ্য বিপ্লব-বিদ্রোহ-আন্দোলন-সংগ্রাম এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের সশস্ত্র ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পটভূমিতেই আসে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, মহাবিপ্লব।[৫] ফলে এটি একটি আকস্মিক বা প্রথম ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে পারে না।

আত্মগোপন করে ফিরছিলেন। জঙ্গলেই তাঁর দুই পুত্র নিহত হয়। নির্বংশ মীর কাশিম এরপর কোথায় উধাও হয়ে যান----ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। শুধু দীর্ঘদিন পর তাঁর লাশ পাওয়া যায় দিল্লির আজমিরি গেটের নিকট রাস্তার উপরে। বিস্তারিত, আখতার-উল-আলম [২০০৯: ৩৬]। অন্য একজন গবেষকের মতে, "১৭৭৭ সালের ৬ জুন দিল্লির আজমিরী দরজার বাইরে অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফিররূপে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন মীর কাশিম। তাঁর মাথার নিচে রাখা নামাঙ্কিত চাদর দেখেই বাংলার এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত নবাবকে সেদিন সনাক্ত করা সম্ভব হয়।" মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৮:৪৩]

৪. বিশ্লেষকদের মতে, মীর কাশিম মসনদে বসেই পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সমর্থ হন এবং ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অতীত ভুলের কাফফারা আদায়ে সচেষ্ট হন। ইংরেজ প্রভাব থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি দেশের অর্থনীতিকে ইংরেজ ও মারোয়ারিদের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও সাবলম্বী করার পদক্ষেপ নেন। পাটনার নায়েব নাযিম রামনারায়ণ, গুপ্ত-পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা রাজা মুরলী ধর, ঢাকার দিওয়ান রাজবল্লভ, সুদের কারবারি জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভসহ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে তিনি দেশদ্রোহিতা এবং ষড়যন্ত্র করার কারণে গ্রেফতার করেন। কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড হয়। জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভকে মুঙ্গের দুর্গের চূড়া থেকে বস্তায় ভর্তি করে গঙ্গা নদীবক্ষে নিক্ষেপ করা হয়। মীর কাশিম কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালায় ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এবং রাজত্ব হারিয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় নেন। মীর কাশিমকে সরিয়ে ইংরেজরা পুনরায় মীর জাফরকে কলকাতা থেকে ধরে এনে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসায় ১৭৬৩ সালে। মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহ এবং মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে ইংরেজবিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি সম্মিলিত বাহিনীসহ ১৭৬৪ সালে বক্সার নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীকে মুবাবিলা করার জন্য উপস্থিত হন। অযোধ্যার মন্ত্রী বেনী বাহাদুর, মোগল সম্রাটের দিওয়ান সেতাব রায় এবং মীর কাশিমের খ্রিস্টান সেনাপতি মার্কাট এবং আরাটোনা গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলায়। তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় বক্সারের যুদ্ধক্ষেত্রেও পলাশীর প্রহসন-নাটকের পুনারাবৃত্তি ঘটে। বিস্তারিত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৮:৪৮-৯]

৫. ইংরেজ বিরোধী শত-সহস্র আন্দোলন, সংগ্রাম, বিপ্লব, বিদ্রোহের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: নরহরি কবিরাজ [১৯৫৭], সুপ্রকাশ রায় [১৯৮৩],

www.bjilibrary.com

ফলে এটি একটি আকস্মিক বা প্রথম ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে পারে না। চিহ্নিত হতে পারে সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অন্যতম প্রধান মুক্তিযুদ্ধরূপে, অন্যতম প্রধান জনআন্দোলনের বৈপ্লবিক-ঘটনারূপে।

পটভূমি

একটি আকস্মিক বা প্রথম ঘটনারূপে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অন্যতম প্রধান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনারূপে ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লব বা মহাবিদ্রোহকে চিহ্নিত করা হলেও পূর্ববর্তী শতবর্ষের অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের পলাশী পরবর্তীকালের বিপ্লব-বিদ্রোহ-সংগ্রাম-আন্দোলনের সঙ্গে এর মৌলিক-চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যগত সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। একই সঙ্গে ১৮৫৭ সালের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছিল কতিপয় সমকালীন বিষয়, যেগুলোর সম্মিলিত প্রভাব অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সমগ্র জন-জীবন আর সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে।

- পূর্ববর্তী বিপ্লব-বিদ্রোহ-সংগ্রাম ছিল দেশের কোনও না কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী। মহাবিদ্রোহের আগে কেবলমাত্র সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির নেতৃত্বাধীন জিহাদ আন্দোলনই সমগ্র ভারতবর্ষকে সাড়া জাগাতে কিয়দাংশে সফল হয়।[৬]
- পলাশী বিপর্যয়ের পরবর্তী শতবর্ষের [১৭৫৭-১৮৫৭] প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে সর্বপ্রথমবারের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু নেতা ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর বাস্তবসম্মত কারণও ছিল। পলাশী বিপর্যয়ের পূর্বেই ইংরেজরা মহারাষ্ট্রের উগ্র-হিন্দু মারাঠাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতবর্ষ থেকে মুসলিম শাসন উৎখাতে তাদেরকে প্ররোচিত করে। মহীশূরের টিপু সুলতানকে ১৭৯৯ সালে পরাজিত ও হত্যা করে মহীশূর রাজ্য জবরদখল করার সময়ও ইংরেজরা সফলভাবে মারাঠাদের ব্যবহার

হেমচন্দ্র কানুনগো [১৯৮৪]

৬. সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির নেতৃত্বাধীন জিহাদ আন্দোলনে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী তাঁর অনুসারীগণ অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জিহাদ আন্দোলনের মূল কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে শাহাদাত বরণও করেন সেখানেই। জিহাদ আন্দোলনের তৎপরতা সমগ্র উপমহাদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল বলে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ সংগঠন, পরিচালনা ও নেতৃত্বদানে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির অনুসারী জিহাদ আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ সংক্রান্ত বিবরণ বিস্তারিতভাবে জানতে, দ্রষ্টব্য, Santimoy Roy [1979], মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫], Muinud-Din-Ahmad Khan [1965], Narahari Kaviraj [1982].

www.bjilibrary.com

করে। কিন্তু ১৮১৭-১৮ সালে প্রবল আক্রমণাত্মক যুদ্ধে ইংরেজগণ মারাঠাদের চরমভাবে পর্যদুস্ত করে দেয়। ফলে তাঁতিয়া তৌপিসহ মারাঠা নেতারা ইংরেজবিরোধী হয়ে ওঠেন।[৭]

- ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এ সময় একটি নতুন আইন জারি করার মাধ্যমে 'কোন অপুত্রক দেশীয় রাজা দত্তক পুত্র গ্রহণ করলে তাঁর উত্তরাধিকার অতীতের ন্যায় গ্রাহ্য না-করার' সিদ্ধান্ত নেয়। এই আইনের কারণে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব বার্ষিক তৎকালীন আট লক্ষ টাকার বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন। এই একই আইনের অজুহাতে ঝাঁন্সিসহ বেশ কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ইংরেজরা দখল করে নেয়। এসব কারণে মারাঠা নেতা তাঁতিয়া তৌপির মতোই নানা সাহেব, ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ হিন্দু দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রথমবারের মতো ইংরেজবিরোধী হয়ে ওঠেন এবং ১৮৫৭ সালে বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমে যোগদান করেন।[৮]

- পলাশী-পরবর্তী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চরম দুঃশাসনের সময়কালে মুসলিম রাজন্যবর্গের অনেকেই ইংরেজদের প্রতি ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে না-ঘাঁটানোকেই নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করতেন। অযোধ্যার নবাব সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ ছিলেন এমনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ১৮৫৬ সালে ইংরেজরা তুচ্ছ অজুহাতে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর রাজ্য দখল করে নেয় এবং তাঁকে কলিকাতায় নির্বাসিত জীবন-যাপনে বাধ্য করে। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।[৯] প্রসঙ্গত, ১৮৪৩ সালে ব্রিটিশরা সিন্ধু রাজ্যটিকে 'প্রজাদের মঙ্গলের' বাহানায় দখল করে। আর অযোধ্যা ছিল ১৮০১ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলসলির সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি অনুযায়ী 'রক্ষিত বা আশ্রিত করদ মিত্র রাজ্য'। কিন্তু ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ জোরপূর্বক রাজ্যটি দখল করে নবাবকে বার্ষিক বারো লাখ রুপি ভাতা দিয়ে কলকাতায় পাঠানো হলে তিনি সেখানে ব্রিটিশবিরোধী শক্তির সঙ্গে গোপনে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অযোধ্যা দখলের মাধ্যমে ভারতে শেষ স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের পতন ঘটানো হয়। হতভাগ্য নবাবের সকল স্থাবর-অস্থাবর ধন-সম্পদ, এমনকি

---

৭. মোহাম্মদ আবদুল গফুর [২০০৯:১৪]

৮. বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫]

৯. অজ্ঞাতনামা ইংরেজ লেখকের হিস্টরি অব দ্য ইন্ডিয়ান রিভল্ট গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, "১৯ জুন ১৮৫৭ সালে অযোধ্যার সাবেক নবাবের কোলকাতাস্থ গার্ডেন রিচের বাসস্থানে ইংরেজ সামরিক বাহিনী খোঁজাখুঁজির পর 'মোহামেডান স্কেচ ম্যাপ' পায়, যাতে লেখা ছিল ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের শতাব্দী পূর্তির দিন বিদেশীদের উচ্ছেদ করে দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।" মুহাম্মদ সিদ্দিক [২০০৯:১৯১]

www.bjilibrary.com

তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির তৎকালীন দুই লাখ টাকা মূল্যের হস্তলিখিত গ্রন্থাদি, প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোষাগার পূর্ণ করা হয়। এর চেয়েও অধিকতর পৈশাচিক ব্যবহার এবং বর্বরতা করা হয় বিশেষত অন্তঃপুরবাসিনী বেগমদের সঙ্গে। তাঁদেরকে বলপূর্বক অন্তঃপুর থেকে বাইরে এনে লুণ্ঠন করা হয়। পাশবিকভাবে খুলে নেওয়া হয় মূল্যবান পোশাক, অলঙ্কারাদি এবং ভূষণসমূহ। এসব নিষ্ঠুরতা, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অদম্য লালসাপূর্ণ নিপীড়ন, নিস্পেষণ, মর্মন্তুদ হাহাকার ও আর্তনাদের রূপ ধারণ করে ভারতের আকাশ-বাতাস মথিত করে এবং সাতান্ন সালে বিরাট বিপ্লবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।[১০]

- ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে ইংরেজ বেনিয়া শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী নখর বিস্তার করে ক্রমশ যখন কেন্দ্রস্থল দিল্লির দিকে হানা দিচ্ছিল তখন সেখানে নামমাত্র মোগল বাদশাহ ছিলেন বয়োবৃদ্ধ বাহাদুর শাহ জাফর। সমগ্র ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান ইংরেজ আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ও সামর্থ্য তখন ক্ষয়িষ্ণু মোগল শাসকের ছিল না। বাহাদুর শাহ মনে মনে ইংরেজদের প্রতি যত ক্ষোভই পোষণ করুন না কেন, বাস্তবে তিনি আগ্রাসন রুখে দাঁড়ানোর জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি বা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঘটনাচক্রের এক পর্যায়ে এই নিরীহ কবিতাপ্রেমী বাদশাহকেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করতে এবং সে কারণে চরম ও অন্যায় দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।[১১] বাহাদুর শাহ জাফরের প্রতি বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই ধূর্ত ইংরেজের কু-নজর ছিল। দিল্লির এই প্রায়-ক্ষমতাহীন শাসকের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইংরেজরা বিদ্রোহের আগেই নির্দেশ জারী করেছিল যে, বাহাদুর শাহের পর আর কেউ সম্রাট থাকবেন না এবং সম্রাট না থাকার কারণে মোগল বংশের কেউই লালকেল্লায় বসবাস করতে পারবেন না। তাদেরকে বাস করতে হবে শহরের মেহেরালী নামের এক নগণ্য মহল্লায় সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সাধারণ সুযোগ-সুবিধার মধ্যে। বিদেশী দখলদারদের এহেন নির্দেশ কেবল মোগল বংশকেই নয়, সমগ্র দেশবাসীকেও দারুণ ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কারণ সেদিন এই মোগল সম্রাটই ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সর্বশেষ প্রতীক। তাঁকে সামনে রেখেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহী স্বাধীনতাকামীগণ স্বদেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ সশস্ত্র লড়াইয়ের সূত্রপাত করেন।
- এভাবেই মুক্তি মিছিলে সক্রিয় হয়েছিলেন ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ও বেগম জিনাত মহল, অযোধ্যার ক্ষমতাচ্যুত নবাব

---

১০. আব্বাস আলী খান [২৯৪-৫]
১১. পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে

www.bjilibrary.com

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ্ ও বেগম হযরত মহল,[১২] ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মারাঠা নেতা তাঁতিয়া তৌপি, নানা সাহেব এবং রায়বেরেলির মুজাহিদ নেতা মাওলানা আহমদুল্লাহ।[১৩]

- মহাবিদ্রোহের সামনের কাতারের নেতাদের মধ্যে একমাত্র মাওলানা আহমদুল্লাহই সিংহাসন, ভাতা বা কোন ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা হারানোর কারণে নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং বিদেশী দখলদার-সাম্রাজ্যবাদী বিতাড়নের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির শাহাদাতের পর তাঁর এই সুযোগ্য শিষ্যই পাটনায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করে স্বাধীনতার বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে স্বাধীনতাকামী-মুজাহিদ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাংগঠিক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। মূলত তিনিই ছিলেন স্বাধীনতাকামী-মুজাহিদ বাহিনী এবং মহাবিদ্রোহের অন্যান্য সহযোগী শক্তিসমূহের [সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর ও বেগম জিনাত মহল, নবাব সৈয়দ ওয়াজেদ আলী শাহ্ ও বেগম হযরত মহল, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তৌপি, নানা সাহেব প্রমুখ] মধ্যে প্রধান যোগসূত্র।[১৪]

কার্যকারণ

১৮৫৭ সালের সর্বব্যাপ্ত সিপাহি-জনতার সম্মিলনে জনযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে যেমন বহুমত রয়েছে, তেমনি রয়েছে একাধিক কারণের সমাবেশ। অনেকে কারণ হিসাবে একাধিক্রমে ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক অসন্তোষকে চিহ্নিত করেছেন। যুবরাজ মির্জা ফিরোজ শাহের ঘোষণা হতে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ক্ষোভের কতক সুস্পষ্ট কারণ দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বা কারণ হিসাবে এগুলোর ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মাত্রাগুলো অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। যেমনঃ

১. ইংরেজদের অভিপ্রায় পূর্বতন রাজা এবং ওমরাহদের বংশ ধ্বংস করা;

২. ইংরেজরা ভারতের সমস্ত ধর্মের গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করছে;

৩. তারা দেশীয় রাজন্যবর্গের ভূমি-অধিকার অস্বীকার করছে;

৪. ভারতীয় নারীদের বিয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতে স্বতন্ত্র একটি জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে;

৫. দেশীয় সিপাহিদের তারা বিশেষ আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয় না;

---

১২. পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

১৩. মোহাম্মদ আবদুল গফুর [২০০৯:১৫]

১৪. পূর্বোক্ত

www.bjilibrary.com

৬. ইংরেজরা দেশীয় সিপাহিদের কাছে অস্ত্র হস্তান্তরে অনিচ্ছুক;
৭. ইংরেজদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা তথা সাংস্কৃতিক আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন না করলে তারা দেশীয়দের চাকুরি দেয় না;
৮. ইংরেজরা মৌলভী ও ব্রাহ্মণদের ধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছে;
৯. ভারতীয়দের ব্রিটিশ আইনে বিচার করা হচ্ছে;
১০. খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তকরণের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে;
১১. ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি ইংরেজরা অবজ্ঞা দেখাচ্ছে;
১২. ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মান্তর করণের কাজে কোম্পানি অনুমতি দিয়েছে।[১৫]

ইংরেজ গবেষক-লেখকেরা অন্যবিধ বিষয়াবলীকে যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধাবস্থার বিশ্লেষক-গবেষক মন্টগোমারী মার্টিনের মতে:

১. অত্যাচারি ও শোষণমূলক ভূমিনীতি;
২. অদক্ষ প্রশাসন ও বিচার;
৩. সরকারি চাকুরি হতে ভারতীয়দের বর্জন নীতি;
৪. ইংরেজদের দেশীয় ভাষার অবজ্ঞা এবং দেশীয়দের প্রতি হীন ও অবজ্ঞামূলক মনোভাব;
৫. শিক্ষানীতি, ধর্মীয় সংস্কার ও মিশনারিদের কার্যকলাপ;
৬. জাতিভেদ প্রথা;
৭. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা;
৮. ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রানীতি;
৯. আফিমের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার;
১০. জনহিতকর কার্যে কোম্পানির অবজ্ঞা;
১১. ইংরেজদের কর্মোদ্যমের অভাব;
১২. দেশীয় রাজ্য সংযোজন নীতি;
১৩. হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনের বিরুদ্ধাচরণ;
১৪. সাতারা, নাগপুর, কর্ণাট, ঝাঁন্সি, তাঞ্জোর ও অযোধ্যা ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যের উপস্থিতির বিলোপ সাধন;

---

১৫. যুবরাজ মির্জা ফিরোজ শাহের ঘোষণা থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় G. N. Dodd লিখিত The History of the Indian Revolt গ্রন্থের ৪১০-১১ পৃষ্ঠায়

www.bjilibrary.com

১৫. বাংলার সৈন্যের সার্বিক অবস্থা, শিথিল আইন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারিদের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ, বেসামরিক নিয়োগ, স্বল্প সংখ্যক ইউরোপিয় সৈন্যের ভারতে উপস্থিতি, সিপাহিদের ষড়যন্ত্র;

১৬. পারস্য ও রাশিয়ার বৈদেশিক ষড়যন্ত্র।[১৬]

১৮৫৭ সালে মহাযুদ্ধের পেছনে যে যথেষ্ট পরিমাণ কারণ বিদ্যমান ছিল, এবং এটি যে কেবল বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র বা ক্ষমতা দখলের মুসলিম চক্রান্ত ছিল না, সেটা বিভিন্ন লেখকের বিশ্লেষণ ও মতামতসমূহকে তুলনা করা হলেই অনুধাবণ করা যায়। ইংরেজ লেখকের পাশাপাশি এদেশীয় লেখকদের মতামত লক্ষ্য করলেও একই চিত্র উদ্ভাসিত হয় যে, এটি একটি মুসলিম নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল এবং সিপাহি ও জনতার সম্মিলনে এটি একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হকের মতে:

> "সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী সংঘটিত প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ, যাকে ইউরোপিয় ঐতিহাসিকরা সিপাহি বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো দেশব্যাপী জনগণের প্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন; যার সূচনা হয়েছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং ফরায়েজি সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। এই স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর ফলশ্রুতি এবং এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম সবাই সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র দেশকে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের অধীনে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। অবশ্য আলীগড়পন্থী মুসলিমদের মতে এটাই ছিল মুসলিমদের ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের সর্বশেষ প্রচেষ্টা।"[১৭]

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্বের কারণে 'মুসলিম মানেই বিদ্রোহী' বলে ইংরেজরা উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট ইংরেজ গবেষক ও ঐতিহাসিক P. Hardy তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Muslims of British India" গ্রন্থে লিখেছেন:

> "For most British observers in 1857 a Muslim meant a rebel."[১৮]

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা বা আজাদীর যুদ্ধে মুসলিমদের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে আরেক ইংরেজ ঐতিহাসিকও অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন:

---

১৬. বিস্তারিত দেখুন, Montogomery Martin, The Indian Empire, vol. 2, pp. 1-3.

১৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫:৩৮-৯]।

১৮. P. Hardy, The Muslims of British India, Cambridge: The Cambridge University Press, 2002, p. 62.

www.bjilibrary.com

> "The first sparks of disaffection it was generally agreed, were kindled among the Hindu sepoys who feared an attack upon their caste. But the Muslims then fanned the flames of discontent and placed themselves at the head of movement, for they saw in these religious grievances the stepping stone to political power. In the British view it was Muslim intrigue and Muslim leadership that converted a sepoy mutiny into a political conspiracy, aimed at the extinction of the British Raj."[১৯]
>
> [সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ধর্মের ওপর আঘাতের ভয়ে হিন্দু সৈন্যরা অসন্তোষের প্রথম শিখাটি জ্বালিয়েছিল। কিন্তু মুসলিমরা সেই অসন্তোষের অগ্নিশিখাকে উস্কে দেয় এবং নিজেদেরকে আন্দোলনের শীর্ষ স্থানে নিয়ে যায়। তারা এই ধর্মীয় আঘাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় যাওয়ার প্রথম সিড়িটি দেখতে পায়। ইংরেজদের মতে, এটা ছিল মুসলিমদের ষড়যন্ত্র ও নেতৃত্ব, যা একটি সামান্য সিপাহী বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের অবসানকামী রাজনৈতিক চক্রান্তে রূপান্তরিত করে।]

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ইংরেজ কর্তৃক উপমহাদেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় শতবর্ষব্যাপী সময়কালে মুসলিমদের উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অসংখ্য আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটটিকে ব্রিটিশ গবেষকরা ঘৃণ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং শত সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় যে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী সূচিত হয়েছিল, তাকেও মুসলিম নেতৃত্বে পরিচালিত 'ইংরেজ শাসনের অবসানকামী রাজনৈতিক চক্রান্ত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুসলিমরা নেতৃত্বে ছিলেন এটা ঠিক। কারণ, ইংরেজ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করার মত নেতৃত্ব, এলিট শ্রেণী ও সামরিক সক্ষমতা সেই আমলের ভারতে অন্য কোন সম্প্রদায়ের ছিল না।[২০] কিন্তু এটা তো কোনভাবেই কেবল 'ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত' ছিল না; ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে

---

১৯. Thomas R. Mtcalf, The Aftermath of Revolt: India 1857-1870, Princeton, 1965, p. 298.

২০. ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং হিন্দু জমিদার শ্রেণীকে মুসলিম নেতৃত্বাধীন ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ওপরে বসানো সম্ভব হয়নি। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতার পর ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিচে ঠেলে দেওয়ার কাজটি ইংরেজ-হিন্দু যৌথ উদ্যোগে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। বিস্তারিত, দেখুন,
ক] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫]
খ] P. Hardy [2002]

www.bjilibrary.com

মুসলিমদের নেতৃত্ব দান ও অবদান রাখার বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক::

> "১৮৫৭ সালের যুদ্ধের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে তাদেরকে রাষ্ট্রের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ব্রিটিশদের ক্রোধানলে পড়ার জন্য এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলন বা আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়াটাই যথেষ্ট ছিল। ইংরেজ-হিন্দু নির্বিশেষে মুসলিমদেরকে এ যুদ্ধের জন্য দায়ী করেছে।"[২১]

স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলিমদের মধ্যে প্রথম দিকের লেখক হিসাবে ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে 'সিপাহি বিদ্রোহের কারণ' নামে যে গ্রন্থ লিখেছিলেন, তাতে তিনি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, "বিজাতীয় শাসন বিলোপ করার উদ্দেশ্যে জাতি কোনো হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি।"[২২] অথচ ১৮৫৭ সালে মুসলিম নেতৃত্বে সংঘটিত একটি সর্বাত্মক গণআন্দোলন ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে বিকৃতভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ইংরেজ গবেষক-লেখকেরা আমাদের বিপ্লবী-স্বাধীনতাকামী-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহাসিক আন্দোলন-সংগ্রামের গৌরবময় ধারাবাহিকতাকে পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছে।

ইতিহাস বিকৃতির সূচনা

১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘটনাবলীকে বিকৃত করা এবং মুসলিমদের স্বাধীনতাকামী-জাতীয়তাবাদী-বৈপ্লবিক আন্দোলনকে 'ক্ষমতা দখলের বিচ্ছিন্ন চক্রান্ত' বা 'ওয়াহাবী ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও ভ্রষ্ট চরিত্রে প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে ইংরেজ এবং তাদের বশংবদ, বিশেষ করে, বাঙালি মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের[২৩] লেখক-গবেষকদের তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলে বুঝা যাবে যে, তারা ১৮৫৭ সালকে কত সিরিয়াসভাবে নিয়েছিল এবং এর মূল স্পিরিটটিকে নস্যাৎ করতে কত নৈপুণ্য দেখিয়েছিল। মূলত আমাদের ভূখণ্ডে ইতিহাস বিকৃতির সূচনা ও বিকাশ এখান থেকেই শুরু হয়।

স্যার উইলিয়ম মূরের [১৮১৯-১৯০৫] নাম এক্ষেত্রে প্রথমে চলে আসে, যিনি ১৮৫৮-১৮৬১ সালে Life of Mohammed এবং ১৮৯১ সালে The Caliphate, its Rise, Decline and Fall নামের দু'টি বড় মাপের গ্রন্থ রচনা করেন এবং যার প্রধান লক্ষ্যই ছিল এই মিথ বা উপকথাকে প্রতিষ্ঠা করা যে, 'ইসলাম এক হাতে তরবারি আর অন্য হাতে কুরআন নিয়ে বিশ্ব দখল করেছে।' মূরের উদ্দেশ্যকে বলতে গিয়ে আরেক বিশিষ্ট ইংরেজ পণ্ডিত পি. হার্ডি লেখেন:

---

২১. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫:৪০]

২২. সৈয়দ আহমদ খান [১৯৭৯:৫]

২৩. এ প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

www.bjilibrary.com

"whose [books] helped to foster the myth of the Muslim as always armed with the sword in one hand and the Qur`an in the other."[২৪]

১৮৫৭ সালের অকটোবর মাসে যুদ্ধের মধ্যে মূর তাঁর ভাইকে এক চিঠিতে লেখেন:

"The Musulmans, while they thought their cause had a fair chance of final success have frequently compromised themselves by flagrantly traitorous acts. At Allygurh, for instance, the Musulmans were for a considerable time dominant; they forcibly converted many Hindoos; they defied our Government in the most insolent manner; all the ancient feelings of warring for the Faith, reminding one of the days of the first Caliphs, were resuscitated."[২৫]

ইংরেজদের সৃষ্ট ইতিহাস বিকৃতির ধারা এবং মুসলিমদের চরিত্র হননের কাজটি অতি দ্রুত তৎকালীন রাজধানী কলকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজ সোৎসাহে শুরু করে। মুসলিমদের ওহাবী, বিপ্লবী, সন্ত্রাসী, মধ্যযুগীয়, অনাধুনিক ইত্যাদি কুৎসার মাধ্যমে চিত্রিত করা হতে থাকে। যে বিবরণ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আরও বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে এবং মজার ব্যাপার হলো আজ অবধি ইতিহাস বিকৃতির এহেন ধারা আমাদের পারিপার্শ্বে অব্যাহত রয়েছে।

নেতৃত্বের নানা দিক

ইতিহাস বলছে, পলাশী বিপর্যয়ের [১৭৫৭] ঠিক ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল-বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে জাতীয় মুক্তির সানাই এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের রক্ত-পাগল-করা দামামা বেজে উঠে। শত বছর ধরে এদেশের স্বাধীনতাকামী মুসলিমরা নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করে 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা'[২৬] অভিধা লাভ করেছিলেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল তারই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা। স্বাধীনতাকামী বৈপ্লবিক-জিহাদি আন্দোলনের নায়কগণই ছিলেন 'সিপাহি বিদ্রোহ' বা 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ'-এর নেতৃত্ব দানকারী মূল শক্তি ও আদর্শিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল।

---

২৪. P. Hardy [2002:62]
২৫. William Muir [1902: 46]
২৬. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং আন্দোলন-সংগ্রামের রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে, দেখু মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৬]

www.bjilibrary.com

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব ও প্রেরণায় মুসলিমদের অগ্রণী ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য। ইংরেজ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী মুসলিম আন্দোলন ও সংগ্রামের অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ধারা ১৮৫৭ সালে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল বহিরাগত-দখলদারদের ক্ষমতার ভিত্তি।

সংক্ষিপ্তভাবে যদি আমরা ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটগত দিকটিকে আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, ভারতে মুসলিম নেতৃত্ব ও মানস যে কোনো বহিরাগত আদর্শ বা শক্তির মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত ও সংগ্রামরত থেকেছে। বলতে গেলে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর [১৭০৭] পর মোগল সাম্রাজ্যের যে অবক্ষয় ও পতনের যুগ শুরু হয়, তখন থেকেই সূচিত হয় মুসলিমদের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা। সেই সময় মুসলিমদের আত্মশুদ্ধিভিত্তিক[২৭] যে সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়, বস্তুত তা থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম নবজাগরণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লির শাহ ওয়ালিউল্লাহ [রহ.]-এর নেতৃত্বে সূচিত 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া'[২৮] বা ইংরেজদের ভাষায় 'তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন'[২৯] পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ বেরেলভি শহীদের অধিনায়কত্বে শিখ ও ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভির শাহাদাতের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে পূর্ব প্রান্তের

---

২৭. আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কত তীব্র ছিল এবং সেইসব আত্মশুদ্ধির উদ্যোগ ইসলাম ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ বিকাশের জন্য কতই না দরকারী ছিল, তার একটি উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে: "মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন হিন্দু রায়তদের আচার-অনুষ্ঠান এমনভাবে পালন করত যে তাদেরকে শুধু অনুষ্ঠানে নয় বরং নামেও পৃথক করা দুষ্কর হতো। মুসলিমদের নামের মধ্যে এরূপ নামও ছিলো যথাঃ গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন ইত্যাদি।" বিস্তারিত, দেখুন, Abdul Bari [1960].

২৮. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শে দেশবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করাই এই অন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলেই এর নাম 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া'। অকৃত্রিম ইসলামি সমাজব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এরা আপোষহীন ও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। সকল ধরনের ইসলামবিরোধী কাজ, যেমন, শির্ক, বিদাত, কবর পূজা, পীর পূজা, যা ইসলামের নামে প্রচারিত ও পরিচালিত ছিল, সেগুলোর মূলোৎপাটনে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক অবদান অনস্বীকার্য। বিস্তারিত, দেখুন, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ [১৯৭৪]

২৯. ভারতের 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনকে এদেশের মুসলিমদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র হিসাবে এ আন্দোলনের নেতা ও অনুসারীদেরকে ইংরেজরা 'ওয়াহাবি' নামে চিহ্নিত করে। শান্তিময় রায়ের মতে, 'ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওয়াহাবিদেরই।' দ্রষ্টব্য, Santimoy Roy [1979:20]| হবিবুল্লাহর [১৯৭৪:১১৯] মতে, 'আধুনিক মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের সূচনা হয় ওয়াহাবি আন্দোলনের মাধ্যমেই। শুধু তাই নয়, ভারতের কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে'

www.bjilibrary.com

বাংলায়ও এর সজোর ধাক্কা লাগে। তৎকালীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে [বর্তমান বাংলাদেশে] হাজি শরিয়তুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র মোহসেনউদ্দিন দুদু মিয়ার নেতৃত্বে 'ফরায়েজি আন্দোলন'[৩০] এবং পশ্চিমাঞ্চলে [বাংলাদেশের খুলনা-যশোর এবং ভারতের অধীনস্থ পশ্চিম বঙ্গ] মির নেসার আলী তিতুমীরের[৩১] অধিনায়কত্বেও মুসলিম জাগরণবাদী-প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। এইসব আন্দোলন অচিরেই ভূম্যাধিকারী ও ইংরেজ প্রশাসনবিরোধী কৃষক-প্রজাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ লাভ করে। দুদু মিয়া ও তিতুমীরের প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীরা ১৮৪০-এর দশকে নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে ১৮৫০-এর দশকে তুমুল ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, "১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেও এ আন্দোলনের জোর পরোক্ষ প্রভাব ছিল।"[৩২]

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হলে "ফরায়েজিরা মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার আশায় আশান্বিত হয়। কারণ, তাদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব কারও অজানা ছিল না। তাছাড়া তাদের চলাফেরা ও কথাবার্তায় এসব মনোভাব প্রকাশ পেত। তদুপরি এ সময় ইংরেজ সরকারের কাছে নামে-বেনামে ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে এ মর্মে চিঠি আসতে আরম্ভ করে যে, তারা সিপাহিদের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অধিকন্তু তাঁরা বিদ্যালয় থেকে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ফেরত নিচ্ছে। আগামীতে তাঁরা মুসলিম শাসনের প্রতিনিধি হতে পারে, এমন খবরও পত্র মারফত সরকারকে জানানো হয়। ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের কাছে উল্লেখ করেন যে, ফরায়েজিরা

---

৩০. ইংরেজ শাসনের কুপ্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিমরা দেখতে পায় যে, তারা সত্যিকারের ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং তারা শিক্ষাগতভাবে পশ্চাৎগামী, সংস্কৃতিগতভাবে নীতিভ্রষ্ট, ধর্মগতভাবে অধঃপতিত এবং রাজনৈতিকভাবে একটা হতাশাব্যঞ্জক সম্প্রদায়ে অবনতি লাভ করেছে। ইসলামের মূল কর্তব্য বা 'ফরজ' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত। ভারতীয় মুসলিমদের আরেকটি সংস্কার আন্দোলন, যা পরে বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই আন্দোলনের নেতা পূর্ব বঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের হাজি শরিয়তুল্লাহ [১৭৮১-১৮৬২] প্রথম ব্যক্তি যিনি নিম্ন ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদেরকে তাদের আত্মোপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করেন। বিস্তারিত, দেখুন,
Muinud-Din-Ahmad Khan [1965]

৩১. সৈয়দ আহমদ শহীদের শিক্ষা ও আদর্শে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু সংগ্রামী অনুসারীর সৃষ্টি হয়। তারা সৈয়দ আহমদের শাহাদাতের পরেও আদর্শিক জিহাদ অব্যাহত রাখেন। পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণার বারাসাত অঞ্চলের মির নিসার আলী ওরফে তিতুমীর [১৭৮২-১৮৩১] আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য ছিল মুহাম্মদীয়া ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা এবং হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে যেসব কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলোকে পরিহার করা। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা-জনসাধারণকে সংগঠিত করে তিনি নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা স্থাপন করেন এবং সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করে শহীদ হন। বিস্তারিত, দেখুন, Narahari Kaviraj [1982]|

৩২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫:২]

www.bjilibrary.com

একযোগে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তাঁরা সিপাহিদের কাছে সমর্থনের জন্য লিখেছে।"[৩৩]

দৃশ্যতই দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রথম স্বাধীনতার প্রাক্কালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশবাদ বিরোধী সকল ইসলামী শক্তিই তাদের সংগ্রামী গণপ্রতিরোধ আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালে প্রেক্ষাপটে কাজে লাগাতে সচেষ্ট ছিল। উল্লেখ্য:

> "১৮৩১ সালে [৬ মে] বালাকোটে[৩৪] সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির মুজাহিদ-মুক্তি বাহিনীর আপাতঃ বিপর্যয়ের পর স্বাধীনতাকামী জিহাদি-বিপ্লবী ভাবধারায় উজ্জীবীত নেতৃবৃন্দ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভির অন্যতম অনুসারী হাফিয কাসিম। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেনারেল বখত খান, মওলানা আহমদউল্লাহ শাহ ও মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী দিল্লি কেন্দ্রে, হাজি ইমদাদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীগণ শামেলি, সাহারানপুর ও থানাভবনে সক্রিয় ছিলেন। হাফিয কাসিমের অনুসারী নেতৃস্থানীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামী-মুজাহিদদের মধ্যে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসিম নানুতুভি, মওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মওলানা মোহাম্মদ মুনীর প্রমুখ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ, দিল্লি ও কানপুরসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে এক সুগ্রন্থিত যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল।"[৩৫]

বিশিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ গবেষক আনিসুজ্জামানের মতে:

> "...এই পূর্বপরিকল্পনার পশ্চাতে তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়াপন্থীদের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্রোহী সৈন্যদের সর্বাধিনায়ক বখত আলী খান এ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর গুরু সরফরাজ আলী ছিলেন কেরামত আলী জৌনপুরীর শিষ্য। বিদ্রোহীদের আর দু'জন নায়ক শাহজাদা ফিরোজ শাহ এবং মৌলভি আহমদউল্লাহও ওয়াহাবি ছিলেন। এই বিদ্রোহে হাজার হাজার ওয়াহাবি স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়েছিলেন।"[৩৬]

---

৩৩. বিস্তারিত, দেখুন, Muinud-Din-Ahmad Khan [1965]; Narahari Kaviraj [1982]

৩৪. পাঞ্জাবের হাজারা জিলার বালাকোট নামক স্থানে সৈয়দ আহম্মদ ইংরেজের প্ররোচণায় শিখ ও পাঠান ষড়যন্ত্রে শহীদ হলে তাঁর নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতার আন্দোলন আপাত স্তিমিত থেকে পরে সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তারিত, দেখুন, মাহতাব সিং, তাওয়ারিখে হাজারা। Mahmud Hussain, The Success of Sayyid Ahmed Shahid: History of the Freedom Movement.

৩৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৬:১০৬-৭]

৩৬. আনিসুজ্জামান [১৯৬৯:৫০]

www.bjilibrary.com

আনিসুজ্জামানের ব্যাখ্যায় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম আকস্মিক ছিল না এবং এটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। যদিও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রহণকারীদেরকে ঢালাওভাবে ওয়াহাবি বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও আমরা ইংরেজ কর্তৃক ওয়াহাবি অভিধা ব্যবহারের ষড়যন্ত্রমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৬ সাল থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা আহমদউল্লাহর সিদ্ধান্তে বিপ্লব ও বিদ্রোহের সঙ্কেতবাহী চাপাতি রুটি এবং রক্তজবা ফুল বিতরণ শুরু হয়ে যায়। আনিসুজ্জামান রক্তজবা ফুলের বদলে পদ্মফুলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সংশয়ের সঙ্গে লিখেন: "...চাপাটি আর পদ্মবিলি হবার কাহিনী যত অতিরঞ্জিতই হোক না কেন, এর মূলে কিছু সত্যতা নিশ্চয় ছিল।"[৩৭] অন্যদিকে, গবেষক-ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন:

> "এক গ্রামের নেতার হাত থেকে দ্রুত অন্য নেতার হাতে ঘুরছিল বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী চাপাতি রুটি। এক সৈন্য আরেক সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন রক্ত-রঙিন আযাদী বিপ্লবের ইঙ্গিতবাহী জবা ফুল। সে কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। দিল্লি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সবখানে বিপ্লবীদের কার্যক্রমের খবর প্রতিদিনই সতর্কতার সাথে পৌছে যাচ্ছিল।"[৩৮]

সিপাহি যুদ্ধে ইতিহাস রচয়িতা রজনীকান্ত গুপ্তও মুসলিমদের নেতৃত্বদান এবং চাপাতির প্রসঙ্গ স্বীকার করে লিখেছেন:

> "এর মধ্যে রুটি বা চাপাতির ঘটনা এসে পড়ে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে এ চাপাতি ঘুরতে থাকে। গ্রামের প্রধান এই চাপাতি অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। কেউ এটা নষ্ট করে না। সরকার অনুসন্ধান করে এর কোনো হদিস বের করতে ব্যর্থ হয়। তবে অধিকাংশ লোক এ মত পোষণ করে যে, এই চাপাতি দেশের মুসলিমদেরকে একসূত্রে গ্রথিত করছে এবং শীঘ্রই সকলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হবে।"[৩৯]

এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সর্বাত্মক যুদ্ধ কোন আকস্মিক বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া বা পরিকল্পনাবিহীন কোন ঘটনা মাত্র নয় এবং এই আন্দোলন-সংগ্রাম-যুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে ছিলেন সংগ্রামী মুসলিম নেতৃবৃন্দ, যাঁদের ছিল ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের দীর্ঘ ও রক্তাক্ত ঐতিহ্য এবং যাঁদেরকে ইংরেজ ও ধর্মনিরপেক্ষ গবেষকরা 'ওয়াহাবি' অভিধায় বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। এ কারণেই দেখা যায়, ১৮৫৭

---

৩৭. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৩৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৩৯. রজনীকান্ত গুপ্ত [১৮৯৩:৬২-৩]

www.bjilibrary.com

সালের এপ্রিল মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা এবং ইংরেজবিরোধী প্রচারপত্র বিলির অপরাধে সংগ্রামের অগ্রণী নেতা মওলানা আহমদউল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়। আটক ও শহীদ হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলনকে তিনি বেগবান করে গেছেন এবং ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজে যে বক্তৃতা করেন, তাকে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদবিরোধী স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়:

> "দেশবাসী, আপনারা জেগে উঠুন। ফিরিঙ্গি কাফেরদের উৎখাত করতে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। এই কাফেররা ন্যায়কে পদদলিত করছে, আমাদের স্বরাজ্যে তারা লুণ্ঠন করছে। এই কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সে সংগ্রাম হবে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য জিহাদ।"[৪০]

স্বাধীনতা আন্দোলনের এমন অসংখ্য নেতা ভারতবাসীকে ইংরেজ বিতাড়ণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন। দিল্লির মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কদের সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন এবং "বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।"[৪১]

মূলত মুসলিম নেতৃত্বই ছিল যুদ্ধের চালিকা শক্তি। স্যার জেমস আউটরামের মতে, "বিপ্লবী মুসলিমগণই ছিলেন এই বিদ্রোহের মূল শক্তি।"[৪২] বিদ্রোহ দমনের কাজে নিয়োজিত দু'জন ইংরেজ সৈন্য ১৮৫৭ সালে বেনামীতে লেখা বিদ্রোহের ইতিহাসমূলক একটি গ্রন্থে স্বাধীনতা আন্দোলনে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীর ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেন:

> "রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলী ১৮৫৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায় নির্বাসিত হন এবং তিনি ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের উপায় তালাশ করতে থাকেন। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সৈন্যদের সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি চেষ্টা চালাতে থাকেন। অযোধ্যার নবাবের সভাসদ ও অনুচরবৃন্দ সন্দেহাতীতভাবে এই বিদ্রোহে জড়িত ছিল।"[৪৩]

স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য মুসলিমরা কিরূপ ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, সেটা জানা যায় আন্দামান দ্বীপে বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদীর বিবরণে:

---

৪০. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৪১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৪২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৪৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

www.bjilibrary.com

"স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই কোন হিন্দুকে আটক করা হতো, কিন্তু পালাতে পারেনি এমন একজন মুসলিমও সে দিন বাঁচে নি।"[৪৪]

কত স্বাধীনতা-সংগ্রামী মুসলিম এবং আলিম-মুজাহিদের জীবন ব্রিটিশ ফাঁসি কাষ্ঠে বা বুলেটে শহীদ হয়েছিল, সে বিশাল হিসাব পাওয়াও আজ আর সম্ভব নয়। ঢাকার সদরঘাটের অদূরে বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক বা 'আন্টাঘর ময়দান'-এ মাসের পর মাস শহীদদের পবিত্র লাশ ঝুলিয়ে রেখে জনগণকে ভীত ও দুর্বল করতে চেয়েছিল ইংরেজরা। বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ঢাকার লালবাগের অদূরে স্থাপন করেছিল স্বাধীনতাকামীদের নির্যাতন করার জন্য কারাগার। সমগ্র ভারতের বড় বড় শহরগুলো হয়ে ওঠেছিল মুসলিমদের তাজা রক্তে রঞ্জিত। দিল্লি, আগ্রা, কানপুর, মিরাট, সাহারানপুরসহ সারা ভারতে মুসলিম নিধনের এত বড় ঘটনা ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। যুদ্ধোত্তরকালে ইংরেজ শাসনে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিমদেরকে কোণঠাসা করে এমন শোচণীয় পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়, যেন তারা আর কখনওই ১৮৫৭ সালের মত নেতৃত্ব দিয়ে দেশবাসীদের স্বাধীনতার যুদ্ধে উজ্জীবীত করতে না পারে এবং নিজেরাও যেন স্বাধীনতার দাবীতে আর কখনওই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।[৪৫]

ব্যর্থতার নেপথ্য এবং বিপ্লবীদের ইতিবৃত্ত

প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের পেছনেই একজন মূল বা কেন্দ্রীয় নেতার প্রয়োজন হয়। শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর তখন ৮২ বছরের নিবু নিবু প্রদীপ। বিপ্লবীরা তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করায় বৃদ্ধ সম্রাট বললেন, "আমি সর্বান্তকরণে তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু আমার না-আছে অর্থ, না-আছে সৈন্য।" এই কথায় জনসাধারণ সমস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হুজুর, আমরা ধনও চাই না, সৈন্যও চাই না। আমরা চাই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার নেতৃত্বের সমর্থন আমাদের দিন।" বাদশাহ তখন বললেন, "আমার যা কিছু আছে তা তোমাদের দায়িত্বে দিলাম। তবে তোমরা বিশৃঙ্খলা করো না। তোমরা লুটপাট ও নারী-শিশুদেরকে হত্যা করো না। আমার সম্পত্তি-অলঙ্কার বিক্রয় করে তোমাদের বেতন

৪৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৪৫. প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ তথা সিপাহি-জনতার মহাযুদ্ধে ১৫০ বছর পরেও মুসলিমরা কি উপমহাদেশের দেশগুলোতে আবার স্বাধীন-স্বকীয়তার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছেন? ১৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে আত্মসমালোচনার দর্পণে নিজেদেরকে দেখে দেখে তারা কি আত্মপরিচয়ের হারানো উপলব্ধি খুঁজে পেয়েছেন? চিনতে পেরেছেন কি নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে, যা ১৫০ বছর আগে ইংরেজ উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করেছিল। আজকেও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সেই ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আমাদের আত্মউপলব্ধি ও উজ্জীবনের ধারাকে সাফল্যের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্পে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। উপসংহারে আমরা এই প্রশ্নেই আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রাখতে সচেষ্ট হয়েছি।

www.bjilibrary.com

দেব।" বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা সফলতার মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়। কারণ সেখানেও ছিল বেঈমানী। মোহনলাল, গোবিন্দ দাস, আগাজানদের বিশ্বাসঘাতকতা, ভারতীয় রাজন্যবর্গের অসহযোগিতা, উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব সর্বভারতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয় নি। বাহাদুর শাহ নিজের অনেক কিছু বিক্রয় করে বিপ্লবী সৈনিকদের ছয় মাসের অগ্রিম বেতন দিলেন। যখন আর পেরে উঠলেন না, তখন ভারত সম্রাট ভিক্ষুকের মত ধনী ব্যবসাদার রামজীমলকে বললেন, "আমি আপনার নিকট অর্থ ঋণ হিসাবে চাচ্ছি, কর হিসাবে নয়।" কিন্তু রামজীমল ঋণ দিতেও অস্বীকার করলেন। অথচ আগ্রার ধনী ঠিকাদার জ্যোতিপ্রসাদ ইংরেজদের ত্রিশ হাজার টাকা যুদ্ধকালীন তহবিলে সাহায্য দিলেন। এদিকে হঠাৎ বাজার থেকে রসদ ও বারুদ উধাও হয়ে গেল। যামিনী দাসের মত অর্থলোভীরা আটার মজুদ গড়ে তুললেন। যিনি বারুদ লুকিয়ে রেখে সঙ্কট সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তার নাম দেবীলাল। ঐ বারুদ দিয়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। ফলে যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। ১৮৫৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সম্রাট বুঝতে পারলেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে তাঁর আর বেশি দেরি নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কেশ রক্ষিত যে বাক্সটি তাঁর কাছে ছিল, সেটি ইংরেজ ও তাদের দোসরদের দ্বারা কলঙ্কিত হওয়ার ভয়ে তিনি সেটি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মাজারের তত্ত্বাবধায়নকারীর হাতে সঁপে দিলেন এবং নিজে সপরিবারে হুমায়ুন মাকবারা বা হুমায়ুনের সমাধিস্থলে আত্মগোপন করে রইলেন। কুখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি হডসন নির্দয় অপমান সহকারে সম্রাটকে গ্রেফতার এবং দুর্গে বন্দী করলেন। যে সম্রাট একদিন বিপ্লবীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না-করতে এবং নারী-শিশু হত্যা করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি হডসন সেই সম্রাটের দুই পুত্রসহ পরিবারের মোট ২৯ জন শিশু, বালক, বালিকাকে দিল্লির প্রকাশ্য রাজপথে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। এমন কি, এহেন পাষণ্ড হডসন সেই ২৯ জন নিহত বাচ্চার কাটা মাথা সম্রাটকে পাঠিয়ে দিল। পরিবারের অবশিষ্টদেরসহ সম্রাটকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। অথচ তিনি ভারতবর্ষে তাঁর কবরের জন্য মাত্র একখণ্ড জমির জন্য হাহাকার করেছিলেন। রেঙ্গুনে তিনি বিনা চিকিৎসায় একটি ছোট্ট কামরায় দুঃখময় বন্দী জীবন কাটান এবং পরবর্তীতে ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। রেঙ্গুনেই নির্বাসিত শেষ মোগল সম্রাটের সমাধি রয়েছে।

১৯৭৭ সালের অকটোবর মাসের কয়েক দিন বাংলাদেশ সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তৎকালীন বার্মা বা বর্তমান মায়ানমার সফরের সময় চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী-এর সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সে সকল তথ্য তাঁর রঙ্গুম রঙ্গিলার দেশে নামক গ্রন্থে উলেখ করেন[৪৬]:

৪৬. বিমলেন্দু বড়ুয়া [২০০৫:৪২-৩]

www.bjilibrary.com

...সকাল আটটায় সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের মাজার পরিদর্শনের কর্মসূচী। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে মহাবিপ্লবে নেতৃত্বদানের অভিযোগে প্রহসনমূলক এক বিচারের মাধ্যমে এখানেই নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিল। তাঁর নির্বাসিত জীবন এই রেঙ্গুন নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকটে একটি দ্বিতল কাঠের ভবনে কড়া প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত অনটনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বাহাদুর শাহের মাজারে যখন উপনীত হলাম, তখন সেই হতভাগ্য সম্রাটের অন্তিম জীবনের বেদনা-বিধুর দিনগুলির দীর্ঘশ্বাস যেন অনুভব করতে লাগলাম সেখানকার নীরব-নিস্তব্ধ ভাবগম্ভীর পরিবেশে। দিল্লির সিংহাসন হারালেন, সাম্রাজ্য হারালেন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর। সর্বস্ব হারিয়েও অন্তিম জীবন স্বদেশের মাটিতে অতিবাহিত করার অধিকারটুকুও পেলেন না। সম্রাট চলেছেন নির্বাসনে। সঙ্গে আছেন রাণী জিনাত মহল এবং শাহজাদা জওয়ান বখত। পথে পথে জনসমুদ্র, তাদের চোখে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু। সম্রাট নিজেই কাঁদছেন আর দু'হাত তুলে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন: 'আমার এই অভাগা অসহায় লোকদের তুমি ছহি ছালামতে রেখো হে রহমানুর রহিম।' সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন স্বভাব কবি এবং সুফি-সাধক। তাঁর রচিত গজল ও কবিতা উর্দু এবং পারসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সেই সব গজল ও কবিতায় তাঁর নির্বাসিত জীবনের করুণ কাহিনীর ছাপ সুস্পষ্ট। এ ধরনের একটি কবিতায় তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন: 'আমি কারো নয়নমণি নই, নই গো কোনো প্রাণের শান্তি ধারা/এক মুঠো ধুলির মতো আমি রয়ে গেলাম শুধুই ছন্নছাড়া/চেহারা আমার হয়েছে বিবর্ণ সৌন্দর্যের নাহি লেশ/আমি যেন ফসলের অবশেষ।' কবিতাটি ইংরেজিতে পেয়েছিলাম। তা মোটামুটি বাংলা করেছিলাম সেদিন ডায়েরির পাতায় তাৎক্ষণিকভাবে। বাহাদুর শাহের মাজারে গিয়ে সেই আক্ষেপ-হাহাকারের আরো অনেক কথা শুনেছিলাম। হতভাগ্য সম্রাট ও তাঁর পরিবারের জন্য ভাতা দেয়া হতো মাসিক মাত্র ছয়শ' টাকা। রাণীর অলঙ্কার বিক্রি করে সম্রাটের গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে হতো। ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর সম্রাট বাহাদুর শাহ মারা যান। তাঁর অন্তিম শয্যা পাশে উপস্থিত ছিলেন রাণী জিনাত মহল, পুত্র জওয়ান বখত, পুত্রবধূ ও ছোট এক নাতনী। ১৮৮৬ সালের ১৭ জুলাই রাণী জিনাত মহলের মৃত্যু হয়। সম্রাটের কবরের নিকটে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ১৮৮৪ সালে মৌলমেইনে চরম দারিদ্র্যে শাহজাদা জওয়ান বখত মারা যান। তাঁকে কোথায় কবর দেওয়া হয়, তা এখনো অজ্ঞাত। সম্রাট বাহাদুর শাহ ও রাণী জিনাত মহলের কবরও বহুকাল যাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবদুস সালাম নামের একজন বাঙালি মুসলিম অনেক কষ্ট করে সম্রাট ও রাণীর কবর আবিষ্কার করেন। বাহাদুর শাহ জাফরের আধ্যাত্ম সাধনার গুণে তাঁকে প্রবাসী মুসলিমরা পীর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতো। এখনো তাঁর মাজার শরীফে প্রতি বছর সপ্তম চান্দ্র মাসে পবিত্র ওরস উদযাপিত হয়ে থাকে। মাজারের নিকট দিয়ে যে সড়কটি বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডার দিকে চলে গেছে তা জাফর শাহ রোড নামেই পরিচিত। মাজারটি একটি ট্রাস্টি বোর্ডের

www.bjilibrary.com

তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বর্মা সরকার মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সাহায্য করে থাকেন। এসব কথা আমাদেরকে বলেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার উ. ইউনুস। তিনি আমাদের মাজার শরীফের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন মাজারের পেশ ইমাম মৌলানা নূও মোহাম্মদের সাথে। মৌলানা সাহেবের বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে। তবে তিনি লেখাপড়া শিখেছেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও সাতকানিয়ায়। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের রুহের মাগফেরাত কামনা করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। ফেরার সময় মনে পড়ল তাঁরই বুকফাটা আর্তনাদ: "হাউ আনফরচুনেট ওহ জাফর/আর্ট দাউ টু বি ডিনাইড ইভেন টু ইয়ার্ডস অব ল্যান্ড/ফর গ্রেভ ইনদি কান্ট্রি দাউ লাভড।' [কী দুর্ভাগা তুই রে জাফর/যে দেশকে তুই ভালোবাসিস/তার বুকে তোর কবরের জন্য/দুই গজ জমিও হায় তোকে দেয়া হলো না।][৪৭]

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মত ১৮৫৭ সালে মহাসংগ্রামও ব্যর্থ হয় জমিদার আর রাজা-মহারাজাদের বেঈমানির কারণে। এই মহাসংগ্রামকে ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদার রাজা-জমিদাররা যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং পরবর্তীতে যে নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে নস্যাৎ করেছিল তার নজীর ইতিহাসে বিরল। বাহাদুর শাহ গ্রেফতার হওয়ার পর ইংরেজরা দিল্লিসহ সারা ভারতে যে নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালিয়েছিল তা দেখে বিখ্যাত কবি মির্জা গালিব, যিনি সে সময় দিল্লিতে ছিলেন, লিখেছিলেন:

"রক্তের সমুদ্র দেখেছি, আল্লাহ আর কতদিন দেখাবেন কে জানে!"

নির্যাতনের করুণ ইতিকথা মিশে রয়েছে ১৮৫৭ সালের সঙ্গে।[৪৮] ইন্ডিয়ান মিউটিনি গ্রন্থে চার্লস বল লিখেন: "বেসামরিক ও সামরিক আদালতের হুকুমে যাদেরকে গুলী করে মারা হয় বা যাদেরকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয় বা ফাঁসিতে হত্যা করা হয়, তাদের সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেশি। যুদ্ধ শেষে ইংরেজরা একটি ব্যাপক গণহত্যা চালায়। কমপক্ষে ত্রিশ হাজার মুক্তিকামী সিপাহি এবং পঞ্চাশ হাজার স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করা হয়।"[৪৯] ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ-যুদ্ধে শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির রক্তাক্ত কাটা-তাজা মাথা ভারতবাসীকে দিয়ে গেছে ইংরেজরা।

---

৪৭. ইতিহাসের কী ঈঙ্গিত কে জানে! মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং শেষ শাসকের কবর ভারতের বুকে হয় নি। বাবর সমাহিত রয়েছেন কাবুলে আর বাহাদুর শাহ জাফর রেঙ্গুন বা ইয়াঙ্গুনে! বিস্তারিত দেখুন, কামালউদ্দিন হোসেন [১৯৯৮]

৪৮. "ক্ষিপ্ত ইংরেজদের হাতে শুধু বুড়োবুড়ি ও কেবল শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। ইংরেজরা জয় লাভ করার পর আনন্দের চোটে লাখনৌ-এর সেইসব দেশী সিপাহীকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে, যারা লাখনৌকে রক্ষা করতে ইংরেজদের সঙ্গ দিয়েছিল।" এস.এন সেন [১৯৫৭]

৪৯. চার্লস বল নিহতের প্রকৃত সংখ্যা লুকিয়েছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে কমপক্ষে এক লক্ষ মানুষকে ১৮৫৭ এবং তৎপরবর্তী সময়ে ইংরেজরা গণহত্যার মাধ্যমে নিধন করে। আর পলাশী থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়কালে [১৭৫৭-১৯৪৭] ইংরেজ কর্তৃক এবং ইংরেজের প্ররোচণায়-সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারী-মন্বন্তরে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আহত, নিহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়

www.bjilibrary.com

১৮৫৭ সালের বীর-বিপ্লবী মৌলভি আহমদউল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতায় লড়াই করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে এক জ্বলন্ত আতঙ্কে পরিণত হন। এ কারণেই ইংরেজ সরকার তাঁকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দেওয়ার জন্য তৎকালীন ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। অর্থের লোভে এবং ইংরেজ প্রভুদের খুশি করার জন্য পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তাঁকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গুলী করে হত্যা করে এবং তাঁর ছিন্ন শির ইংরেজ প্রভুর কাছে প্রেরণ করে। এক নিষ্ঠুর ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আহমদউল্লাহর ছিন্ন শির প্রকাশ্য স্থানে দুইদিন ঝুলিয়ে রেখে জনসাধারণের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য প্রদর্শনী করা হয়। মিথ্যা সভ্যতাগর্বী ইংরেজরাজ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ রাজা জগন্নাথকে ৬৫ হাজার টাকা পুরস্কার এবং জমিদারি দান করে।

অন্য এক বিবরণে জানা যায়:

> "বিপ্লবের এক পর্যায়ে মৌলভি আহমদউল্লাহর প্রচেষ্টায় অযোধ্যার বেগম হজরত মহলের পুত্র বিরজিস কদরকে সিংহাসনে বসানো হয় এবং অভিভাবকরূপে বেগম হজরত মহল দেশের শাসন কার্য তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। আহমদউল্লাহ এবং বেগম হজরত মহল ইংরেজ ফৌজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। আহমদউল্লাহ মুহাম্মদীপুরে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন। শাহজাদা ফিরোজ শাহসহ আরও কয়েকজন সেই হুকুমতের উজির নিযুক্ত হন। সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন জেনারেল বখত শাহ। আহমদউল্লাহ রাজা বলদেব সিংহের আমন্ত্রণক্রমে গডড়ি অভিমুখে রওয়ানা হন। একদিন বিশ্বাসঘাতকদের প্ররোচনায় তিনি হাতীর পিঠে আরোহণ করেন এবং সেই অবস্থায় লুকিয়ে থাকা শত্রুর গুলীতে শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁর শির খণ্ডিত করে কোতোয়ালিতে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কয়েকদিন পর আহমদপুর মহল্লায় তাঁর পবিত্র শির দাফন করা হয়। আহমদউল্লাহর হত্যাকারীকে রাজা বলদেব সিংহ ৫০ হাজার টাকা বখশিশ দেন।[৫০]

অযোধ্যার ক্ষমতাচ্যুত নবাবের[৫১] বেগম হজরত মহল[৫২] ১৮৫৭ সালে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রাজধানী লাখনৌ-এর প্রতিরক্ষায় উন্নততর অস্ত্রসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং লাখনৌ-এর পতন হলে তিনি রাজধানী ত্যাগ করে ফয়জাবাদে আহমদউল্লাহর বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন। শাহজানপুরের প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময় ইংরেজ বাহিনী সমস্ত দিক ঘিরে ফেললে অসম সাহস ও অসীম দক্ষতার সঙ্গে পথ তৈরি করে তিনি ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী

---

৫০. হাসান জামান, [,,,:১৪৭]

৫১. ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইংরেজ কর্তৃক অযোধ্যা দখল এবং নবাবকে কলকাতায় নির্বাসিত করার বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে

৫২. পরে নেপালে তাঁর অবস্থান প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

নেপালের তরাই-এর দিকে চলে যান। কঠোর পরিশ্রম ও দুর্ভোগে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে নেপালের পাহাড়ি জনপদে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অকুতোভয় বীরাঙ্গনা হজরত মহল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বীরাঙ্গনা হজরত মহল নেপালে প্রচণ্ড বিরূপতার সম্মুখীন হন। 'প্রতিবেশী শক্তিবর্গের বিরোধিতা' অধ্যায়ে আমরা অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালের ঘটনা-প্রবাহে নেপালের বিরোধিতাপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরবো। এক্ষণে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক হবে:[৫৩]

> "কাঠমাণ্ডুতে প্রায় পাঁচ বছর ছিলাম। নেপালি জামে মসজিদে জুম্মার নামায পড়তে গিয়ে সামনে পড়ত অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দ্বিতীয় বেগম হজরত মহলের কবর। মসজিদের আঙিনায় স্বাধীনতা আন্দোলনের আরও কিছু নেতার কবরও রয়েছে। এঁরা কোনওক্রমেই ইংরেজ আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। লাখনৌ-এর নবাব-পত্নী সাধারণ ঘর থেকে এসে বেগম হন। এই শিল্পানুরাগী মহিলা পরবর্তীতে জাতির জন্য অস্ত্র তুলে নেন। এবং এভাবেই একজন সাধারণ মহিলা ইতিহাসে অমর স্থান অর্জন করেন। উল্লেখ্য, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে লাখনৌ-এর চিফ কমিশনার হেনরি লরেন্স নিজের লোকজনসহ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় নেন। বিপ্লবীদের হাতে লরেন্স নিহত হলে স্বাধীনতাকামীরা পুরো এলাকা অবরোধ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর হ্যাভলক ও আউটরামের নেতৃত্বে আরেকটি বিরাট ইংরেজ বাহিনী অযোধ্যায় এসে পৌঁছায়। জেনারেল নেইল এ সময়ে নিহত হন। নভেম্বরের প্রথম দিকে কলিন ক্যাম্পবেলও সসৈন্যে অযোধ্যায় এসে ইংরেজ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেন। অবশেষে নেপালি বাহিনী ইংরেজের সাহায্যে এগিয়ে এলে অযোধ্যা দখল[৫৪] করা সম্ভব হয়।"

১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার সঙ্গে মিশে রয়েছে আরও হাজারও বিপ্লবীর আত্মত্যাগের ইতিবৃত্ত। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে গান রচিত হয়েছে 'বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ভারতবাসী।' অথচ ইতিহাস বলছে অন্য কথা:

> "ক্ষুদিরাম কোন ব্রিটিশ বড়লাটকে মারেনও নাই, মারতে যানও নাই। মিসেস কেনেডি নামক এক নিরীহ ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ভারতের দুইশ' বছরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে একজন মাত্র

---

৫৩. বিস্তারিত, দেখুন, মুহাম্মদ সিদ্দিক [২০০৯]

৫৪. আসলে নেপালি বাহিনীর কাজটি ছিল অতর্কিতে পেছন থেকে ছুরিকাঘাতের শামিল। লাখনৌ ছিল আন্দোলনের কেন্দ্র। কেন্দ্রের পতনে স্বাধীনতার সংগ্রামের সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টার নস্যাৎ হয়। নেপালিরা সাহায্য না-করলে লাখনৌতে ইংরেজরা নিশ্চিহ্ন হত এবং পরিণতিতে ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত। পরবর্তীতে প্রতিবেশী শক্তির ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে

www.bjilibrary.com

বড়লাটই বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাঁর নাম লর্ড মেয়ো। ১৮৭২ সালে বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার জেল পরিদর্শনে গেলে সেখানে নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত 'ওহাবি বিপ্লবী'[৫৫] মোহাম্মদ শের আলি শাবলের আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে লর্ড মেয়োকে হত্যা করে। পরে ইংরেজরা শের আলিকে ফাঁসি দেয়।"[৫৬]

চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্যসেনের ব্যাপারেও অনেক কথা হয়। কিন্তু ইতিহাস আবারও জানাচ্ছে যে:

"সূর্যসেনের ৬৫ বৎসর আগে ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের বিপ্লবী বীর রজব আলি বিরাট দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম ট্রেজারি এবং জেল দখল করে নেন। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেন এবং তিনটি সরকারি হাতি ও সদ্য কারামুক্ত কয়েদীসহ[৫৭] চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। পথে ত্রিপুরার রাজা ঢাকা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাদের গতিরোধ করায় তারা মনিপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে সিলেটের লাতু নামক স্থানে সিলেট বাহিনীর অধিনায়ক মেজর বাঙ-এর সৈন্যদের সাথে বিপ্লবীদের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে মেজর বাঙ নিহত হয়। বিপ্লবীদের অধিকাংশও শহিদ হন। পরে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে হাবিলদার রজব আলি ও তাঁর অনুগত সৈন্যদল রেঙ্গুনের গহীন পার্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধারণা করা হয় সেখানেই তাঁদের মৃত্যু হয়।"[৫৮]

১৮৫৭ সালের বিপ্লবীরা আপাত পরাজিত হলেও থেমে থাকেন নি; বরং প্রবল প্রতাপে সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী ইংরেজদের হটিয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

"১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মহম্মদ আবদুল্লাহ নামক এক বিপ্লবী কলকাতা টাউন হলের সামনে চিফ জাস্টিস নরম্যানকে গুলী করে হত্যা করেন। পরে তিনি ফাঁসির দড়ি গলায় পরে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। ... মহম্মদ আসফাকউল্লাহ, পীর মহম্মদ, মাওলানা ইসমাঈল, হাফেজ আ. সামাদ, মহম্মদ রইসউল্লাহ, ইকবালমান্দ, গজনফর হোসাইন, সাখাওয়াত হোসাইন, তফাজ্জল হোসাইন, কাজি মিএ্রাজান, রহিম বখশ, আবদুল করিম, মাওলানা ইলাহি বখশ প্রমুখ গুচ্ছ গুচ্ছ নাম, যাঁরা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছেন। গবেষক ঐতিহাসিকদের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ

---

৫৫. এই পরিচিতি ১৮৫৭ সালের বিপ্লবীদের ব্যাপারে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করার ইংরেজ-হিন্দু ষড়যন্ত্র এবং ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি রিচনার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৬. আরিফুল হক [২০০৯: ৫৩]

৫৭. ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের জেলখানায় স্বাধীনতাকামী এবং বিপ্লবীদেরই অধিক হারে থাকার ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে।

৫৮. আরিফুল হক [২০০৯: ৫৩]

www.bjilibrary.com

বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়জনার নাম আমরা জানি, কয়জনাই বা আমাদের আলোচনায় উঠে আসেন। নিজেকে চিনি না বলেই অপরের ঘরে বাস করতে আমাদের বড়ই আহ্লাদ। সে ঘর যতই গোলামখানা বা কামলাখানা হোক না কেন, আমাদের পুলকের অন্ত নেই।"[৫৯]

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা

সিপাহি যুদ্ধ ও বাংলাদেশ গ্রন্থে রতন লাল চক্রবর্তী দাবী করেন যে: "প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম অন্যান্য জনগণ সিপাহি যুদ্ধের সময় ছিল নিষ্ক্রিয়। ভারতের অন্যান্য কতিপয় অঞ্চলের মতো ভূস্বামী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোম্পানিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে, অবশ্য এই সহযোগিতার মূলে ছিল শ্রেণী স্বার্থ আদায়।"[৬০] সন্দেহ নেই, গ্রন্থের নাম থেকেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। তিনি জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার যুদ্ধ না বলে ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলীকে নাম দিয়েছেন 'সিপাহি যুদ্ধ'। ইংরেজ সহযোগীরূপে ভূস্বামী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে তিনি যাদেরকে যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় বলেছেন, তারা ১৭৯৩ সালের ইংরেজ-প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর সুবিধাভোগী নব্য হিন্দু জমিদার শ্রেণী এবং ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সনদ প্রাপ্ত কলকাতাকেন্দ্রীক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের হীন কার্যকলাপের কিয়দংশ এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি শ্রেণী স্বার্থ আদায়ের জন্য হিন্দু জমিদার ও মধ্যবিত্তদের আনুগত্যকে চিহ্নিত করলেও তাদের সম্প্রদায়গত চারিত্রিক অবস্থানটিকে নিরূপণ করেন নি। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে কোনরূপ রাখঢাক না করেই সে কাজটি করেছেন। তিনি পরিস্কার ভাষায় ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলীকে মিউটিনির হাঙ্গামা[৬১] নামে অভিহিত করে যা লিখেন তা অপরিবর্তিত বানান ও ভাষায় উল্লেখ করা হলো:

> "১৮৫৭ সালে মহারানী প্রজাদিগকে অভয়দান করিয়া ভারতসাম্রাজ্য নিজহস্তে লইলেন; কলিকাতা শহর আলোকমালাতে মণ্ডিত হইল; চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশে ও সমাজে এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।...বিদ্রোহজনীত উত্তেজনাকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক সাপ্তাহিক ইংরাজি কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল। পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার

---

৫৯. আরিফুল হক [২০০৯: ৫৩]

৬০. রতন লাল চক্রবর্তী [১৯৯৬: ১৪৯]

৬১. জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তো দূরের কথা, এহেন জাতীয় স্বার্থমূলক কোনও ধারণাই তৎকালীন মধ্যবিত্ত বঙ্গ সমাজ তথা কলকাতাকেন্দ্রীক হিন্দু শিক্ষিত সমাজে ছিল না। ছিল ঘটনা সম্পর্কে ব্রিটিশের মতোই মিউটিনি বা বিদ্রোহ এবং হাঙ্গামা নামক অভিব্যক্তি। বিস্তারিত, দেখুন, শিবনাথ শাস্ত্রী [২০০৬]

www.bjilibrary.com

দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহি-বিদ্রোহ কেবল কু-সংস্কারাপন্ন সিপাহিগণের কার্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই। প্রজাকূল ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচল রহিয়াছে। পেট্রিয়টের চেষ্টাতে লর্ড ক্যানিং-এর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল; সেজন্য এদেশীয়দিগের প্রতি কঠিন শাসন বিস্তার করিবার জন্য ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। পূর্বেই বলিয়াছি সেই কারণে তাঁহার স্বদেশীগণ তাঁহার Clemency Canning বা "দয়াময়ী ক্যানিং" নাম দিল। এমনকি তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য লন্ডনের প্রভুদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেন্টেও সেকথা উঠিয়াছিল; কিন্তু ক্যানিং-এর বন্ধুগণ পেট্রিয়টের উক্তিসকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, এদেশবাসীগণ ক্যানিং-এর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ।...সকলে উত্তেজনাতে[৬২] পড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেট্রিয়ট হারায় নাই; এজন্য রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত। হিন্দু পেট্রিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল।"[৬৩]

ইতিহাস জানাচ্ছে যে, ১৮৫৭ সালে মহাসংগ্রামের ব্যর্থতায় বাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। মুসলিমদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে গদগদ ভাষায় তারা ইংরেজ শাসকের প্রদি তাদের আনুগত্য নিবেদন করেন। 'সাহিত্য-সম্রাট' নামে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রচনার জন্য বিখ্যাত, সংবাদ ভাস্কর পত্রিকায় লিখলেন:

"হে পাঠক, সকলে উদ্বাহু হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর। আমাদের প্রধান সেনাপতি সক্ষমরূপে দিল্লি প্রবেশ করিয়াছেন। পাঠকগণ জয় জয় বলিয়া নৃত্য কর। হিন্দু প্রজাসকল দেবালয়ে পূজা দাও। আমাদের রাজ্যেশ্বর শত্রুজয়ী হইলেন।"[৬৪]

---

৬২. ১৮৫৭ সালে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে কখনও হাঙ্গামা এবং কখনও উত্তেজনা বলে অভিহিত করা হয়েছে

৬৩. শিবনাথ শাস্ত্রী [২০০৬:১৮১-২]

৬৪. মোহাম্মদ আবদুল গফুর [২০০৯:১৭]

www.bjilibrary.com

আর তৎকালীন বিখ্যাত কবি ঈশ্বর গুপ্ত মুসলিমদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে গদগদ চিত্তে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য নিবেদন করে লিখলেন:

"যবনের যত বংশ এবারে হবে ধ্বংস/সাজিয়াছে কোম্পনীর সেনা/গরু জরু লবে কেড়ে, চাপ দেড়ে যত নেড়ে/এই বেলা সামাল সামাল।"[৬৫]

তিনি আরও অগ্রসর হয়ে হিন্দু ধর্মকে ইংরেজ সেবায় ব্যবহার করলেন:

"চিরকাল হয় যেন বৃটিশের জয়/বৃটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়/এমন সুখের রাজ্য আর নাহি হয়/শাস্ত্রমতে এই রাজ্য রামরাজ্য কয়।"[৬৬]

ঈশ্বর গুপ্ত একটি জনপ্রিয় শ্লোগান পর্যন্ত তৎকালে ইংরেজানুগ এবং বিপ্লববিরোধী জনমত গঠনের লক্ষ্যে প্রচার করেন:

"ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়/মুক্ত মুখে বল সবে বৃটিশের জয়।"[৬৭]

হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক মুখপাত্র হিসাবে কবি-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৭ সালের ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে স্বীয় সামাজিক শ্রেণীর মনোভাবকেই বারংবার তুলে ধরেছেন। কেননা, তাঁর সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর সে সময় সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে এবং সংগ্রামী-স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সংবাদ এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। একটি সখ্যায় পত্রিকাটি লেখে:

"অবোধ যবনেরা [মুসলিম] উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গভর্নমেন্টের সাহায্যার্থে কোন প্রকার সদানুষ্ঠান না করাতে তাহাদিগের রাজভক্তি সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ রহিয়াছে এবং 'বিজ্ঞ লোকেরা' তাহাদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞও জানিয়াছেন।"[৬৮]

ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সংবাদ প্রভাকর-এ উল্লেখিত মুসলিম বিদ্বেষী 'বিজ্ঞ লোকেরা' ছিলেন রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র সেন এবং স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত।[৬৯]

১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের বিরুদ্ধে হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজানুগ মনোভাবকে বিশ্লেষণ করে সুপ্রকাশ রায় ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গ্রন্থে লিখেন:

"ইহারা [হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী] প্রথম হইতেই ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইয়া ইংরেজদেরও ভারত জয়কে 'ভগবানের মঙ্গল

---

৬৫. মোহাম্মদ আবদুল গফুর [২০০৯:১৮]
৬৬. পূর্বোক্ত
৬৭. এমরান জাহান [২০০৯:২৩৩]
৬৮. এমরান জাহান [২০০৯:২৩২]
৬৯. পূর্বোক্ত

www.bjilibrary.com

বিধান' বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং মহাবিদ্রোহে ইংরেজদের পরাজয় তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। সমসাময়িককালে শহুরে মধ্যশ্রেণী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না করিলেও অনেকেই মহাবিদ্রোহের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমনকি স্বাধীনতার অগ্রদূত বলিয়া কথিত কবি ঈশ্বর গুপ্ত যিনি 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুর পূজা করিব' বলিয়া আস্ফালন করিতেন, তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য নানা সাহেব, ঝাঁন্সির রাণী ও অন্যান্যদের প্রতি কুৎসিত কটাক্ষ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।"[৭০]

হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মতোই হিন্দু শোষক-বুর্জোয়া শ্রেণীও ইংরেজ দালালির মাধ্যমে বিপ্লবকে নস্যাৎ কল্পে তৎপরতা চালায়ঃ

> "হিন্দু, জমিদার, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরা সিপাহী বিপ্লবের বিরোধিতা করেন। ১৮৫৭ সালের ২৫ মে তারিখেই বর্ধমানের জমিদার মহারাজা মহৎব চাঁদ ২৫০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি মারফৎ ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন।"[৭১]

১৮৫৭ সালের ১০০ বছর পূর্বে বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী পলাশীর যুদ্ধের সময়ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়ঃ

> "পলাশীর এই যুদ্ধকে কোন কোন হিন্দু লেখক 'দেবাসুর [দেবতা ও অসুর বা অশুভ শক্তি] সংগ্রাম' নামে অভিহিত করেছেন। এখানে 'দেবতা' ইংরেজ-লুটেরা ক্লাইভ আর 'অসুর'রূপে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ে জীবন দানকারী তরুণ নবাব সিরাজকেই চিহ্নিত করা হয়। পলাশীর শোকাবহ বিপর্যয়কে কলকাতায় [হিন্দু নাগরিকগণ কর্তৃক] 'পলাশীর বিজয়োৎসব'রূপে পালন করা হয় এবং হিন্দুদেবী দুর্গার অকালবোধনের মাধ্যমে বসন্তকালীন দুর্গোৎসবকে শারদীয় দুর্গোৎসবরূপে পালন করে ক্লাইভকে দেবতুল্য সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করা হয়।"[৭২]

অদ্যাবধি বসন্তকালের বদলে শারদীয় দুর্গোৎসব বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পালিত হচ্ছে।

প্রতিবেশী শক্তিবর্গের বিরোধিতা

১৮৫৭ সালে মহাসংগ্রামের সময় ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর কয়েকটি স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অবস্থান গ্রহণ করার মাধ্যমে ইংরেজদের বিজয়কে সম্ভব করে।

---

৭০. সুপ্রকাশ রায় [১৯৮৩]
৭১. মোহাম্মদ আবদুল গফুর [২০০৯:১৭]
৭২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৮:৪২]

www.bjilibrary.com

অযোধ্যা যখন বিপ্লবীদের দখলে এবং সেখানে লরেন্স ও নেইলের মত ইংরেজ কমান্ডার নিহত হয়েছে আর হ্যাভলক, আউটরাম, কলিন ক্যাম্পবেলরা কোনও মতেই স্বাধীনতাকামীদের হটিয়ে অযোধ্যাসহ লাখনৌ উদ্ধার করতে পারছে না, তখন সর্বমোট ১৪ হাজার প্রশিক্ষিত নেপালি গুর্খা সৈন্য এসে ইংরেজদের সাহায্য করে এবং সম্মিলিতভাবে হামলা চালিয়ে অয্যোধা পুনর্দখল করতে সমর্থ হয়। মহাবিদ্রোহ দমনে নেপাল সরকার ইংরেজদের খুবই প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে, এমন কি খোদ নেপালের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত একটি বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিলিতভাবে স্বাধীনতাকামীদের আক্রমণ করেন। শামীমা সিদ্দিকার লেখা গবেষণাগ্রন্থ মুসলিম অব নেপাল-এ নেপালি গবেষক রিমিকেশ সাহার বরাতে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৭৩]

ভারতবর্ষে মহাবিদ্রোহের খবর নেপালে পৌছলে ৩১ মে ১৮৫৭ তারিখে নেপালের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণা বাহাদুর ইংরেজদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠান। জঙ্গ বাহাদুর নামের এক ক্ষমতার দাবিদার সামরিক কর্মকর্তাও একই ধরনের প্রস্তাব দেন।[৭৪] কাঠমাণ্ডুতে অবস্থানরত ইংরেজ রেসিডেন্ট মেজর জর্জ র‍্যামসে জঙ্গ বাহাদুরের সাহায্য প্রস্তাবকে অবহেলা করে প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণা বাহাদুরের সাহায্য গ্রহণের জন্য গভর্নর জেনারেলের নিকট নোট পাঠান। যখন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর পক্ষ থেকে অবিলম্বে নেপালি সাহায্য গ্রহণের সম্মতি এলো, তখন ক্ষমতার দাবিদার জঙ্গ বাহাদুর অধিকতর সাহায্য করার ব্যাপারে ইংরেজদেরকে সন্তুষ্ট করে ইংরেজদের সহযোগিতায় নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করে নেন। জুলাই মাসের মধ্যে তিন হাজার নেপালি গুর্খা সৈন্য ভারতবর্ষের সীমান্ত সুগার্ডলিতে জমা হয়। তারা পিছন দিক দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে জৌনপুর, বারানসী, আজমগড় দখল করে। ক্ষমতা দখলকারী নেপালি প্রধানমন্ত্রী নিজে দশ সহস্রাধিক সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ভারতের পথে যাত্রা করেন। কাঠমাণ্ডু থেকে বিদায়কালে তিনি ইংরেজদেরকে সহযোগী হওয়ার পিছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত: এটা প্রমাণ করা যে, নেপালিরা হল বিশ্বস্ত তাদের প্রতি, যারা তাদেরকে সম্মান করে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদের ক্ষমতা বেশি। তৃতীয়তঃ ইংরেজ বিজয়ী হলে নেপালের লাভ হবে। আসল যে কারণটি তিনি অব্যক্ত রাখেন, তা হলো ইংরেজের সাহায্যে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার অভিপ্রায়। অনেকের মতে, তার উদ্যোগ কতকটা বর্তমান কালের পাকিস্তানি জেনারেল মোশারফ কর্তৃক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করার মতো। দেশে এই জেনারেলের গণভিত্তি নেই, তাই তিনি মার্কিনীদের শক্তিতে দাঁড়াতে চান। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জঙ্গ বাহাদুরও ইংরেজদের পক্ষে রাখতে চেয়েছিল। ইংরেজরা মহাবিদ্রোহ শেষে

---

৭৩. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও তথ্য, দেখুন, মুহাম্মদ সিদ্দিক [২০০৯]

৭৪. ইংরেজদের প্রতি নেপালি সাহায্যের বিষয়টি নেপালের সকলেই মেনে নেয় নি। রাজপরিবার, আমলা ও সেনাবাহিনীতে এ নিয়ে ছিল মতপার্থক্য। নেপাল সেনাবাহিনীর গুরুঙ্গ সম্প্রদায়ের রেজিমেন্টে এ নিয়ে ছিল অসন্তোষ। রিশিকেশ সাহা [২০০০]

www.bjilibrary.com

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জঙ্গ বাহাদুর ও তার বংশকে শক্তি যোগাতে থাকে। ফলে পরবর্তী প্রায় একশ' বছর ধরে জঙ্গ বাহাদুরের বংশের লোকেরাই নেপালের প্রধানমন্ত্রী হতে থাকে এবং রাজাকে হাতের পুতুলে পরিণত করে।

শুধু ১৮৫৭ সালেই নয়, নেপালিরা ১৮৫৮ সালেও ইংরেজানুগত্য অব্যাহত রাখে। জানুয়ারি ১৮৫৮ সালে জঙ্গ বাহাদুর স্বাধীনতা-সংগ্রামী নিজাম মোহাম্মদ হোসেনের মুজাহিদ বাহিনীকে পিছন থেকে হামলা করার মাধ্যমে গোরখপুর দখল করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। ১৭ মে ১৮৫৭ সালে তৎকালীন ইংরেজ শাসনের কেন্দ্রস্থল কলকাতা থেকে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নেপালকে জানান যে, ইংরেজরা নেপাল সরকারের কাছ থেকে পূর্বে ছিনিয়ে নেওয়া কিছু এলাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া নেপালিদেরকে ইংরেজ সরকার তাদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ দুই লাখ ত্রিশ হাজার ছয়শ' পনের রূপি এবং জীবিত ও মৃত সৈনিক-কর্মকর্তাদেরকে আরও চার লাখ পঞ্চাশ হাজার রুপি প্রদান করে। এর ফলে নেপালিদের ইংরেজানুগত্য আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৯ সালে ইংরেজ ও নেপালি যৌথ বাহিনী নেপাল-ভারত সীমান্তে সম্মিলিত অভিযান চালিয়ে আত্মগোপনকারী স্বাধীনতা-সংগ্রামীর অকাতরে হত্যা ও আটক করে। শুধু অযোধ্য, লাখনৌ বা উত্তর ভারত নয়, নেপালি সৈন্যরা বাংলাতেও ইংরেজদের পক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এমন কি, জঙ্গ বাহাদুর ইংরেজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নেপালের মাটিতেও বিপ্লবীদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। তবে, ইতিহাসে এমন তথ্যও রয়েছে যে, প্রচুর ধন-সম্পদের বিনিময়ে তিনি অনেক বিপ্লবীকে নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রাখেন।[৭৫] অর্থলিপ্সাই ছিল জঙ্গের একমাত্র নীতি। ফলে তিনি যাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অযোধ্যার বেগম হজরত মহল ও তাঁর পুত্র বিরজিস কদর, নানা সাহেব ও তাঁর পুত্র দেবী বক্স, রাজপুত নেতা বেনিমাধো, জ্বালা প্রসাদ, বেরিলির খান বাহাদুর খান। বেগম হজরত মহল পরিবারের আটাশ জন সদস্যসহ কাঠমাণ্ডুতে রাজার 'যপোথলী দরবার' নামের এক প্রাসাদে বসবাসের সুযোগ পান প্রচুর অর্থেও বিনিময়ে। উল্লেখ্য, মহারাজা রনজিত সিংহের মহারাণী জিনদান চান্দ কাউর চুনার দুর্গের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে নেপালে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের অর্থলিপ্সা সামাল দিতে না পেরে মহারাণী ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে ভারতে ফিরে আসেন। মায়ের মৃত্যুর পর বিরজিস কদরও নেপালে অবস্থান অপেক্ষা ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে ভারতে ফিরে আসাকেই পছন্দ করেন। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের অধীনে কর্মরত মুফতি মাওলানা সারফারাজ আলি শাহও কাঠমাণ্ডুতে চলে আসেন। তিনি সেখানে নেপালি জামে মসজিদের সংস্কার সাধন ও ধর্ম-কর্ম-সমাজসেবার মাধ্যমে দিন গুজরান করেন। মৃত্যুর পর মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে দাফন করা হয়।

৭৫. রিশিকেশ সাহা [২০০০]

www.bjilibrary.com

বিপ্লবীদের সঙ্গে কেবল নেপাল নয়, অপরাপর প্রতিবেশীরাও ইংরেজ তোষণ নীতির কারণে ভালো ব্যবহার তো করেই নি বরং চূড়ান্ত বিরোধিতা এবং ক্ষতি করেছে। বীর বিপ্লবী হাবিলদার রজব আলি, যিনি সূর্যসেনের অর্ধ শতক পূর্বেই চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করাসহ ইংরেজদের পরাজিত করার প্রথম নায়ক, তিনি ত্রিপুরারাজের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং মনিপুর এবং বার্মার পক্ষ থেকেও কোন সাহায্য না পেয়ে রেঙ্গুনের গভীর অরণ্যে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন।[৭৬]

স্বাধীনতাহীনতা আর পশ্চাতপদতার লাঞ্ছনা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে গেলে প্রধানত মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে থাকে এবং একশ' বছরের বঞ্চনার পর ১৮৫৭ সালে মুসলিমগণ যখন দখলদার ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির কবল থেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে গিয়েও নানা শাঠ্য-ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্যর্থ হয়, তখন আরও ভয়ানকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জিন্দানখাসায় তাদেরকে বন্দী হতে হয়। ফলে তাঁদের দুর্ভাগ্য ও পশ্চাতপদতার সীমা-পরিসীমা থাকে নি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা একজন ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণে নিম্নরূপঃ

> "যাহার [মুসলিমগণ] পূর্ব-পুরুষগণ এক সময় কোম্পানির বণিকদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় দিয়াছিলেন, যাহার পূর্ব-পুরুষের সৌজন্যে বণিক কোম্পানি বাঙালায় আপনাদের ব্যবসা চালাইয়া সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং যাহার পূর্ব-পুরুষেরা কোম্পানিকে বাঙালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তিনিই[৭৭] এখন সেই বণিক কোম্পানির বিচারে, সেই বণিক কোম্পানির কৃপায় এরূপ ক্ষমতাশূন্য, প্রভুত্বশূন্য ও রাজলক্ষণশূন্য হইয়া পড়িলেন।"[৭৮]

স্বভাবতই রাজনৈতিক ক্ষমতা, শক্তি ও সাম্রাজ্য হারানোর ফলে মুসলিমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তদুপরি ইংরেজরা কখনও ভুলতে পারে নি যে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের মত দালালি ও মোসাহেবীতে মোটেই অভ্যস্ত নয়। ব্রিটিশদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মুসালিমরা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে কখনও আপোষ করবে না এবং স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা থেকে কখনও বিরত হবে না। ফলে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের চরম দিনে ইংরেজ ও তার বশংবদ-তাবেদারগণ যখন উল্লাস, আনন্দ, অর্থ-উপার্জন এবং

---

৭৬. যে বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে

৭৭. তিনি বলতে মোগল শাসনের সমাপ্তিকালের মোগল সম্রাট আকবর শাহ এবং বাহাদুর শাহকে গণ্য করা যেতে পারে

৭৮. রজনীকান্ত গুপ্ত [১৮৯৩:১৪৯]

www.bjilibrary.com

নিজেদের শান-শওকত বৃদ্ধিতে মশগুল, তখন "ইসলাম ও মুসলিমরা গালমন্দ আর অপব্যাখ্যা ছাড়া অতি অল্প কিছুই লাভ করেছে।"[৭৯]

১৮৫৭ সালের পর মাত্র এক যুগের মধ্যেই মুসালমগণ এমন ব্যাপকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন, যা খোদ ইংরেজ-কর্মচারী ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারও লুকিয়ে রাখতে পারেন নিঃ

> "নিজেদের পদ্ধতিতে শিক্ষিত মুসালমরা দেখেছে যে তারা শাসন বিভাগের সব ক্ষমতা ও সব রকম মাহিনা-মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এগুলো পূর্বে তাদেরই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। তারা এটাও দেখেছে যে, জীবন-ধারণের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা হিন্দুদের হাতে ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে।"[৮০]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসালমগণ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ব্যাপারে আপোস করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেরূপ আপোসমূলক মনোভাব ও আচরণ দেখা গেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। মুসলিমগণ মতাদর্শও পরিবর্তন করতে পারে নি, যা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ সংস্কৃতি আর খ্রিস্ট ধর্মের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এসেছে। সৈয়দ আহ্মদ খান যদিও ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে ছিলেন, বলেছেনঃ

> "পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে লোকজন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হবে, এ মর্মে খিস্টান মিশনারিদের ঘোষণার পর স্বভাবতই মুসলিমরা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য হারাবার আশঙ্কা করে। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিমরা অধিক মনক্ষুণ্ন হয়।"[৮১]

তদুপরি এডমন্ড নামের একজন খ্রিস্টান পাদ্রি ১৮৫৫ সালেই কলকাতা থেকে এ মর্মে প্রচারপত্র বিরি করেন যে, সারা ভারতে যেহেতু এক রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে সর্বত্র সমভাবে খবরাখবর পৌঁছে যাচ্ছে, এখন ধর্মও এক হয়ে যাওয়া উচিত। সকলেই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এক ধর্মাবলম্বী হয়ে যাওয়া দরকার।[৮২] এটা ঠিক যে, এ সময় মুসলিমের চেয়ে হিন্দুরাই অধিক সংখ্যায় খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তবুও এটা "মুসলিমদেরকে চিন্তামুক্ত করতে পারে নি।"[৮৩]

রাজনৈতিক ক্ষমতা লুণ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয় শিক্ষাক্ষেত্রে। মুসলিমদেরকে ধর্ম বিমুখ করার লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানভিত্তিক নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন করা হয়। মিশনারি স্কুল স্থাপন করে খ্রিস্ট ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার করায়[৮৪] ইসলামী শিক্ষা ও চেতনার

---

৭৯. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫:৪৩]
৮০. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার [১৯৭৪:১৪৫]
৮১. সৈয়দ আহমদ খান [১৯৭৯:২৫]
৮২. পূর্বোক্ত
৮৩. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫:৪৪]
৮৪. উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা এসব স্কুলে এসে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং খ্রিস্টান ধর্ম

২৩—

www.bjilibrary.com

মূলোৎপাটনের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা গোপন থাকে নি। তদুপরি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষাকে সুপরিকল্পিতভাবে অকেজো করে দিয়ে মুসলিমদেরকে প্রবলভাবে আঘাত করার সাক্ষ্যও পাওয়া যায় খোদ ইংরেজ গবেষকের বয়ানে:

> "আমরা এ রকম এক শিক্ষাপ্রণালী আমদানী করেছি যার দ্বারা তাদের সমগ্র সম্প্রদায় বেকার হয়ে গেছে এবং তারা অপমান ও দারিদ্রের মুখে পতিত হয়েছে। আমাদের অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালীতে উচ্চশ্রেণীর লোকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা থাকলেও তাদের জীবনোপায়ের কোনও ব্যবস্থা না থাকার দরুন তার দ্বারা কত মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।"[৮৫]

শিক্ষা ও সরকারি কাজের ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই ভাষা ও জ্ঞানে দক্ষদের সমাজ ও প্রশাসনের শীর্ষে বসানো হয় শতবর্ষ ধরে প্রতিষ্ঠিত মুসলিমদেরকে হটিয়ে। শিক্ষা ও প্রশাসনে "আরবি-ফারসির আধিপত্যের অবসান মুসলিমদের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির মৃত্যুর আঘাতরূপে প্রতীয়মান হয়।"[৮৬] অন্যদিকে ব্রিটিশ ক্ষমতা এবং তাদের ভাষা ও শিক্ষানীতি হিন্দুদের জন্য প্রভু পরিবর্তনের ন্যায় ছিল। ফলে তারা এ পরিবর্তন 'অতি সহজে এবং সুখানুভূতিতে'[৮৭] গ্রহণ করে এবং সর্বাবস্থায় ব্রিটিশ-প্রভুর আনুগত্য অব্যাহত রাখে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পেছনে ঠেলে দেওয়ার ফলে অবহেলিত-ক্ষতিগ্রস্ত-দুর্দশাগ্রস্তে মুসলিমগণ চাকুরি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চরমভাবে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্য ও বেকার জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে থাকে এবং তাদেরকে রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতির সকল প্রকার সুযোগ, সুবিধা ও সাহায্য থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যারা শাসক ছিল, তাদেরকে কেবল শাসিতই নয়, অবহেলিত, নিঃস্ব এবং নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা হয় ক্ষমতা দখলকারী ইংরেজ এবং তাদের তাবেদার শ্রেণীর সর্বান্তকরণ ষড়যন্ত্র, প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের মাধ্যমে। পরিস্থিতি কতটুকু শোচনীয় এবং ভয়াবহ আকার ধারন করে, সে বিবরণ পাওয়া যায় সমসাময়িক একটি ফারসি পত্রিকার ভাষ্যে:

> " ছোট-বড় সব রকম চাকুরি ক্রমে ক্রমে মুসলিমদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতিকে বিশেষ করে হিন্দুদেরকে দেয়া হচ্ছে। সব জাতির প্রজাকে সরকার

সম্পর্কে উত্তর দিতে পারলে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করেন। তদুপরি স্কুল পরিদর্শনের জন্য যারা চাকরিপ্রাপ্ত হয়, তারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের খ্রিস্ট ধর্মানুসারী করতে এমন উৎসাহ ও তৎপরতা চালায় যে, লোকজন তাদের নাম দেয় 'কালো পাদ্রী'। বিস্তারিত, সৈয়দ আহমদ খান [১৯৭৯:২১-২২]।

৮৫. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার [১৯৭৪:১৪২]

৮৬. মুহাম্মদ আজিজুল হক [১৯৬৯:১১]

৮৭. Sufia Ahmed [1974:7-8]

www.bjilibrary.com

সমান নজরে দেখতে বাধ্য কিন্তু যামানা আজকাল এমন হয়েছে যে, সরকারি চাকুরি থেকে বাদ দেবার জন্য গেজেটে মুসলিমদের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়। কিছুদিন আগে সুন্দরবন অঞ্চলের কমিশনারের অফিসে কয়েকটি চাকুরি খালি বলে কমিশনার সরকারি গেজেটে সে সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, চাকুরিগুলো কেবল হিন্দুদের দেওয়া হবে। মুসলমানরা আজকাল এতদূর নিচে নেমে গেছে যে, তারা সরকারি চাকুরির জন্য উপযুক্ত হলেও সরকারি ইশতেহারে তাদেরকে বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়।"[৮৮]

বিশ্লেষকদের মতে: "মুসলিমদের এমনভাবে চাকুরি ও অন্যান্য সুবিধা থেকে সরিয়ে রাখা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাদের কপালে কুলী, পিয়ন ও চাপরাশীর চাকুরি ছাড়া অন্য কোনও পদ থাকে না।"[৮৯]

রাজনৈতিক অধিকার হননের পর মুসলিমদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ী করে পরবর্তী দশ-পনের বছর ব্রিটিশ ও তাদের সহযোগীরা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর ধ্বংসলীলা চালায়। জীবন বাঁচাবার জন্য হাজার হাজার মুসলিমকে দেশত্যাগ করতে হয়। হাজার হাজার মুসলিমকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অনেককে বিনাবিচারে গুলী করে মারা হয়, সন্দেহের বশে চরমভাবে লাঞ্ছনা আর নাজেহাল করা হয় এবং আরও শত শত মুসলিমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ব্রিটিশপন্থী বলে পরিচিত সৈয়দ আহমদ খান পর্যন্ত বলেন:

"১৮৫৭-৫৮ সালের পর এমন কোনও অত্যাচার সংঘটিত হয় নি যার দোষ মুসলিমদের ঘাড়ে চাপানো হয় নি, যদিও সত্যিকারের অপরাধী ছিল হিন্দু রামদিন বা মাতাদিন।"[৯০]

ইংরেজ কর্তৃক দিল্লি অধিকারের পর পাইকারি হারে হত্যা, গৃহদাহ ও লুঠতরাজের ফলে দিল্লির পুরাতন মোগল ঐতিহ্য ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। ইংরেজদের বিবাদ ছিল বিদ্রোহী-বিপ্লবীদের সঙ্গে, কিন্তু ইংরেজরা বিপ্লবী-বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী তথা মুসলিম জনতার সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় প্রতিটি সদস্যের ওপর পাগলা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাছাড়া ইংরেজদের প্রতি শিখ সৈন্যদের সমর্থন বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ ও প্রদর্শনের জন্য পাঞ্জাবি-শিখ অফিসাররা দলবল নিয়ে এমনই উন্মাদনা আর বর্বরতা প্রদর্শন করে, যা ক্ষেত্র বিশেষে ইংরেজ নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বাছ-

৮৮. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার [১৯৭৪:১৬৯]
৮৯. Qureishi, I.H [1967:131]
৯০. সৈয়দ আহমদ খান [১৯৭৯:৬০]

www.bjilibrary.com

বিচারবিহীন যে জঘন্য অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা চালানো হয় তা অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়। দিল্লি অধিকারের বেশ কিছুদিন পর অবধি মুসলিম পরিচয়যুক্ত বেসামরিক লোকদেরকেও পর্যন্ত দেখা মাত্রই গুলী করা হতো। বেঁচে গেলে সামরিক আইনের আওতায় প্রহসনমূলক বিচার-নাটক করে নির্মম শাস্তি দেওয়া হতো, যার বেশির ভাগই মৃত্যুদণ্ড আর কমপক্ষে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ইংরেজের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় কোনও নিরীহ, অভিজাত বা ভালো মুসলিমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেই তা সহজে বিশ্বাস করা হতো এবং সাক্ষ্যদানকারীকে পুরস্কৃত করা হতো। এভাবে একদল দালাল-তাবেদার, যাদের ধর্মীয় পরিচয় বলার অপেক্ষা রাখে না, মুসলিমদের আক্রান্ত করার আর ইংরেজ অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিল যে, দিল্লির সমস্ত যশস্বী ব্যক্তি যাদের নাম স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর আসার-উল-সানাদিদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হয়ত মৃত অথবা বাঁচার তাগিদে পলাতক। দিল্লির লাল কিল্লা ও জুম্মা মসজিদের মধ্যবর্তী মোগল অভিজাত শ্রেণীর আবাসিক বিরাট এলাকা ধূলিস্মাৎ করে ফেলা হয়। সম্রাট শাজাহানের নির্মিত বিরাট জুম্মা মসজিদ সেনাবাহিনী দখল করে এবং ইঙ্গ-ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ তুমুল বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় যে, একে ধ্বংস করা ভালো হবে না গির্জায় রূপান্তরিত করা হলে উত্তম হবে![৯১]

ধর্ম, সংস্কৃতি, ইজ্জত, আব্রু হারানোর মতোই দীর্ঘস্থায়ী বেদনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় দীর্ঘমেয়াদী পরাধীনতা, যা মুসলিম জনগোষ্ঠী কখনওই মেনে নিতে পারে নি এবং সময়-সময়ই স্বাধীনতার দাবীতে তৎপর হয়েছে।

স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের প্রতি বিজয়ী ইংরেজ সরকার ও সহযোগী শ্রেণীর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ ছিল অপোষহীন এবং অত্যন্ত উগ্র। বিপ্লবোত্তরকালে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি ইংরেজ অত্যাচার ও উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ছিলো বর্ণনাতীত, 'যা ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশদের একটি সত্যিকারের কলঙ্কময় অধ্যায়।'[৯২]

উপসংহার : ১৫০ বছরের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি

১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রাম আপাত-ব্যর্থ বলে মনে হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন এবং ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে জনগণের মুক্তির সংগ্রামী ঐতিহ্য ও চেতনার জন্য এহেন বিপ্লবাত্মক-স্বাধীনতাকামী ঘটনা-প্রবাহের অবদান ও প্রতিক্রিয়া অপরিসীম। এর বাস্তব প্রমাণ হলো, ১৮৫৭-এর মাত্র ৯০ বছরের মাথায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে উৎখাত করে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে উপমহাদেশ স্বাধীনতা অর্জন

---

৯১. S.M. Ikram [১৯৬৫:৩২]।
৯২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫:৬০]।

www.bjilibrary.com

করতে সক্ষম হয়। মুসলিমগণ সুদীর্ঘ বছর পর আবার ফিরে পায় স্বাধীনতার স্বাদ এবং উপমহাদেশের আপামর জনতা লাভ করে মুক্তির আনন্দ। কিন্তু আজকে প্রশ্ন হলো উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষই কি প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে----কাশ্মীরী, পাঠান, শিখ, হরিজন, সংখ্যালঘু ভারতীয় মুসলিম/খ্রিস্টান/বৌদ্ধ কি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা না অবরুদ্ধ জীবন কাটাচ্ছে? স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের মহাসংগ্রামের ১৫০ পরেও কি সেই সংগ্রামের অগ্রসেনানী মুসলিমগণ উপমহাদেশের দেশগুলোতে আবার স্বাধীন-স্বকীয়তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছেন? ১৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে আত্মসমালোচনার দর্পণে নিজেদেরকে দেখে দেখে তারা কি আত্মপরিচয়ের হারানো উপলব্ধি খুঁজে পেয়েছেন? চিনতে পেরেছেন কি নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে, যা ১৫০ বছর আগে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক অপশক্তি স্থানীয় দালাল ও তাবেদারদের সহযোগিতায় ধ্বংস করেছিল? বর্তমানেও চলমান একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার নামে বিশ্বের দেশে দেশে, এমন কি আমাদের আশেপাশে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ-ইহুদি-জায়নবাদ-ব্রাহ্মণ্যবাদের মিলিত আক্রমণের নব-নব রূপ, কৌশল ও চরিত্র ইসলামী মতাদর্শ আর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত ও ধ্বংসের পাশবিক উৎসবে মেতে উঠেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা আমাদের আত্মউপলব্ধি ও উজ্জীবনের ধারাকে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্যের মঞ্জিলে পৌছে দেওয়ার সঙ্কল্পে সঠিক পথ ও পন্থা অনুসরণ করতে পারি নি এবং পারছি না।

এই না-পারার ব্যর্থচক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাতে পারে ১৮৫৭-এর ঐতিহাসিক সফলতা-ব্যর্থতার শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা থেকে প্রাপ্ত সত্যনিষ্ঠ-নির্মোহ উপলব্ধি। ■

গ্রন্থপঞ্জী

এস.এন সেন [১৯৫৭], "দ্যা রিভল্ট অব ১৮৫৭", কলকাতা : স্টেটসম্যান।

আখতার-উল-আলম [২০০৯], "বাহাদুর শাহ জাফর এবং ঐতিহাসিক সিপাহী-বিপ্লব", ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত মহাবিদ্রোহ ১৯৮৭, ঢাকা : বদ্বীপ প্রকাশন।

আনিসুজ্জামান [১৯৬৯], মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ [১৯৭৪], সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ঢাকা : নওরোজ।

আব্বাস আলী খান [], বাংলার মুসলিমদের ইতিহাস, ঢাকা :

এমরান জাহান [২০০৯], "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও পরাধীন মুসলমান ১৭৫৭-১৮৫৭ : অতঃপর স্বাধীনতার
সংগ্রাম", ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত মহাবিদ্রোহ ১৯৮৭, ঢাকা : বদ্বীপ প্রকাশন।

আরিফুল হক [২০০৯], "আমাদের স্বাধীনতার বাঁকে ১৮৫৭", ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত মহাবিদ্রোহ
১৯৮৭, ঢাকা :বদ্বীপ প্রকাশন।

কামালউদ্দিন হোসেন [১৯৯৮], রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

বিমলেন্দু বড়ুয়া [২০০৫], রঙ্গুম রঙ্গিলার দেশে, চট্টগ্রাম: লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া।

www.bjilibrary.com

মোহাম্মদ আবদুল গফুর [২০০৯], "সিপাহী বিপ্লব-স্বাধীনতা সংগ্রামের টার্নিং পয়েন্ট", ফাহমিদ-উর-রহমান
সম্পাদিত মহাবিদ্রোহ ১৯৮৭, ঢাকা : বদ্বীপ প্রকাশন।
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৮], বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা : কথামেলা প্রকাশন।
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান [২০০৬], আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড।
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার [১৯৭৪], দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, [আবদুল মওদুদ অনুদিত], ঢাকা : নওরোজ।
মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক [১৯৯৫], ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
মুহাম্মদ আজিজুল হক [১৯৬৯], বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, ঢাকা : এশিয়ান পাবলিশার্স।
মাহতাব সিং, তাওয়ারিখে হাজারা
মুহাম্মদ সিদ্দিক [২০০৯], "সিপাহী বিপ্লব, বেগম হজরত মহল ও নেটিভদের বিশ্বাসঘাতকতা", ফাহমিদ-উর-রহমান সম্পাদিত মহাবিদ্রোহ ১৯৮৭, ঢাকা : বদ্বীপ প্রকাশন।
নবহরি কবিরাজ [১৯৫৭], স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।
সুপ্রকাশ রায় [১৯৮৩], ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, কলিকাতা : পত্রপুট।
হাসান জামান [--], শতাব্দী পরিক্রমা, ঢাকা :-----।
সৈয়দ আহমদ খান [১৯৭৯], ভারতের বিদ্রোহের কারণ, ঢাকা : নওরোজ।
হেমচন্দ্র কানুনগো [১৯৮৪], বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলিকাতা : চিরায়ত প্রকাশন।
ফাহমিদ-উর-রহমান [২০০৯], [সম্পাদিত], মহাবিদ্রোহ ১৯৮৭, ঢাকা : বদ্বীপ প্রকাশন।
শিবনাথ শাস্ত্রী [২০০৬], রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।
রতন লাল চক্রবর্তী [১৯৯৬], সিপাহি যুদ্ধ ও বাংলাদেশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
রজনীকান্ত গুপ্ত [১৮৯৩], সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, কলিকাতা : প্রকাশকের নাম নেই।
S.M. Ikram [1965], Modern Muslim India and the Birth of Pakistasn, Lahore: Pakistan Press and Publication.
Abdul Bari [1960], The Reform Movement in Bengal and History of the Freedom Movement, Dhaka: APB Library.
J.W. Sherer [1898], Daily Life During the Indian Mutiny: Personal Experience of 1857, London..
Santimoy Roy [1979], Freedom Movement and Indian Muslims, New Delhi.
Muinud-Din-Ahmad Khan [1965], A History of the Faraidi Movement in Bengal [1881-1909], Karachi.
Narahari Kaviraj [1982], Wahabi and Farazi Rebels of Bengal, New Delhi:
Riswikhash Saha [2000], Modern Nepal, Kathmandu: Kantipur Press.
J.W. Sherer [1898], Daily Life During the Indian Mutiny : Personal Experience of 1857, London.
G. N. Dodd, The History of the Indian Revolt.
Montogomery Martin, The Indian Empire.

www.bjilibrary.com

P. Hardy [2002], The Muslims of British India, Cambridge : The Cambridge University Press.
Thomas R. Mtcalf [1965], The Aftermath of Revolt : India 1857-1870, Princeton: Princeton Press Ltd.
William Muir [1902], Records of the Intelligence Department of the North-West Provinces during the Mutiny of 1857, vol. 1, Edinburgh : Edinburgh Press Ltd.
Mahmud Hussain, The Success of Sayyid Ahmed Shahid: History of the Freedom Movement.
Sufia Ahmed [1974], Muslim Community in Bengla [18884-1912], Dhaka: Bangla Academy.
Qureishi, I.H [1967], A Short History of Pakistan, Karachi : Pakistan Publications.

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ- কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ৩১শে অকটোবর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সেমিনার-প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

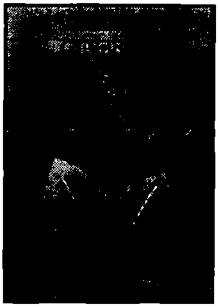

ভারত-উৎসারিত বাংলাদেশবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাস

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক, **জনাব আবুল আসাদ বলেন,** বহুমুখী ষড়যন্ত্রের কবলে এখন বাংলাদেশ। বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস, মিডিয়া সন্ত্রাস, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস, মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা সন্ত্রাস– এধরনের বহুবিধ সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা সকল সময়ই অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে বাংলাদেশেরই একশ্রেণীর আত্মবিক্রিত বুদ্ধিজীবী। বিষয়টি ছোট করে দেখলে চলবে না। কারণ ভারতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো বাংলাদেশকে সকল দিক দিয়ে দুর্বল এবং চাপের মধ্যে রাখা। বাংলাদেশকে তারা তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এটা যেন না পারে সেজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

গত ১৫ই জানুয়ারী, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ভারত উৎসারিত বাংলাদেশবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাস" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব আজিজুল হক বান্না।

পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. নজরুল ইসলাম খান, জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, জনাব আশরাফ আল দীন, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস। তারা বাংলাদেশে ইসলামের উত্থান ও অগ্রগতিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। এদেশের ইসলামী আন্দোলনকেও তারা সইতে পারে না। এসব কারণে তাদের সকল সময় বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র। তবে তারা যত ষড়যন্ত্রই চালাক না কেন বাংলাদেশ যদি ইসলামী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে ভারত কোনো ষড়যন্ত্রেই সফল হবে না ইনশাআল্লাহ।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, ভারত যা করছে, সেটা তাদের মজ্জাগত স্বভাবের বহি:প্রকাশ। তবে মনে রাখতে হবে যে, আমরা কি করছি? মুসলিম উম্মাহ কখনই চাপ ও ভয়-ভীতির উর্ধে ছিল না। সকল সময়ই তাদের ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আমাদেরও এখন ঈমানের পরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষায় আমাদের মজবুত ঈমান দ্বারাই সফলতা লাভ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতের পেটের মধ্যে বাংলাদেশ। তাই বলে পড়শী দেশ হিসাবে ভারত বাংলাদেশের সাথে কখনো বৈরী আচরণ করতে পারে না। কিন্তু তারা বাংলাদেশের প্রতি হিংসাত্মক ও আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে। ভারতের এই আগ্রাসী থাবা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে হবে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, ভারতীয় সন্ত্রাসের মুকাবিলায় আমাদের করণীয় কি, সেটা জাতির সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই ছিল। বর্তমান ইসলামের শত্রুরা এটাকে আরও বেশি জোরদার করে তুলেছে। কিন্তু এতে আমাদের ভয় পেলে চলবে না।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, ভারত বাংলাদেশের কখনো বন্ধু ছিল না, আজও নেই। বরং বাংলাদেশকে গ্রাস করার জন্য তারা যাবতীয় অপকৌশল প্রয়োগ করে যাচ্ছে। মিডিয়া সন্ত্রাসও তার ভেতর একটি। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, ভারত পরাশক্তি হবার জন্য প্রতিবেশী দেশসমূহের ওপর ক্রমাগত সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এদেশ মুসলিম দেশ হবার কারণে তাদের আক্রোশটা আরও বেশি। তারা বাংলাদেশকে গ্রাস করার জন্য সকল প্রকার কৌশল গ্রহণ করেছে। তার বিপরীতে আমাদের কর্মকৌশল এখনো গ্রহণ করতে পারিনি, এটাই আমাদের বড় দুর্বলতা।

জনাব আশরাফ আল দীন বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কটা কেমন, সেটা এদেশের অধিকাংশ জনগণই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি আমাদের কৌশলী এবং বাস্তবমুখী পদেক্ষপও গ্রহণ করতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, গোটা মুসলিম বিশ্বে ভারতীয় আগ্রাসন অব্যাহত আছে। তাদের নজরদারির মধ্যে রয়েছে মুসলিম বিশ্ব। তাদের আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এর পেছনে কাজ করছে। প্রকৃত অর্থে ভারতের পেট থেকে বাংলাদেশের বের হয়ে আসা বেশ সুকঠিন। তবুও আমাদের হতাশ হলে চলবে না। চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের প্রকৃতি ও প্রবণতা যা দেখা যায় তা হচ্ছে প্রতিবেশী কারোর সাথেই তাদের সুসম্পর্ক নেই। সকল প্রতিবেশীর সাথেই তাদের কোন না কোন গোলমাল ও সংকট লেগেই আছে। ভারত সব সময় সমস্যা জিইয়ে রাখতে চায়। সমাধানে তাদের আগ্রহ নেই। আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারেও তাদের বাধা রয়েছে। তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বিষয়টি বাংলাদেশ অন্যান্য মুসলিম দেশের নজরে এনে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতো, কিন্তু কখনো তা করেনি। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে যারা আমরা গর্ব করি তাদের মধ্যে যেমন ঐক্য নেই তেমনি দূরদর্শী কোন পরিকল্পনাও নেই।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির বলেন, নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ভারত, 'কর্পোরেট নীতিমালা' দ্বারা পরিচালিত একটি দেশ। নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলেও ভারত সকারের কর্পোরেট নীতিমালার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' জাতীয় আদর্শের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসনকার্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্যাক্টর হচ্ছে হিন্দু দর্শন ভিত্তিক জাতীয়তা। যা কার্যত মূর্তিপূজা ভিত্তিক জীবনদর্শনের প্রতিফলন মাত্র। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কর্মরত ভারতের সামরিক-বেসামরিক টেকনোক্রেট, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক আইকন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন নাগরিক পেশায় নিয়োজিত থেকে ভারতের 'কর্পোটের গভর্নসকে' শক্তিশালী করে যাচ্ছে। ভেতরে বাইরে ভারতের নাগরিক ও সরকারের এই অভিন্ন ঐক্যতান ভারতকে এ অঞ্চলে কার্যত বহু আগেই আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার-এ পরিণত করেছে। ফলে একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকা ও তার একমাত্র একান্ত সুহৃদ ইসরাইলের সাথে সামরিক-বেসামরিক উচ্চ পর্যায়ের লেনদেন ভারতকে বৈশ্বিক সুপার পাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে ভারত তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি গণ্য করেই চলেছে। ১৯৭১-এর পর ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান তার নিজস্ব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে দু'টুকরো হয়েছে। ভারত এতে নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখলেও ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভারতকে আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত ভারত

www.bjilibrary.com

সরাসরি পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলকে সরকার গঠন করতে আহ্বান না জানিয়ে বরং ২৫ মার্চের রাতে বাংলাদেশের মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের মানুষদেরকে ভারতের আশ্রয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যা ভারতের জন্য তর নিজস্ব নিরাপত্তার হুমকি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে টুকরো করার কাজে ভূমিকা রাখার এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দেয়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন ও মানবাধিকার আইন ভারতকে বাংলাদেশের শরণার্থীদেরকে সহমর্মিতা দেখাতে বাধ্য করে। এই আইনগত বাধ্যবাধকতার সহমর্মিতাই এখন বাংলাদেশের সাথে ভারতের সকল পর্যায়ের সম্পর্কের নিয়ামক।

এমন পরিস্থিতে বাংলাদেশের করণীয় কী? দেশের ইসলামী শক্তিসমূহের করণীয় কী? প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অবস্থানের বিপরীত ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের কী কোন বিকল্প আছে?

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, অধুনা প্রোপাগাণ্ডা গবেষণার নামে ইসলাম, মুসলিম এবং সংগ্রামরত-সম্ভাবনাময় জাতিসত্তা ও আদর্শের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আক্রমণের দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক জ্বলন্ত উদাহরণ ভারত। এহেন আক্রমণের ধারাবাহিকতা ইরাক, কাশ্মীর এবং আফগানিস্তানসহ সমকালীন বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের কিছু স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যুতে এমন একতরফা অপপ্রচারের কুটিল জাল অতীতের চেয়ে বর্তমানে, বিশেষ করে, নির্বাচন ও অন্যান্য ঘটনাকে সামনে রেখে অবিরামভাবে পরিচালিত হয়েছে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। জাতির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে চাপা দিয়ে এহেন স্পর্শকাতরতাকে উস্কে দিয়ে প্রকারান্তরে আমাদেরকে বিভ্রান্তি ও ভুল পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা আশাবাদী এজন্য যে, একটি মিথ্যাকে বার বার সত্য বলে প্রচার করা হলেও শেষ পর্যন্ত মিথ্যার স্বরূপ সময়ের প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত ও প্রকাশিত হবেই।

সীমানা, পানি বন্টন, নদীতে বাঁধ প্রদান, পুশ ইন, সীমান্তবর্তী মানুষ-ফসল-পশু-পাখি নিধন, জাতিসত্তা বিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন-আধিপত্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের

www.bjilibrary.com

বহুমাত্রিক বিরোধিতা এবং আক্রমণের সঙ্গে ভারত সর্বসাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাসের চূড়ান্ত আঘাত হেনে চলেছে। আজ আর কারো এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ভারত ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ এশিয়ার ইসরাইল হয়ে ওঠার প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। আমরা যদি এখনই সতর্ক, সচেতন, ঐক্যবদ্ধ এবং একটিভ না হই, তাহলে হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয় যে, ইসরাইল লেবানন ও প্যালেস্টাইনে যেরূপ সর্বাত্মক আঘাত হানছে, ভারতও দক্ষিণ এশিয়ায় সেটা প্রকাশ্যে ও সশস্ত্রভাবে শুরু করবে। [কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেটা শুরু হয়ে গেছে।] বর্তমান প্রবন্ধের তথ্যসমূহের মাধ্যমে ভারতের আগ্রাসনের স্ত রগুলো অনুধাবন করা সম্ভব এবং ভারত যে কূটনৈতিক, মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে আক্রান্ত করে তার সম্প্রসারণবাদী-আধিপত্যবাদী-আগ্রাসী লক্ষ্যাভিসারী পথে অগ্রসর হয়ে এ অঞ্চলে ইসরাইলের সন্ত্রাসী-রক্ত-লোলুপ ধারাকে হাসিল করতে চাচ্ছে তা-ও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ধারায় আন্তর্জাতিক মোড়ল আমেরিকা ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল সার্বক্ষণিকভাবে মদদগার হিসাবে এবং বাংলাদেশকে আক্রান্ত করার কুকাজে ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রয়েছে। এহেন সঙ্কুল ও জাতিহানিকর পরিস্থিতিতে বর্তমান ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সংক্রান্ত আগ্রাসনকে ঐতিহাসিক সত্যতায় উছে এসেছে। বাংলাদেশের দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্ক, যাবতীয় চুক্তি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতাসহ সকল ক্ষেত্রেই ভারতের আগ্রাসী-আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী ধারার মতই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সংক্রান্ত আগ্রাসনও একটি বাস্তব সত্য। এবং সকল ধরনের আগ্রাসী-আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রম ভারত গ্রহণ করছে বাংলাদেশ বিরোধী একটি নীল নক্সার অংশ হিসাবে, যেখানে বাংলাদেশকে লেবানন বা প্যালেস্টাইনের মত বিপন্ন-রক্তাক্ত-অসংহত-অস্থির এবং সর্বোপরি ব্যর্থ করে দেওয়ার ব্রাহ্মণ্যবাদী-বর্ণবাদী শাঠ্য-ষড়যন্ত্র নিহিত রয়েছে। ভারতের নৃশংসতার চিত্র দেখে মানুষ মাত্রই আতঙ্কিত হবেন এবং যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম, স্বাধীনতার চেতনা, বিবেক ও আত্ম-মর্যাদাবোধ অবশিষ্ট রয়েছে, তাঁরা শিরদাঁড়া উঁচিয়ে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য ভারত ও তাঁর বর্হিস্থ ও অন্তস্থ তাবেদার সাঙ্গ-পাঙ্গ-মিত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, অস্তিত্ব ও গণতন্ত্র বাঁচানোর এটাই শেষ পথ।

www.bjilibrary.com

ড. নজরুল ইসলাম খান বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সারা বিশ্বের একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি। আর আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি ভারত বর্তমানে এই পরাশক্তির সাথে আণবিক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ। তাই এই দুই শক্তি বাংলাদেশকে একটি সেক্যুলার একদলীয় শাসন দেখতে আগ্রহী ছিল- যা ইতোমধ্যে শত ভাগ সফল হয়েছে। আমি মনে করি এই সাফল্যের পেছনে ভারত উৎসারিত বাংলাদেশ বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক মিডিয়া সন্ত্রাস বড় ভূমিকা রেখেছে। একুশ শতকে ভারতেক আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার থেকে বৈশ্বিক সুপার পাওয়ারে উন্নীত করার জাতীয় চেতনার সাথে রাজনীতিক সামরিক-অসামরিক আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক থিংক ট্যাংককে একাট্টা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী সশরীরে বিদ্যমান না থাকলেও ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অঘোষিত একাধিকা বাহিনী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ৭৫-পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। আমি মনে করি শুধু সেনাবাহিনী নয় এখন গোটা দেশ ও সরকার তাদের তাবেদারী করছে। পরিবর্তিত বিশ্বে জঙ্গিবাদীয় ও জঙ্গী তৈরির কারখানা যাদের হাতে, জঙ্গিবাদ দমনের অস্ত্রও তাদের হাতে।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাস এখন চরম পর্যায় ধারণ করেছে। মিডিয়া বলতে শুধু পত্রপত্রিকা ও সংবাদ চ্যানেল নয়, এর বাইরেও বহু মিডিয়া রয়েছে। বিশেষত বিনোদনের নামে তাদের চ্যানেলগুলো যে নীরব সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কেও আমাদের অবগত থাকা জরুরি।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাসের কর্মকৌশল বিচিত্র এবং বহুমাত্রিক। তারা বই, পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের মাধ্যমেও অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির সয়লাভ বইয়ে দিচ্ছে। এটাও আমাদের বিরুদ্ধে তাদের এক ধরনের মিডিয়া সন্ত্রাস। এখন প্রয়োজন আমাদের শক্তিশালী মিডিয়া সেন্টার চালু করা। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সেটা করতে হবে। ■

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্ক : অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** 'অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন আইন তৈরি হয়েছে। ভারত তাতে স্বাক্ষরও করেছেন, কিন্তু তারা কোনো আইনেরই তোয়াক্কা করে না। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ভারত এবং সকল কিছুই করতে প্রস্তুত। তারই প্রমাণ তারা রেখে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রতি। কিন্তু ভারতের এই নীতিহীনতার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারছিনি। এমনকি তেমন কোনো উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জনমত তৈরি করতে হবে।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত এব সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন। উক্ত সেমিনারে 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক : অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মাহফুজ পারভেজ, জনাব আশরাফ আল দীন, ড. নজরুল ইসলাম খান, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ

www.bjilibrary.com

এহসানুল হক, জনাব শফিউল ইসলাম ভূঁইয়া, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, বাংলাদেশের অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে বাংলাদেশ ভারতের কাছে ঋণী। তাদের সেই ঋণ শোধ করার জন্য ভারতের চাপিয়ে দেয়া অন্যায় আচরণেরও কোনো বাদ-প্রতিবাদ তারা করেন না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছিল বিনা স্বার্থে নয়, বরং তারা এদেশকে তাদের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই এগিয়ে এসেছিল। এই সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, নতুন প্রজন্ম ভারতের আসল চেহারা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরাও তাদেরকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছি। যদি নতুন ও তরুণ প্রজন্মকে ভারত সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করে তোলা যায় তাহলে এর সুফল আমরা পেতে পারি। ভারত বাংলাদেশের যে বন্ধু নয়, বরং শত্রু– এই ম্যাসেজটি সর্বত্র পৌঁছানো প্রয়োজন। তরুণ প্রজন্মকে যদি এটা বুঝানো যায় তাহলে ভারতের বৈরী আচররেণ বিরুদ্ধে তারা জেগে উঠবে। নতুন প্রজন্মকে জাগিয়ে তোলাই এখন সময়ের দাবি।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, অভিন্ন পানি বণ্টন সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে জনগণকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, শক্তিহীনের শক্তিমানের সাথে শান্তি ও সন্ধি কামনা করা বাতুলতা মাত্র। সন্ধি ও শান্তির চুক্তি হয় সমানে সমানে। ইসলামের ইতিহাসেও এর প্রমাণ হলো, রাসূল [সা] তাঁর স্বজাতি মক্কাবাসীরা জন্মভূমি থেকে বরে করে দেয়। আবার তারাই হুদায়বিয়াতে উপস্থিত হয়ে রাসূলের [সা] সাথে সন্ধি

www.bjilibrary.com

করে যখন তিনি শক্তিমান হয়ে ফিরে দাঁড়ান। আমরা ভারতের সাথে চুক্তি ও শান্তি চাইলে শক্তি অর্জন ছাড়া সম্ভব হবে না। সে শক্তি অস্ত্র-শস্ত্রও হতে পারে, জনমত গঠনও হতে পারে। শক্তির জোরেই মুসলিমরা অতীতে ভারত শাসন করেছে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, ইংরেজি প্রবাদে স্বীকৃত আছ যে, Might is right যার হাতে ক্ষমতার যন্ত্র, তার স্বার্থ রক্ষাই হল গণতন্ত্র। তালগাছ ক্ষমতাধরের হলে সে বিচার মানবে, অন্যথায় নয়।

নীতিকথা শক্তিধরের যদি মুখে বলে বা স্বীকৃতি দেয় এটাই বাহবা দেয়ার মত। দুর্বলদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নেবে কোন শক্তিধর স্বার্থ ছাড়া এটা অকল্পনীয় বরং ইউটোপিয়ান আইডিয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা মদদ দিয়েছিল তারা এদেশবাসীর প্রতি দরদী যতটা ছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল তাদের মনে ইসলাম বৈরিতা। তাই পাকিস্তান ভাঙার পর বাংলাদেশে আবার ইসলামের জয়ডংকার বাজুক এটা তাদের আদৌ কাম্য ছিল না। ভারতসহ অন্যান্য বহিঃশক্তি বাংলাদেশে একমাত্র ইসলামী শক্তিকেই বিরুদ্ধবাদী হিসেবে তাদের স্বার্থের অন্তরায় ভাবে। তাই তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য তারা সব সময় এদেশের ইসলামী চরিত্রকে নিস্তেজ ও অবদমিত করে রাখতে চায়। এই উদ্দেশ্যেই তারা নানা কৌশলে ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশবাসীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এদেশের ওপর নিজেদের আগ্রাসন কার্যকর ও চিরস্থায়ী করতে চায়। বাংলাদেশী বাঙালীরা চরম বিপদে নিপতিত হয়ে তাদের সার্বভৌমত্ব নিজ হাতে বিদেশী প্রভুদের কাছে সঁপে দিতে বাধ্য হোক এটাই তাদের বাংলাদেশ নিয়ে রাজনীতির মূল লক্ষ্য গোমতি, খেয়াই, মনু, টিপাইমুখ, সোনাই ও গঙ্গাবাঁধ প্রতিষ্ঠাসহ বাংলাদেশকে মরুকরণের ভারতীয় কুট ও ক্রুট পরিকল্পনা এদেশকে তাদের চরদের মাধ্যমে একটি অকার্যকর অনুগত রাষ্ট্রে রূপান্তরের নীল নক্সার অংশ বৈ আর কী? বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জেআরসি গঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক এই নদীসমূহের পানি প্রবাহ থেকে বাংলাদেশ যেন ন্যায্য হিস্যা অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে। কিন্তু তারা শুধু সিটিং, মিটিং, ইটিং, ও ব্রিফিং ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন

www.bjilibrary.com

সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি। পারেনি ভারতের বড়দা সুলভ আগ্রাসী আচরণের জন্যই।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজ নামক খ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং কিছু রাজনৈতিক পরগাছাদের ইসলামের বিরুদ্ধে ভাড়া খাটিয়ে এই বিদেশী আগ্রাসী প্রভুরা তাদর মাধ্যমে এদেশের ভূ-রাজনৈতিক পটেনশিয়ালিটি হস্তগত করে রাখতে চায়। লগি-বৈঠার তাণ্ডব ঘটানো, এক-এগারোর পরিবর্তন, দেশকে বিরাজনীতি করণের অপচেষ্টা, কারণে-অকারণে জাতীয় ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভিনদেশীদের নাক গলানো এসব কিছুর সাথে বাংলাদেশ ভারতের মাঝে পানি বন্টন সম্পর্কে অবনতি ঘটানোর এই দীর্ঘ তৎপরতা, দীর্ঘ সুত্রিতা মূলত একই সুতোয় গাঁথা। যারা এই বিদেশী প্রভুদের অঙ্গুলী হেলনে চলার পথে বাধা প্রভুরা সেই বিপক্ষবাদীদের ভাতে, পানিতে মারতে চায়। এমনকি সম্ভব হলে বাতাসের অক্সিজেন বন্ধ করে জব্দ করতে চায়। বাংলাদেশ যেমন ভারত বেষ্টিত হবার কারণে নাজুক অবস্থানে, দারুণ হুমকির মাঝে রয়েছে, ভারতও অনুরূপভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম অধ্যুসিত এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই এই ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশকে ডি-ইসলামাইজ্ করে নিজেদের কুক্ষিগত না করা পর্যন্ত তাদের ষড়যন্ত্র চলতে থাকবেই। বাংলাদেশের ইসলামী শক্তি পারে এই রিজিয়নের মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রাণের সঞ্চার সৃষ্টি করতে। এই ঘুমন্ত বাঘকে হুংকার দিয়ে জাগিয়ে তুলতে। এই আতংকের কারণেই তারা একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে গ্রাস করতে তৎপর, অন্যদিকে তারা এই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ভাংগন চালু রাখতে প্রাণপনে তৎপর রয়েছে। এই অপশক্তিকে মুকাবিলা করতে হবে শক্তি দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে, নিজেদের মাঝে ঈমানী মজবুত ঐশী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

ড. মোহাম্মাদ লোকমান বলেন, শুরুতেই বিআইসি কর্তৃপক্ষকে উল্লেখিত একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে এহেন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও ভূ-আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ-এর মাধ্যমে আজকের এ সেমিনারে দক্ষতার সঙ্গে তুলের

www.bjilibrary.com

ধরার জন্য প্রবন্ধকার জনাব মোহাম্মাদ নূরুল ইসলামকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সম্মানিত প্রন্ধকার ইস্যুটির বিভিন্ন অপরিহার্য দিকগুলো তুলে ধরেছেন। যেমন- ১. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক, ২. অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন সমস্যা, ৩. মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ, ৪. জাতিসংঘে ফারাক্কা ৫. '৭৭ সালের পানি সমস্যা, ৬. গঙ্গার পানি চুক্তি, ৭. যৌথ নদী কমিশন ৮. বাংলাদেশে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীসমূহ ৯. ফারাক্কার অশুভ প্রভাব, ১০. আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প ও ভারতের পদক্ষেপ, ১১. আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রকল্পের যথার্থতা, ১২. বাংলাদেশের করণীয়, ১৩. বাংলাদেশকে ঘিরে অসংখ্য মিনি ফারাক্কা [১৪] বাংলাদেশের প্রাক্তন সেচ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী এফ. কে. সিদ্দিকীর অীভজ্ঞতার আলোকে দুটো ঘটনা এবং ১৫. বাংলাদেশের বর্তমান ভারতপন্থী পানি সম্পদ মন্ত্রী রমেশচন্দ্র সেনের ও বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর মন্তব্য বনাম অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন।

মূলত বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদ-নদীসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দেশের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু ভারতের কারণে এ সমস্ত নদী যার উৎসমুখ ভারতে এগুলো আমাদের জন্য অভিশাপ। কেননা ভারতের একগুয়েমী, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি বিরুধী ও অমানবিক আচরণের কারণেই আমাদের নদীসমূহ আমাদের জন্য সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। সাবেক পাকিস্তান আমলে যেখানে আমরা "মরণফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে" দাও গুঁড়িয়ে দাও শ্লোগান দিতাম তারপরও যখন কাজ হয়নি আর বর্তমান নতজানু সরকারের আমলে এ ধরনের শ্লোগান আশা করা যায় না। তাই প্রবন্ধকারের হতাশার সঙ্গে একমত পোষন করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য প্রবন্ধকার বাংলাদেশের করণীয় বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী সরকার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ফোরামে সরকারের পক্ষ থেকে মজবুত পদক্ষেপ নেয়া ছাড়া শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক আলোচনা যথেষ্ট নয় বলে আমরা মনে করি। কেননা অতীতে ভারত সরকারের এ সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিকতার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশে ভারতে রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী এবং

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। আন্তর্জাতিক আইনে অভিন্ন নদীতে উজানে বাঁধ দেয়া বা একতরফাভাবে পানি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। একথা ভারত আদৌ মানতে রাজী নয়।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, প্রবন্ধকার নূরুল ইসলাম নদ-নদীর বর্তমান পরিস্থিতি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক সমূহ অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। ভারতের আগ্রাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা গবেষণা রয়েছে তারমধ্যে নদনদী আগ্রাসনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পানি আগ্রাসনের দ্বারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করার এবং দেশের মানচিত্রটি মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র। নদ-নদীর পানি বন্ধ করার কারণে দেশের পানি সম্পদ কে ধ্বংস করে দিয়েছে অপর দিকে সুবিধাবাদী... গোটা চর দখল করে নদীর প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। এতে করে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ মারাত্মক দূষিত হচ্ছে।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, অভিন্ন নদীগুলো পানি বণ্টন বিষয়ে আমার পরামর্শ হলো:

১. সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স এবং অতি একসপার্ট রিপোর্ট তৈরি, এক্ষেত্রে পানি মন্ত্রণালয় পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগ দেশে-বিদেশে থেকে সহযোগিতা নেয়া।

২. টাস্কফোর্সে নতুন মুখ আনা, তাদের রিপোর্ট দেশের সমস্যা জর্জরিত নদ-নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে গ্রহণযোগ্য সিনারিও তুলে ধরা এবং বাস্তাবয়নের জন্য কর্মসংস্থা তুলে ধরবে।

৩. ভারতীয় এক্সপার্টগণের অভিজ্ঞতা খুব উচ্চ মানের হওয়ায় আমাদের কতগুলো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়া।

৪. ভারতের সাথে আলোচনার জন্য গঠিত প্রতিনিধি দলকে কোয়ালিটি সম্পন্ন হতে হবে।

৫. বিদেশে দূতাবাসের মাধ্যমের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা করা এভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

৬. বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাবলী এবং পানি সম্পদ ও সমস্যা নিয়ে সুলিখিত প্রতিবেদন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তুলে ধরা।

www.bjilibrary.com

৭. মিয়ানমার, নেপালকে সম্পৃক্ত করে আঞ্চলিক কমিটি গঠন

প্রধান তিস্তা আরো ছয়টি কমন নদ-নদীর পানির সুষম বন্টন এবং গঙ্গার পানি বন্টনে বঞ্চনা, যা ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি আওতায় সুরাহা করার অঙ্গিকার ভারত এড়িয়ে এসেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা।

আন্তর্জাতিক যৌথ নদীগুলোর একটি চিত্র এবং সে আলোকে আইন কি? সে সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, দু'টো দেশের সম্পর্ক হয় বহুমুখী। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক,বাণিজ্যিক এবং অভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসের সম-অংশীদারিত্ব, এমনি ধরনের বিভিন্ন দিকেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্ক ভাল কী মন্দ তা ঘটনা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার পর যে কোন পাঠকই নির্ধারণ করতে পারবেন। অভিন্ন নদীর বিষয়টি প্রাকৃতিক উৎসের অংশীদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত। ১৯৭৪থেকে ২০০৯ দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বৎসর। ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য চালু করা ফারাক্কা বাধ ৩৫ বৎসর যাবৎ তিলে তিলে বাংলাদেশের মানুষকে পানিতে ও ভাতে মারার "পানি কলে" পরিণত হয়েছে।

কোটি কোটি রুপি খরচ করে ভারত, বাংলাদেশের চতুর্দিকে অবস্থিত অভিন্ন নদীগুলোর উপর এ ধরনের আরও অসংখ্যত বাঁধ নির্মাণ করছে। কোন বিলাসী লক্ষ্যে এই কোটি কোটি রুপি খরচ করছেনা ভারত। এই বাধ নির্মাণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে গোটা বাংলাদেশে একদিকে যেমন শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকটে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, অন্যদিকে এদেশের মানুষকে পানির অবরোধ দিয়ে জিম্মি করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বাংলাদেশের আগমী প্রজন্ম কিভাবে এই জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করা ছাড়া আর কান বিকল্প নেই। অভিন্ন নদীর ওপর একের পর এক বাধ নির্মাণের আগ্রাসী নীতি থেকে ভারতেকে বিরত রাখতে আন্ত

www.bjilibrary.com

র্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এই ইস্যু তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি সেই সাথে কৌশলগত বিকল্প বাঁধ তৈরির বিষয়টিও ভেবে দেখা যেতে পারে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, বাংলাদেশকে আক্রান্ত করার ক্ষেত্রে ভারত যে বহুমুখী আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী অপতৎপরতা ঐতিহাসিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে নদী সন্ত্রাস ও পানি সন্ত্রাস অন্যতম। ভারত থেকে বাংলাদেশে আগত ৫০টি নদীর সবগুলোতে বাঁধ এবং জলাধার স্থাপন করে ভারত বাংলাদেশকে পানি শূন্য করতে চায়। নদীগুলো শুকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার ভারতীয় আধিপত্যবাদী উদ্যোগ আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন, মানবতা ও মানবাধিকার বিরোধী। অথচ নদীগুলোর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সুষ্ঠু পানি বন্টনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ যথা চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ চুক্তি ও সমঝোতা হওয়া দরকার। এটাই আইন ও নিয়মের দাবি। কিন্তু ভারত কোন আইন ও নীতি-নৈতিকতাকে পরোয়া না করেই শক্তির বলে নদী সন্ত্রাস ও পানি লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। এতে পানির অভাব ছাড়াও মাছ, জীববৈচিত্র্য ও মানুষ ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হবে। নদী মাতৃক বাংলাদেশ মরুভূমি হয়ে যাবে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে ভারতের সঙ্গে পানি সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। জাতিকে রক্ষা করতে হলে ন্যায়সঙ্গত পানি আমাদের পেতেই হবে। সরকার ও সংশ্লিষ্টরা দেশ-জাতি-জনগণের স্বার্থে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করবেন বলে সকলেই আশা করনে। ভারতের প্রতি কোনরূপ নতজানু নীতি নিয়ে জনগণের স্বার্থকে পদদলিত করা হলে ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করবে না।

জনাব আশরাফ আল দীন বলেন, প্রবন্ধটি পড়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, প্রবন্ধকার যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং নানা প্রকার তথ্য-উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায়। তিনি পাঠকদের একটি ভালো মানের প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন সন্দেহ নেই। তবে কিছু বিষয়ে যত্নবান হলে এই প্রবন্ধকে আরো উন্নত মানের গবেষণাপত্র হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। আমার মন্তব্য ও পরামর্শগুলো হলো :

www.bjilibrary.com

১. এ প্রবন্ধের মূল বিষয় 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক'। প্রেক্ষিত রচনা করার কথা 'অভিন্ন নদীগুলো পানি বন্টন' দিয়ে। কিন্তু 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে ঘিরেই আবর্তিত হওয়া উচিত ছিল প্রবন্ধের মূল থিম। উপসংহারে ও সুপারিশ-এ সুস্পষ্ট উচ্চারণ থাকা প্রয়োজন ছিল এ সম্পর্কে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে 'অভিন্ন নদীগুলোর পাণি বন্টন'-কে কেন্দ্র করে সে সম্পর্কে বক্তব্য ও সম্পর্ক উন্নয়নের পরামর্শগুলো দেয়া উচিত প্রবন্ধের শেষে।

২. ভূমিকা ও উপসংহার নামে কিছু নেই। পরামর্শও নেই। শুরুতে দেয়া শিরোনামহীন স্থবক দু'টোর বিষয়বস্তুর 'ভূমিকা'র দায় শোধ করে না।

৩. প্রথম স্তবকে লিখিত 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন, ইন্দিরা ডকট্রিন বলে খ্যাত ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল....' কথাটি তরলভাবে বলা হয়েছে। একে রেফারেন্সসহ সুনির্দিষ্টভাবে বলা ভালো। মূলতঃ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল হলো 'নেহেরু ডকট্রিন' যা আমেরিকার 'মনরো ডকট্রিনের' আদলে সৃষ্ট, ইন্ডিয়া ডকট্রিন বা ইন্দিরা ডকট্রিন বলে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নেহেরু নিজে ন্যাম-এর উদ্যোক্তা ও রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনকারী হয়েও নিজে গ্রহণ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নীতি।

৪. কিছু বিষয়কে অতি সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। ব্যাপক বিষয় হিসেবে এ সম্পর্কে আরো কথা থাকা প্রয়োজন। যেমনঃ চাকমা সন্ত্রাস ও আর্সেনিক সমস্যা। চাকমা সন্ত্রাসীদের আস্কারা দিয়ে, লালন করে ও লেলিয়ে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার চরম বিপক্ষে কাজ করেছে, যা '৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য সহযোগিতা দানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। চাকমা সন্ত্রাসীদের তারা এখনো লালন করছে অথচ তারাই দাবী করে 'বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী ভারত শাসিত আমাদের বিপ্লবী নেতা অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে আমাদের তুলে দেয়া উচিত।' আর্সেনিক সমস্যা যে কত সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে তা আরো একটু বেশি করে না বললে

www.bjilibrary.com

আমাদের নগরবাসীদের অনেকেও বিষয়টির গভীরতা ও ভয়াবহতা বুঝতে পারবে না।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি বন্টন নিয়ে কোন আইন আছে কিনা? সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু থাকলেও বা কি হবে? দানিয়ুব ও নীল এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। নীচের ওপর মিশর অনেকটা ভারতের মত কর্তৃত্ব দেখাতে চেয়েছিল। NBI or Nile Basin Initiative যা ১৯৯৯সালে কার্যকর হয়েছে তার মাধ্যমে শুধু মিশর আর সুদান নয়, বরং ১০টি আফ্রিকান দেশ এর সুফল ভোগ করছেন। দানিয়ুব অববাহিকায় জার্মানির মত শক্তিশালী দেশ আছে। আবার সোলদাভিয়ার মত ক্ষুদ্র দেশ আছে। তবুও তারা সমতা ভিত্তিতে পানি সম্পদ ভোগ করছে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? বিষয়টি জাতিসংঘে তোলেও সমাধান হয়নি। এখন আমেরিকা ও ইন্ডিয়া স্বার্থ এক হওয়ায় বাংলাদেশ কী করবে। যেখানে সুশীল শ্রেণী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মাথা বিক্রি করে দিয়েছে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দেশের জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা তৈরা করা ভবিষ্যত তথা ১০০/২০০ বছর পর ভূ-প্রকৃতি কেমন হবে তার জন্য গবেষণা সেল গঠন করা প্রয়োজন। বিকল্প কোনা পথ খোলা আছে কিনা তাও ভাবতে হবে। বিকল্প পানি পাওয়ার ব্যবস্থা কি হতে পারে সেটাও আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের উদ্যোগ ও চুক্তি গঙ্গার পানি চুক্তি এবং তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ফারাক্কার অশুভ প্রভাব-আন্তর্জাতিক আদলে আলোচিত বাংলাদেশকে ঘিরে আরো এমন অসংখ্য মিনি ফারাক্কা বাঁধ তারা তৈরি করছে। বর্তমান ও আগন্তুকদের জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রয়োজন। আমি মনে করি ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বন্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী যে চুক্তি করেছিল তার প্রধান প্রধান দিক এখানে বাংলাদেশের জনগণের জানার স্বার্থে তুলে ধরা প্রয়োজন।■

www.bjilibrary.com

জায়নবাদ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রমের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেন,** জায়নবাদ অর্থই হলো আধুনিক একটি নির্মম ইতিহাসের কথা। বর্তমান সময়ের কথা। জাইনয়বাদ অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়। আমাদের এখন জানা প্রয়োজন যে, যায়নবাদের মাধ্যমে ইহুদীরা কিভাবে জিরো থেকে আজকের আকাশ স্পর্শ করেছে। যায়নবাদী শক্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। খ্রীস্টানরা তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে আসছে। ফলে তারা সংখ্যার চেয়ে শক্তিকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাদের টার্নিং পয়েন্ট উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি আমাদেরকেও বাস্তবমুখী কার্যকরী কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে মুসলিম বিশ্বকেও শক্তি ও প্রযুক্তিতে বলীয়ান হওয়া প্রয়োজন।

গত ১৯শে মার্চ, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে ‘যায়নবাদ : সূচনা ও ক্রমবিকাশ’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

www.bjilibrary.com

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. মাহফুজ পারভেজ, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, যায়নবাদ বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সবাই জানে যে, কেজিবিসহ অন্যান্য সংস্থা ইতোপূর্বে বহু অঘটন ঘটিয়েছে। তাদের অপতৎপরতা আজও অব্যাহত আছে। তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে মোশাদ এবং 'র'। কিন্তু সকল কিছু থেকেও অধিক ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর যায়নবাদ। দুই হাজার বছর যাবৎ ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যে বিরোধ ছিল। খ্রীস্টানরা ইহুদীদের কখনই সুনজরে দেখতো না। দুই হাজার বছর পর খ্রীস্টানরা ইহুদীদের পেটে প্রবেশ করে। এখন ইহুদী এবং খ্রীস্টান মিলেই যায়নবাদকে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিষয়টি হালকাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই বরং যায়নবাদের মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর করণীয় সম্পর্কে এখন গভীরভাবে ভাবতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, মুসলিম উম্মাহ আজ সর্বত্রই মযলুম। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? এখন প্রয়োজন মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি। শক্তি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জায়নবাদের যথাযথ জবাকব দেয়ার সময় এসেছে। তাদের একচছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমাদের কার্যকরী ও কৌশলী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, এখন কি মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দেখে মনে হয় না যে এখনকার মুসলিমরা তেমনি অভিসম্পাতগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে? ইহুদী ও

www.bjilibrary.com

জায়নবাদীরা যে যখন যে অবস্থায় থাকে তখন সেই অবস্থাকে ব্যবহার করে তারা লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টাকেই কুরআনী পরিবষাভায় বলা হয়েছে জিহাদ। আর এই জিহাদে সাড়া না দিয়ে যারা বৈষয়িক প্রাপ্তি ও দুনিয়াকে আঁকড়ে থাকে তাদের বদলে অন্য জাতিকে নেতৃত্ব প্রদান আল্লাহর অঙ্গীকার এটাই হচ্ছে দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নীতি। ইহুদীদের অন্য একটি গ্রুপ ইহুদী সত্তা বিলীন করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি পুরোপুরি গ্রহণ করে তারাও পশ্চিমাদের মাঝে অস্তিত্ব লয় করেছে। তৃতীয় গ্রুপটি ইহুদী বিশ্বাসকে সঠিক স্থানে ধারণ করে তারা সাধারণ জনতার সাথে মিশে গিয়ে ইউফেমিস্টিক বা সুগ্রাহ্য এবং ভীতি বিবর্জিত আইডেন্টিটি গ্রহণ করে সকল সমাজের মাঝে নিজেদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করে। জুডাইজম আন্দোলনের রিফরমিস্ট হিসাবে তারাই শেষে কৃতকার্য হয়েছে। এরাই জার্মান, ইটালিয়ান, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, সুইস কিংবা আমেরিকান পরিচিতি নিয়ে তাদের মাঝে সেই সমাজে জুডাইজমের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইহুদীরা আজ বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রচার মাধ্যম ও কূটনীতির চালিকা শক্তি হিসিবে নিজেদে ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়েছে। রাসূলের [সা] পরবর্তী সময়ে সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যান্ত্রিক ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে যে বিশাল উন্নতি ঘটেছে সেই প্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষী ও চিন্তবিদদের মাঝে চিন্তার স্থবিরতা আদৌ কাম্য নয়। সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সময়োপযোগী কৌশলী ভূমিকা গ্রহণের নতুন ফিকহ ও ফিলোসোফি প্রণয়ন ও তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে ইসলামকে সমাজের জন্য সহজ ও সুপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। ইসলাম সম্পর্কীয় ভীতি প্রদানকারী পরিভাষা ও পরিচিতি থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করে অধিকাংশ জনতার সাথে ও পাশে থেকে তাদের কল্যাণকর কাজে নিজেদের জড়িত করে, সব ধরনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার করে স্বাভাবিক কর্মতৎপরতার মাঝে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভাল মানুষী পরিচয় তুলে ধরই হবে মুসলিমদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মানুষের মাঝে ভুল ধারণা জিইয়ে থাকলে ইসলাম অপরিবর্তিত রয়ে যাবে। জায়োনিস্টরা এটাই চায়।

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, যায়নবাদের ক্রমবিকাশ ও তাদের অপকর্ম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন। যায়নবাদ একটি মস্ত বড় সমস্যা। এটাকে মুকাবিলা করতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চললে পুরস্কার পাওয়া যায় আর নিজেদের চিন্তার প্রেক্ষিতে চললে তিরস্কৃত হতে হয়। মুসলিম বিশ্ব যদি আজ জেগে ওঠে তাহলে যায়নবাদকে মুকাবিলা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, আধুনিক যায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন Tayoder Hurtizel যিনি ইহুদী সাংবাদিক ছিলেন। তিনি জুদাপিস্ট শহরে ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এর মূল লক্ষ্য হলো ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে শাসন করা। যায়নবাদীদের চিন্তা ও বিশ্বাস হলো যাইওনা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন- মিশর, সাইনা, ফিলিস্তীন, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান- উত্তরাঞ্চল ও মদীনাসহ বিশাল ভূখণ্ডে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ইহুদীরা হলো শ্রেষ্ঠ জাতি। নেতৃত্ব তাদেরই। অন্য জাতি তাদের সেবক। তারা মনে করে বিশ্বকে শাসন করতে হবে ভয়-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এখন সর্বত্র অর্থের আধিপত্য। অর্থের সকল পন্থা কবজা করে অর্থের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। মূর্খ জাতিগুলোকে অশ্লীলতা ও কদর্যতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুষ, প্রতারণা, বিশ্বাস ঘাতকতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। নেতৃত্বের লোভী অথচ চরিত্রহীন ও অনভিজ্ঞ লোকদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হবে। আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও অনৈক্যের আগুন জ্বালিয়ে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা। এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ লাগানো, অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে সকল জাতিকে আয়ত্বে রাখা ইত্যাদি লক্ষ্যগুলো তিনটির মধ্যে : ১. পৃথিবী সকল জাতিকে বিভক্ত করা। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে প্রলুব্ধ করা। জাতি সমূহের বিশৃংখলা সৃষ্টি ও যুদ্ধ লাগানো। ২. আকীদাহ বিশ্বাসসহ চিন্তা চেতনা নীতি নৈতিকতার ধ্বংস সাধন করা। ৩. বৃহত্তর ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, মিশরের নীল নদ থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত। নীতিবান, সৎ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের চরিত্র হনন করাও তাদের লক্ষ্য।

www.bjilibrary.com

পাশ্চাত্য সমাজে অনেক কিছুই তাদের পরিকল্পনার অংশ এবং তা প্রকাশ্যে চকটদার। তাই কোন কোন আধুনিক ইসলামিস্ট তাদের চিন্তা চেতনার সাথে সমন্বয় করার জন্য ইসলামের উদারতাকে পুঁজি করে ছাড় দেয়ার আহ্বান জানাচেছ। তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, ইয়াহুদীদের স্বীকৃত গ্রন্থ "তালমুদ" মৌলিক নীতিমালার আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বর্তমান যায়নবাদী গোষ্ঠী সমগ্র বিশ্বে ঐ নীতিমালার আলোকে আধিপত্যবাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির বলেন, বর্তমান সময়ে জায়নবাদ একটি বার্নিং ইস্যু। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর আরবদের সাথে যুদধ এবং পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত এই ইহুদী রাষ্ট্রটিকে আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করণের ঘটনা জায়নবাদের আদর্শিক ও ভূখণ্ডগত উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অঅরবদের সাথে ছয়দিন মেয়াদী যুদ্ধে ইসরাইলের বিজয় জায়নবাদীদের মধে?্য নতুন উদ্যমের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীরা জায়নবাদীদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সারা বিশ্বে জায়নবাদ পুনরুদ্ধারে আলোক ছটা ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি এর ফলে সামরিক সম্প্রসারণবাদও উৎসারিত হয়। এর ফলে লিকুড পার্টি ও মোনাচেম বেগিন নেতৃত্বে আসেন এবং বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। নেতৃত্ব কট্টরপন্থী সংস্কারাদীদের হাতে চলে যাওয়ায় আরব ভূখণ্ড অগ্নিগর্ভা হয়ে পড়ে। বস্তুত ১৯৭৭ সালে লিকুড পার্টি ক্ষমতায় আসার পর ইসরাইল সরকার ও জায়নবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব কাঠামো অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় ইহুদী বসতি স্থাপনের ব্যাপারে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তারা মুক্ত বাজার অর্থনীতির অনুকূলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ করে। ইসরাইলের ঐতিহাসিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আনা হয় এবং জায়নবাদী বিভিন্ন দল উপিদলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে নেয়া হয়। বিভিন্ন দেশের জায়নবাদী আন্দোলন সমূহ ভূমি পুনরুদ্ধার ও বসতি স্থাপন

www.bjilibrary.com

আন্দোলনের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে। তবে জায়নবাদীদের মধ্যে এক্ষেত্রে এখনো অনেক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক জিভ স্টার্নহেলের একটি মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, জায়নবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং প্রায়োগিত দিকসমূহের মাধ্যমে ইহুদি সাইকি ও মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করা যায়। এই জাতিসত্তার দ্বৈতাচার সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ব্যক্তি হিসাবে ইহুদি ও রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাইয়েল সর্বদাই জিওনিস্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর। একজন ইহুদি যে পদে বা স্তরেরই থাকুক না কেন, সে তার পেশাগত-সামাজিক- রাজনৈতিক দায়িত্বের ভেতর দিয়ে জিওনিস্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নে ক্রিয়াশীল। আমেরিকায় যে সকল ইহুদি রয়েছে কিংবা আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক বা পেশাগত-একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে যে সকল ইহুদি রয়েছে, তারা নিজ নিজ কাজের চেয়ে তাদের জায়নবাদী মতাদর্শিক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আর এ জায়নবাদ তত্ত্বগত দিক থেকে উগ্র মৌলবাদ, জ্যাতাভিমান, রেসিজমকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। পাশাপাশি পুঁজিবাদ, শোষণ ও লুণ্ঠনকে একচ্ছত্র করার মাধ্যমে অত্যন্ত অমানবিক স্বার্থ হাসিল করে এবং ব্যাপক সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে মুসলিমদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়। ইতিহাস যে দুঃখজনক ও রক্তাক্ত অধ্যায়ের স্বাক্ষী।

বলে রাখা ভালো যে, শুধু পুঁজিবাদ নয়, পৃথিবীকে বিশৃঙ্খল ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যত রকমের তত্ত্ব আবিষ্কার ও ব্যবহার করা যায়, জিওনিষ্টরা সেটা করেছে। সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সেকুলারিজম এবং ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিমদের মধ্যকার ভিবিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার জন্মদাতা জিওনিস্ট ইহুদীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইন্ধন বা সাম্প্রতিক সময়ে ৯/১১, ১/১১ ইত্যাকার রহস্যাবৃত-জনস্বার্থবিরোধী-বিতর্কিত-অগণতান্ত্রিক-ষড়যন্ত্রমূলক বহু অপঘটনা-নাটকের জন্মও ইহুদি দুষ্টচিন্তার গর্ভে। বিশ্বের প্রায় সকল ধরনের ন্যাক্কারজনক, নৈরাশ্যকার ও নিন্দিত অপকর্মের পেছনে ইহুদি জায়নবাদীদের সম্পৃক্তকা সুবিদিত। যে ঐতিহাসিক কলঙ্ক ইহুদিদের অন্যতম স্মারক। বর্তমান বিশ্বেও জায়নবাদীরা এনজিও ও বিশ্বায়নে নানা এজেন্টদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অব্যাহত নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী, মূল্যবোধ, আকিদা, বিশ্বাস, তাহজিব-তামাদ্দুনকে বিনষ্ট করছে। পাশাপাশি ইসলামবিরোধী অপশক্তিসমূহকে এক ও অভিন্ন কাঠামোতে নিয়ে আসছে। ইসরায়েল ও ভারতের মৈত্রী ও সামরিক-সাংস্কৃতিক সমঝোতা চুক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতপক্ষে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের অধীনে সুপরিকল্পিত অনাচার এবং ইহুদি ও ইহুদিবন্ধু-ভিন্ন অন্য জাতির সামগ্রিক ক্ষতি সাধনের ক্রনলজিক্যাল প্রসেসের অন্য নাম হল জায়নবাদ; যা এখন নানা ইসলামীরিরোধী সেক্যুলারিটি গ্রুপকে আশ্রয় করে বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। মিডিয়া, এনজিও, কাদিয়ানী, বাহাই প্রভৃতি বিতর্কিত সংগঠনের মাধ্যমে এবং ফ্রিস্টাইলিজম, আল্টামর্ডানিজম, ওয়েস্টানাইজেশন এবং অবশ্যই একমুখী ও ভারসাম্যহীন বিশ্বায়নের নামে যে টাকার স্রোত ও পরিস্থিতি অশান্ত করার মত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-মতাদর্শিক ইস্যু ও বক্তব্য হাজির করা হচ্ছে, তাতে দেশের ঐক্য, সংহতি, নিরাপত্তা, একাত্মতা, আদর্শিক প্রণোদনা ও বিশ্বাসের পাটাতন লণ্ডভণ্ড হয়ে বাংলাদেশ ক্রমশই একটি অকার্যকর ও অপবাদাক্রান্ত দেশে পরিণত হচ্ছে; এর জনগণ অহেতুক মৌলবাদী, জঙ্গী; এবং এর নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য বলে লাগাতার অভিযুক্ত হচ্ছে সেই দেশবিরোধী অপশক্তির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তি-সংগঠন-মুখপাত্রদের মাধ্যমে। বিশ্বের উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ, বাংলাদেশ ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হলে যারা দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিনাশ চায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অমানবিক শোষণ ও পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা চায়, তারাই লাভবান হবে। ভারত, ইসরায়েল ও আমেরিকাকে সামনে এনে লেবান, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর ও বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে এবং এদের স্থানীয় ও অস্থানীয়ভিত্তিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এজেন্টদের কার্যক্রম লক্ষ্য করা হলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের সদস্যরা এক অক্টোপাসরূপী বীভৎস শত্রুর দানবিয় আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদকে দেখতে পাবে, যার নেপথ্যে 'কোর কনসেপ্ট' হিসাবে কার্যকর জায়নবাদ নামে ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিকভাবে কর্মতৎপর একটি অনামবিক-রক্তলোলুপ চিন্তাস্রোতকে এবং এই চিন্তাধারার অনুসারী ছদ্মবেশী ও দ্বৈতসত্তার ইহুদি-ভাবাপন্ন কতিপয় মানবতাবিরোধী

www.bjilibrary.com

অবয়বকে চিহ্নিত কারাও অসম্ভব নয়। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং ইতিহাসের সকল পর্যায়েই স্বাধীনতাকামী, বিশ্বাসী ও সংগ্রামীদের ষড়যন্ত্রকারী, জনবিরোধী, নৈরাজ্যবাদী অপশক্তির পার্থক্য ও প্রভেদ সুস্পষ্ট।

জনাব হাফিজুল ইসলাম বলেন, যায়নবাদ সবেচেয় বেড় পরিকল্পনা হল মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে মুসলিম বিশ্বের সম্পদশালী অংশকে শক্তিহীন করে ফেলা। সারা বিবেশ্ব, মুসরিম দেশেও ইহুদীর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আলেম-উলামাদের পক্ষ হতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ডেলিগেশন প্রেরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি প্রচার এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ জরুরি। এখন আমাদের করণীয় হলো : জায়নবাদের নিয়ন্ত্রণ তথা অবসানের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হবে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ব করে সত্য জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই এ পরিকল্পনা নিতে হবে। মুসলিমদের সকল অনৈক্য দূর করার জন্য সকল সেক্টরকে একত্র করে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা গ্রহণ তথা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাইল ও ইহুদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারা যে অভিশপ্ত জাতি সে কথাও আল কুরাঅনে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই অভিশপ্ত জাতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, জায়নবাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। হযরত উমার [রা] কর্তৃক জেরুসালেম দখল, প্রথম আরব ইসরাইল যুদ্ধ [১৯৪৮], ২য় আরব ইসরাইল যুদ্ধ [১৯৬৬], ৩য় আরব ইসরাইল যুদ্ধ [১৯৭৩] সালে সংঘটিত হয়। এসব তথ্য আমাদের সামনে থাকা দরকার। খৃস্টবাদ কেন ইহুদিবাদের সমর্থকে পরিণত হল সেটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার। বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব ইহুদিদের ইসরাইলে আনা হচ্ছে তারা নৃতাত্ত্বিকভাবে ফিলিস্তিনের সন্তান ছিল না- এ বিষয়টিও সকলের জানা থাকা দরকার। এখত কথা হচ্ছে, জায়নবাদের বিরুদ্ধে আমাদের করণীয় কি? সেটাই আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইহুদিদের জেরুসালেম-এ পুনর্বাসনের যে প্লান ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি কর্তৃক অস্ত্র বানিয়ে দেওয়া এবং পুরস্কার হিসেবে তাদের এ ভূখণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান কি ছি। সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, পৃথিবীর বুকে মুসলিম দেশগুলো যখন একবিংশ শতাব্দীকে তাদের জন্য কল্যাণকর শতাব্দী মনে করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে তখনই মুসলিমদের শত্রুরা মুসলিম দেশগুলোতে তাদের পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ফলে আজ বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে অশান্তি ও উদ্বিগ্নতা বিরাজ করছে। এ পর্বে মুসলিম বিশ্বের এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে সচেতনতা জাগ্রত করা প্রয়োজন। ■

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ কারণ ও প্রতিকার

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** বাংলাদেশের যে সামাজিক দুরাবস্থা তাতে করে কিশোর অপরাধের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কেননা কিশোরদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা, তাদের মানসিক বিকাশ ও সামাজিক নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থার দিকে সরকার দৃষ্টি দেয় না। তাদের এসব ঘাটতির কারণে দিন দিনই কিশোর অপরাধ বাড়ছে। আমরা কিশোরদের জন্য জাতীয় দিবস পালন করি বটে, কিন্তু তাদের অধিকার সম্পর্কে আদৌ সচেতন নই। যদি সরকার ও সমাজ সচেতনতার সাথে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে, তাদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে তাহলে কিশোর অপরাধের পরিমাণও কমে যাবে।

গত ১১ই এপ্রিল, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে "বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ : কারণ ও প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক জনাব শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন, ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব

www.bjilibrary.com

নাজির, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমিন, ড. মাহফজু পারভেজ, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ, অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের চিত্র ভয়ঙ্কর হলেও পাশ্চাত্যের তুলনায় অবশ্য অনেক কম। পাশ্চাত্যে যদি বিশাল পুলিশ বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন না করতো তাহলে সেখানকার মানুষ একে অপরকে কামড়ে খেত। আমদের দেশে কিশোর অপরাধের পরিমাণ দিন দিনই বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ হলো তাদের পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাব। একটি পরিবার যদি ইসলামের শিক্ষায় পরিবারের সদস্যদেরকে গড়ে তোলে, তাহলে ঐ পরিবারের কিশোর অপরাধী হতে পারে না। পরিবারই হলো সুশিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান। আমাদের পরিবার হতে হবে যেমন ইসলামী শিক্ষায় উজ্জীবিত, তেমনি কিশোরদেকেও গড়ে তুলতে হবে ঠিক সেইভাবে। শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, তাকওয়া প্রভৃতি জাগ্রত করতে পারলে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ রোধ করা সম্ভবপর হবে। এজন্য প্রথমত পরিবারগুলোর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবদু বলেন, বাংলাদশে যে হারে কিশোর অপরাধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। কিশোরদের প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার ফলে সমাজে এধরনের ধস নেমেছে। কিশোরদের নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে কিশোর অপরাধ কমে যাবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, অপরাধ একটি ব্যাধি, এটা depression জনিত একটি জটিল রোগ। প্রতিকার হিসেবে শাস্তি বিধানের পরিবর্তে সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট ও সংশোধনের পরিবেশ

www.bjilibrary.com

সৃষ্টির বিষয়টির গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আমরা ইসলামকে ন্যাচারাল বা ফিতরাতের মত করে মানুষের নিকট পেশ করতে বোধ হয় সক্ষম হচ্ছি না যার ফলে বিপরীত পন্থীদের আবেদনসমূহ কিশোরদের নিকট মোস্ট ন্যাচারাল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। একটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে আল্লাহ নবী পাঠতেন guidance হিসাবে। এই উম্মাহ যুগোপযোগী dynamic ইজতিহাদের মাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির নেতৃত্ব দেবে অথবা সেসবের যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামাইজেশনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। আমরা সেই ভূমিকা রাখতে সক্ষম না হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ঘরের অনেক সন্তানের নিকটই আমরা সেকেলে হয়ে চিহ্নিত হচ্ছি এবং এই জেনারেশন ব্যাপক পূরণে আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার নিজস্ব আদর্শের প্রয়োগ নেই বরং আমরা সমাজে অন্যদের বিদেশীদের বিজাতীয় আগ্রাসী পরিকল্পনা প্রয়োগের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছি।

কিশোরদে শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় সাধন, কুরআন পড়ান, বাড়িতে ইসলামের পরিবেশ রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিতিভাবে পরিবেশকে জানতে দেয়া, যাতে করে পরিবর্তীতে আর কোন সময়েই তারা নৈতিকতা বিবর্জিত না হয়। মা-বাবার সান্নিধ্য, সোহবত, বন্ধুত্ব প্রাপ্তি তাদের মৌলিক অধিকার। তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন শিরক না করে। মাতা-পিতা গুরুজনের সম্মান ও তাদের সৎ নির্দেশ মান্য করে। মানুষের সাথে কথা ও কাজে বিনম্র আচরণ করে।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য আমাদের উচিৎ তাৎক্ষণিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অগ্রিম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তো অবশ্যই নেয়া জরুরি। কিশোরদের ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের প্রতি সহমর্মী ও যত্নবান হতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কারণ সেখানে কোনো ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা নেই।

www.bjilibrary.com

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, গত দশকেও কিশোর অপরাধের চিত্র আজকের মত এতটা ভয়ঙ্কর ছিল না। দিন যত যাচ্ছে, কিশোর অপরাধের পরিমাণ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য শুভ নয়, দেশ ও আমাদের জন্যও শুভ নয়। আমরা কিশোরদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের এই ব্যর্থটা দূর করতে হবে। কিশোরদের প্রতি অধিক মনোযোগী হলে, তাদেরকে যথাযথভাবে বিশিষ্ট করে গড়ে তুলতে পারলে দেশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, পরিবেশগত কারণেও কিশোররা বিপথগামী হয়। সুতরাং তাদের জন্য সুন্দর পরিবেশ, পরিশীলিত মন ও মনন বিকাশের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাদের চরিত্র গঠনের জন্য সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাও একান্ত জরুরী।

জনাব হাফিজুল ইসলাম বলেন, কিশোর অপরাধ দমন ও প্রতিকারের মূল দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপর। সরকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের যেমন তদারকি করে, তেমনি করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরও। কিশোর অপরাধ সংশ্লিষ্ট কিশোরদের তুলনায় সরকারী প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত অপ্রতুল। বেসরকারী পর্যায়েও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারছে না। এ জন্য সরকারকেই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে Probation Service নামে একটি Revenue Head এ প্রোগ্রাম রয়েছে বহু পূর্ব হতেই। প্রতি জেলায় একজন করে Probation Officer নিযুক্ত রয়েছে। বর্তমানে প্রতি উপজিলায়ও সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে Probation Officer -এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মূলত কিশোর অপরাধ, অপরাধের কারণ, তাদের সাজা/মুক্তি ইত্যাদি দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। এ সকল কর্মকর্তা যদি সঠিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সারা দেশের কিশোর অপরাধ চিত্র অনেক কমে আসতে পারে। একজন Probation Officer যিনি সমাজ সেবা কর্মকর্তাও বটে [যার

www.bjilibrary.com

হাতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প রয়েছে, সে কিশোরদের কিছু অংশকে খেলাধুলার মাধ্যমেও সংগঠিত করতে পারে। সংগঠিত কিশোরদের মধ্যে যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, তাদেরকে পরামর্শ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সুপথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ ব্যাপারেও সরকার তথা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করার যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন Probation Officer যদি ২৫ জন কিশোরকে খেলাধুলার মাধ্যমে সংগঠিত করতে পারে, তাহলে দেখা যায় প্রায় ৫০০ উপজেলায় প্রায় ১২৫০০ জন কিশোরকে এ পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব। প্রতিটি বেসরকারী সংগঠন কি রাজনৈতিক বা সামাজিক, উল্লেখিত কর্মসূচী তারাও গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারী সহায়তার জন্য এগিয়ে আসতে পারে। এভাবে বেসরকারী পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোরকে এ পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হতে পারে।

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের পূর্ব নাম কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র সংখ্যা মাত্র ৩টি এবং আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ৫টি। সরকারের উচিত একদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, অপরদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ার বিষয়ে সহযোগিতা করা। এছাড়া সকল প্রতিষ্ঠানে যারা কিশোর অপরাধ প্রতিকারে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত তাদেরকে পদায়ন দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়টিও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের নজরে আনা প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, মায়ের কর্তব্য হচ্ছে সন্তানকে নিজের দুধ পান করানোর । কুরআন তার সাথে সদাচারণ করার জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে। মায়ের কাজ হচ্ছে দুধ পান করানো ছাড়াও সন্তানকে তাওহীদের প্রশিক্ষণ দেবে, রাসূলের মহব্বতে ধর্মের প্রীতি শিক্ষা দেবে এবং এই ভালবাসাকে তার হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা করবে। শুধু পিতার ওপর তার ভার ছেড়ে দেবে না।

আমাদের সন্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পারিবারিক এবং সাংগঠনিকভাবে চরিত্র গঠন করছে। প্রলোভনের কাছে

www.bjilibrary.com

আত্মসমর্পণ না করে তারা সঠিকভাবে চলছে । তারা মাদক, নীচবৃত্তি, লাম্পট্য, জ্বিনা, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অভিভাবকরা যদি এই শিক্ষার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেন তাহলেই বখে যাওয়া থেকে তারা আত্ম রক্ষা করতে পারবে। স্রোতের মুখে ভেসে গিয়ে জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিশোর যুবকদের মধ্যে যারা ঈমানদীপ্ত আত্ম বিশ্বাসে উজ্জীবিত এবং প্ররোচনা-প্রলোভনকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যাদের ইচ্ছা শক্তি রয়েছে তারা আবেগকে শক্তিতে পরিণত করতে পারে। এই শক্তিই দুনিয়া গড়তে সক্ষম।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, বাংলাদেশে নীতি-নৈকিতাহীন সামাজিক অগ্রগতির প্রধান প্রতিফল হলো কিশোর অপরাধ। ধনী বা দরিদ্র, গ্রাম বা শহর নির্বিশেষে সর্বস্তরে এ অপরাধের হার বাড়ছে। তাহলে আমরা কি তথাকথিত অগ্রগতির মধ্যে আমাদের শিশু-কিশোরদের অপরাধী করে তুলছি? আমরা যদি প্রযুক্তি ও তথ্য বিপ্লবের নেতিবাচক দিক থেকে শিশু-কিশোরদের বাঁচাতে না পারি, তাহলে তাদেরকে অপরাধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারবো না। কিশোর অপরাধ কমানো না গেলে বাংলাদেশের ভবিষ্যত ঘোরতর অন্ধকার। আমাদের শিশু-কিশোর প্রজন্মকে অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা থেকে রক্ষার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতে পারি। এ লক্ষ্যে ইসলামের নৈতিকতা ও নীতিমালার অনুসরণ করা হলে শিশু-কিশোরগণ অপরাধমক্ত জীবনের নিশ্চয়তা পাবে। এজন্য সরকার ও অভিভাবকদের মনোযোগী হওয়া অপরিহার্য।

জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, শুধু বাংলাদেশে কেন, যে কোন দেশের প্রেক্ষিতেই বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে ইসলাম এবং প্রতিকারের প্রধান উপায়ও হবে ইসলাম। জন্মের পূর্ব থেকে অথবা জন্মলগ্ন থেকেই সকল ক্ষেত্রে যথার্থভাবে ইসলামী অনুশাসন না মানাই হলো কিশোর অপরাধের মূল কারণ। আর সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মানাই হলো এর প্রতিকারের সঠিক উপায়।

www.bjilibrary.com

অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন বলেন, কৈশোরের শারীরিক এ মানসিক পরিবর্তন তথা কৈশোর সত্তার চিত্রট আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। মানসম্পন্ন নৈতিক শিক্ষার অভাবে কিশোর অপরাধ বাড়ছে। আদর্শহীন নৈতিকতা বিবর্জিত ছাত্র-জীবনও এর অন্যতম একটি কারণ। আমাদের দেশে অনেক ছাত্র-রাজনীতি বিদ্যমান, অধিকাংশ দলের আদর্শিক ভিত্তি নেই, আছে কিশোর মনকে প্রভাবিত করার মত চাকচিক্য এবং অনেক লোভনীয় আয়োজন। এতে কিশোররা অনুগামী হয় ঐসব ছাত্র-রাজনীতির প্রতি। স্বার্থান্বেশী ছাত্র নেতারা নিজেদের প্রয়োজনে এদেরকে ব্যবহার করে। চরিত্র খারাপ হওয়ার সকল উপদানা এদের হাতে তুলে দেয়। এভাবেই কোমলমতি কিশোর ছাত্ররা জড়িয়ে পড়ে অপরাধ জগতে। যেখান থেকে ফিরে আসার আর সুযোগ থাকে না। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবেও কিশোর অপরাধ বাড়ছে। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য জাতিসত্তার ভিত্তিতে আদর্শকে সমুন্নত রেখে মূল্যবোধ সমৃদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগও নেয়া যেতে পারে। গণ মাধ্যমে চরিত্র গঠনমূলক প্রোগ্রাম প্রদান করা প্রয়োজন। সব ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা জরুরি। ইন্টারনেটে, ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে চরিত্র বিধ্বংসী ডিস চ্যানেল ও ওয়েবসাইট বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা ব্যাপক। সমাজ বিজ্ঞানী সিলিন বলেন, [Gillin], অপরাধ এমন ধরনের কাজ যা সমাজবদ্ধ মানুষ মূলত সমাজের জন্য ক্ষতিকারক মনে কর। শুধু তাই নয় ক্ষতিকারক ঐসব কাজের শাস্তি বিধানে সমাজবদ্ধ মানুষেরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা রাখে।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য আমাদের শিক্ষা, সুনীতি, তাকওয়া এবং ইসলামের আদর্শের প্রতি অধিক পরিমাণে জোর দিতে চায়। তাদের যথাযথভাবে বেড়ে ওঠা ও বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কিশোরদের প্রতি উদাসীন হলে তাদের অপরাধের মাত্রা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে।

www.bjilibrary.com

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, কিশোরদের গঠনে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কিশোরদের আমার আপনার তোমার বলে দূরে ঠেলে দেয়া এবং কাঁদায় ছুড়াছুড়ি না করে তারা আমাদের, আমাদের সকলের এ কথাটি মাথায় রেখে আজ আমরা প্রবীণরা যে যে অঙ্গনে আছি সেখান থেকেই তাদের জন্য সুন্দর গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কিশোররা তো আমাদেরই। তাই কিশোরদের জন্য সুন্দর পরিবেশ এবং আদর্শিক কল্যাণমুখী ও গঠনমূলক বর্তমান উপহার দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব। আর তাহলেই আজকের কিশেরারা আগামী দিনে আমাদের লাশ কাঁধে নিয়ে কবরে গমন করবে, দাফন কার্য সম্পাদন করবে। নতুবা তারা আমাদের লাশ যেমনি কাঁধে নেবে না তেমনি আমাদের শ্রদ্ধাও করবে না। আমাদেরকে মূল্যায়নও করবে না। ■

www.bjilibrary.com

ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন**, ইহুদী ও সন্ত্রাস–মূলত অবিচ্ছেদ্য। যেখানে ইহুদী আছে, সেখানেই সন্ত্রাস আছে। আল কুরআনের বহু স্থানেও তাদের ঘৃণ্য চরিত্রের বর্ণনা আছে। ইসরাইল কুরআনকে ভয় পায়। ইসরাইল এমনি এক আত্মঘাতি জাতি যে, নিজেদের স্বার্থে তারা নিজেদের মধ্যেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। পৃথিবীতে এমন সন্ত্রাসী জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। জার্মানে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সেখানে তারা ইহুদীদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে স্বার্থ হাসিলের জন্য। সুতরাং যারা স্বার্থের কারণে আপন জাতির লোকদের ওপর সন্ত্রাস চালাতে পারে, তারা যে অন্য যে কোনো জাতির ওপরই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে– এটাই তো স্বাভাবিক। ইহুদীরা সকল সময়ই সন্ত্রাসী ও ষড়যন্ত্রকারী ইতিহাসই তার সাক্ষী।

গত ১৪ই মে, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস" প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক ও ব্যাংকার

www.bjilibrary.com

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমীন, ড. মাহফুজ পারভেজ, জনাব আশরাফ আল দীন, জনাব আহসান হাবীব ইমরোজ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধূর্ত ও কৌশলী জাতি হলো ইহুদী। সংখ্যায় কম হলেও শক্তি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে তারা এগিয়ে আছে। ক্রমাগত সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রই তাদের মোক্ষম হাতিয়ার। কোনো মুসলিম দেশ যেন শক্তি ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রসর হতে না পারে,সেজন্য তারা সকল সময় তৎপর। ইসলামী আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার সকলপ্রকার অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র তারা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলের মত এত হীন চরিত্রের জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। অথচ তাদের সম্পর্কে খুব কম মানুষই ওয়াকিবহাল। সুতরাং ইসরাইলের মুকাবিলার জন্য মুসলিম বিশ্বকে এখন আন্তর্জাতিকমানের প্রযুক্তি ও শক্তি অর্জনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের সম্পর্কে অধিক পরিমাণে অবহিত করতে হবে বিশ্বের জনসমষ্টিকে। সকলপ্রকার মিডিয়ার মাধ্যমে ইসরাইলী সন্ত্রাসী চরিত্রের দিকগুলো উন্মোচন করতে হবে। ইহুদীরা যে শুধু মুসলিমদেরই শত্রু নয়, বরং অন্যান্য সকলের জন্য ভয়ঙ্কর– এ সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখি ও প্রচারণা চালাতে হবে। ইসরাইল মনে করে ইসলামই তাদের জন্য বড় ধরনের বাধা। ইসলামকে দাবিয়ে রাখতে না পারলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই আশঙ্কা ও ভীতি থেকেই ইসরাইল মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল ও শক্তিহীন রাখার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে

www.bjilibrary.com

আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং এর মুকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, ইহুদীরা যে কেমন জাতি, সেটা আল কুরআনই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এই সন্ত্রাসী জাতি সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে আজ সতর্ক থাকতে হবে। তাদের সকল অপকৌশল নস্যাৎ করার মত প্রযুক্তিগত জ্ঞান, আর্থিক ও ঈমানী শক্তি-সাহস অর্জন করতে হবে।

জনসংখ্যা, রাষ্ট্রীয় আয়তন, অতি নগণ্য রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের স্বীকৃতি লাভ পাকিস্তানেরও পরে। কিন্তু সমরাস্ত্রে, সমরনায়ক কূট কৌশল ও গোয়েন্দাগীরিতে টপ অব দি লিস্টে এদের অবস্থান। মিত্র শক্তির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার অন্যতম প্রাণ কেন্দ্রে বিষ ফোঁড়ার মত ইসরাইলের অবস্থান। তারা ক্রমাগত সেখানে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের আগমন হয়েছে সন্ত্রাস কবলিত জনপদের বাসিন্দাদের মাঝে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এলে আল্লাহ তাদের সাহায্য দিয়ে সন্ত্রাসকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দেন এটা আল্লাহর ওয়াদা।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, কুরআন-হাদীসের আলোকে মধ্যপ্রাচ্যে অতীতে ইহুদী তথা বনী ইসরাইলের উত্থান-পতনের কথা জানতে পারি। কিন্তু ইউরোপ তথা রাশিয়া, জার্মানীতে ইহুদীদের গমন ও ক্ষমতাবান হবার ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরলে ভালো হবে। অল্পকিছু সংখ্যক ইহুদীদের মুকাবিলায় বিশাল সংখ্যক মুসলিম আরবের পরাজয়ের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করতে হবে। ইহুদী-খ্রীস্টানদের পরাজিত করতে হলে মুসলিমদের প্রকৃত মুসলিম হতে হবে। যেমন অতীতে ইহুদী খ্রীস্টানদেরকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল। ইহুদীদের ষড়যন্ত্র তখনও ছিল, খ্রীস্টান পারসিকদের ক্ষমতা ছিল প্রবল, কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলিমদের সামনে তারা টিকে থাকতে পারেনি। আমরা সেইভাবে প্রস্তুত থাকলে আশা করি আজও পারবে না।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, ইহুদীদের চিত্র পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে। এবং আমাদের সেইভাবে সচেতন থাকতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে ইহুদীদের

www.bjilibrary.com

বর্তমান কুকাজের সংবাদ জানতে হবে এবং বিশ্বকে জানাতে হবে। তাদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করার জন্য ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই কেবল সম্ভব এই অতি ঘৃণ্য জাতি ইসরাইলের ও ইহুদীদের মুকাবিলা করা।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ইসরাইল রাষ্ট্র ও এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের পর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে ক্রমাগত। অতি সম্প্রতি সংঘটিত গাজা যুদ্ধ এবং এর ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে বর্ণনা আমরা তেমন কিছু জানি না। মোসাদের বিশ্বব্যাপী হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নই। এটা অত্যন্ত দু:খজনক। এখন প্রয়োজন বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান বিশ্বে ইহুদীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেয়া। ইসরাইল শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের জন্য সমস্যা নয় বরং এটা মুসলিম এবং ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য সমস্যা।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় ইহুদীদের স্বভাবগুলো উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা সুদখোর, তর্জবাজ, খুনীচক্র, লাঞ্ছিত সম্প্রদায়, বাইরে বন্ধু ভেতরে শত্রু, অন্যের দু:খে খুশী, অন্যের খুশীতে দু:খী, ঘুষখোর, মিথ্যাবাদী, অভিশপ্ত, বানর, শূকর, ঘৃণিত, যুদ্ধবাজ, ফাসাদ বাজ, হিংসুক। দীনের উপহাসকারী, সালাত নিয়ে উপহাসকারী। তারা প্রতিশ্রুতি লংঘণকারী। 'তালমুদের' কতিপয় নীতিমালা হলো : নন ইহুদীর প্রতি সদয়ী হওয়া নিষিদ্ধ, নন ইহুদীদের সম্পদ গ্রহণ হালাল, নন ইহুদীদের রক্ত ইহুদীদের জন্য হালাল, এর কোন বিচার নেই।

সুতরাং এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহুদীদের চরিত্র কত জঘণ্য।

ড. আবদুস সামাদ বলেন, ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তাত্ত্বিক কারণ কি? তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তথ্য সন্ত্রাসের ক্ষেত্রেও ইসরাইল চৌকষ। তারা সন্ত্রাসকে ছড়িয়ে দিয়েছে গোটা বিশ্বে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে মুসলিম দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে ইসরাইলের সার্বিক চুক্তি বিশেষ করে সামরিক চুক্তি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং আমাদের এখনই যথাযথ সতর্ক ভূমিকা রাখার সময় এসেছে।

www.bjilibrary.com

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, ১৯৭০ সালে ফিলিস্তিনী গেরিলাদের সাথে জার্মানী বাহিনীর সংঘর্ষ ৭১ সালের মধ্যভাগে জর্দানী বাহিনী গেরিলাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সম্ভব হয়। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে লেবাননে বামপন্থী মুসলিম ও ফিলিস্তি নী উদ্বাস্তু এবং খৃস্টান ফ্যালাঞ্জি বাহিনীর সাথে সংর্ঘষ হয়। ক্রমে এই সংঘর্ষ পূর্ণাঙ্গ গৃহযুদেদ্ধ রূপ নেয়। মে মাসে সিরিয়া শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে ফলে ইসরাইলীরা হস্তক্ষেপ করে এবং দক্ষিণ লেবানন দখল করে নেয়। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, আরব লীগ থেকে মিশরের বহিষ্কার মিশরের সাথে আরব দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

মুসলিমদের মিডিয়ার অভাব ও দুর্বলতা প্রকট। ফিলিস্তিন এক সময় ইহুদীদের অধীনে ছিল এটাই ঐ দেশ দখলের জন্য তাদের যুক্তি হতে পারে না। এটা যদি যুক্তি হয় তাহলে সমগ্র ভারত বর্ষ মুসলিমরা দাবী করতে পারে, স্পেন তারা দাবী করতে পারে। ইউরোপের অপরাধের জন্য ফিলিস্তিনীরা শাস্তি পাবে কেন? প্রকৃত অর্থে ইহুদীরা কোনো সভ্য জাতি নয়। একটি বর্বর জাতি। তাদের সকল বর্বতার জবাব দতে হবে আজকের মুসলিম বিশ্বকেই।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, আল কুরআনে ইহুদী সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।" [২ : ১১] আল্লাহর আয়াতকে বর্তমান পেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে এই চিত্রই আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় যে, গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমকারী একমাত্র শক্তি ইসরাইল এবং এর প্রত্যক্ষ মদদ দাতা হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যারা বিশ্বে একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবিদার। ইসরাইলের সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড এতটাই ব্যাপক যে, তা এখন পুরো বিশ্বকেই আক্রান্ত করেছে। তাই সেমিনার প্রবন্থ 'ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' শীর্ষক না হয়ে 'ইসরাইলে গ্লোবাল সন্ত্রাস' শীর্ষক হলে ইসরাইলের প্রতি সুবিচার হত। গোটা বিশ্বে ইসরাইল, গোটা মানবজাতির বিরুদ্ধে শয়তানের ঘোষিত ডিক্লারাশেন বাস্তবায়নের একমাত্র এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শক্তি। গোটা বিশ্বে ইসরাইলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও চতুর্মুখী। গোটা বিশ্বে ইসরাইলের সন্ত্রাসের উইংগুলো

www.bjilibrary.com

হলো- সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এবং পারিবারিক। সামরিক সন্ত্রাসের হাতিয়ার আণবিক সমরাস্ত্র, অর্থনৈতিক সন্ত্রাসের হাতিয়ার সর্বগ্রাসী সুদ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সন্ত্রাসের হাতিয়ার ডিজিটাল ক্যামেরা এবং সাইবার নেট আর পারিবারিক সন্ত্রাসের হাতিয়ার অবাধ যৌনতা। গোটা বিশ্বে এই চতুর্মুখী সন্ত্রাসের একমাত্র পুঁজি সরবরাহকারী হচ্ছে ইসরাইল। গোটা মানবজাতির বিরুদ্ধে শয়তানের ঘোষিত ডিক্লারেশন বাস্তবায়নের এমন উপযুক্ত এজেন্ট যে একমাত্র ইসরাইল তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আর একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে উক্ত সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এবং পারিবারিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন দেশকে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে অস্থির করা খুবই ফর্মূলা। এতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করারও কোন প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে এবং তার ইসলামী চেতনা এই চতুর্মুখী সন্ত্রাসের প্রবল হামলার কবলে আজ। ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এবং পারিবারিক সন্ত্রাসের পাশাপাশি এখন পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের দুয়ার উন্মুক্ত করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিশ্বের জাতি সমূহের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত সন্ত্রাসই পাশ্চাত্য ও তার বশংবদ ইসরাইলের আজকে গোটা বিশ্বে সুপিরিয়টির একমাত্র কারণ। কোন আদর্শ, মূল্যবোধ বা ধর্মীয় অনুশাসন নয়। আর এমন সন্ত্রাসী শক্তির কাছে আদর্শ, মূল্যবোধ বা ধর্মীয় অনুশাসন-এর যে কোন মূল্য নেই, তা সহজেই বোধগম্য। আর তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তি বা আদর্শ, মূল্যবোধ বা ধর্মীয় অনুশাসন-এর মূল্য নেই এমন ধর্ম ও আদর্শহীন রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসী ইসরাইল ও তার পাশ্চাত্য দোসর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে এটাই দুনিয়ার সব দেশের ঐতিহাসিক চিত্র। যা আজকে বাংলাদেশের বাস্তবতা।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ: ক্ষেত্রে ইসরায়েলের রক্তাক্ত ভূমিকা সন্ত্রাসের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ও কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশের ভেতরে ও বাইরে

www.bjilibrary.com

ধারাবাহিক সন্ত্রাস চালিয়ে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার এহেন সন্ত্রাসী আচরণ ইসরাইল ছাড়া অন্য কোন দেশই ইতিহাসের কোন পর্যায়েই করতে পারেনি। এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের ভিত্তিই সন্ত্রাস। টিকে থাকা এবং বিকশিত হওয়াও সন্ত্রাসের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে চলেছে ইসরায়েল। কিন্তু ইসরায়েল কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অন্যতম হোতা। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী অপতৎপরতার আদি গোড়া ইহুদিবাদ এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত। বিশ্ব শান্তি, আঞ্চলিক শান্তি এবং জাতীয়ভত্তিক শান্তি নিশ্চিত করতে হলে বিশ্বের সবাইকে সম্মিলিতভাবে ইসরাইলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। ইসরাইলকে নিবৃত্ত করা ছাড়া একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

জনাব আশরাফ আল দীন বলেন, ইহুদীদের নিয়ে ব্যাপক আলোচনাও লেখালেখি হওয়া প্রয়োজন। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ইহুদী জাতির উত্থান এবং ক্রমবিকাশ ও তাদের সন্ত্রাসের ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

জনাব হাফিজুল ইসলাম বলেন, মূলত মুসলমানদের ইহুদীদের দ্বারা পদানত করার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র ইহুদীদের ফিলিস্তিনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আসলে মুসলিমদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে না নেমে ইহুদীদের সামনে রেখে খৃষ্ট জগত এবং বর্তমানে মুশরিকরা সুকৌশলে সাহায্যেই মুসলিমদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমদের বিবেচনা করতে হবে এ অত্যাচার-নির্যাতন মূলতই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। যুদ্ধের অবস্থা বিবেচনা করেই মুসলিমগণকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন :

- প্রথমেই মুসলিমদের হলো অনতিবিলম্বে একতাবদ্ধ হওয়া,
- অত্যাচার-নির্যাতন ইতিহাস সাথে সাথে সকল দেশে সকল মুসলিমদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া।
- ইহুদীরা যে রূপ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে, মুসলিমদেরকে তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী হতে হবে [যেমন বর্তমানে

www.bjilibrary.com

ইউনাইটেড আরব আমিরাত অস্ত্র সম্ভার সংগ্র করছে। যে কোন মূল্যে ইসরাইলী সন্ত্রাস মুকাবিলা করতে হবে। আমাদের সেই যোগ্যতা ও শক্তি অর্জন করতে হবে।

জনাব আহসান হাবীব ইমরোজ বলেন, হাজার বছর আগে আল কুরআন ইহুদীদের সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছে। আমাদের তরুণরা আজ ব্যস্ত ক্রিকেট আর ফুটবল নিয়ে। আমরাও খেল-তামাশায় মগ্ন আর তারা মগ্ন পৃথিবী নিয়ে। তার দখল নিয়ে। তারা তো এখণ বলতে গেলে গোটা বিশ্বই নিয়ন্ত্রণ করছে। কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, অর্থনীতি, মিডিয়া, বিজ্ঞান, সিনেমা, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির মাধ্যমে তারা চালকের আসনে রয়েছে। তাদের উত্থানের কারণ হলো তাদের রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা। ওরা ১০০% শিক্ষিত আমরা ১৯%। তাদের পরিকল্পনা ১১২ বছরের। আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ওদের মজবুত। তারা বিশ্বের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। তাদের ঐক্য অটুট। ইসরাইলের সন্ত্রাস নিয়ে আরো গবেষণা হওয়া দরকার। তাদের মুবাকিলার জন্য আমাদের ঐক্য ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন বলেন, ইসরাইলের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। মাত্র ৪/৫ মাস পূর্বের এই সন্ত্রাস, যা থেকে হাসপাতাল, জাতিসংঘ স্কুল পর্যন্ত বোমা হামলা থেকে রেহাই পায়নি। দুই সহস্রাধিক নিরাপরাধ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশু হত্যা করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কার্যাবলী টুইন টাওয়ারে বোমা হামলা সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায় এদে কার্যাবলীর ভয়াবহতা ব্যাপক। যার ফলশ্রুতি হল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে চলেছে। ইসরাইলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কোন উদ্যোগই নেই। এ থেকে উত্তরণের উপায় হলো ওআইসি-র উদ্যোগে বিবিসি এর ন্যায় মিডিয়া সেন্টার, বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানস গড়ে তুলে এই সন্ত্রাস প্রতিহত করার নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জনাব রফিকুল ইসলাম বলেন, ইহুদীদের ধর্মই হলো সন্ত্রাসী কর্মাকাণ্ড চালানো। যেমন ১৯৪৮ সাল যুদ্ধে ১৩০০০ মারা যায় ফিলিস্তিনী এবং ৯ লক্ষ পলায়ন করে। ১৯৪৭ সাল-৩১ ডিসেম্বর

www.bjilibrary.com

বালদাত আল নাইখ- যা ইহুদীরা বলে গানা, তাতে মারা যায় ৬০০ লোক। ১৯৪৮ , ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারী হেরন এ আক্রমণ করে মধ্যরাতে ২০ বাড়িতে বোমা মারে। ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ আবু কাসার হত্যাকাণ্ড চালায়। ১৯৪৮ সালের ১০ এপ্রিল দেইর, ইয়াসিন হামলা করে। ১৯৫৬ সালের ১০ আকটোবর কালফিলিয়া শহরের হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ১৯৮২ সালের ১৬-১৮ সেপ্টেম্বর সাববা ও মাতলাব বইরুত এর হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ১৯৯০ সালের ৮ই অকটোবর আলা আকসা মসজিদে যোহরের নামাযের পর হামলা করে। ১৯৯৪ সালে ইব্রাহিমী মসজিদে হেবরন হত্যাকাণ্ডা ঘটায়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর টানেল তৈরী করে মসজিদ ভাঙ্গার জন্য ৬২ জন মারা যায়। ফলে এহেন একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের মুকাবিলায় আমাদের যুগোপযোগী কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন।

জনাব আবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ইহুদীরা কখনই মুসলিমদের বন্ধু ও কল্যাণকামী হতে পারে না। সে সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে জাগ্রত করার পাশাপাশি তাদের কবল থেকে কিভাবে আজ ও আগামীরা মুক্তি পেতে পারে সেটা আমাদের ভাবতে হবে। এছাড়াও আমি মনে করি পৃথিবীর বুকে মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ তথা বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সহযোগীগণ যেমন হিম্মত, ধৈর্য, একতা ও ঐক্য এবং তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আজও সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা যদি সেই রকম আখলাক এবং দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে তাহলে তাদের সামনে বিজয় নিশ্চিত হবে। আজ মুসলিমদের ক্রান্তি লগ্নে দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে সেটি হলো আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং আদর্শ চরিত্রে বলীয়ান হওয়া। এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরতে পারলে অবশ্যই মুসলিমরা আবারও সমগ্র বিশ্বে বিজয় পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে চলতে সংগ্রাম হবে। ■

www.bjilibrary.com

আল্-কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** আল কুরআন বিজ্ঞানগ্রন্থ নয় আবার বিজ্ঞানবর্জিতও নয়। এ এক স্বতন্ত্র মহাবিস্ময়কর গ্রন্থ। যে গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সকলপ্রকার জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল কুরআনই আমাদের গাইড বুক। রাব্বুল আলামীন এই গাইডবুকে আমাদের যেভাবে চলতে বলেছেন, সেইভাবে চলতে পারলেই কেবল আমরা সাফল্য লাভ করতে পারবো। আল কুরআন মানবসৃষ্ট নয় বলেই এর সম্মোহনী ক্ষমতা সীমাহীন। বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, কিন্তু আল কুরআন অপরিবর্তনীয়। বিজ্ঞানের যাত্রা এখনো শেষ হয়নি। সেটা আপেক্ষিক এবং অসম্পূর্ণ। একমাত্র সম্পূর্ণ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে আল কুরআনকেই অনুসরণ করতে হবে।

গত ১১ই জুন, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "আল কুরআনের প্রতি বিজ্ঞানের সমর্থন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক ও প্রকৌশলী জনাব মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন।

www.bjilibrary.com

পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. মাহফুজ পারভেজ, জনাব আশরাফ আল দীন, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ তাওহীদ হুসাইন প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, আল কুরআন এক শাশ্বত মহাগ্রন্থ। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানের বহুবিধ বিষয়ে বিবৃত হয়েছে। যা গবেষণা করে মানুষ বিজ্ঞানের যাত্রাকে আরও অগ্রসর করেছেন। বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে। কারণ রাব্বুল আলামীনই মানুষকে বিজ্ঞানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের জন্য এটা মহান রবের এ এক বিশেষ করুণা। প্রথমে বস্তুজ্ঞান তারপর বিজ্ঞান– এই সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এবং এর সকল উৎসই হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। সুতরাং আল কুরআনকেই আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। আল কুরঅনের পথেই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, আল কুরআনে স্পষ্ট বলা হচ্ছে 'অআনজালনাল হাদীদ, ফিহে বাসুন শাদীদ' অর্থাৎ নাযিল করেছি : পূর্বে থেকে পৃথিবীর অস্তিত্ব। আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিজ্ঞানের বহু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন- গ্যাসীয় বর্হিস্থ আবরণের সৌর জগৎ : জুপিটার, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন। অন্ত স্থ পাথুরে গঠনের গ্রহসমূহ : ভেনাস, বুধ। সম চার্জের রিপালশন, একধিক প্রোটন বা নিউক্লিয়াসকে পাশাপাশি আসার বিরোধী ফিউসন প্রক্রিয়ায় কিছু হালকা/ছোট মৌলের গঠন ব্যাখ্যা করা যায়। ভারী মৌলের আণবিক বিক্রিয়ার ফলে কিছু নতুন মৌল সৃষ্টি হয়। বড় মৌল গঠনে পরস্পরের মাঝে যে বাঁধন তা মধ্যাকর্ষণ

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যা করেনা বরং তা এর চাইতে ১০৪০ গুণেরও বেশি শক্তিশালী। ভারী মৌলের গঠন ব্যাখ্যার বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। আল কুরআন থেকেই আমার জানতে পারি বিজ্ঞানের জ্ঞান। এই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া আর্টারী ও ভেইনের রক্ত সঞ্চালনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট; হেমিনের কেন্দ্রীয় মৌল আয়রন, শ্বাস গ্রহণের অক্সিজেন, আয়রন বহন করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছায়। আবার কার্বোহাইড্রেট, এমিনো এসিড মেটাবলিনামের মাধ্যমে সৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড, আয়রন শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে শরীর থেকে বের করে দেয়া হয়। এমনিভাবে লোহা মানুষের জীবন রক্ষায় মহা উপকার করে এবং এই প্রক্রিয়ায় শিরা ও ধমনীর সার্কুলেশন কষ্ট ও আনন্দের অনুভূতি মস্তিস্কে পৌছায়। এদের অবস্থান চামড়ার নিচেই। আল কুরআনই মানুষকে বিজ্ঞানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে আমাদের নতুন থেকে আরও নতুনতর বিজ্ঞানের বিষয়।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, আল কুরআনের পরিচয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যাপক বিশাল। বিজ্ঞানও এর সাথে সংযুক্ত। আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত একটি বিষয়। এটা এমন এক মহাগ্রন্থ যার মধ্যে সকল কিছুর উপস্থিত রয়েছে। বিজ্ঞান, দর্শনসহ কোনো কিছুই বাদ যায়নি। আল কুরআনে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা, প্রশাখায়র ইঙ্গিত ও উল্লেখ আছে। যেমন পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, চিকিৎসা, জীববিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যই আল কুরআন। আমাদের উচিত এই মহাগ্রন্থের আলোকে জীবনকে পরিচালিত করা।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআন এমন এক শাশ্বত গ্রন্থ যা নিয়ে গবেষণার জোয়ার বয়ে গেছে অতীতে। বর্তমানেও হচ্ছে এবং আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল কুরআন যেহেতু কখনো পুরনো হবে না, সুতরাং এর কার্যকারিতা ও গবেষণাও থেমে থাকবে না। আল কুরঅনই আমাদের জন্য একমাত্র নির্ভুল কল্যাণকর গাইডবুক।

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, বিজ্ঞানের সকল বিষয় ও উপাদান কেবল আল কুরআনেই আছে। গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার জন্য আল কুরআনের কাছেই দ্বারস্থ হন, মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকল গবেষককেই আল কুরআনের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

আল কুরআনই আমাদের জীবন, জগৎ ও গন্তব্য- এই মৌলিক দিকসমূহের দিক নির্দেশনা দেয়। আমাদের চারপাশের জীব-জগৎ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যও আল কুরআনে স্পষ্ট হয়ে আছে। মহান রবের এক বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ। যে গ্রন্থ তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নিদর্শন রয়ে গেছে প্রচুর। পাশ্চাত্যের গবেষকগণও তাঁদের গবেষণার জন্য আল কুরআনের কাছেই ফিরে এসেছেন- এমন নজির বহু আছে। আবার অনেক গবেষকের গবেষণা ভুল প্রমাণিত হয়ে আল কুরআনের সত্যতাই শেষ পর্যন্ত অভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। প্রকৃত অর্থে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যাতে বিবৃত হয়নি- আল্লাহর সৃষ্টিকুলের তেমন কিছুই নেই। এখনও বহু গবেষক আল কুরআন নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং নতুন নতুন বিষয়ের সন্ধান আমাদেরকে দিচ্ছেন। আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তার কার্যপরিধি ব্যাপক-বিশাল এবং সীমাহীন।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, পবিত্র কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য অন্তঃহীন আলোর দিশা। বিশ্ব জগৎ ও মানব জীবনের সকল বিষয়াদি, সমস্যা, সম্ভাবনা সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বিদ্যমান। জীবনে ও জগতের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেসব বিষয়ে কুরআনে আলোকপাত করা হয়নি। আমাদের কর্তব্য হলো, প্রতিনিয়ত কুরআনে অধ্যয়ন, গবেষণা ও চর্চা করা এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞান, বিশ্ব, মহাজগৎ, সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে কুরআনের কল্যাণময় দিক-নির্দেশনা খুঁজে বের করা। তাহলেই মানব জাতি প্রকৃত কল্যাণের দেখা পাবে এবং সন্ত্রাস,

www.bjilibrary.com

হানাহানি ও হিংসার পৃথিবীতে চির শান্তির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, আমাদের জন্য মহান রবের এক বিশেষ নিয়ামতের স্বরূপ তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল কুরআন আমাদের শুধু সত্যপথের দিশাই দেয় না, তার মাধ্যমেই আমার পাই দুনিয়া, আখিরাত এবং মহান রবের তাবৎ সৃষ্টির রহস্যের জ্ঞান। আল কুরআন এমনি এক বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ যাতে বর্ণিত হয়নি এমন কিছু নেই। হাজার হাজার বছর ধরে গবেষকগণ এই একটিমাত্র গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তবুও তাঁদের গবেষণাকর্ম শেষ হচ্ছে না, বরং নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কারের খবরে তাঁরা বিশ্বকে আলোড়িত করছেন। আল কুরআনই গবেষণার মূল উৎস, মূল উপাদান। আমরা যদি আল কুরআনকে যথাযথভাবে ধারন করতে পানি, যদি তার আলোক রশ্মিতে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে পারি, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হব। আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে।

জনাব হাফিজুল ইসলাম বলেন, মুসলিমদের প্রয়োজন হলো- মরিস বুকাইলির মত গবেষকের। আল কুরআন যে আল্লাহরই এক অসামান্য কিতাব তিনি তা প্রমাণ করেছেন তাঁর গবেষণার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের লক্ষ উদ্দেশ্যের খুব কমই বাস্তবায়িত হয়েছে বাকি রয়েছে অসংখ্য বিষয়। সবচেয়ে প্রমাণের প্রয়োজন হল মহান রাব্বুল আলামীন যে বিশ্ব জগতের মালিক এবং পরিচালক, তিনিই মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন– এ বিষয়টিও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন। আল কুরআন নিয়ে গবেষণার জন্য মুসলিম বৈজ্ঞানিক ও গবেষগণের গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতে হবে। সাধারণ মানুষ যারা ইসলাম থেকে দূরে বা অনেক মুসলিম যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেকে পিছিয়ে রয়েছে তাদের জন্য উল্লেখিত প্রমাণ সহজতর করে তুলে ধরতে হবে তাহলে আশা করা যায় মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারলে তাদের জন্য ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা সহজ হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, আমাদের বোধগম্য না হলেও মহাশূন্যের অসংখ্য পাথর ভ্রাম্যমান নক্ষত্রের ওপর পতিত হয়। এ পাথর অন্যান্য নক্ষত্রের ওপর যেমন পতিত হয়ে বিশালাকার অগ্নি গর্ত সৃষ্টি করে কিন্তু পৃথিবী নামক নক্ষত্রের ওপর এ পাথরগুলোও পতিত হয় কিন্তু তাতে ঐ ধরনের ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে না এর কারণ হলো পৃথিবী নামক নক্ষত্র মহাশূন্য ঢাকনা সদৃশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ফলে পতিত পাথরের সঙ্গে এর সংঘর্ষের কারণে পাথরগুলো পুড়ে যায় এবং এগুলোর বিশালত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের জন্য আল কুরআনই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে। বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অনেক নক্ষত্র ও অসংখ্যা তারকারাজি। এর ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, বিস্ফোরণের ফলে যেমন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একইভাবে পৃথিবী এক সময় সংকুচিত হবে ও গুটিয়ে যাবে। এ কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে আল কুরআনে।

জনাব আশরাফ আল দীন বলেন, বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। এই কথাকে প্রমাণ করতে হবে। বিশেষ জ্ঞান নির্দেশ করে জ্ঞানের গভীরতা ও গবেষণার দিকে। বিজ্ঞানময় কুরআন তেমনই একটি গ্রন্থ যা গবেষণা ও জ্ঞান-গভিরতার দিকেই নির্দেশ করে এবং এই গ্রন্থই গবেষণার বিষয় ও জ্ঞান গভীরতার বিচারে নিজেই বিজ্ঞানময়। তাই বিজ্ঞান দিয়ে আল কুরআনকে প্রত্যায়ন বা সত্যায়ন করার প্রয়োজন নেই। সেই তুলনায় বেশি বেশি কুরআন পাঠ এবং কুরাআন গবেষণার দিকে আহ্বান করা প্রয়োজন। কুরআন নিজেই বিজ্ঞানময়। তাই তাকেই তুলে ধরতে হবে এবং তাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ তাওহীদ হুসাইন বলেন, আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মানুষ। গোটা কুরআনে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান উল্লেখ করে কিসে মানুষের কল্যাণ ও অকল্যান উল্লেখ করে মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা হয়েছে– এ বিষয়টি মানষকে বুঝাতে হবে। সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন “আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, এবং এতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি”। এখানে লোহা অবতীর্ণ হওয়া

www.bjilibrary.com

বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। কোন জিনিস ওপর থেকে নিচের দিকে অবতরণ করা হওয়াকে "নযুল" বলা হয়। অথচ লোহা মাটির নিচে পাওয়া যায়। এখানে এ শব্দের তাৎপর্য কি?

অধুনা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে বজ্রপাতের সময় বৃষ্টের সাথে এক ধরনের পাদর্থ [আয়রণ] আকাশে থেকে জমিনে পড়ে আর তাহাই হল লোহার খনীর মূল উপাদান। "এতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি" লোহার মাঝে এমন কি শক্তি রয়েছে যাকে "প্রচণ্ড" বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান লোহার মাঝে 'এটমিক পাওয়ার" আবিষ্কার করেছে, যা অনেক আগেই কুরআনুল করীমে বিবৃত হয়েছে। সূরা তাকভীরের ৬নং আয়অতে মাহন আল্লাহ বলেন, "যখন সমুদ্রসমূহে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।" সমুদ্রে আগুন লাগানো হবে কিভাবে? পানিতে কি আগুন জ্বলবে? বরং পানিকে আগুন নিভিয়ে দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা করে বের করেছে- পানির মৌল উপাদান অক্সিজেন + হাইড্রোজেন এর একটি নিজে জ্বলে অন্যটি জ্বলতে সাহায্য করে। সুতরাং দু'টি গ্যাস আলাদা করলেই সমুদ্রগর্ভ আগুনে ভরপুর হয়ে যাবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মুসলিম গবেষকগণের আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। ■

www.bjilibrary.com

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদকে সম্পৃক্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। সন্ত্রাস কারা করে? দুর্বলরাই সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। ইসলাম কখনো দুর্বল ছিল না, এখনো নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে যুদ্ধ এবং জঙ্গিবাদ এক নয়। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অতএব ইসলামের সাথে যেমন জঙ্গিবাদকে যুক্ত করা যাবে না, ঠিক তেমনি যুদ্ধের সাথেও জঙ্গিবাদকে যুক্ত করা ঠিক নয়। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, যুদ্ধ এবং জিহাদের পার্থক্যসমূহ নিরূপণ করতে হবে। জনগণকেও এব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। রাসূল [সা] কখনো আক্রমণকারী ছিলেন না, বরং আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। ইসলামের শিক্ষাই হলো এটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছে। এই অজ্ঞতাই ইসলামের বড় শত্রু। কারণ অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেই ধারণাপ্রসূত নানা ধরনের অপব্যাখ্যা। যেটা সভ্য জগতের জন্য কখনো কাম্য হতে পারে না। সুতরাং আমাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং ইসলামকে পূর্ণভাবে জানতে ও বুঝতে হবে।

www.bjilibrary.com

গত ৩০শে জুলাই, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ মূলত একই। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জঙ্গিবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে জিহাদের প্রসঙ্গটিও চলে আসে। কিন্তু জিহাদ আর জঙ্গিবাদ এক নয়। জিহাদের অর্থই হলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। আর জঙ্গীবাদের অপর নাম হলো সন্ত্রাসবাদ। ইসলাম জঙ্গিবাদকে কখনই সমর্থন করে না। জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বেদনার বিষয় যে, এই সত্য কথাটি বলতেও আমরা কার্পণ্য করি। জনগণকে বুঝাতেও আমরা অপরাগ। এটাই আমাদের বড় দুর্বলতা। ইসলামের সঠিক অর্থ যদি জনগণের মাঝে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা যায় তাহলে মানুষের ভ্রান্তি ধারণারও অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো একান্ত জরুরী।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, অমুসলিমরা গোটা বিশ্বে ইসলামকে জঙ্গিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করছে। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম মানেই জঙ্গি। অথচ ইসলাম ও মুসলিমের সাথে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপক প্রচার কৌশলের কাছে আজকের মুসলিম বিশ্ব যেন পরাজিত। আমরা যদি ইসলামের

www.bjilibrary.com

প্রকৃত অর্থে, এর মহান শিক্ষা সেইভাবে প্রচার-প্রসারের কাজে যথাযথ ভূমিকা বা দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতাম তাহলে প্রকৃত অর্থেই অপপ্রচারকারীদের জন্য একটি উপযুক্ত জবাব হত। আমদের সেটা করা উচিত। তাদের চেয়েও আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম তো মূলত অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যারই শিকার। যার উৎপত্তি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। এর মুবাকিলায় আমাদের সময়োপযোগী ভূমিকা রাখতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির বলেন, ইসলামকে জঙ্গিবাদের সাথে কারা সম্পৃক্ত করেছে, কেন করেছে, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া উচিত। মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমারা আজ 'ভয়ঙ্কররূপে' চিত্রিত করছে। এজন্য তারা সর্বপ্রকার প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু কেন? কেন ইসলাম সম্পর্কে তাদের এত গাত্রদাহ? প্রকৃত অর্থেই তারা জানে যে ইসলামের উত্থান মানেই তাদের পতন। সুতরাং তারা এখন ভয়তাড়িত এবং বেহুশ। যারা ইসলামকে জঙ্গিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করছে, তারাই কিন্তু সবচেয়ে বড় জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী। তাদের মুকাবিলায় আমাদের যথাযথ কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, আমাদের ব্যর্থতা ঐখানে যে, ইসলামকে আমরা যথাযথভাবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। এই ব্যর্থতার সুযোগটুকু গ্রহণ করছে পশ্চিমা বিশ্ব। তারা তাদের মিশনে সফল হয়েছে। ইসলামকে জঙ্গিবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গোটা বিশ্বকেই বলতে গেলে তারা ব্যবহার করছে। কিন্তু এর বিপরীতে আমরা কি করছি? আমাদের ভূমিকা কতটুকু–বিষয়টি নিয়ে আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, দু:খজনক হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে, যে বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে ইসলাম এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের একটি অভিযোগ উত্থাপনের অপচেষ্ট অত্যন্ত সুকৌশলে করা হচ্ছে। পশ্চিমা প্রচার

www.bjilibrary.com

মাধ্যম এবং এদের কিছু কিছু এদেশীয় সহযোগী এ অপকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। প্রধানত দু'টি কারণে অভিযোগটি হাজির করতে প্রতিপক্ষ সচেষ্ট হচ্ছে। প্রথমত, বিচ্ছিন্নভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক সমাজের কোনও ক্ষুদ্র অংশকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে ব্যবহার করার ফলে; এবং দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ইসলাম ও মুসরিম জনসমাজের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের একতরফা ঢালাও অপপ্রচারের ফলে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলাদেশেও কোনও কোনও স্বার্থন্বেষী-হটকারী মহল, যার সঙ্গে ইসলামের মূলস্রোতের কোনই সংযোগ নেই, ইসলামের নামে সন্ত্রাসমূলক কাজ করছে বা করিয়ে নিচ্ছে। এহেন জটিল ও ঘোলাটে পরিস্থিতিকে পুঁজি করে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিরোধী মহল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রচণ্ডভাবে অভিযুক্ত ও আক্রান্ত করার বিরাট বড় মওকা পেয়ে যাচেছ। আর যারা দেশে ও বিদেশে ইসলামের পরীক্ষিত শত্রু, তারা এ বিরূপ পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমাদের সর্বনাশ করার প্রচেষ্টা চালাবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব বিদ্যমান সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং চলমান ঘটনা প্রবাহকে অত্যন্ত গভীর ও গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাস-সংক্রান্ত প্রচার ও অপপ্রচার প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে; নিজেদেরকে নানামুখী বিভ্রান্তির হাত থেকে হেফাজত করে ইসলামের প্রকৃত কাণ্ডারীরূপে অবিতর্কিতভাবে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। এবং প্রকৃত দ্বীনি দায়িত্ব পালনের পথে বাধাহীন ও স্বচ্ছ অবস্থান ও পরিবেশ অর্জন করতে হবে। প্রধানত এহেন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলিমগণ যে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক অর্থে জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী নয় এবং তারা যে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, এ সত্যটি প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে যা করতে হবে, তা হলো: ইসলামের মত শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দীনের নামে কোনও হটকারী

www.bjilibrary.com

বা সন্ত্রাসী কাজে কোনওভাবে না জড়ানো; যদি কেউ জড়িত থাকে তো তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো এবং সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম যে কোনওভাবে এক নয় এবং কখনই যে এক হতে পারে না, এ সত্যটি তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণভাবে সকলের সামনে প্রতিনিয়ত তুলে ধরা। এভাবেই সন্ত্রাসবাদের নামে সাধারণ মুসলিমকে বিপথগামী করার হাত থেকে এবং প্রতিপক্ষের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে ইসলাম ও এর অনুসারীদের হেফাজত করা সম্ভব হবে; তাদের উজ্জ্বল ও সম্মানজনক ইমেজ বজায় রাখা যবে। এক্ষেত্রে বিবেকবান বুদ্ধিজীবীগণের পাশাপাশি ইসলামী পণ্ডিতদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করাও একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

ইসলাম ও এর অনুসারীদের জঙ্গি-সন্ত্রাস ও হটকারিতায় আক্রান্ত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে তখনই এবং শত্রুপক্ষ কর্তৃক একতরফাভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিযুক্ত করার সুযোগ বন্ধ করা যাবে তখনই, যখন আমরা ইসলাম ও জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যে আদর্শিক ও ঐতিহাসিক পার্থক্য রয়েছে, সেটা বুঝতে পারবো এবং সমাজের সকল অংশকে তা বুঝাতে সক্ষম হবে। মূলত কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও সে অনুযায়ী আমল বা কার্যক্রমই আমাদেরকে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসহ সকল ধরনের হটকারিতা, বিভ্রান্তি ও বিরোধিতা থেকে হেফাজত করতে পারে। এখন সময় এসেছে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হয়ে সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা, ফেতনা, বিরোধিতা ও অপপ্রচারের প্রতিরোধের ইসলাম নির্ধারিত সঠিক ও জনকল্যাণকর কার্যক্রম গ্রহণ করার।

ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম বলেন, ইহুদীরাই মূলত জঙ্গি ও সন্ত্রাসী। তারা নবীদের হত্যা করত। তাদের ধর্মগ্রন্থ সন্ত্রাসকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইহুদীদের সাথে সাথে আমেরিকাও এখন বড় সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার বড় প্রমাণ হলো– রেড ইন্ডিয়ানরা সে দেশ থেকে বিতাড়িত। ১৯৪৫ এর ৬ই আগস্ট, নাগাসাকিতে ফ্যাটম্যান দিয়ে দেড় লাখ হত্যা, ৯ই আগস্ট

www.bjilibrary.com

ফ্যাটমান দিয়ে হিরোসিমায় এক লাখ হত্যা। ১৯৬২ সালে কিউবায় রাশিয়া মিসাইল বেস তৈরি করার পরিকল্পনা করলে কয়েক বার তাদের ওপর আঘাত হানে। ১৯৬৪-৬৭ সালে ভিয়েতনামে ৭০ লাভ টন বোমা ফেলে। ১৯৭০ সালে ভিয়তনমের নমপেনে হাজার হাজার মানুষ হত্যা। ১৯৮৮ সালে গাদ্দাফীর বাস ভবনে আক্রমণ। ইরাক ও আফগানিস্তানে ধর্ম যুদ্ধের ঘোষণা। দাগী সন্ত্রাসী ৫০ হাজার, সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে ৮০০টি এর মধ্যে ৪০০ সশস্ত্র। অন্যান্য দেশের কয়েক লাখ সৈন্য অন্যদের ভূখণ্ড দখল করে আছে। পারমাণবিক বোমা, জর্জিয়ারর ফোর্টবেনিংগ হচ্ছে হচ্ছে সন্ত্রাস শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাটিন আমেরিকাতে সন্ত্রাস করার জন্য সেখানে ৬০,০০০ লোককে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আর ইসরাইলের সন্ত্রাসের কতিপয় দৃষ্টান্ত হলো- তারা-১৯৮১ তে ইরাকের অসিরাক পারমাণবিক চুল্লি ধ্বংস করেছে। ১৯৮৩ সালে তিউনেসিয়ায় পিএলওর অফিসে বিমান হামলা করেছে। ১৯৮২ সালে সাবর শাতিল শরনার্থী শিবিরে একদি ১০,০০০ ফিলিস্তিনী হত্যা করেছে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মূলত মুসলিমরাই সন্ত্রাসের শিকার। সুতরাং মুসলিমদেরকেও এখন জেগে ওঠার সময় এসেছে।

জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম বলেন, জঙ্গীবাদ শব্দটা সাম্প্রতিককালে আবির্ভূত। ঠিক Terrorism শব্দের প্রতিশব্দ এটা নয়। জঙ্গিবাদকে এখন ইসলামী জঙ্গীবাদের সাথে ইচ্ছাকৃতভাবেই সমার্থক করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত পরিকল্পিত একটি কার্যক্রম। যুবকদের কাছে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করাই এর লক্ষ্য। তাই জঙ্গিবাদের আলোচনা/পর্যালোচনা লেখা, সেমিনার ইত্যাদি উপরোক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজন বলে মনে করি। সকল সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ খোঁজা প্রয়োজন।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, বর্তমানে জঙ্গি ইস্যুতে ইসলামের নানা দিকের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

একটি বিষয়ে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা দরকার, সেটি হল জিহাদ। জিহাদের বিষয়ে আজ নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। জিহাদের সঠিক ধারণা তুলে ধরা দরকার। একাজে আমাদের সকল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা জরুরী।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া যুদ্ধ অনুমোদন করে না। তবুও ইসলামকে জঙ্গিবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এটা খুবই দু:খজনক। ইসরাইল, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলো যা করছে সেই গুলোই তো প্রকৃত সন্ত্রাসউ ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম

ইসলাম ও জঙ্গীবাদের ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে সচেতন মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, গোটা মুসলিম বিশ্ব এখন অমুসলিমদের সন্ত্রাস, আক্রমণ ও অপপ্রচারের শিকার। তাদের সন্ত্রাসী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও তারাই আবার ইসলামকে জঙ্গীবাদের সাথে তুলনা করছে। কি হাস্যকর ব্যাপার! অথচ তাদের যথাযথ জবাব দিতে আমার ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের এই বর্থতাই ইসলামের শত্রুদেরকে আরও বেশী উৎসাহিত করছে। সুতরাং আমাদের এখন সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ■

www.bjilibrary.com

পর্দা-অবরোধ-প্রগতি

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, পর্দা কখনই প্রগতির অন্তরায় নয়, বরং সহায়ক। কারণ ইসলামে পর্দার বিধান এমনি এক কার্যকরী বিধান যার মাধ্যমে একজন নারী সকল দিক দিয়ে নিরাপদ ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। সেই সাথে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পায়। যেহেতু পর্দা একটি যুগোপযোগী নারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সেই কারণে পশ্চিমা বিশ্ব এর সমালোচনায় মুখর। তাদের কাছে নারীর কোনো মর্যাদা নেই। বরং নারীর উলঙ্গপনা ও তাদের যথেচ্ছ ভোগের মাধ্যমেই পশ্চিমা বিশ্ব আধুনিকতা খুঁজে পায়। এটা তাদের চারিত্রিক ও মানসিক ব্যাধি। ইসলামই নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। এই মর্যাদারই একটি প্রতীক হিজাব বা পর্দা। ইসলামের এই শাশ্বত বিধান মেনে চললে যে কোনো সমাজেই নারীরা নিরাপদ থাকতে পারে।

গত ২০শে আগস্ট, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "পর্দা-অবরোধ-প্রগতি" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার

www.bjilibrary.com

আলী, ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. মাহফুজ পারভেজ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুসল হক, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, পর্দা ইসলামের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সময়োপযোগী এবং বিজ্ঞানসম্মত। পর্দার কল্যাণকর দিকগুলো নিয়ে আরও বেশি পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ জনগণের মধ্যেও পর্দার কল্যাণকর দিকগুলো তুলে ধরে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা জরুরী। পর্দা এমনি একটি বিষয়, যার মাধ্যমে অনেক অকল্যাণকর দিক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আজ যথাযথভাবে পর্দার প্রচলন না থাকায় দেশ ও সমাজ এক ভয়াবহ করুণ অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে। যেটা সভ্য সমাজের জন্য কখনো কাম্য হতে পারে না।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, রাসূলের [সা] পূর্বেও পর্দার প্রচলন ছিল। ফলে তখনকার দেশ ও সমাজ পর্দার সুফল ভোগ করেছে। আজ প্রগতির নামে পর্দাকে অবহেলা করার কারণে দুর্বিষহ দুর্গতি নেমে এসেছে। সমাজে চারিত্রিক ও নৈতিক ধস নেমেছে। এসব থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের আল কুরআনের বিধানের কাছেই ফিরে যেতে হবে। যথাযথভাবে পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, পর্দা না মানার কারণেই আজকের গোটা বিশ্বে যত হানাহানি ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে। পশ্চিমা বিশ্ব নারীদেরকে বেআব্রু করে তাদের মান মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে। প্রগতির নামে তারা নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সুতরাং নারীর প্রকৃত মর্যাদা দিতে গেলে অবশ্যই পর্দার বিধান যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

www.bjilibrary.com

ড. এম. উমার আলী বলেন, পর্দা-অবরোধ-প্রগতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পর্দার নামে নারীদের শিক্ষা, উৎকর্ষতা, উন্নতি এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধা দেয়া ইসলাম অনুমোদন করে না। বর্তমান সমাজ ও সামাজিকতাকে বাস্তবে আমলে না নিয়ে নিজেরা islated ভাবে জীবন যাপন করে কি পর্দার বিধান কার্যকর করা সম্ভব? সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা কে adopt করে তার মাধ্যম ছাড়া অগ্রসর হবার পথ যেখানে নেই সেখানে কেমন পন্থা অবলম্বন করে আমরা নিজেদের পশ্চাদপদতা থেকে সামনে অগ্রসর হতে পারি? অধিকাংশ পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেপর্দার মাঝে চলার কারণে যত দুর্গতি নেমে আসছে। পর্দা ও শালীনতা রক্ষা করে একই সাথে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের উপায় কি হতে পারে তা অবশ্যই তুলে ধরতে হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, মধ্য যুগে ইউরোপের পরিস্থিতির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিত্ব ইউরোপের খৃস্টান সমাজকে নাস্তি ক বানানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছে তাদের মধ্যে ডারউইনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, কিন্তু এখানে ফ্রয়েড, কার্লমার্কস-এর বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক বিষয়টিও আমাদের সামনে রাখা প্রয়াজন। প্রাচ্যের 'পর্দা বিরোধী' অভিযান মুসলিম বিশ্বে তথা প্রাচ্যে কিভাবে বিস্তার লাভ করল সেটা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, পর্দার বিধান নিয়ে আলোচনায় এদেশের এক প্রচলিত উপস্থাপনা হল, পর্দা শুধু নারীর জন্যই যেন কোন একক বিধান। অর্থাৎ পর্দা হল নারীর বিষয়। এখানে পুরুষের পালনীয় কোন নিদের্শনা যেন নেই। ড্রেস কোড নিঃসন্দেহে পর্দার অংশ। কিন্তু শুধু ড্রেস কোডই পর্দা নয়। মুসলিম নারীদের ড্রেস কোড সম্পর্কে সূরা আহযাবে [৩৩ : ৫৯+৩৩] যেমন আল্লাহতায়ালা উল্লেখ করেছেন তেমনি সূরা আন নূর [২৪ : ৩০-৩১]-এ মুসলিম নারী ও পুরুষদের দৃষ্টির সংযম এবং প্রাইভেট পার্ট-এর পবিত্রতা বজায় রাখার কথা বলেছেন। বলেছেন পুরুষ ও নারীর পরস্পর মেলামেশার সীমা ও স্বাধীনতার কথা। ড্রেস কোড, দৃষ্টির সংযম, প্রাইভেট পার্ট-এর পবিত্রতা, পুরুষ ও নারীর পরস্পর মেলামেশার সীমা ও স্বাধীনতা এই সব মিলেই পর্দা। যা শুধু নারীর

www.bjilibrary.com

নয়, নারী ও পুরুষ উভয়ের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা এবং সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষক। এ যেন অমূল্য রত্নকে সংরক্ষণের, যত্নে রাখার নি:ছিদ্র নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।একটি গাড়ীর ইন্টারনাল নিরাপত্তার গ্যারান্টি হল ব্রেক সিস্টেম। যত সুন্দর আর দামী হোক না কেন ব্রেক সিস্টেম বা গাড়ী নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা না থাকলে সে গাড়ির ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ মানুষকে [নারী ও পুরুষ] তৈরী করেছেন সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হিসেবে এবং তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে দিয়েছেন ব্রেক সিস্টেম বা পর্দার বিধান। [সূরা আত তীন]

ঘুম, যৌনতা, ক্ষুধা এগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একান্তই স্বাভাবিক প্রয়োজন। এসব প্রয়োজন অপূরণ থাকলে মানুষ স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সক্ষম হয় না। আর এই প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা আল্লাহপাক নারীকে দেননি। ফলে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের অর্থনৈতিক সার্বিক তৎপরতার উপর নির্ভরশীল। ইসলামে নারীর প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুরুষকে দেয়া হলেও অন্য কোন ধর্ম বা পুঁজিবাদী-সমাজবাদী অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষকে নারীর দায়িত্ব দেয়া হয়নি। নারীকে নানা অলৌকিক অজুহাতে, ছল-চাতুরীতে, সংস্কার বাহানায় শুধু ভোগের উপকরণ হিসেবেই মর্যাদা দেয়া হয়েছে অথবা নরকের দ্বার হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। তাই নারীর অবস্থান [Position] মানুষ হিসেবে ইসলামে যতটা সুদৃঢ় অন্যত্র তা নয়। অন্যান্য ধর্ম এবং পুঁজিবাদী-সমাজবাদী অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে নারীর অবস্থান [Position] দুর্বল হওয়ার কারণে নারী তার আব্রু বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সমাজবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী প্রভাবে মুসলিম পুরুষরা তাদের নারীদের প্রতি অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পালনে দারুণভাবে উদাসীন এবং অসচেতন। ঘুম, যৌনতা আর ক্ষুধা নিবৃত্তির মত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকে এখন উদয়াস্ত শ্রম দিতে হচ্ছে । অনেক মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই পুজিবাদী অর্থনীতির দর্শন ও কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাবার কারণে সামগ্রিকভাবে নারীর আব্রু অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের কাছে বার বার আত্মসমর্পণ করছে। পর্দার বিধান পালনের

www.bjilibrary.com

অভাবে নারী আব্রু হারাচ্ছে এটা যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক দীনতা নারীকে আব্রু বিকিয়ে দিতে বাধ্য করছে এটাও সত্য। তাই নারীর আব্রুর নিশ্চয়তার জন্য পর্দার বিধান যেমন পালন জরুরী তেমনি জরুরী নারীর অর্থনৈতিক দীনতা দূরীকরণে মুসলিম পুরুষদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন। আর এই অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরীর জন্য ইসলামের যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, পর্দা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চর্চার অভাব বর্তমান নারী পশ্চাৎপদতা এবং নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। নারীর দুর্ভোগের জন্য পশ্চিমা বিশ্ব কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্রকে চিহ্নিত করে বিরাট ভুল করেছে। কারণ উন্নত ও ধনী দেশের নারীরা কিন্তু পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। আজকে পশ্চিমা নারীরা ক্রন্দনধ্বনি বিশ্ব মর্মাহত। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের নারী নির্যাতনের ঘটনায়ও আমরা উদ্বিগ্ন। এ থেকে অর্থনৈতিক প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে রক্ষা পাওয়া যাবে না, তারা প্রমাণ পশ্চিমা নারীর অধ:পতন লক্ষ্যণীয়। পর্দা নারীর জন্য একটি অপরিহার্য নিয়ামত। এর মাধ্যমে নারী নিজের স্বকীয়তা, ইজ্জত, আব্রু রক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে। পর্দাকে বলা যায় আত্মরক্ষার উপকরণ। যে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট, তাকে আক্রমণকারী কিছুই করতে পারে না। পর্দা মহান স্রষ্টা আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা কর্তৃক নারীকে প্রদত্ত আত্মমর্যাদা ও আত্মরক্ষার উপকরণ এই পর্দাকে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করার মাধ্যমেই নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম বলেন, যারা পর্দা প্রথার সুশৃঙ্খলতা, দায়িত্বশীল যৌনজীবনের নিশ্চয়তা, অসংখ্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিষেধক এবং নারীর মান-সম্ভ্রমের রক্ষাকব তারাই আসলে সত্যপন্থী। যারা সত্যপন্থী নয়, তাদের রয়েছে পর্দা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। আত্মিক উন্নতি, পারিবারিক প্রয়োজন, সমাজ কল্যাণ ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে নারীর ভূমিকাকে দুর্বলভাবে উপস্থাপন করলে চলবে না। নারীর ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে নয়, বরং ইতিবাচক বক্তব্য দিয়ে নারীর অধিকার সমূহ আরো জোরালোভাবে

www.bjilibrary.com

তুলে ধরা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পর্দার ইতিবাচক দিক। পর্দার রয়েছে অসংখ্য কল্যাণকর ফলাফল, যা বর্ণনা করা জরুরী।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, পর্দার সাথে প্রগতির কোনো সংঘর্ষ থাকতে পারে না। আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী গোষ্ঠী পর্দা সম্পর্কে নারীদের মনে নেতিবাচক ধারণা জন্ম দেয়ার জন্যই এধনের কথা প্রচার করে। পর্দা নারীকে দিয়েছে প্রকৃত মর্যাদা। মাতৃজাতির সেই মর্যাদা রক্ষার জন্য পর্দার বিধানসমূহ আরও জোরালোভাবে সর্বস্তরে সহজ ভাষায় প্রচার করা প্রয়োজন।

জনাব শফিউল আলম ভুঁইয়া বলেন, পর্দা একটি কল্যাণকর বিষয়। পর্দা বলতে শুধু নারীদের পর্দাই বুঝায় না, বরং সকল শ্রেণীর মানুষেরই পর্দার বিধান মেনে চলা প্রয়োজন। পর্দা সম্পর্কে আমাদের সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য আমাদেরই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, বেপর্দা হওয়ার কুফল তো আমরা প্রতিটি মুহূর্তে দেখছি। সুতরাং পর্দার সুফলগুলো এখন বেশি বেশি প্রচার করা উচিত। পর্দা যে একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা সেটা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। এর পাশাপাশি সমাজের অনৈতিক ধস কিভাবে রোধ করা যায় সেই সম্পর্কেও আমাদের ভাবতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইসলামে নারীর চলার ক্ষেত্রসমূহ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্দা বিরোধীরা পর্দ প্রগতির অন্তরায় বলে বানোয়াট প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আলাদা আলাদা কর্মক্ষেত্র বিদ্যমান। স্ব স্ব স্থানে তারা স্বাধীন। পাশ্চাত্য প্রগতির নামে কিভাবে নারীকে পণ্য বানিয়েছে সেই চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। মতলববাজ লোকেরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা, বিকিনি প্রতিযোগিতা, সূর্যস্নান নামে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীকে মর্যাদার শূন্য কোঠায় এনেছে। নারীকে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পর্দার কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না।

www.bjilibrary.com

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, পশু বিবেকহীন। মানুষ বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিমান, তাই উভয়ের নীতি ও আচরণে অবশ্যই পার্থক্য থাকতে হবে। কেবল মানবিক অবয়বের কারণেই কেউ মানুষ হতে পারে না। তাকে মানুষ হতে হয় নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে। মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ঘোষিত বিধান অনুসারে আদর্শিক জীবন গড়ে। কিন্তু পশুকে পশুত্ব অর্জন করতে হয় না। সে জন্যে পশু হয়ে মারাও যায় পশু হয়ে। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন না গড়ে তাহলে তাকে পশু হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এখানেই শেষ নয়, তারপরও রয়েছে পরকাল বা হিসাব নিকাশের আরেক জগৎ। তাই আজ প্রয়োজন নারী পুরুষভেদে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকগুলো তাদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন এবং তা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ। পর্দা সমাজ জীবনকে সুস্থ রাখে। এছাড়াও অনেক কল্যাণ এতে রয়েছে। তাই এ বিষয়গুলো সবার সামনে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবি। ■

www.bjilibrary.com

ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য। এই ব্যবস্থা সর্বকাল ও সর্বযুগের জন্য সমান প্রযোজ্য। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' শব্দটি এসেছে অথচ আজকের দিনে 'জিহাদ' শব্দটি নিয়ে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দু:খজনক। ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য 'জিহাদ' এবং 'কেতাল' শব্দ দু'টি আছে। কিন্তু এই শব্দ দু'টির অর্থ এক নয়, ভিন্ন। এদের মধ্যে পাথ্যর্ক অনেক। সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও 'জিহাদ' এবং 'কেতাল' এর অর্থ ও তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। এজন্য বিষয়গুলো আরও সহজতর ও বোধগম্য করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম জীবন মানেই সৈনিক জীবন। একজন মুসলিম যেমন তাঁর গৃহকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন, তেমনি তিনি হবেন দেশ ও জাতির জন্যও শক্তিশালী, নিরলস ও সাহসী কর্মী। ইতিহাস সাক্ষী মুসলিমরা কখনো যুদ্ধ করে না, বরং তারা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অলোচনা, পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

www.bjilibrary.com

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মাহফুজ পারভেজ। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, জনাব শেখ মুহাম্মাদ শোয়েব নাজির, জনাব আশরাফ আল দীন, জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, মুসলিমদের সৈনিক জীবনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। একজন মুজাহিদের গুরুত্ব কত বেশি সেটা আল কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। শহীদের মর্যাদা সামানে থাকলে যে কোনো মুসলিমই মুজাহিদের ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামে প্রতিরক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে যে কোনো দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন ক্ষেপণাস্ত্র। একটি মুসলিম দেশ কখনো অন্য দেশ গ্রাস করার জন্য যুদ্ধ করে না। কিন্তু তাদের ওপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে যাতে তারা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সেই ধরনের উপায়-উপকরণ তাদের থাকতে হবে। শক্তিতে যদি কোনো মুসলিম দেশ বলীয়ান হতে পারে, তাহলে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও সক্ষম হয়।

ড. এম. উমার আলী বলেন, প্রতিরক্ষার সাথে জিহাদ শব্দটি সম্পর্কযুক্ত। জিহাদ একটি ইসলামী পরিভাষা, ইবাদাতের একটি উচ্চতম শিখর হিসেবে একে চিহ্নিত করা হয়। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার নয় বরং প্রতিরক্ষা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার, মানুষকে অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার একটি বড় শক্তিশালী ইবাদাত। ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় জিহাদ হলো সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনমূলক বস্তুবাদী যুদ্ধ সমূহ থেকে ভিন্নরূপ। আত্ম প্রতিরক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোর মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে লুটপাট, হত্যা, পরোস্ব

www.bjilibrary.com

অপহরণে লিপ্ত না হওয়ার জন্যই ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে স্থানীয় জনশক্তির সমর্থন অর্জন করেছে। জিহাদের মাধ্যমে হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়, আমলকে খাদমুক্ত করা সম্ভব হয়, মুনাফিক চিহ্নিত হয়। বাতিল বা খাদ মুক্ত অবস্থায় ইসলামী জনশক্তির মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শক্তিশালী হয় এবং তারা সংঘবদ্ধ নিজেদের প্রতিরক্ষার বিষয়ে self alert হয়। সমাজে জাহিলিয়াতের জুলুমাত দূর করে আনে নূর, সন্ত্রাসের পরিবর্তে সার্বিক নিরাপত্তা।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণ নি:সন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'প্রতিরক্ষা' বিষয়ে এর গুরুত্ব তুলে ধরে ইসলামে পূর্ণত্ব পবিত্র ব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি সেটা আলোচনার দাবি রাখে। অধিকন্ত সাধারণ অর্থে যুদ্ধ [যা প্রতিরক্ষা একটা কৌশল] ও ইসলামের জিহাদের প্রভেদ পার্থক্য স্পষ্টভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। এছাড়া বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ন্যায় যুদ্ধ, যুদ্ধোন্মাদনা ও যুদ্ধ বিগ্রহকে চিহ্নিত করা যায়। জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশন এর শ্লোগান ছিল দুনিয়াকে যুদ্ধের ধ্বংস ও রক্তাক্ত হানাহানি হোক বাঁচানো। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে ও নিজেকে রক্ষার নীতি ব্যবস্থার যুদ্ধকে কৌশল হিসেবে গ্রহণকারী হয়েছে। দেখা গেছে বর্তমানে বিশ্বের যারা শক্তিমান তারাই যুদ্ধের সূচনা করে এরা যারা শক্তিহীন তারা শক্তিমানের কাছে পরাভূত। কিন্তু ইসলাম সভ্যতার ইতিহাসের এটা প্রতিষ্ঠিত শক্তি প্রদর্শন বা নিছক আত্ম রক্ষার জন্য নয় বরং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে হয়। রাসূল [সা] এ প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন কৌশল আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকা জরুরী। প্রতিরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একটি দেশের ভূ খণ্ড রক্ষার্থেই শুধু প্রয়োজন নয় বরং একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এটি একটি রক্ষাকবচ। বিশেষ করে ইসলাম এ বিষয় যে গুরুত্ব আরোপ করেছে তা সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে বিশ্ব যদি রাসূলের [সা] প্রতিরক্ষার কৌশলসমূহ গ্রহণ করে তাহলে সারা বিশ্বের অশান্তির পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত । কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজকের বিশ্বে প্রতিরক্ষার নামে চলছে বিশ্বসন্ত্রাস এবং দুনিয়াবাসীর জন্য তা এক বিরাট আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত।

www.bjilibrary.com

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, মদীনার প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ শত্রুদের হাত করা হয়েছিল। সামজিক ঐক্য ও বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জিহাদ, কিতাল ও হারব এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। জিহাদ 'আম' কিতাল হচ্ছে খাছ। বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের অভিনব কৌশল মাত্র। অতএব এরা দ্বারা যুদ্ধের দাবানল বাড়ে। সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধের দাবানল বৃদ্ধির বিষয়টি জায়নবাদী ইহুদীদের প্রটোকল বিধিমালার অন্যতম বিধি। আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অস্ত্র কারখানা সমূহের উৎপত্তি অস্ত্রগুলোর বেচা কেনা যুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়। ইসলামে প্রতিরক্ষার নীতিমালার মধ্যে রয়েছে- ক. নারী শিশু হত্যা নিষেধ, গাছাপালা নষ্টা করা অবৈধ; খ. যুদ্ধ ময়দান থেকে পলায়ন হাদিসের ভাষায় কবিরা গোনাহ; গ. যুদ্ধের ক্ষেত্রে গরিমা করা নিষিদ্ধ। ঘ. কখনো কখনো সন্ধি করা প্রয়োজন হয়।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা অর্থ হলো বহি:শত্রু আক্রমণ থেকে নিজ দেশকে রক্ষা করা। সার্বিক স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা প্রচেষ্টার নাম প্রতিরক্ষা। সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আসতে পারে। ইসলামের প্রতিরক্ষা বিষয়টি শরীয়াতের মূল লক্ষ্যগুলোর সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে দেখা যায়। ১. ঈমান-আকীদার প্রতিরক্ষা : ক. যুক্তি ও বর্ণনার মাধ্যমে, খ. লড়াই করা। ২. মুসলিম জাতির ও মানবতার অস্তিত্ব রক্ষা : মুসলিম জাতি একটি অবিচ্ছেদ্য জাতি। ৩. মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সম্পদের রক্ষা করা। ৪. মুসলিম উম্মাহর রক্ষার জন্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। সূরা নিসাঃ ১০০, আম্বিয়া, ৯২, আলে ইমরান : ১০৩, ৫. শাসক নির্বাচনে মুসলিম উম্মাহর অধিকার রক্ষা। ৬. দেশ রক্ষা : সূরা আল বাকারা বলা হয়েছে- 'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করা যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে আর সীমা লংঘন কর না।'

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা অনুধাবন করতে হলে ইসলামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সামনে রাখা অপরিহার্য। ইসলাম জীবনের পবিত্রতার শিক্ষা নেয়; উৎপীড়ন, নিপীড়ন, বল প্রয়োগ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়। শান্তি ও ন্যায়ের

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা, এখানে বংশ বর্ণ, ক্ষমতা, অর্থ বিত্ত ও সম্পত্তি দিয়ে নয় ফরহেজগারী ও মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে মানুষের মর্যাদা নির্ণিত হয় ইসলামে Holy war এর ধারণা নেই। যুদ্ধকে এখানে ন্যায় এবং অন্যায় এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যুদ্ধ মৃত্যু ও ধ্বংস ডেকে আনে, তা কখনো Holy বা পবিত্র হয়না। অন্যায় অবিচার অত্যাচার রোধ এবং আত্ম রক্ষার জন্য ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি আছে। বিশেষ করে সূরা আল নহলের ৯০নং আয়াত, আন হুজরাতের ১৩, আল বাকারার ১৯০, হজ্জ এর ৩৯, নিছার ৯০-৯১ নং আয়াতে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা নীতির দিক দর্শন রয়েছে। রাসূল [সা] শুধুমাত্র আত্মরক্ষা স্বার্থেই অস্ত্র হাতে নিয়েছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। তার শিক্ষা অনুযায়ী যুদ্ধরত শত্রুরা মুসলিমদের চিরশত্রু নয় তারা একটি Potential force for peace and faith, কেননা ন্যায়ের পথে আনার জন্য মানুষের মন জয় করা ইসলামের লক্ষ্য। তাদের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত করা নয়। আরেকটি বিষয়ও প্রনিধানযোগ্য। ইসলাম শুধু মানুষের জীবন নয়, জীবন্ত সকল প্রাণীর জীবনকে পবিত্র ও অলংঘনীয় বলে মনে করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বর্বরতা ও অসভ্য আচরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। যুদ্ধকালে গ্রাম ও শহরের জনপদ ধ্বংস করা, উঠতি ফসল ও বাগান নষ্ট করা, মালিকের বিনা অনুমতিতে এবং যথাযথ মূল্য পরিশোধ ছাড়া গবাদি পশু জবাই করা প্রভৃতি ও ইসলামে হারাম। ধর্মনেতা তথা ধর্মযাজক, প্রার্থনাগার ধ্বংস করা ইসলামী প্রতিরক্ষা নীতিতে নিষিদ্ধ বলে গণ্য। শত্রু সৈন্যদের মৃত দেহের অবমাননা ইসলামী আইনে একটি গর্হিত কাজ। ইসলাম যখন যুদ্ধ বিদ্যার এই civilized rule গুলো অনুসরণ করেছে ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জগৎ তখন অন্ধকারে ছিল। সপ্তদশ শতকে এসে তারা যুদ্ধের মানবিক দিকগুলো সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক হতে শুরু করে এবং বিংশ শতাব্দিতে এসে জেনেভায় চারটি কনভেনশন এবং দু'টি অতিরিক্ত প্রটোকলের মাধ্যমে এই বিধিগুলোর কিছু কিছু law তে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই বিধিগুলো ইরাক আফগানিস্তানে যুদ্ধ সহ সর্বত্র তারা লংঘন করেছেন। এই অবস্থায় ইসলামের অনুসারী হিসেবে আমাদের কাজ হচ্ছে ইসলামের প্রতিরক্ষা নীতিগুলো সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বেশি করে অবহিত ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রাপ্ত সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে

www.bjilibrary.com

ইসলামের প্রতিরক্ষা ধারণায় সমর কৌশল ও সমরাস্ত্রের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ও সর্বাধুনিক কৌশল গ্রহণের বিষয়টিকে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, চলমান বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রতিরক্ষরা একটি বিশেষায়িত বিষয়। নৈর্ব্যক্তিক বিষয় নয়। প্রতিরক্ষা, জীবনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণে আল্লাহপাক প্রতিটি মাখলুকাতের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার জন্মগতভাবেই দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা কোন কোন মাখলুকাতের ক্ষেত্রে offensive কোন কোন মাখলুকাতের ক্ষেত্রে Defensive। মানুষকে আল্লাহপাক জন্মগতভাবেই প্রতিরক্ষার হাতিয়ার দিয়েছেন। শিশুর কান্না তেমনি এক হাতিয়ার। ঈমানদারদের প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষা মূলত: Defensive। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ঈমানদাররা Offensive। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য। মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যে বিষয়ে মুসলিমদের দুনিয়াতে কল্যাণ, আখিরাতে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতেও তাতেই কল্যাণ। আর তাদের পার্থিব অকল্যাণ সেখানেই যেখানে তাদের পারলৌকিক ও ধর্মীয় অকল্যাণ নিহিত। প্রতিরক্ষা, এই উভয় কল্যাণ লাভের জন্য দুনিয়ার বুকে যে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনের প্রয়োজন তা নিশ্চিত করে। প্রতিরক্ষা দু'টো দিক। এক. অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার কৌশল, দুই. বহি:শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কৌশল।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কাছ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিতে চান, তার প্রাথমিক প্রয়োজন হল, তাদের সব ধরনের জাতীয় ও মানবিক দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকা এবং তাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট ও দৃঢ় থাকা। তারা স্বয়ং যদি নিজেদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা না করে এবং শত্রুর সৃষ্ট গোলযোগ ও চক্রান্ত সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখিয়ে নিজেদেরকে যাবতীয় সামাজিক জ্বরাব্যাধিতে আক্রান্ত করে ফেলে, তাহলে এতে করে তারা যে শুধু নিজ অস্তিত্বকেই অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে তা নয়, বরং মানবতার যে মহান সেবার কাজটি সম্পাদনের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাও তারা করতে পারবে না। এটা শুধু নিজদের ওপরই নয়,

www.bjilibrary.com

গোটা মানবজাতির ওপর জুলুম করার শামিল হয়। এজন্যই মুসলিমদের যেসব শত্রু তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে বা হয়ে থাকে তাদেরক স্পষ্ট করে চোখে আংগুল দিয়ে চিনিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শত্রুকে নির্মূল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে– যেন তারা পৃথিবী থেকে হিদায়াতের জ্যোতিকে নিশ্চিহ্ন করতে বিশ্বব্যাপী সংস্কারমূলক কাজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে। এজন্য দুষ্কৃতি শুধু শুরু করলেই বা গোলোযোগ আরম্ভ করলেই অস্ত্রধারণের নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং প্রতিরোধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যাতে দুষ্কৃতি মাথা তোলারই ধৃষ্টতা না দেখায়।

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বলতে আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার কৌশল এবং বহি:শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কৌশল এই উভয়দিকে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম বলেন, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ, নিজেকে রক্ষার নীতি-ব্যবস্থা-কৌশল প্রণয়ন, একটি বাস্তবসম্মত-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে নাগরিক-রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যব্যবস্থা, সামগ্রিকভাবে যার নাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিরক্ষার এটা একটা উত্তম সংজ্ঞা হতে পারে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝে থাকি-

১. আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা [শান্ত পরিবেশে]- সংশ্লিষ্ট আয়াত হতে পারে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মান্য করো, প্রতিপত্তি যাবে বিনিষ্ট হয়ে।

২. বহি:আক্রমণের মুখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা– সংশ্লিষ্ট আয়াত হতে পারে, "শত্রুর সঙ্গে লড়াই কবার জন্য যথাসাধ্য সমরাস্ত্র ও সিপাহিসুলভ শক্তি সদা-সর্বদা প্রস্তুত রেখো, যেন দুশমনের ওপর তোমাদের ভীতিকর প্রভাব কায়েম থাকে।"

৩. স্বীয় আক্রমণের সময় অর্থাৎ আক্রমণকারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা– সংশ্লিষ্ট আয়াত হতে পারে "যদি দুশমন সন্ধির প্রস্তাব করে তবে তোমরা তাতেসাড়া দেবে এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা শক্তির মোহে সীমা অতিক্রম করো এবং দুশমনের আগ্রহ সত্ত্বেও তোমরা সন্ধি স্থাপনে এগিয়ে না যাও।" ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে যত বেশী আলোচনা হবে, লেখালেখি হবে, ততোই জনগণ সচেতন হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, ইসলামে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু দু:খের বিষয় যে, এই দিকটি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা ও লেখালেখি হয় না। ইসলামে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আবার অনেকের ধারণাও স্বচ্ছ নয়। আল কুরআনকে যদি সামনে রেখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঠিক কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়, যদি রাসূলের [সা] জীবন থেকে প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষা নেয়া হয়, তাহলে মুসলিম বিশ্ব মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

জনাব আশরাফ আল দীন বলেন, ইসলামে প্রতিরক্ষার ধারণা আমাদের কাছে স্বচ্ছ থাকতে হবে। ইসলামে প্রতিরক্ষার প্রাথমিক ও ঐতিহাসিক ধারণাও আমাদের থাকা জরুরী। প্রতিরক্ষা বিষয় অনেক আলোচনা প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা কি ও কেন? এই বিষয়ে আমাদের জানা থাকা দরকার। প্রতিরক্ষার স্তরসমূহ এবং প্রতিরক্ষার পর্যায় অলোচনার মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের জনগণ পরিচিত নয়। ইসলামী শরীয়াতের নিয়ম ও নির্দেশাবলীর সিনথেসিস করে প্রতিরক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। Attack is the best defence বা আক্রমণই আত্মরক্ষার উত্তম উপায় জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযান এ পর্যায়ে দাঁড়ায়। রণকৌশলগত অবস্থান গ্রহণে দ্রুততা ও চাতুর্য যুদ্ধের বিদ্যাকে এগিয়ে আনে। তাবুক যুদ্ধের ইতিহাস তার প্রমাণ। এটি যুদ্ধ ছিল না, ছিল অভিযান। তবে প্রস্তুতি ছিল যুদ্ধের। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষায় কিছু অনিবার্য দিক আছে। যেমন, অর্থনীতি, জনশক্তি [এর ঐক্য ও প্রশিক্ষণ], ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, গ্রুপ-ব্লক-আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, কোন স্থানে মুসলিমরা যদি অত্যাচারিত হয় তবে সেখান থেকে অবশ্যই তাকে বের হতে হবে। এজন্য সংগ্রামের প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে বারবার ধৈর্য্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ইসলামকে নির্মূল করতে ইচ্ছা পোষণকারীর বিপক্ষে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। আল কুরআনের বহু জায়গায় আত্মরক্ষামূলক, দেশ ও জাতি রক্ষামূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন এবং এ সম্পর্কে জনগণকেও সচেতন করে তোলা জরুরী। ■

www.bjilibrary.com

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** দেশে এখন অনৈতিকতা ও অরাজকতার সুনামি চলছে। জনগণকে গোলকধাঁধায় ফেলে সরকার একেরপর এক প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং তা জোর করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতিও ঠিক ঐ ধারাবাহিকতারই ফসল। এই শিক্ষানীতি কি ও কেন? এর কুফল কতটা ভয়াবহ! এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে এই দেশ ও সমাজকে কোথায় নিয়ে যাবে– সেটা কি আমরা ভেবে দেখেছি? এটা একটি জগাখিচুড়ি শিক্ষানীতি, যার কোনো গুরুত্বই নেই। এই শিক্ষানীতি একটি খেলতামাশার চিত্র যেন। জনগণের সাথে, দেশের মানুষের সাথে সরকার মূলত তামাশার নীতিই অবলম্বন করেছে। সরকারের বয়সমাত্র নয় মাস। এর মধ্যেই আবার শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি এত জরুরী হয়ে উঠলো কেন? এর একটি গূঢ়তর অর্থ আছে। সেটি হলো ট্রানজিট, করিডোর, সেতু প্রভৃতি ইস্যু থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকার শিক্ষানীতির নামে একটি অপকৌশল গ্রহণ করেছে। সরকারের এই খেলতামাশা জনগণ বুঝে গেছে। সুতরাং এই সেক্যুলার শিক্ষানীতি এদেশে তারা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। জনগণই সেটা প্রত্যাখ্যান করবে।

—

www.bjilibrary.com

গত ১০ই অকটোবর, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মাদ লোকমান। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির। ড. মাহফুজ পারভেজ, জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমিন, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ তাওহীদ হুসাইন, জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতি সরকারের একটি অপনীতিরই নামান্তর। এর পূর্বেও এধরনের সেক্যুলার শিক্ষানীতি এদেশে তারা চালু করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনগণই সেটা বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। ইনশাআল্লাহ এবারও তাই হবে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম পছন্দ করে, ইসলামী বুদ্ধিজীবীরাও শিক্ষার সাথে পরিচিত ও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অতএব এখানে ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে অন্য কোনো শিক্ষানীতি চালু হতে পারে না। ১৯৬২ সাল থেকে আমরা শিক্ষানীতি নিয়ে কাজ করছি। এখন প্রয়োজন একটি ইসলামী কোর্স ডিজাইনের। আল্লাহতাআলা প্রত্যেকের যে যোগ্যতা দিয়েছেন, তা কাজে লাগাতে হবে। আমাদের উচিত আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। তাহলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

ড. এম. উমার আলী বলেন, কথায় বেশি বেশি এবং বাড়াবাড়ি কিন্তু কাজের বেলা পেছনে পড়ে থাকা এটা আল্লাহর কাছে বড়ই অপছন্দনীয়। অথচ এবিষয়ে আমরা প্রায়শই বাড়াবাড়ি করে থাকি। কোন ভাল বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাও ভাল নয়। সবকিছুর জন্য একটা মাত্রা রয়েছে। যেখানে কথা ও কাজে মিল হতে পারে, সেটাই প্রকৃত পক্ষে উত্তম পন্থা। ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষের জীবন বলতে

www.bjilibrary.com

শুধু দুনিয়ার জীবনকে যারা বোঝে তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ভ্রান্ত লোকদের সবনীতি অনুসরণযোগ্য হতে পারে না। আর শিক্ষানীতিতে ঐ ধরনের ভ্রান্ত লোকেরা শুধু ব্যক্তি প্রাপ্তি, জৈবিক প্রাপ্তি, বস্তুবাদী প্রাপ্তির কথাই বোঝে। নৈতিকতা ও ধর্মকে তারা বাদ দেয়। পাক-ভারত উপমহাদেশে থেকে ৫০ এর দশকে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পেছনে এদেশের জনসাধারণের ধর্মীয় চেতনা প্রবলভাবে শক্তি ও উদ্দীপনা প্রদান করে।

বাংলাদেশে স্বাধীন হলেও ইসলামবিরোধী আগ্রাসী শক্তি এদেশের জনগসাধাণকে তাদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করার চক্রান্ত হিসেবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রচার মাধ্যমের আগ্রাসনকে কাজে লাগায়। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সকল মাধ্যমেই তারা প্রচারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা, চমক ও জৌলুস এনে জনগণের একটি অংশকে তাদের পক্ষে নেয়ার প্রয়াস চালায় এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। এতদসত্ত্বেও মানুষের অন্তরের ধর্মীয় চেতনা তারা মুছে ফেলতে পারেনি। যে সব দেশে ইসলামী খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানের সংস্কৃতি এবং যেখানে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাদের সংস্কৃতির মাঝে বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে। এই উপমহাদেশে সাত শত বছরের অধিককাল ধরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও এখানে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী তমদ্দুন জনগণের কাছে কোনদিনই পরিচিতি পায়নি। তাই ধর্মের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও ইসলাম বিষয়ে অধিকাংশই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির ভিত্তিতে প্রণীত এবারের শিক্ষানীতির একটি বস্তুবাদী চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি অন্য দেশ থেকে আমাদনী যোগ্য কোন পণ্য নয়। দেশের চাহিদা, দেশের মানুষ, দেশীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির সাথে শিক্ষা একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িত একটি বিষয়। তাই দেশের জনগণের প্রকৃতি, দেশের চাহিদা, জনগণের আদর্শিক চেতনার সাথে সংহতি রেখেই দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, তড়িঘড়ি করে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। এই শিক্ষানীতি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমার মতে, প্রাক প্রাইমারী+ ১ম+ ২য় + ৯ম-১২শ ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ডিগ্রী লেভেলে ২০০ নম্বর ইংরেজী ও ২০০ নম্বর ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষাকে

www.bjilibrary.com

মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের সাথে পরামর্শ করেই করা উচিত। কওমী ও O-Level A-Level কে শিক্ষানীতির আওতায় আনা দরকার। মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষার জন্য আলাদা এফিলিয়েটেড ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করা উচিত। আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, সাধারণ, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সকল ধারাতে বৈষয়কি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী ও ইসলামী বিষয় আবশ্যিক হিসেবে চালু করতে হবে। মুসলিম শিশুদের পাশাপাশি অমুসলিম শিশুদের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি পাঠদানের প্রয়োজন নেই। কারণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্ধেক শিক্ষার্থী ঝরে যায়। এই ইংরেজি শিক্ষা তাদের জীবনে কোন কাজে আসবে না। বরং ধর্মীয় শিক্ষা তাদের জীবনে বেশি কাজে আসবে। বর্তমান শিক্ষানীতি একটি প্রহসন মাত্র। এদেশে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হতে দেবে না এ দেশের জনগণ।

জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সকল সময় নানা ধরনের বিতর্ক ও বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে। বর্তমান শিক্ষানীতি তারই একটি অংশবিশেষ। তারাও জানে এই সেক্যুলার শিক্ষানীতি এদেশে কখনো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, তবুও তারা এটা কেন করছে? কারণ হলো দেশের বর্তমান যে অবস্থা, তাতে করে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষের দৃষ্টি এখন অন্য দিকে নেয়ার জন্যই তারা সুকৌশলে শিক্ষানীতির ওপর হাত দিয়েছে। সরকারের অপকৌশল সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এদেশের মানুষের আদর্শ, জীবনাচার, সংস্কৃতি এবং প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডের আদলেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। যেটা হবে বাস্ত বমুখী ও সময়োপযোগী। প্রকৃত অর্থে দেশের মানুষ আর কোনো প্রতারণার শিকার হতে চায় না। এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, বর্তমান শিক্ষা নীতি সরকারের একটি বড় ধরনের চালাকি। তারাও জানে, এদেশের মানুষ কি চায়। দেশের মানুষ যে চাপিয়ে দেয়া কোনো অন্যায় নীতি সহ্য করে না, সেটাও তারা জানে। তবুও তড়িঘড়ি করে শিক্ষানীতির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা হাত দিল কেন? নিশ্চয়ই এর অন্তরালে অন্য কোনো রহস্য আছে। তারা সরকারী অর্থ অপচয় করে যে শিক্ষানীতি

www.bjilibrary.com

প্রণয়ন করেছে, সেটা কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা হওয়া উচিত। সরকারও চায় এটা নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি, আর তারা সেই সুযোগে ট্রানজিট করিডোর, সেতু, বাজারদর, টেন্ডারবাজি, লুটপাট ইত্যাদি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাক। কিন্তু না, আমাদের সকল দিকেই চোখ কান খোলা রাখতে হবে। সকল দিকেই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, শিক্ষা নীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষার সংজ্ঞা। আমাদের শিক্ষানীতিতে এই সংজ্ঞা আমার নজরে পড়েনি। সংজ্ঞাহীন এই শিক্ষা আমাদের সন্তানদের সংজ্ঞাহীন করে গড়ে তুলছে। জ্ঞান আহরণন, অজানাকে জানা, নিজের দর্শ, তাহজীব তমদ্দুন, ঐতিহ্যকে জানা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষা মানুষত্বে উত্তরণের বাহন, পশুকে মানুষের পরিণত করে এবং মানুষকে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে। শিক্ষা পরাশ্রয়িতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করতে সাহায্য করে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ শিক্ষার্থীদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সার্টিফিকেট পাওয়া হচ্ছে বড় কথা, অভীষ্ট লক্ষ্য সর্বত্র অনুপস্থিত। নীতিহীনতা সর্বত্র মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। এই শিক্ষা মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করছে না বরং গুরুজনরা বাল্যকালে যে মূল্যবোধ শেখাচ্ছেন তা শুধু ভুলিয়ে দিচ্ছে না, বিরোধিতা ও অবহেলা করতেও শেখাচ্ছে। সনাতন মূল্যবোধ যে কোন দেশে এমনটি পাশ্চাত্যেও ধরে রাখা হয়, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী তা ধ্বংস করতে শেখান। আমাদের দেশে অশিক্ষিত লোকের তুলনায় শিক্ষিত লোকের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় বেশি। অশিক্ষিত লোকেরা শ্রমের মর্যাদা দেয়, কিছু না কিছু কাজ করে। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের মধ্যে পরাশ্রয়ী সংখ্যা বেশি। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজী, যৌতুক ইত্যাদি শিক্ষত লোকদের অবদান। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কাজ করতে চায় না, ধনী লোকের মেয়ে খুঁজে যৌতুক নেয়। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজী, ধর্ষণ, লাম্পট্য ও লূটপাটের প্রসার ঘটছে।

বর্তমান শিক্ষা জ্ঞান আহরণের বাহন হচ্ছে না, মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটাচ্ছে না, কর্মমুখী আত্ম নির্ভরশীল হতেও তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। তথাপিও এর যৎসামান্য, যে কতটুকু ইতিবাচক দিক আছে নতুন শিক্ষানীতি তাও ধ্বংস করে দেবে।

www.bjilibrary.com

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, বাংলাদেশের জন্য একটি যথোপযুক্ত ও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার অভাব আমাদের পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ। দেশ ও জাতিকে উন্নত ও অগ্রসর করতে হলে সেটা অতি অবশ্যই করতে হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের যদি মানব উন্নয়নমুখী ও নৈতিকমান অর্জনকারী শিক্ষানীতি না থাকে তাহলে আমাদের অগ্রসরতা কীভাবে সম্ভব হবে? শিক্ষানীতি না-থাকার পাশাপাশি যদি ভুল শিক্ষানীতি বা শিক্ষা পরিকল্পনা কাজ করে, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি বৈ হ্রাস পাবে না। দু:খের ব্যাপার হলো, জাতির চিন্তা- চেতনা স্বপ্ন উজ্জীবনকারী শিক্ষানীতির অনুপস্থিতিতে কতিপয় আমরা কিংবা অজনসমর্থিত সামরিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সময়ে সময়ে বাংলাদেশে সে শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো জাতির সদ্যস্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারেনি। একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরী এ কথাটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর এ দলের সরকারই ১৯৭৪ সালে কুদরই-ই-খুদা শিক্ষাণীতি প্রণয়ন করেছিল যা দেশের চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী ছিল। জনগণ উক্ত নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিগত ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর এ দলের সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য এতা তাড়াহুগা করে নি। কিন্তু এবারে সরকার তরিঘড়ি করে শিক্ষানীতি প্রণয়নে হাত দিয়েছে। এ দেশের ৮৫% মুসলিম, যাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলাম। কিছুনি পূর্বে একটি আমেরিকান সংস্থা জরীপের পর জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ৯৯ ভাগেরও অধিক ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তই সরকার যে সেক্যুলার শিক্ষানীতি প্রণয়েনের অগ্রসর হচ্ছে, তা অত্যন্ত বাধার সম্মুখীন হবে। বিশেষ করে যেখানে বিরোধীদলের নেত্রী এ শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সরকারের উচিত সংসদে বিরোধী দলগুলোর উপস্থিতিতে শিক্ষানীতির ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে consensus-এর ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। তা না হলে বিরোধিতার কারণে তার গ্রহণযোগ্যতা পাবে না, বরং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যেতে পারে, যা সরকারের

www.bjilibrary.com

জন্য কল্যাণকর হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানব সম্পদ তৈরিতে ইসলামী পদ্ধতির শিক্ষার কোন বিকল্প নেই এটা আমাদের শিক্ষাবিদগণকে প্রমাণ করতে হবে। তাদের প্রমাণ করতে হবে আদর্শবাদী মানব সম্পদ তৈরি ইসলামী ব্যবস্থাপনার শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, কোন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে সে জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে, আরোহণ করাতে। আবার শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে কোন জাতিকে অধঃপতনের অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে। একথা আমরা সবাই স্বীকার করি যে, বর্তমান দুনিয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশি শান্তি বিরাজ করছে সৌদি আরবে। এর পেছনে দু'টি প্রধান কারণ আছে বলে আমি মনে করি- এক. মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কিছু মৌলিক বিধান সেখানে বাস্তবায়িত হয় যা অন্য কোথাও হয় না।

দুই. সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরাও বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতির প্রণয়ন কমিটির যারা সদস্য তারা সবাই সমাজতন্ত্রের নেতা কর্মী। শিক্ষানীতি কারিক্যুলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সেই চিন্ত াধারার লোকের দ্বারা প্রণীত হবে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি! এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি আছে? এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ সেক্যুলারিজম এবং বর্তমান সংবিধান বিরোধী। এই শিক্ষানীতিতে ধর্ম শিক্ষার সংকোচন করা হয়েছে।

মুসলিমদের জন্য ইসলামের বাইরে নৈতিকতা উৎস খোঁজার দরকার নেই, থাকতেও পারে না। নৈতিকতার উৎসতো ধর্মই।

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ তাওহীদ হুসাইন বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষানীতির ঐতিহাসিক পটভূমি হলো, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন [১৯৭৪], কাজী জাফর আহমদ শিক্ষা কমিশন [১৯৭৭], মফিজ খান শিক্ষা কমিশন [১৯৮২], শামসুল হক শিক্ষা কমিশন [১৯৯৭ ও ২০০০], মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন [২০০৩]। এছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগে মাওলানা মহিউদ্দিন শামীর নেতৃত্বে গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন, বিশপ মাইকেল ডি রোজারিওর নেতৃত্বে খ্রিস্টান শিক্ষা কমিশন ১৯৮৭ ইত্যাদি উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিক্ষানীতিতে পবির্তন অনেক রকম হতে পারে তার কিছুটা উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে আদর্শিক

www.bjilibrary.com

পরিবর্তনের উল্লেখ করা যায়। যেমন ১৯৯২সালের ২৩ ডিসেম্বর কাজাখস্থানের রাজধানী আলমা আতায় তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়েনের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরভাচেভ সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেন নতুন ১৫টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। [৬টি মুসলিম রাষ্ট্রসহ] সমাজতন্ত্র, নিজ ভূমিতে আত্মহত্যা করে। পৃথিবী আজ ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড। সমাজতন্ত্র শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না।

শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনিষীদের বক্তব্য যেমনঃ Milton বলেন, "Education is the harmonious development of bodys, mind and soul." আল্লামা ইকবাল বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মশক্তির জাগরণ। কিভাবে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় তা জানার নাম শিক্ষা। সুতরাং সেই আলোকেই আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, আজকের বিশ্বে মানব জাতি তাদের মূল যে লক্ষ্য সেটি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। কারণ মানুষকে যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তালায়া সৃষ্টি করেছেন, তিনিই শিক্ষার নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই সাথে এই শিক্ষা নির্দেশনা কিভাবে বাস্ত বায়িত হবে তার নীতি কী হবে তাও তিনি যুগে যুগে মহান শিক্ষক দ্বারা মানব জাতির কাছে পেশ করেছেন। এবার যেসকল জাতি মহান স্রষ্টার দেয়া বিধান এবং রাসূল [সা] প্রদর্শিত শিক্ষা নীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের মন গড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে কোন জাতির উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে তাদের সেই শিক্ষা নীতিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী শিক্ষানীতি যেমন বাংলাদেশী মানবগোষ্ঠীর কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি তেমনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ড. কুদরত-ই-খুদা প্রণীত শিক্ষানীতিও তার মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার কারণে এদেশবাসীর কাছে গ্রহণযো্য হয়নি। ■

www.bjilibrary.com

১৮৫৮ : সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহসংগ্রাম

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** আমাদের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম একটি মাইলফলক ও টার্নিং পয়েন্ট। এই যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল, কাদের বিরুদ্ধে, কারা এর বিরোধিতা করেছিল এবং এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফল কি হয়েছিল– সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সম্যক অবহিত হতে হবে। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অথচ এই বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা ও লেখালেখি হয় না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যারা ইতিহাসসচেতন, যারা লিখতে পারেন– তাঁরা অন্যবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এতবড় একটি মহা ঘটনাকে সেইভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সমাজের বিকেবসম্পন্ন লেখক ও গবেষকগণ যদি সচেতন হন, তাহলে তাঁরা এই জাতিকেও সচেতন করে তুলতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম ছিল বৃটিশবিরোধী এক রক্তাক্ত মহাসংগ্রাম। ১৮৫৭ সালের এই মাহসংগ্রাম ছিল কিসের পরিণতি? সেটা বুঝতে হলে আমাদের অন্তত একশো বছরের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

গত ৩১শে অকটোবর, ২০০৯ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

www.bjilibrary.com

সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "১৮৫৭ : সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মাহফুজ পারভেজ। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. এম. উমার আলী, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমিন, জনাব হাফিজুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, ইতিহাস মানুষের অন্যতম প্রেরণার উৎস। সত্য ইতিহাস পেছনে রাখা কিংবা তার থেকে দূরে থাকার অর্থই হলো নিজেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করা। এটা কোনো ব্যক্তির জন্য যেমন কাম্য নয়, তেমনি একটি জাতির জন্যও কাম্য নয়। ইতিহাসবিমুখ হলে যেকোনো জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই ক্ষতি অপূরণীয়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার রক্তাক্ত মহাসংগ্রামের ইতিহাস থেকে আমাদের জাতিকে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ এই ধরনের ইতিহাসই বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির চিন্তাকে নাড়া দেয় ও জাগ্রত করে। তবে আশার কথা হলো, সকলপ্রকার আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের অবস্থান। এটা আগেও ছিল, এখনো আছে, আগামীতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ড. এম. উমার আলী বলেন, ইতিহাস আমরা পড়ি না। ইতিহাস আমরা ভুলেও যাই। এটা শুধু সীমিত সেক্টরে নয়। এটা জাতীয় ক্ষেত্রে একটা বড় ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জাতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিরাজমান খারাপী অবস্থা, জুলুম, অবিচার, পীড়ন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়াবহতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্যেকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার চাহিদায় এক হিংস্র অপশক্তির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য অন্য অপশক্তির হাতে সম্পর্কিত হচ্ছে। আজকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ১৮৫৭ সাল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আজ মুসমিলমদের মাঝে অনেক বিভেদ। এখনও ইসলামী

www.bjilibrary.com

কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশাল ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যপারে আমাদের সচেতন হতে হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, অতীতের মুসলিম ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। ১৮৫৭ সালের চেতনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়োজন। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে, যতক্ষণ তোমরা দীন ত্যাগ না কর।' হাদিসে বলা হয়েছে, 'মুসলিম জাতিকে এখানে প্রেরণের লক্ষ্য মানব জাতিকে পরাধীনতার শিকল থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর দাসে রূপান্তরিত করা।' ১৭৫৭-১৮৫৭ সালে মুসলিমগণ মূলত সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীর শিকল থেকে নাজাত লাভের জন্য অনুরূপ আন্দোলন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ১৮৫৭ : সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মুসলিমদের অতীত পরিচয় এবং বীরত্ব গাঁথার সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইতিহাসের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে হবে, তাহলে আমাদের মধ্যে সুপ্ত বিবেক জাগ্রত হবে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত : ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সোপান হিসেবে কাজ করেছে। মুসলিমরা জন্মগতভাবে স্বাধীন আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো অধীনতা তারা স্বীকার করতে পারে না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব তথা মুসলিমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর মৌল চেতনায় আজও উজ্জীবিত হবার দাবি রাখে। এ ধরনের অতীত ইতিহাসই আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির বলেন, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষমতা হারানোর অস্থিরতায় পীড়িত মুসলিমদের অবৈধ কার্যকলাপ, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, প্রযুক্তি বিমুখতা, ইসলামী জীবন আচরণে বৈপরিত্যতা-সীমাহীন আনুগত্যহীনতা এ সবকিছুই আমাদের মাঝে বিরাজমান। যার কারণে ১৮৫৭ পরবর্তী ১৫০ বছরেও মাথা তুলতে না পারার অমোঘ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের যাতাকল থেকে মুক্ত হয়েও কেন আমরা বৃটিশদের আদলে দেশ শাসন করতে ব্রতী হলাম? আজ আমরা স্বাধীন। অথচ ইসলামকে উৎখাত করতে কেউ কেউ উঠে-পড়ে লেগেছে। আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু গোলামী মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এটা বৃটিশ শাসনের কুপ্রভাবে

www.bjilibrary.com

যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি হলো ইসলামের সর্বজনীনতা ও মানবিক আবেদন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতা। এক অতুলনীয় মানবিক জীবন বিধান ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাসূলের শেখানো পথেই আমাদের পথ খুঁজতে হবে।

ইতিহাস সকল সময়ই একটি শিক্ষণীয় বিষয়। ১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার ইতিহাস ঘুরে ফিরে বার বার জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সুদূর পরাহত করবে। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক–একটি সর্বব্যাপী আন্দোলন প্রয়োজন। শুধু রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আন্দোলনরূপে একে বিবেচনা করলে ১৮৫৭-এর মাহসংগ্রামের মূল চেতনা আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে, সেটা কখনো কাম্য হতে পারে না।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুধুমাত্র, ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য জন সাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি ব্যাপকতর ছিল। এটা ছিল গণবিদ্রোহ-গণবিপ্লব এর প্রতি জনগসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা। বৃটিশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সংগে এদেশে নতুন অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছিল এবং বৃটিশ সরকার যেসব নতুন সামাজিক ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তার ফলে পুরাতন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত লোকের মনে অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল তারই পরিণাম। লর্ড ডালহৌসির সম্প্রসারণবাদী নীতির ফলে অনেকগুলো ভারতীয় দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাপের দরুণ কৃষকরে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। সেই সংগে ভারতীয় বাজারে বৃটিশ যন্ত্র শিল্পজাত পণ্যের আমদানী এদেশের লক্ষ লক্ষ হস্তশিল্প ও কারিগরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের মাধ্যমে তাদের বিক্ষোভের অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম বলেন, সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস আর গোলাম আজো বিদ্যমান। চিরকালই একটি গোষ্ঠী উদারনৈতিকতার তথা হবপঁষধৎরংস এর মুখোস চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদের লজ্জাহীন দালালি ও লেজুড়বৃত্তি করেছে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধ যারা সেদিন দাঁড়িয়েছিল, তাদের বক্তব্য, বিবৃতির

www.bjilibrary.com

সাথে আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকদের অনেক মতামতের আশ্চর্য মিল রয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। তখন সংগ্রামের অনুসারীদের স্বাধীনতাকামী না বলে ইংরেজ ও কলকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবী-মিডিয়া বলতো ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ হয়েছে। আর এখন মুসলিমদের দেখলেই বলার চেষ্টা করা হচ্ছে জঙ্গি বা মৌলবাদী! ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! শতবর্ষেরওবেশি সময় পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত বিপ্লবী-স্বাধীনতাকামী-মুক্তিযোদ্ধার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার কাজটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। এসব হতাশা আর অবক্ষয়ের মধ্যেও আশার আলো আছে। কেননা, ১৮৫৭ সাল আমাদেরকে শত্রু-মিত্র চিনিয়ে গেছে, পথের দিশা রেখে গেছে। সেটি সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদরিরোধী সংগ্রামের চিহ্ন। কোনও সন্দেহ নেই আজকেও মানব জাতির প্রধান সমস্যার নাম সাম্রাজ্যবাদ আর আধিপত্যবাদ, যার থেকে মুক্তির জাতীয় মহাসড়কে পৌঁছানোর প্রধান অবলম্বন অবশ্যই ১৮৫৭ সালের শিক্ষা ও প্রেরণা। ১৮৫৭ এর ঘটনা-প্রবাহ সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ উৎখাতের মাধ্যমে মুক্তি আর স্বাধীনতার অনন্ত প্রেরণা জাগিয়ে রেখেছে উপমহাদেশের প্রতিটি মুক্তিকামী, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য। আমরা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তি লগ্নে, আন্দোলন-সংগ্রামে, মুক্তির মিছিলে শুনতে পাই ১৮৫৭ সালের অনিঃশেষ আহ্বান।

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ তাওহীদ হুসাইন বলেন, ইতিহাস হচ্ছে অতীতের দর্পণ, বর্তমানর বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। মার্কিন ও বৃটিশরা বরাবরই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা সমসময় সকল স্থনে স্থনীয় এজেন্ট তৈরি করে নিত। যেমনা পলাশী যুদ্ধের সময় ব্যক্তি স্বার্থ, প্রলোভন, ক্ষমতা, অর্থলিপ্সা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ের উর্ধ্বে না উঠতে পারায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ সময় সংকটপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতাহীনতা আর পশ্চাতপদতার লাঞ্ছনার নিগড়ে বন্দি ছিল। আমাদের শত্রু ও ভুল চিহ্নিত করে অগ্রসর হতে হবে। মুসলিমরা একটি ছকে বাঁধা পদ্ধতিতে সময় পার করছে। কিন্তু বিধর্মীদের মুকাবিলার যোগ্য করে গড়ে উঠছে না। এক্ষেত্রে প্রতিভাধর ও যোগ্যদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। মুসলিম বিশ্বে সম্পদ-অর্থ, সংখ্যাধিক্য, ভূখণ্ড, ভৌগোলিক গুরুত্ব ও অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ, এ বিষয়গুলোকে কাজে লাগাতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন। মুসলিম জাতিসত্তার পরিচয় ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ১৮৫৭ সালের রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল সাহসী পদক্ষেপ। বৃটিশের নৃশংসতা থেকে মুক্ত হবার জন্য এই সংগ্রাম ছিল অনিবার্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সেই মহাসংগ্রামের ইতিহাসের সাথে আজকের প্রজন্ম আদৌ কি পরিচিত? বলা যায় সচেতনভাবেই তাদেরকে সত্য ইতিহাস থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ ১৮৫৭ সালের সেই মহাসংগ্রামই ছিল আমাদের প্রতিটি আধিপত্যবাদীবিরোধী প্রতিটি সংগ্রামের প্রেরণার উৎস। আজ প্রয়োজন আমাদের ইতিহাস-সচেতন হওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ও ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সেমিনার পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।■

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা